বৈশাখ । ১৩৮৩ চতুর্থ বর্ষ । প্রথম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮৩ ॥ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী
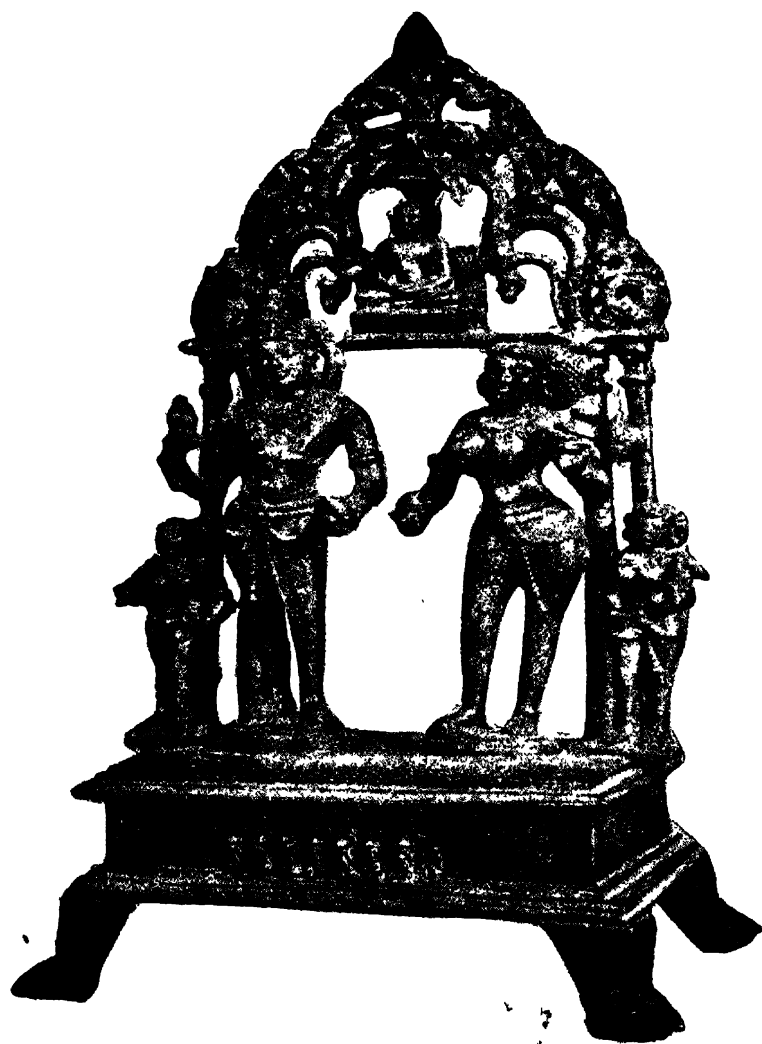
মহাবীরের যক্ষ ও যক্ষিনী
রজনপুর খিনখিনি, বিদর্ভ
চালুক্য কালীন

প্রবন্ধ চিন্তামণি

পূরণ চাঁদ সামসুখা

[রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস হইলেও অন্য পুরাণাদির ন্যায় ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা উহাদের মধ্যে কতক রূপক ; কতক নানারূপ কাব্যালঙ্কার সমাচ্ছাদিত। একমাত্র কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিণী' হিন্দু রাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস মধ্যে গণ্য। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ সমুচ্চয়ের মধ্যে অনেক গ্রন্থে সত্য ঘটনা অবিকৃত আছে। আমাদের আলোচ্য 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' এইরূপ একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। খৃষ্টোত্তর ১৩০৪ অব্দে মেরু তুঙ্গাচার্য নামক জৈন যতি ইহা প্রণয়ন করেন। ইহা সংস্কৃত গদ্য-ভাষায় রচিত ও পঞ্চসর্গে সমাপ্ত। আমরা ইহার কোনো কোনো অংশের সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।]

[১]

গুর্জর দেশে বঢ়িয়ারাভিধান বিভাগের অন্তর্গত পঞ্চাসর নামক গ্রামে চাপোৎকট বংশীয় এক বালক পেটিকায় সংরক্ষিত হইয়া বন নামক বৃক্ষের শাখায় ঝুলিতেছিল ও তাহার মাতা ইতস্ততঃ ইন্ধনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছিল। ঘটনাক্রমে শ্রীশীলগুণ সূরী নামক জৈনাচার্য তথায় আগমন করিলেন। তিনি বালকের অঙ্গোপাঙ্গে নানাবিধ সুচিহ্ন দর্শন করিয়া পরে প্রভাবিক পুরুষ হইবে এই আশায় তাহার জননীর জীবন ধারণোপযোগী বৃত্তির সংস্থান করিয়া বালকটিকে গ্রহণ করিলেন। বীরসতী নামক সাধ্বী তাহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বনবৃক্ষে ঝুলিতেছিল বলিয়া গুরু ইহার বনরাজ নামকরণ করিলেন। ক্রমে বনরাজ অষ্ট বর্ষ বয়ঃ ক্রমে উপনীত হইলে গুরু ইহার অসাধারণ বলবীর্য ও রজোগুণাধিক্য দেখিয়া তাহার মাতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বনরাজ মাতার সহিত কোন পল্লীগ্রামস্থ মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতুল চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। কালক্রমে বনরাজও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি মহানিকা নাম্নী কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ গুজরাতের একখণ্ড প্রদান করেন। এই প্রদেশ হইতে কর সংগ্রহার্থ কান্যকুব্জাধিপতি পাঁচজন বলবান পুরুষ প্রেরণ করিলেন। প্রায় ছয় মাস কাল পরে যখন ইঁহারা কর সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন সৌরাষ্ট্রের সন্নিকটে বনরাজ ইঁহাদিগকে আক্রমণ করতঃ নিধনপূর্বক চতুর্বিংশতি লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ও চারি সহস্র তেজস্বী অশ্ব লুণ্ঠন করিলেন। কিন্তু কান্য-

কুব্জাধিপতির ভয়ে বর্ষেক কাল বনান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ধন ও বল সংগ্রহপূর্বক কান্যকুব্জাধিপতির রাজ্য উৎসাদন করিয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিলেন।

নূতন রাজধানী স্থাপনার্থ উপযুক্ত ভূমি অন্বেষণ করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলে অনহিল্ল নামক জনৈক ব্যক্তি উপযুক্ত স্থান প্রদর্শন করায় তাহার নামানুসারে অনহিল্লপট্টন নামক নগর সংস্থাপন করিলেন। খৃষ্টোত্তর ৭৪৬ অব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে নব প্রতিষ্ঠিত অনহিল্লপট্টনে বনরাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। জম্বা নামক বণিক প্রধানামাত্য পদে বরিত হইলেন। অভিষেকানন্তর পঞ্চাসর গ্রাম হইতে শ্রীশীলগুণ সূরীকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইলেন ও বিনয় পূর্বক সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সংসার ত্যাগী নিস্পৃহ যতি সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন। বনরাজ সূরীর আদেশ ক্রমে ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থংকর শ্রীপার্শ্বনাথ স্বামীর চৈত্য ও তদভ্যন্তরে স্বকীয় আরাধক মূর্তি স্থাপন করিলেন। বনরাজ ৫৯ বৎসর ২ মাস ২১ দিন যাবৎ রাজ্য ভোগ করিয়া ১০৯ বৎসর বয়ঃক্রমে ৮০৬ খৃষ্টাব্দে তনু ত্যাগ করিলেন। বনরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যোগরাজ ৮০৬ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসীয় শুক্লা তৃতীয়াতে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইঁহার তিন পুত্র। একদা ক্ষেমরাজ নামক কুমার পিতাকে বলিলেন যে অন্য দেশীয় ভূপতির বাহিনী সহস্র তুরঙ্গ, পঞ্চাশৎ হস্তী ও অন্যান্য বহু দ্রব্য সহ সোমেশ্বর পত্তনে আগমন করিয়াছে ও আমাদের রাজ্য মধ্য দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিবে। অতএব যদি আপনি আদেশ প্রদান করেন তবে সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লই। কিন্তু ভূপতি পুত্রকে নিষেধ করিলেন। কুমারত্রয় পিতার বার্দ্ধক্যবশতঃ বুদ্ধি বৈকল্য ঘটিয়াছে মনে করিয়া গুপ্তভাবে সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক হঠাৎ বাহিনীর উপর আপতিত হইলেন ও ধনাদি সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করিলেন। যোগরাজ পুত্রগণের বিধি বিগর্হিত আচরণে ক্রোধাতুর হইলেন ও বিরাগবশতঃ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োপবেশন অনুষ্ঠান পূর্বক চিতাপ্রবেশে (৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া) একশত বিংশতি বর্ষ বয়ঃ ক্রমে ৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইনি ভট্টারিকা যোগিনী দেবীর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর ক্ষেমরাজ ৮৪১ অব্দে সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ইনি ২৫ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার পুত্র ভুবনাদিত্য ৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৯ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তৎপরে বৈরি সিংহ ৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৫ বৎসর ও তৎপুত্র সামন্ত সিংহ ৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এইরূপে চাপোৎকট বংশীয় সপ্ত সংখ্যক ভূপতি ১৯৫ বৎসর পর্যন্ত অনহিল্ল পট্টনে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া ছিলেন।

চাপোৎকট বংশীয় শেষ ভূপতি সামন্ত সিংহের মূলরাজ নামক এক শৌর্যবীর্য সম্পন্ন ভাগিনেয় ছিলেন। সামন্ত সিংহ মূলরাজকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মূলরাজও স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে মাতুলের রাজ্য অনেক বিস্তার করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় সামন্ত সিংহের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল। ইনি সময়ে সময়ে মূলরাজকে সিংহাসন প্রদান করিতেন ও সময়ে সময়ে তাঁহাকে অপসৃত করিয়া নিজে সিংহাসনারোহণ করিতেন। একদা সামন্তসিংহ মূলরাজকে পুনঃ সিংহাসন প্রদান করিলে মূলরাজ উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়া মাতুলকে নিধনকরতঃ প্রকৃতপক্ষে গুজরাতের রাজা হইলেন। এইরূপে গুজরাতের সিংহাসন চৌলুক্য বংশীয়গণের করায়ত্ত হইল। একদা সপাদলক্ষীয় (চাহমান) ভূপতি মূলরাজের সহিত যুদ্ধার্থ গুজরাটের প্রান্তভাগে শিবির সংস্থাপন পূর্বক তদ্দেশ আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তৈলঙ্গদেশীয় নৃপতির বারপ নামক সেনাপতিও গুজরাতের উপর আপতিত হইলেন। এককালে উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া মূলরাজ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শকরতঃ কচ্ছের সন্নিকটস্থ কান্থাদুর্গে প্রস্থান করিলেন।

সপাদলক্ষীয় ভূপতির নবরাত্র নামক বাৎসরিক পর্ব দিবস নিকটস্থ জানিয়া মূলরাজ মনে করিয়াছিলেন যে সে সময়ে এই নৃপতি নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন ও এই সুযোগে বারপ সেনানীকে পরাস্ত করিব। পরে সপাদলক্ষকে পরাজিত করিব। কিন্তু সপাদলক্ষীয় ভূপতি মূলরাজের অভিসন্ধি অবগত হইয়া নবরাত্রের সময় স্বরাজ্যে প্রস্থান না করিয়া তৎস্থানেই শাকম্ভরী নামক নগরী স্থাপন পূর্বক নবরাত্রের উৎসব সমাধা করিলেন। মূলরাজ ইহা অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাতুর হইলেন ও মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিজের সামন্তগণকে সৈন্যসহ সপাদলক্ষ ভূপতির শিবিরের সন্নিকটে নির্দ্ধারিত দিবসে ও নির্দ্ধারিতক্ষণে লুক্কাইতভাবে সজ্জিত থাকিতে গুপ্ত আদেশ প্রদান করিলেন এবং পূর্ব হইতে কয়েকজন রাজপুত্রকে সৈন্যগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। স্থিরীকৃত দিবসে মূলরাজ বেগবান হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অল্প কয়েকজন দেহরক্ষক সমভিব্যাহারে অতি প্রত্যূষে সপাদলক্ষীয় ভূপতি চাহিনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎমাত্রও দ্বিধা না করিয়া মিত্রের ন্যায় অকুণ্ঠিতভাবে বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করতঃ একেবারে ভূপতির শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং ত্বরিৎ হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া একজন দ্বারপালকে বলিলেন যে, "তোমার রাজাকে বল যে গুর্জর দেশাধিপতি শ্রীমূলরাজ আগমন করিয়াছেন।" প্রতিহারী শিবিরাভ্যন্তরে যাইতে না যাইতেই মূলরাজ স্বীয় প্রচণ্ড রাজদণ্ডে অন্যান্য প্রহরীকে বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রত্যাদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে শিবিরাভ্যন্তরে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে প্রবেশ করতঃ সপাদলক্ষ ভূপতির সুবর্ণ পালঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। ভয়ভ্রান্ত নৃপতি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই স্থিরচিত্ত হইয়া বলিলেন যে, "আপনিই কি মূলরাজ?" মূলরাজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে চাহমান নৃপতি বাক্যস্ফুরণের উপক্রম করিতেছিলেন, ইত্যবসরে

পূর্ব সঙ্কেতানুযায়ী মূলরাজের চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য হঠাৎ সপাদলক্ষীয় ভূপতির শিবির পরিবেষ্টন করিল। অনন্তর মূলরাজ বলিলেন যে, "হে ভূপতি, এই পৃথিবী মণ্ডলে মৎসহ যুদ্ধক্ষম সর্বগুণপেত মুকুটধারী কোন রাজা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আপনিই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। আপনি এখানে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছেন অতএব আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার সু:যাগ অনায়াসলব্ধ হইয়াছে, কিন্তু পরিবেশিত অন্নে মক্ষিকাপাতের ন্যায় তৈলঙ্গ দেশীয় বারপ সেনানী আমাদের যুদ্ধে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। অতএব যতদিন পর্যন্ত আমি তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া প্রত্যাগমন না করিব ততদিন আপনি পক্ষপাতশূন্যভাবে এই স্থানেই অপেক্ষা করুন। এই অনুরোধ করিবার জন্যই আমি আগমন করিয়াছি। মূলরাজের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সপাদলক্ষীয় নৃপতি বলিলেন যে, "হে রাজন, আপনি রাজা হইয়াও সাধারণ সেনানীর ন্যায় প্রাণকে তুচ্ছ গণিয়া একাকী শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিয়াছেন এরূপ সাহসিক ও গুণবান ভূপালের সহিত আমি যাবজ্জীবন সাম্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনার সহিত আমার সন্ধি স্থাপিত হউক। কিন্তু মূলরাজ না না শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ভূপিতর ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তরবারি করে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ও স্বসৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া বেগে প্রস্থান করতঃ বারপ সেনানীর উপর সহসা আপতিত হইলেন। সংগ্রামে বারপ সেনানীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত করিয়া দশ সহস্র তুরঙ্গ ও অষ্টাদশ গজ লুণ্ঠন করিলেন। অল্প কয়েক দিবস পরেই সপাদলক্ষরাজের সহিত যুদ্ধার্থ শাকম্ভরী নগরীর সন্নিকটে আগমন করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বারপ সেনাপতির পরাজয় ও নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া সপাদলক্ষরাজ স্বদেশে পলায়ন করিলেন। এই বিজয়বার্তা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য মূলরাজ মুঞ্জালদেব নামক শিবের প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

ইহার পরে ইনি রাজধানীতে ত্রিমূর্তিশিবালয় নির্মাণ করান। এ সময়ে কচ্ছ প্রদেশে লক্ষ (অথবা লাখা) নামক জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। ইনি একাদশবার মূলরাজের সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। একারণে ইঁহার উপর মূলরাজের অত্যন্ত আক্রোশ ছিল। একদা লক্ষরাজ কপিলকোটি নামক দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া মূলরাজ স্বয়ং সসৈন্য দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। লক্ষরাজের মাহেছ নামক বলবীর্য সম্পন্ন একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি সসৈন্যে শত্রুদমনার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্যসিদ্ধি করিয়া প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে মূলরাজের সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। তথায় শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মুক্ত হইবেন জানিয়া সঙ্কটকালে প্রভুর উপকার করিবার জন্য শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লক্ষরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এদিকে মূলরাজ ও লক্ষরাজ পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মাহেছ নিজ প্রভুকে প্রণাম করিয়া

নানাপ্রকার শৌর্য গর্বিত বাক্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিন দিবস দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের পর চতুর্থ দিবসে মূলরাজ লক্ষরাজকে নিহত করিয়া জয়শ্রী লাভ করিলেন।

মূলরাজ একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে ৯৪২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন ও ৫৫ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ৯৯৭ অব্দে ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

মূলরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র চামুণ্ডরাজ ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রয়োদশ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। ইনি পট্টনে চন্দ্রনাথ ও চাচিনেশ্বর দেবের প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন।

তৎপরে বল্লভরাজ ১০১০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ইনি মালবের রাজধানী ধারা নগরী বেষ্টনকালে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি ৫ মাস ২৯ দিবসমাত্র রাজত্ব করেন।

বল্লভরাজের মৃত্যুর পর তদ্‌ভ্রাতা দুর্লভরাজ সিংহাসনাধিকার করেন। ইনি মদনশঙ্কর নামক দেবপ্রাসাদ ও দুর্লভ সরোবর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইনি একাদশ বৎসর ছয় মাস কাল রাজ্য করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমদেবকে অভিষিক্ত করিয়া কাশী যাত্রা করেন। মালব দেশের মধ্য দিয়া গমন কালে সমসাময়িক মালবাধিপতি শ্রীমুঞ্জরাজ ইঁহার অভিযান পথ অবরুদ্ধ করিয়া বলিলেন যে, যদি আপনি সন্ন্যাসীবেশে যাত্রা করেন তবে আমার কোন আপত্তি নাই, আর যদি ছত্রচামর প্রভৃতি রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া গমন করিতে অভিলাষ করেন তবে যুদ্ধ প্রদান করুন। দুর্লভরাজ ধর্মকার্যে অন্তরায় হইবে ভাবিয়া ছত্রচামর পরিত্যাগ পূর্বক ভিক্ষুকবেশে কাশীযাত্রা করিলেন ও মুঞ্জরাজকৃত সমস্ত ঘটনা ভীমদেবকে বলিয়া পাঠাইলে এই ঘটনা হইতে গুর্জর ও মালব দেশে ভীম সমরবহ্নি প্রদীপ্ত হইল।

॥ ইতি বনরাজ প্রবন্ধ ॥

সুধা, শ্রাবণ ১৩১০

[ক্রমশঃ

আমার দুয়ারে এত ফুল

শ্রীপরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

জিন মন্ত্র পরম কবিতা
পরমাণু-লগ্ন তার রূপ
প্রেরণার আধার সবিতা
আর যেন মন্দিরের ধূপ
মুগ্ধ করে অনন্য সৌরভে
আমার দুয়ারে যত ফুল।

মধু-প্রাণ তাপস যেমন
বিসর্জিল আকাঙ্ক্ষার শতবিন্দুগুলি
কেবলীর পথ কি তেমন
অদেখা সে দিগন্তের দ্বার যত খুলি
দেখাবে ভ্রমণ-অন্তে জ্যোতির্ময় শেষ উপকূল।

লবণাম্বু ঊর্মিধন্য জানি
সেখানে হিরণ্য ভারে দূর প্রবহণ
কেমন করুণ তার বাণী
আবেশিছে হৃদয়-গহন
তবু মানি বাহিরের রূপ যত চিরন্তন ভুল।

স্বর্গের ওপারে আছে যেন
অরূপের স্বর্গ-নিকেতন
পরম সে প্রতিবোধ হেন
গোধূলির শাশ্বত রতন
তবু কেন আমার দুয়ারে এত ফুল!

মেদিনীপুরে জৈনমূর্তি আবিষ্কার

ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী

কবি যে কখনও প্রত্নতাত্ত্বিক হতে পারে এটা কোন দিন আমার ধারণাতেই আসে নি কারণ দু'জনের ভাবের মধ্যে চিরবৈষম্য আছে বলেই মনে হত। কিন্তু 'there are many things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy'। আমার নিজের জীবনেই এমন ঘটনা ঘটে গেল যাতে আমার সব ধারণাটাই উল্টে গেল। অবশ্য আমি কবিও নয়, প্রত্নতাত্ত্বিকও নয়। ছেলেবেলা থেকেই আমার দোষের মধ্যে আছে কবিতা ও কাব্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভঙ্গীর ভিতর যে সৌন্দর্য নিত্যতরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে তারই দোলায় আমার প্রাণ নেচে উঠে, কল্পনারাজ্যের সুবর্ণ পালঙ্কে শুয়ে সোনার স্বপ্নের জাল বুনতে আমি চিরদিনই ভালবাসি। প্রত্নতত্ত্বটাকে আমি বরাবর অতি গদ্যময় শুষ্ক কাষ্ঠের বিষয় বলে বিভীষিকার চক্ষে দেখে এসেছি এবং অনেক সময় পেত্নীতত্ত্ব বলে উপহাস করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হইনি। কিন্তু আজ দেখছি আমাকেই সেই পেত্নীতে পেয়ে বসেছে। পাষাণ যে কথা কয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বই পড়েও আমার মন তা স্বীকার করেনি, কিন্তু আজ পাষাণের মূক কণ্ঠের নীরব ভাষা শুনবার জন্য প্রাণে কি আকুল তৃষ্ণা জেগেছে। না খেয়ে না দেয়ে আজ ছুটেছি কোন জঙ্গলে, কাল কোন অজানা গাঁয়ের পিচ্ছিল পথ দিয়ে কোথায় কোন অশ্বত্থ গাছের তলায়। একবার পথে মোটরের ধাক্কা খেয়ে নাকটাই গেল ভেঙ্গে, তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই। পাষাণ মূর্তির চরণতলে পৌঁছবার জন্য এ কি আকুল অভিসার।

আমি মেদনীপুর জেলায় ও তার পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলায় কতকগুলি মূর্তির সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি দেখে এসেছি, তাদের আলোকচিত্র তুলে এনেছি, তাদের রহস্যোদ্ঘাটনে চেষ্টা করেছি—করছি। তার যতটা অনুসন্ধান করেছি, যতটা পরিচয় পেয়েছি তারই একটা মোটামুটি আভাষ আপনাদিগকে দেবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা আমি এখনও সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি আর এ পথে আমার এই প্রথম পদার্পণ —পথ দুর্গম ও বড় কম নয়। আশীর্বাদ করুন পরে যেন পূর্ণ পরিচয় আপনাদিগকে দিতে পারি।

একরকম কাব্যের ভিতর দিয়ে আমার প্রথম মূর্তি আবিষ্কার। এমনি এক ফাল্গুন দিনে আমার এক বন্ধুর কন্যার বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে এই জেলার রামগড়

পরগণায় নেপুরা গ্রামে যাই। রামগড় স্কুলের তরুণ শিক্ষক মণ্ডলী বরযাত্ররূপে সেখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আলাপ জমতে বড় দেরী হল না। কাঁসাই নদীর বাঁকের উপর ছোট্ট গ্রামখানি, ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামল গাছে ঘেরা। বিকেলে সবাই নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া গেল। বেড়াতে বেড়াতে গ্রামের প্রান্তে নদীর উঁচু পাড়ের উপর নিরালা শিব মন্দিরে আসা গেল।

সামনে একটি বৃদ্ধ বটগাছ মন্দিরস্থিত দেবতার মত জটাজাল বিস্তার করে মহাকালের মতই মন্দির দ্বারে পাহারা দিচ্ছে। সেদিন কোন কোলাহলই ছিল না। তবে প্রতি সোমবারে সেখানে হাট বসে। কালো কেশে ফুল গুঁজে রঙবেরঙের কাপড় পরে অনেক সাঁওতাল রমণী সেদিন সে স্থানটাকে বেশ মুখর করে তোলে। এই গাঁয়েরই একটি বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ জমিদার সুকণ্ঠ পশুপতিবাবু অনতিদূরে ধন্বন্তরী মূর্তি দেখতে যাবার জন্য আমাদের অনুরোধ করলেন। আর কারো সে রকম একটা আগ্রহ না থাকলেও আমার পরিষদের যদি কোন খোরাক মেলে এই আশাতে আমি খুব কৌতুহলী হয়ে পড়লাম এবং তাঁর সঙ্গে একরকম সবাইকে টেনে নিয়ে চললাম। গিয়ে দেখি একটি বৃদ্ধ তেঁতুলগাছের নীচে একখানি পাথরে খোদাই করা একটি বৃহৎ দেবমূর্তি, মাথায় সপ্তফণা বিশিষ্ট সর্প, পদতলে প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং আশে পাশে উপরে নীচে অনেক ছোট ছোট মূর্তির সমাবেশ। কত যুগের তেল সিঁদূরের স্তর যে তার উপর জমে উঠেছে তা বলা যায় না। চারদিক জুড়ে একটা ভগ্ন মন্দিরের কিছু কিছু চিহ্ন রয়েছে। মূর্তিটি প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল একটি জৈন মূর্তি। তার কারণ আরকিছুই নয়, খণ্ডগিরি পর্বতের জৈনমন্দিরে এবং অন্যান্য দু'এক জায়গায় যেরূপ জৈন তীর্থংকরের মূর্তি দেখেছি তার সঙ্গে এটির অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

ধন্বন্তরী নামে পরিচিত পার্শ্বনাথ মূর্তি
নেপুরা, বনধার

"Eureka" বলে সেইখানেই চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হয়েছিল, কারণ বাঙ্‌লা দেশে এ পর্যন্ত জৈন relics কিছু পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। সেই প্রথম নেশা জাগল। সেই দিনই স্থির করলাম যত শীঘ্র পারি এর আলোকচিত্র নিয়ে গিয়ে এর প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করব। তারপর আমি গিয়ে নিজে তার আলোকচিত্র তুলে আনি। কিন্তু কি করা যায়? আমার ত মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। ব্যবহারজীবী আমি, কাছারী পর্যন্ত দৌড়টা বেশ অভ্যস্ত আছে কিন্তু এসব সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোন বিদ্যাই জানা ছিল না। কাজেই আমাদের পরিষদের কর্ণধার গুঁফো সরস্বতী, বিশেষ মনীষাসম্পন্ন মনীষিবাবুর শরণ নিলাম। তিনি আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন এবং রহস্যোদ্ভেদে খুবই সহায়তা করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণের বোঝা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তিনি দেখে শুনে আমার সঙ্গে একমত হলেন যে এটি জৈন মূর্তি এবং তিনি এটা ত্রয়োবিংশতি জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের মূর্তি বলে সিদ্ধান্ত করলেন। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির দ্বারা এটা খুব ঠিক বলেই মনে হয়। পরে মূল সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক ও পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত অমূল্যচরণ মহাশয়ও এই মত দিয়েছেন এবং তাঁরই সহায়তায় আর কয়েকটি যা প্রমাণ পেয়েছি তাও এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। মূর্তির ছবিটি দেখলেই দেখতে পাবেন সর্বোপরি দুই কোণে যে মূর্তি আছে তা বোধ হয় মেঘঙ্করা নামে ঊর্দ্ধলোকবাসিনী দিককন্যাগণের মূর্তি। তারা সানন্দে শিঙ্গা বাজাচ্ছে। তাদের নিম্নভাগে বৃষারূঢ় গজেন্দ্রদ্বয়ের মূর্তি। স্বয়ং পার্শ্বনাথ দণ্ডায়মান, তাঁর গর্ভবাসকালে তাঁর মা সাপকে পার্শ্বদেশে বিলম্বিত দেখেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং নীলবর্ণ ও সর্পচিহ্নধারী ছিলেন; সেইজন্য সপ্তফণা বিশিষ্ট সাপ তাঁর দেহ লগ্ন হয়ে আছে। তাঁর পায়ের নীচে প্রস্ফুটিত কমল এবং তার নীচে ভোগঙ্কশা নামে অধঃলোক-বাসিনী দিগ্‌কুমারিগণের মূর্তি। পার্শ্বনাথের মূর্তির দু'ধারে রবি, শশী, লক্ষ্মী এবং বায়ু বিমানে অবস্থিত রয়েছেন, তার নীচে অষ্টবসুগণ ও তার নীচে দু'ধারে দু'জন দেবতা চামর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'ধারে দু'দিকে সিংহ, তার নীচে হাতী, তার নীচে মানুষ (বোধ হয় যবনরাজ—যাঁকে তিনি পরাজিত করেছিলেন), এইটি বোধ হয় তাঁর ধ্বজলাঞ্ছন। অধঃলোকবাসিনী দিককুমারিগণের বাঁ দিকে বৃষভের মূর্তি ও ডানদিকে সরোবর বা সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবের মূর্তি। পার্শ্বনাথের মা পার্শ্বনাথের গর্ভ প্রবেশের আগে গজেন্দ্র বৃষভ, সিংহ, লক্ষ্মী, মালা, শশী, রবি, ধ্বজ, সরোবর, সমুদ্র, বিমান, অষ্টবসু ও অনিল এই চৌদ্দটিকে মুখমধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন। সম্ভবতঃ এই গুলিই মূর্তির চারদিকে যথা সম্ভব আঁকা হয়েছে। বিশ্বকোষ, একাদশ ভাগ, ২৯৯-৩০৩ পৃষ্ঠায় পার্শ্বনাথ সম্বন্ধে এইসব বিবরণ পাওয়া যায়। যথা ঃ

"বারাণসী পুরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় অশ্বসেন নামক এক নরপতি ছিলেন। ই'হার মহিষীর নাম বামা। একদা চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রের

যোগ হইলে মহিষী বামা নিশীথ সময়ে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি যে চতুর্দশটি মহাস্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা একজন তীর্থংকরের জন্মসূচক। বামা তাঁহার মুখমধ্যে গজেন্দ্র, বৃষভ, সিংহ, লক্ষ্মী, মালা, শশী, রবি, ধ্বজ, সরোবর, সমুদ্র, বিমান, অষ্টবসু ও অনিল [রত্ন ও নির্ধূম অগ্নি—সম্পাদক] এই চতুর্দশটিকে প্রবেশ করিতে দেখিলেন।...পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রের যোগ হইলে শুভ-লগ্নে...বামাদেবী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রটি নীলবর্ণ [সবুজ—সম্পাদক] এবং সর্পচিহ্নে চিহ্নিত হইল।...জাত বালককে ভগবান জিন বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ভোগঙ্কশা প্রভৃতি অধঃলোক নিবাসিনী দিককুমারীগণ স্বস্ব স্থান হইতে আগমন করিয়া সূতিকা গৃহের নিকট আসিয়া পুষ্প বর্ষণ করিল (২৯৯ পৃঃ)। রাজা প্রসেনজিৎ-তনয়া প্রভাবতী কিন্নরীগণের নিকট সঙ্গীত প্রসঙ্গে পার্শ্বনাথের রূপগুণের উল্লেখ শুনিয়া পার্শ্বনাথকে মনপ্রাণ অর্পণ করিলেন।...কলিঙ্গ দেশের অধিপতি যবন নামক একজন উদ্ধত প্রকৃতির রাজা...বলপূর্বক প্রভাবতীকে হরণ করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্যসহ কুশস্থলপুরী অবরোধ করে।...যবনরাজ পরে বৃদ্ধ মন্ত্রীর মুখে পার্শ্বনাথের মাহাত্ম্য কথা শুনিতে পাইয়া শশব্যস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া পার্শ্বনাথের নানা প্রকার স্তব করিল।"

James Burgess তাঁহার দিগম্বর জৈন মূর্তিতত্ত্ব নামক প্রবন্ধে (Digambara Jain Iconography, *Indian, Antiquary* Vol 32, 1903, plate ii No 7 and plate iv No 23) একটি সুপার্শ্বনাথের এবং একটি পার্শ্বনাথের চিত্র দিয়েছেন। সুপার্শ্বনাথের চিত্রের মস্তকের উপর ৫ টি সর্প এবং পদনিম্নে স্বস্তিক চিহ্ন আছে এবং পার্শ্বনাথের মস্তকে সাতটি এবং নিম্নে একটি সর্প আছে। এখানেও মূর্তিটির মাথার উপর সপ্তফণাবিশিষ্ট সর্প আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের যত রকম মূর্তি আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে কেবলমাত্র নকুলেশের মূর্তিতে মাথায় সাতটি সাপ দেখা যায়, কিন্তু সে সাপ গলায় জড়ান এবং হাতের ভঙ্গীও অন্যরূপ এবং মূর্তিটি দিগম্বর নয়। কাজেই এ মূর্তি পার্শ্বনাথ ছাড়া হতেই পারেনা। ১৯০৬-০৭ সালের *Archaeological Survay of India* বইতে ১৮৭ পৃষ্ঠায় D. R. Bhandarkar মহাশয় নকুলেশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, "There Nakulesa was represented with his head canopied by a seven-headed cobra, thus bringing to our mind its similarity to the figure of the Jaina Tirthankara Parsvanatha.

বিশ্বকোষের মতে পার্শ্বনাথের জন্মকাল ৮৭৭-৭৭৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দ।

E. J. Rapson, M.A. সংকলিত *The Cambridge History of India*-র Vol. I ১৫৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, "The 23rd Tirthankara Parsva,

the immediate predecessor of Mahavira, is said to have lived only for a hundred years, and to have died only 250 years before his more celebrated successor. Parsva is assumed, on the authority of Professor Jacobi and others, to have been an historical personage and the real founder of Jaina religion. As he is said to have died 250 years before the death of Mahavira, he may probably have lived in the eighth century B.C.

যে স্থানটায় ঐ মূর্তি আছে সেটা settlement নেপুরার টোলা মৌজা বনধার মৌজায় ১৭ দাগে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মূর্তির পরিমাণ দৈঘ্য ৬' ৪'' ; প্রস্থ ২' ১১''।

ওখানে ওই মূর্তিটিকে ধন্বন্তরী বলে পূজা করে। ব্রাহ্মণ পূজক। আর একটা বিশেষত্ব এই যে দেশে অনাবৃষ্টি হলে এই ঠাকুরের পূজা করলেই তৎক্ষণাৎ বারিপাত হয়। কিন্তু এ মূর্তি যে ধন্বন্তরীর নয় তা এক কথাতেই বুঝিয়ে দেওয়া যায়। ধন্বন্তরী শ্বেতাম্বরধর ও তাঁহার হস্তে অমৃত কমণ্ডলু, আর ধন্বন্তরী বৈনেতেয় অর্থাৎ গরুড়ের শিষ্য, সুতরাং সর্প বিদ্বেষী। সর্পচিহ্নিত মূর্তি তাঁর হতেই পারে না। ঐ স্থানটা ধন্বন্তরী ডাঙ্গা বলে পরিচিত। মূর্তিটির আশে পাশে একটা পুরানো ভাঙ্গা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এতে মনে হয় ওখানে পূর্বে মন্দিরই ছিল। পরে কালের আবর্তনে সে সৌধ ভূমিসাৎ হয়ে গেছে এবং সেখানে এই সব বড় বড় গাছ হয়েছে। তারপর মূর্তিটিকে কেউ যত্ন করে একটি গাছের তলায় বসিয়ে রেখেছে, রামগড় রাজার কৃপায় এখনও এর পূজা হচ্ছে।

মূর্তি পার্শ্বনাথের ঠিক করা গেল বটে কিন্তু সমস্যা হল মেদিনীপুর জেলায় তাঁর মূর্তি এল কি করে? বিশ্বকোষের ৩০২-৩০৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়ঃ "পরে তিনি বিশ্বের মঙ্গল কামনায় পুনরায় নানা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্ড্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে তথা হইতে তাম্রলিপ্তে গমন করিলেন···। শিব, সুন্দর, সৌম্য ইত্যাদি পার্শ্বনাথের শিষ্য হইল। পার্শ্বনাথ সেখান হইতে ক্রমে নাগপুরীতে উপস্থিত হইয়া জনৈক ধনাঢ্য অথচ পণ্ডিত বন্ধুদত্ত নামক যুবককে বিবিধ ধর্মের উপদেশ দিলেন।

এথেকে পাওয়া যায় যে তিনি এই জেলার তমলুক থেকে নাগপুর গিয়েছিলেন এবং অনেক শিষ্য করেছিলেন। এতেই মনে হয় যে মূর্তিটি তাঁর শিষ্যদের গড়া কিন্তু তাহলে একটি মূর্তিই বা থাকবে কেন? আরও থাকা সম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং যে পথের সন্ধান পাওয়া গেল সেই পথ ধরে আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্য আবার নুতন সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

পার্শ্বনাথের সময় রেলগাড়ীর লৌহবর্ত্ম ছিল না : হাঁটা পথ না হয় জলপথ এই দুটী পথ তখন প্রশস্ত ছিল। কাঁসাই নদী নাগপুর থেকে বেরিয়ে বাঁকুড়া জেলার কতকাংশ দিয়ে সমগ্র মেদিনীপুরের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। কাজেই কংসাবতীর গতি ধরে এবং তারই ধারে ধারে মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়ার মাঝখান দিয়ে যে পথ নাগপুর পর্যন্ত চলে গেছে সেই পথ রেখা ধরে প্রথম খুঁজতে আরম্ভ করি। নেপুরায় যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ছিলেন তাঁদিগকেও এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করতে বলি। নেপুরায় যে স্নেহের নীড়টি পেয়েছি তারই স্নিগ্ধ ছায়ায় বসেই এসব সন্ধান ও আবিষ্কার করতে পেরেছি। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত গোলকেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত ভবেশ চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত আতঙ্ক ভঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত পশুপতি পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস মহোদয়গণের কাছে আমি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁদের সাহায্য না পেলে আমি এ বিষয়ে এক পদও অগ্রসর হতে পারতাম না।

কালামদন মামে পরিচিত পার্শ্বনাথ মূর্তি, ডুমুরতোড়

আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার—ডুমুরতোড় গ্রামে কালামদন। মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ৩'.২" ; প্রস্থ ১'.৮"। এটিও পার্শ্বনাথের মূর্তি। প্রথম মূর্তিটির সঙ্গে মূল বিষয় সমস্ত মিলে। সেই মাথায় সপ্তফণা বিশিষ্ট সাপ, সেই পদতলে প্রস্ফুটিত পদ্ম। সেই পাশে দেবদ্বয় চামর হাতে দাঁড়িয়ে। কেবল আশপাশের চিত্রগুলি এত অস্পষ্ট যে ধরা যায় না। তাহলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এটিও পার্শ্বনাথের মূর্তি। এই মূর্তিটি আগে নদীতীরে ছিল তারপর ক্রমে নদী ভাঙতে আরম্ভ করায় কিছুকাল হল পথের ধারে একটি নিম গাছের তলায় রাখা হয়েছে। এ স্থানটি মেদিনীপুর জেলা ও বাঁকুড়া জেলার সন্ধি স্থলে। দুইটি জেলার সীমারেখা এইখানে এসে মিশেছে। আগে এটা সম্পূর্ণ মেদিনীপুর জেলার মধ্যেই ছিল। এখন সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ স্থানটী প্রথমকার স্থান থেকে প্রায় ২ মাইল দূরে। কালচক্রের

আবর্তনে এই মূর্তিটির নাম হয়েছে কালামদন। ভোক্তা নামে এক রকম নীচ জাতীয় হিন্দু এর পূজা করে। বর্তমান পূজারীর নাম লীলা ভোক্তা। প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে পূজা হয় এবং পাঠ উপলক্ষেও পূজো হয়ে থাকে। মাটীর হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি দিয়ে এর কাছে অনেকে মানসিক করে। আশ্চর্যের বিষয়, অহিংসার রাজার কাছে আজ-কাল ছাগ বলি পর্যন্ত হয়। চারিদিকে সেয়াকুল কাঁটায় ঘেরা নিমগাছের তলায় মাটীর হাতী ঘোড়া পরিবেষ্টিত হয়ে ইনি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় এখানে বিরাজ করছেন আর নির্বাক হয়ে দেখছেন দিনের পর দিন দেশ কাল পাত্রের কি অদ্ভুত পরিবর্তন।

[ক্রমশঃ

স্থূলভদ্র

[কোশার নাচঘর। স্থূলভদ্র শয্যায় শায়িত। কোশা নৃত্যরতা]

ভদ্রস্বামী ঃ বাঃ বাঃ।

[নৃত্য শেষ করে কোশা স্থূলভদ্রের কাছে গিয়ে]

কোশা ঃ কই তুমি কিছু বললে না ?

স্থূলভদ্র ঃ আমি ? হ্যাঁ, খুব সুন্দর, কোশা।

কোশা ঃ খুব সুন্দর ! এইমাত্র ? [নিকটে বসে] কিন্তু সত্যি বলত তোমার কি হয়েছে, স্থূলভদ্র ? মনে হচ্ছে তুমি যেন তোমাতে নেই।

[ভদ্রস্বামী উঠে যাবে]

স্থূলভদ্র ঃ আমি আমাতে নেই ? না, এমন ত কিছু হয়নি, কোশা।

কোশা ঃ স্থূলভদ্র, তুমি আমায় ভুলিও না। মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কাছ হতে কিছু লুকোচ্ছ। তুমি তোমাকে যত জান আমি তার চাইতে তোমাকে ঢের বেশী জানি।

স্থূলভদ্র ঃ কোশা, তোমার চোখে জল ?

কোশা ঃ তুমি আমায় ভালবাস না, স্থূলভদ্র।

স্থূলভদ্র ঃ তোমায় যত ভালবাসি তত বোধ হয় আর কিছুই নয়। তা নইলে এই সময়—

কোশা ঃ এই সময় কি, স্থূলভদ্র ?

স্থূলভদ্র ঃ এই সময় তোমার এখানে না থেকে বাড়ীতে থাকা উচিত ছিল। বিশেষতঃ আমার পিতার মৃত্যুর পর।

কোশা ঃ তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে অথচ তুমি আমায় কিছুই বলনি।

স্থূলভদ্র ঃ কি বলবার ছিল, কোশা। সেও আবার স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হত্যা—

কোশা ঃ হত্যা ? তুমি কি বলছ স্থূলভদ্র ?

স্থূলভদ্র ঃ হত্যা এবং সে হত্যা করেছে আমার অনুজ শ্রিয়ক এবং সেও পিতার আদেশে—

কোশা ঃ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, স্থূলভদ্র।

স্থূলভদ্র ঃ কেমন করে বুঝবে ? এ সমস্ত সেই ব্রাহ্মণ বররুচির চক্রান্ত। বররুচি

মহাপদ্মকে বুঝিয়েছে যে শাকডাল তাঁকে হত্যা করে তাঁর পুত্র শ্রিয়ককে রাজ সিংহাসনে বসাবার আয়োজন করেছে।

কোশা ঃ আর মহাপদ্ম সেকথা বিশ্বাস করলেন ?

স্থূলভদ্র ঃ হাঁ। মহাপদ্ম যখন পিতার প্রতি অনাদর ভাব দেখালেন তখন তিনি শ্রিয়ককে ডেকে বললেন, এরপর আমি যখন রাজসকাশে যাব তখন তুমি তাঁর সামনে আমায় হত্যা করবে। রাজা জিজ্ঞাসা করলে বলবে রাজার যে অনিষ্টকারী শ্রিয়ক তাকে ক্ষমা করে না। পুত্র, একমাত্র এই ভাবেই তুমি আত্মীয় পরিজনদের রাজরোষ হতে রক্ষা করতে পারবে। নইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সকলে বিনষ্ট হবে।

কোশা ঃ তোমার পিতা খুব দূরদর্শী ছিলেন, স্থূলভদ্র।

স্থূলভদ্র ঃ নইলে কি এতবড় সাম্রাজ্য এতদিন সঞ্চালন করতে পারতেন।

[মদনিকার প্রবেশ]

মদনিকা ঃ সর্বক্ষত্রান্তক একরাট মহাপদ্মনন্দর কাছ হতে দূত এসেছে। আর্যের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

[কোশা ও স্থূলভদ্র দৃষ্টি বিনিময় করে]

স্থূলভদ্র ঃ তাকে এখানেই নিয়ে এসো।

[মদনিকা বাইরে যায়। একটু পরে দূত প্রবেশ করে]

দূত ঃ [অভিবাদন করে] মহারাজ মহাপদ্মনন্দ আপনাকে এখুনি স্মরণ করেছেন। রথ বাইরে অপেক্ষা করছে।

স্থূলভদ্র ঃ তুমি চলো। আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

[দূতের প্রস্থান]

কোশা ঃ তুমি যাবে স্থূলভদ্র ?

স্থূলভদ্র ঃ না যেয়ে উপায় কী ? তাঁর আদেশ ত উপেক্ষা করা যায় না।

কোশা ঃ কিন্তু তুমি যেয়ো না, স্থূলভদ্র। আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হচ্ছে। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার চিত্ত ভরে উঠেছে। মহাপদ্ম যদি তোমায় বধ করেন বা কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

স্থূলভদ্র ঃ আমি সে আশঙ্কা করি না, কোশা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। কারণ তাহলে দূত আমায় অভিবাদন করে নীচে অপেক্ষা করত না।

কোশা ঃ কিন্তু স্থূলভদ্র, আমি কিছুতেই আমার মন আশঙ্কামুক্ত করতে পারছি না। এখনো দেখো আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হচ্ছে। তুমি যত শীঘ্র পার আবার এখানে ফিরে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

[স্থূলভদ্রের প্রস্থান]

মদনিকা ঃ স্বামিনি !

কোশা ঃ কি মদনিকে ?

মদনিকা ঃ গাথাপতি অচল তোমার জন্য আভরণ ও বস্ত্র প্রেরণ করেছেন ।

কোশা ঃ গাথাপতির এত দুঃসাহস ! বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমায় আভরণ ও বস্ত্র পাঠিয়েছে । ওতে আমার প্রয়োজন নেই । ও সব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল । যদি না নিয়ে যেতে চায় তবে তুলে রাস্তায় ফেলে দে ।

মদনিকা ঃ কিন্তু স্বামিনি !

কোশা ঃ বল কি বলতে চাস ।

মদনিকা ঃ বলছি ফিরিয়ে দেওয়া কি ভালো হবে । বিশেষ স্থূলভদ্রের পিতার রাজা-দেশে হত্যার পর । স্থূলভদ্র এখন নিঃস্ব আর যখন গাথাপতি তোমায় ভালবাসেন ।

কোশা ঃ বলি মদনিকে, তোকেও কি গাথাপতি কিছু বস্ত্র ও অলঙ্কার পাঠিয়েছেন ?

মদনিকা ঃ না, স্বামিনি !

কোশা ঃ তবে গাথাপতিকে গিয়ে বল তিনি যেন ভবিষ্যতে এঘরে প্রবেশের চেষ্টা না করেন । করলে তাঁকে অপমানিত হতে হবে ।···দাঁড়িয়ে কি দেখছিস ? যা—

মদনিকা ঃ যাই স্বামিনি !

কোশা ঃ ওঃ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মহাপদ্মনন্দের বিশ্রাম কক্ষ । নেপথ্য হতে সংগীতের সুর ভেসে আসবে । মহাপদ্মনন্দ চিন্তামগ্ন]

[দ্বার রক্ষকের প্রবেশ]

দ্বার রক্ষক ঃ মহারাজ, স্থূলভদ্র দরজায় অপেক্ষা করছেন ।

মহাপদ্ম ঃ .তাঁকে সমাদরে ভেতরে নিয়ে এসো ।

দ্বার রক্ষক ঃ যে আজ্ঞা, মহারাজ ।

[দ্বার রক্ষক বাইরে যাবে । স্থূলভদ্র প্রবেশ করবে]

মহাপদ্ম ঃ এসো এসো, স্থূলভদ্র ।

স্থূলভদ্র ঃ জয় হোক মহারাজের । মহারাজ আমায় স্মরণ করেছেন ?

মহাপদ্ম ঃ হাঁ স্থূলভদ্র । [পাশের চৌকি দেখিয়ে] বসো ।

[মহাপদ্মনন্দ আবার চিন্তামগ্ন]

স্থূলভদ্র ঃ [খানিক অপেক্ষা করে] মহারাজ !

মহাপদ্ম ঃ [মুখ তুলে] কি করে কথাটা আরম্ভ করব তাই ভেবে পাচ্ছি না, স্থূলভদ্র। সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ফলে এমন অঘটন ঘটে যাবে ভাবিনি। সত্যি আমি দুঃখিত, স্থূলভদ্র। তোমার পিতা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন।

মহারাজ !

মহাপদ্ম ঃ বররুচি যে কত বড় শয়তান তা আমি এতদিনে টের পেয়েছি। কল্পক বংশের সঙ্গে নন্দ বংশের সম্বন্ধ বহু দিনের। সেই সম্বন্ধের মধ্যে সে রক্তের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। স্থূলভদ্র, আমি তাকে ক্ষমা করিনি। ব্রাহ্মণ, তাই শূলে দিতে পারিনি। আমার রাজ্য হতে তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছি। মগধের সীমানায় সে আর প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু স্থূলভদ্র, যে জন্য তোমায় ডেকেছি সে এজন্য যে কল্পক হতে বংশ পরম্পরায় তোমরা যেমন নন্দ সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্ব করে এসেছ সেই ধারার, আমি চাই তুমিও অনুবর্তন কর। তোমার পিতার স্থানে তুমি মগধ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ কর।

মহারাজ !

মহাপদ্ম ঃ না-না, স্থূলভদ্র, তোমার কোনো আপত্তি আমি শুনতে চাই না। এ পদ তোমায় গ্রহণ করতে হবে। নইলে আমি সুখী হবনা।

স্থূলভদ্র ঃ কিন্তু মহারাজ, আমি একাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাছাড়া আমি দীর্ঘ দিন—

মহাপদ্ম ঃ সে আমি জানি, স্থূলভদ্র, তার জন্য তোমায় ভাবিত হতে হবে না। প্রেম মানুষকে মহান করে। তুমি কোশাকে বিবাহ কর, আমি তাকে বধূর সম্মান দেব।

স্থূলভদ্র ঃ মহারাজ ! সে আপনার ঔদার্য। কিন্তু আমি সেকথা ভাবছিলাম না। কোশার ঘর হতে আপনার এখানে আসবার সময় আকাশের ছিন্ন ভিন্ন মেঘের দিকে চেয়ে আমার মনে এক নূতন চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। মনে হয়েছে এই সংসারের সমস্তই এমনি অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত সংসারে আমার আজ আর কোনো মোহ নেই। আমায় ক্ষমা করুন, মহারাজ !

মহাপদ্ম ঃ স্থূলভদ্র, তোমার মন কোনো কারণে আজ বিক্ষিপ্ত। তুমি সময় নাও। সাত দিন পর তুমি তোমার সম্মতি জানিও।

স্থূলভদ্র ঃ মহারাজ ! তার প্রয়োজন হবে না। আমি আজই পাটলীপুত্র পরিত্যাগ করে যাচ্ছি। আমায় ক্ষমা করুন। আমার স্থানে আমার অনুজ শ্রিয়ককে নিয়োগ করুন।

মহাপদ্ম। চমৎকার, স্থূলভদ্র ! আমি তোমার পরীক্ষা করছিলাম। আমি শ্রিয়ককেই নিয়োগ করব ভেবেছিলাম। শ্রিয়ক অগ্রজ বর্তমান থাকতে সে পদ নিতে চায়নি। তাই তোমাকে আহ্বান করেছিলাম। শ্রিয়কের প্রধান মন্ত্রীত্ব নিতে আর কোনো বাধা থাকবে না। শ্রিয়ক আজ হতে মগধের প্রধান মন্ত্রী।

স্থূলভদ্র ঃ আমি ধন্য হলাম, মহারাজ !

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শিখী সেই সময় পঞ্চমহাব্রতরূপ মুনিধর্ম গ্রহণ করতেই যাচ্ছিল। কিন্তু এখন তার পিতা তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের দুঃখের কথা বললেন। সত্যিই সে দুঃখ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁর প্রতিটি বাক্যে বাৎসল্য যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠছিল।

শিখীকে তিনি বললেন, বাবা, তোর মত নম্র, বিনয়ী, নিরভিমান ও গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে কোনো ভাগ্যবানের ঘরেই জন্মায়, আমার মত দুর্বল দরিদ্রের ঘরে নয়। তাই আমার ঘরে তোর জন্ম এক আশ্চর্য ঘটনা। আমিও আবার তোর যথাযথ সমাদর করতে পারিনি। আর তোর মায়ের ব্যবহারত তোকে আমার প্রতি আরো বিমুখ করে-দিয়েছে। কিন্তু তোর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। আমি তোর জন্য অন্য ব্যবস্থা করব। তুই আমার সঙ্গে ঘরে ফিরে চল।

শিখী তার পিতার স্বভাব কোমলতার কথা জানত। তাঁকে দুঃখ দেওয়া তার অভিপ্রেতও ছিল না। কিন্তু অনায়াসে যে চিন্তামণি রত্ন প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার মূল্যও যে জানে, সে কি সহজে তা পরিত্যাগ করতে পারে?

শিখী তাই তার পিতাকে বলল, বাবা, আপনি আমাকে ভালবাসেন, আমার জন্য আপনি দুঃখিত তা আমি জানি। কিন্তু সংসারে ফিরে যাবার আমার আর ইচ্ছে নেই। দয়া করে তাই আমায় এপথ হতে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করবেন না।

শিখীর পিতা তখন তাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, মহাব্রত পালন করা তার মত বালকের কাজ নয়। আর এপথ হতে বিচ্যুত হলে তার কোথাও স্থান হয় না। মহাব্রত পালন করা তরবারির ধারের ওপর চলা ইত্যাদি। কিন্তু শিখীও তার সংকল্পে অটল হয়ে রইল।

শিখীর পিতা ব্রহ্মদত্ত তখন খিন্ন হৃদয়ে সেখান হতে ঘরে ফিরে গেলেন। যেতে যেতেও বলে গেলেন, বাবা, তোর শ্রমণ হওয়ায় আমি সম্মতিও দিচ্ছি না, নিষেধও করছি না। তোকে আশীর্বাদ করি সে যোগ্যতাও আমার নেই। তবে তোকে এই টুকুই অনুরোধ করব যে তুই তোর মায়ের ব্যবহারের কথা ভুলে যাস্। ও তার স্বভাব-দোষ। আর কখনো কোনো সময়ে দেখা দিতে আসিস।

॥ ৪ ॥

অল্প দিনের মধ্যেই মুনি শিখীর নাম চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিছু দিন আগেও যার নাম কেউ জানত না, গ্রামের সীমার মধ্যে দীন আতুরের মত যে ঘুরে বেড়াত এখন তার নাম ত্যাগী, তপস্বী ও মুমুক্ষুদের জিহ্বাগ্রে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শিখীর সংসারে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাই সে তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য তার গুরুর সেবা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত করল। গুরুরও তার ওপর বিশেষ কৃপা ছিল। তাই অল্প দিনের মধ্যেই আগম শাস্ত্রেই যে সে বিশেষ পারংগত হল তা নয়, শ্রমণের আচার সম্পর্কেও সে গভীর জ্ঞান অর্জন করল। ফলে সে যেমন পাণ্ডিত্যে তেমনি সংযম ও বৈরাগ্যেও সকলের অগ্রণী হল। এখন যদিও তার নবীন কৈশোর তবু তার সদানম্র চোখ হতে গাম্ভীর্য ও চারিত্রিক নির্মলতা ফুটে উঠত। সে সর্বদা এমন আত্ম নিমগ্ন থাকত যে মনে হত বিশ্বের যা কিছু প্রাপ্য ও বরণীয় তা যেন তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। শিখী যখন তাঁকে প্রণাম করতে আসত তখন গুরুরও মনে হত শিখী একদিন সকলের পূজনীয় হবে। শিখী গুরুরও অনেক কাজ এখন নিজের ওপর নিয়ে নিয়েছিল। সে অন্য সাধুদের কেবল যে পড়াত তাই নয়, নিজে হতে তাদের সমস্ত রকম শঙ্কারও নিবারণ করে দিত। তার সহজ পাণ্ডিত্যে তাদেরো মনে হত শিখী পূর্বজন্মের কোনো অপূর্ণ কাজই যেন পূর্ণ করতে এই পৃথিবীতে এসেছে।

তাম্রলিপ্ত নগরের বাইরের এক মনোহর উদ্যানে বসে শিখী সেদিন শাস্ত্র চর্চা করছিল। তার শান্ত কণ্ঠস্বর বীণার ধ্বনির মতই মনোহর মনে হচ্ছিল আর মাঝে মাঝে সে যখন স্মিত হাসি হেসে সতীর্থ শ্রমণদের দিকে তাকাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল তার দন্ত পংক্তি হতে মরকত মণির প্রভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সেই সময় এক ব্রাহ্মণ বটু সেখানে এসে উপস্থিত হল। মুনিদের বন্দনা করবার মত বিবেকও তার ছিল না। সে শুধু তার হাতের রত্ন-কম্বল শিখীর সামনে রেখে বলল, আপনার মা জালিনী এই রত্ন-কম্বল আপনার ব্যবহারের জন্য পাঠিয়েছেন।

মুনিরা কারু প্রেরিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। যতক্ষণ না প্রয়োজন হয় ততক্ষণ কোনো বস্তুর পরিগ্রহও করেন না। শিখীত তার গুরুর পরিত্যক্ত বস্ত্রাদিই পরিধান করত। অন্য কোনো কিছুর তার প্রয়োজনও ছিল না।

তবুও শিখী মুনি সেই আগন্তুকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। মা তার ব্যবহারের জন্য এই লোকটীর সঙ্গে রত্ন-কম্বল পাঠিয়েছেন সে কথা বিশ্বাস করতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। মা জালিনী এই রত্ন-কম্বল আপনার জন্য পাঠিয়েছেন শোনার পরও তার মনে হচ্ছিল সে হয়ত ভুল শুনেছে।

মায়ের সেই অপ্রতিম স্নেহ ও রত্ন-কম্বলের মত মূল্যবান দ্রব্য এতদূরে লোক মারফত পাঠাতে দেখে মুনিদের হৃদয়ও দ্রবিত হয়ে গেল। একজন ত বলেই উঠল—ধন্য মা! ধন্য মায়ের স্নেহ!

শিখীমুনি ততক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। সে তখন সেই আগন্তুককে সমাদর দেখিয়ে বসতে বলে জিগ্যেস করল, সত্যিই কি তুমি কোশনগরী হতে এতদূর আসছ ও এই উপহার সংসার সম্পর্কে আমার মা আমায় পাঠিয়েছেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে সেই ব্রাহ্মণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তার সামনে বসে পড়ল। তারপর বলল, আপনার চলে আসবার পর মায়ের সে কি কষ্ট। তিনি পরিতাপই করতে পারেন, আর কিই বা করতে পারেন। শেষে যখন আর থাকতে পারলেন না তখন আমায় ডেকে বললেন, সোমদেব, এই রত্ন-কম্বল তুমি তাকে দিয়ে এস।

মায়ের বাৎসল্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় সংসারে এমন আর কিছুই নেই। শিখীর হৃদয় তখন মায়ের সেই বাৎসল্য রসের প্রবাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মা যত কঠোর ও নির্মম হোন না কেন তিনি শেষ পর্যন্ত মা-ই। বাৎসল্যের স্রোত সাময়িক ভাবে রুদ্ধ হলেও তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। মায়ের রূঢ় আচরণ ও বিদ্বেষের কথা তখন শিখীর হৃদয় হতে এক দুঃস্বপ্নের মত বিলীন হয়ে গেছে, সে তাই যখন সেই রত্ন-কম্বল স্পর্শ করল তখন তার মনে হল সে যেন মায়ের চরণ স্পর্শ করেছে। সে যদি সেই সময় একা থাকত তবে হয়ত সেই রত্ন-কম্বল মাথায় করে আনন্দে নৃত্য করত।

শ্রমণদের মধ্যে বসে থাকা শিখী তার অন্তরের ভাবকে অভিব্যক্ত করতে পারল না কিন্তু সংসারী স্বজনের প্রতি আকর্ষণে শিখীর মত অচল ব্রতধারীর হৃদয়ও বিচলিত হয়ে গিয়েছিল।

শিখী তখন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলল, মা রত্ন-কম্বল পাঠিয়েছেন কিন্তু গুরুদেবের আদেশ ছাড়াত তা গ্রহণ করতে পারি না। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

শিখীকে সহসা তাঁর কাছে আসতে দেখে গুরুদেবের মুখ প্রসন্নতায় ভরে উঠল। প্রয়োজন বশেই শিখী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে বুঝতে পেরে সেই প্রয়োজন জানবার জন্য তিনি সমুৎসুক হয়ে রইলেন।

মায়ের প্রেরিত রত্ন-কম্বল কি আমি গ্রহণ করব? কম্পিত কণ্ঠে শিখী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করল।

শিখীর সেই আবেগ ও আশঙ্কাভরা কণ্ঠস্বরে মানব হৃদয়ের সহজ দুর্বলতা পরিমাপ করতে গুরুর একটুও সময় লাগল না। শিখী তখন সর্বত্যাগী তবু সুন্দর ও প্রিয়বস্তু স্বীকার করার মতো দুর্বলতা সাধুর শোভা দেয় না—সেকথা সে তখন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গুরু সেই দুর্বলতাকে ছোট করে দেখলেন না। ভাবলেন, শিখী এখন

কিশোর। মায়ের যে বাৎসল্য হতে সে এতদিন বঞ্চিত ছিল সেই বাৎসল্যের অভিব্যক্তি তাকে এখন আকৃষ্ট করেছে। বস্তুর আকর্ষণে নয়, সেই বাৎসল্যেরই প্রবাহে শিখী আজ পরাভূত। তিনি তাই তাকে সেই রত্ন-কম্বল নিতেও যেমন বললেন না, তেমনি নিষেধও করলেন না। বললেন, যদি প্রয়োজন হয়ত রত্ন-কম্বল নিতে পার কারণ আমি জানি অপ্রয়োজনে তুমি নূতন বস্ত্রও গ্রহণ কর না। মমত্বহীন ভাবে যদি রত্ন-কম্বল নিতে পার ত নিও।

কিন্তু গুরুর সেই কথার তাৎপর্য বোঝার মত মনের অবস্থা শিখীর তখন ছিল না। সে তাই মায়ের প্রেরিত সেই রত্ন-কম্বল গ্রহণ করল। তার মনে হল হাতের মুঠোয় ধরা সেই রত্ন-কম্বলে মাতৃহৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা যেন ভরা রয়েছে। শিখী সেই রত্ন-কম্বলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মায়ের হৃদয় পরিবর্তন যেন স্পষ্ট দেখতে পেল।

গুরুর কাছ হতে শিখী যখন নিজের জায়গায় ফিরে এল ব্রাহ্মণ তখনো সেখানে বসেছিল। শিখী কিছু বলবার আগেই সে বলে উঠল, জালিনীদেবী বলে পাঠিয়েছেন কোশনগর এমন কিছু দূরে নয়, একবার যদি সেখানে যান ও তাঁকে দেখা দিয়ে আসেন তবে তিনি তৃপ্তিলাভ করবেন।

রত্ন-কম্বলের সঙ্গে সঙ্গে মা যে তাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন সে কথা জেনে শিখীর হৃদয় আরো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার মনে হল তার সমস্ত দুর্ভাগ্যের আজ যেন অন্ত হয়েছে। তার মত সৌভাগ্যশালী আজ আর কেউ নেই।

আনন্দ ও আবেগে শিখীর কণ্ঠস্বর কেমন যেন অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, মুনিত নিশ্চিত বাক্য বলতে পারেনা। তবু কোশনগরের দিকে যদি কখনো যাওয়া হয় তবে মায়ের কথা অবশ্যই মনে রাখব।

সোমদেব এইটুকুই চাইছিল।

[ক্রমশঃ

জৈন ধর্ম ও বাঙলা দেশ

ডঃ সুধীর কুমার করণ

॥ ১ ॥

ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জৈন ধর্ম ও জৈন সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল অতি প্রাচীন কালেই। অধিকাংশ পণ্ডিতই এ বিষয়ে একমত যে বৌদ্ধধর্মের চেয়ে জৈনধর্ম প্রাচীনতর।

জৈনদের মতে, জৈনধর্ম অনাদি। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদকে তাঁরা প্রাচীন বেদ বলে মনে করেন না। বেদব্যাস কর্তৃক বিভক্ত এবং প্রচারিত. বেদের মধ্যে জৈনমতবাদের খণ্ডন করা হয়েছে বলে, স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে বৈদিকযুগেই জৈনমত যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল, সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধর্মচিন্তা ও দার্শনিক মতবাদ সম্ভবতঃ বেদবহির্ভূত বিবিধ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন চিন্তার আদি-মূল।

যজুর্বেদসংহিতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, নাগপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নানাভাবে জৈনধর্ম ও তীর্থংকরদের উল্লেখ আছে। যজুর্বেদে আদি তীর্থংকর ঋষভদেবের স্তুতি করা হয়েছে। ঋগ্বেদেও চব্বিশ তীর্থংকরের উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য প্রাচীন ইতিহাসের আকর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাদির সাক্ষ্যপ্রমাণ[১] থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে জৈনধর্ম ও জৈনদর্শন ভারতীয় ঐতিহ্যের অতি প্রাচীন কালের ধারক।

(ক) যজুর্বেদসংহিতা—

রাজস্থ নু প্রসব আবভুবেমাচ
বিশ্বাভুবনানি সর্বতঃ স
নেমি রাজা পরিয়াতি বিদ্বান
প্রজাং পুষ্টিং বর্ধমানো অস্মৈ স্বাহা।

(খ) ঐ — ওঁ নমোঽর্হন্তো ঋষভ।

(গ) ঋগ্বেদ — ওঁ ত্রৈলোক্য প্রতিষ্ঠিতানাং চতুর্বিংশতি তীর্থংকরাণাম্‌।

(ঘ) ঐ — ওঁ পবিত্রনগ্নং সুধীরং দিগ্বসনং ব্রহ্মাগর্ভ সনাতনং
উপৈমি ধীরং পুরুষমর্হৎ আদিত্যবর্ণ তমসঃ পুরস্তাৎ স্বাহা।

অতি প্রাচীনতার জন্যই জৈনদর্শন বহুব্যাপ্ত এবং সেই কারণেই দুরূহ। বিশেষ করে আচার্যদের ব্যাখ্যার বিভিন্নতার জন্য এর গভীরে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নয়। তবু জৈনবিধি এবং মহাবীরের দ্বারা প্রচারিত শিক্ষাক্রমে গভীর চিন্তাশীলতার এবং সহৃদয় মানবিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার কোন তুলনা হয় না। জৈনদের প্রচারিত চারিত্রনীতি, চরম অহিংসাবাদ, পরিশুদ্ধ আদর্শবাদ এবং জৈনসন্ন্যাসীদের সুকঠোর তপশ্চর্যা আমাদের কাছে চরম বিস্ময়ের ব্যাপার। সংগে সংগে আরও বিস্মিত হতে হয়, সেই প্রাচীনকালেই এই ভারতবর্ষে কি করে এমন গভীর চিন্তাশীলতার আবির্ভাব ঘটেছিল, ইদানীংকালেও যাকে আমরা প্রগতিশীল বলে মনে করি!

জৈনদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত। অর্থাৎ,—ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তিবাদের উপরই জৈনমত প্রতিষ্ঠিত। মানবিক গুণের চরম বিকাশের উপরই জৈনাচার নির্ভরশীল। ত্যাগ, সংযম, অহিংসা, অচৌর্য, প্রভৃতির উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করে সেই ধরণের আচরণে ব্রতী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জৈনাচারে। এ কথা নিশ্চিতভাবেই মেনে নিতে হয়,—অহিংসার এমন ব্যাপক অর্থ অন্য কোন ধর্মেই নেই।

॥ ২ ॥

একথা ইতিহাস স্বীকৃত যে প্রাচীন বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি বিস্তারের কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে নয়; গুপ্তযুগেই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির বিকাশ।

কিন্তু তারও আগে জৈন এবং বৌদ্ধ প্রচারকদের মাধ্যমে আর্যভাষা ও আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গ-জনের প্রাথমিক পরিচয় ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জৈনধর্ম, উত্তরবঙ্গে তার ভিত্তি সংস্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। গুপ্তযুগে জৈনধর্মের প্রভাব ম্লান হয়ে পড়েছিল, বলে অনেকের ধারণা। কারণ তৎকালীন কোন গ্রন্থাদিতে নাকি জৈনধর্মের তেমন উল্লেখ নেই। অথচ লক্ষ্য করা যাচ্ছে,—পাল এবং সেন যুগে বেশ কিছু জৈনমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে কৃত এক পট্টোলীর লিপি থেকে জানা যায় যে, উত্তরবঙ্গের—পাহাড়পুরের কাছে বটগোহালী নামক এক স্থানে একটি জৈনবিহার ছিল। এই বিহারের অধিবাসী ছিলেন নির্গ্রন্থনাথ আচার্য গুহনন্দীর শিষ্যসম্প্রদায়। নাথশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ এবং রামী নাম্নী ব্রাহ্মণী, অর্হৎদের নিত্যসেবার ব্যয়নির্বাহের জন্য ঐ সব জৈনসন্ন্যাসীকে ভূমিদান করেছিলেন।

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কালেই উত্তরবঙ্গে জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এমন অনুমান অসংগত নয়। চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন খ্যাতিমান জৈনসূরী ভদ্রবাহু। ইনি সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে 'শ্রুতকেবলী' পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। এ'র

জন্মস্থান ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনের দেবকোট।[২] চতুর্থ শ্রুতকেবলী গোবর্ধন, দেবকোট থেকে শিশু ভদ্রবাহুকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ভদ্রবাহু সাধনায় লিপ্ত হয়ে পরিশেষে সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী হন।

একথা ঠিকই প্রাচীন রাঢ়ভূমিতে জৈনধর্মের প্রচার এবং প্রসার যথেষ্ট বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু জৈনপ্রচারকদের কাছে সব দুর্গমতাই হার মেনেছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গে জৈনধর্মের সংস্থাপনা যে সহজ ছিল এবং অন্য কোন ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পূর্বেই যে জৈনমত তার অহিংসা ও মানবিকতার মহান বাণীগুলি শ্রাবকদের মনে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বস্তুতঃ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গে জৈনধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের অনুমান যে, সম্ভবতঃ পালযুগের শেষভাগে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সাধকগণ ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ, কাপালিক, অবধূত প্রভৃতি উলঙ্গ সম্প্রদায়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান। সপ্তম শতাব্দীর পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ্ অবশ্য বলেছেন যে সে সময় দিগম্বর নিগ্রন্থদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

বৌদ্ধধর্মে বঙ্গদেশ প্লাবিত হলেও বৌদ্ধদের চেয়ে জৈনরাই কিন্তু বঙ্গভূমির সংবাদ জানতেন বেশী। জৈন ভগবতী সূত্রে অঙ্গ, বঙ্গ এবং রাঢ় নামের উল্লেখ আছে। জৈন কল্প-সূত্র থেকে জানা যায় যে এক সময় বঙ্গভূমিতে জৈনধর্মের বহুল প্রচার ঘটেছিল। উক্ত গ্রন্থে জৈন গোদাস সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের চারটি শাখার উল্লেখ আছে। এই চারটি শাখার নাম —তাম্রলিপ্তিয়, কোডিবর্ষীয়, পোংডবধনীয়া এবং খব্বাডিয়া। এর প্রথম তিনটি নিঃসন্দেহে যথাক্রমে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত, কোটিবর্ষ এবং পৌণ্ড্রবর্ধনের সংগে সংযুক্ত। খব্বড দেশটি কোথায় ছিল তার সুষ্ঠু প্রমাণ বোধ হয় নেই, তবে মনে করা যেতে পারে উক্ত স্থানটিও প্রাচীন বঙ্গভূমির অন্তর্গত ছিল।

বৃহত্তর বঙ্গভূমির অন্তর্গত পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ পাহাড় জৈনতীর্থভূমির অন্যতম। চতুর্বিংশতি তীর্থংকরদের মধ্যে কুড়িজনই এখানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এই পরেশ-নাথ শৈলশিখরকে কেন্দ্র করেই একদা পশ্চিমসীমান্ত বাংলার রাঢ় ভূমিতে জৈনধর্মের বিস্তার ঘটেছিল।

॥ ৩ ॥

রাঢ়ভূমি ও মহাবীর॥ জৈন গ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে শেষ তীর্থংকর মহাবীরের রাঢ় বা রায় পরিভ্রমণের বিবরণ আছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, অরণ্য পর্বতময় রাঢ় দেশের বজ্জ ভূমি ও সুব্ভভূমিতে ধর্মপ্রচারের জন্য মহাবীর যখন সেই সব অঞ্চল পরিক্রমণ করছিলেন, তখন আক্ষরিক অর্থেই সেই সব অঞ্চল ছিল দুর্গম এবং দুঃসহ। পথঘাট বলতে কিছুই

---

২ বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত।

ছিল না। না ছিল সভ্য মানুষের বসতি। সেই অরণ্য সংকুল অনুর্বর ভূখণ্ডের অধিবাসিদের রূঢ় আচরণ ও অখাদ্য ভক্ষণের কথাও আচারাঙ্গসূত্রে আছে।[৩] বজ্জভূমির অসভ্য অধিবাসীরা তাঁকে সহজে ধর্ম প্রচার করতে দেয়নি। তাঁকে আক্রমণ করেছে, আঘাত করেছে। কুকুরের দংশনে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে। হিংস্র গ্রাম্য কুকুরদের কেউ নিরস্ত করেনি, বরং ছু ছু করে লেলিয়ে দিয়েছে।

বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমির যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে এখনও মতভেদ আছে। তবে উক্ত অঞ্চল দুটি যে দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল এ কথা অনেকেই মানেন। দক্ষিণরাঢ়ের ব্যাপকতা তার পশ্চিমসীমান্তের দিকে মোটেই অল্প ছিল না। পশ্চিমসীমান্ত বাঙলার সিংভূম-মানভূম-বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম-ময়ূরভঞ্জ-পশ্চিম বীরভূম-উত্তর-পশ্চিম বর্ধমানকে বিশেষ বিশেষ লক্ষণে একটি সাংস্কৃতিক সীমার অন্তর্গত করা যায় বলে এরই অন্তর্গত মানভূম (বর্তমান পুরুলিয়া ও ধানবাদ জেলা) অঞ্চলকে প্রাচীন বজ্জভূমি বা বজ্রভূমি বলে স্বীকার করা যায়। সিংভূম জেলাকেই অনেকে সুব্ভভূমি বলার পক্ষপাতী।

মহাবীর যদি রাজগৃহ-নালান্দা থেকে দক্ষিণ অভিমুখী হয়ে থাকেন, তা হলে পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার মানভূম এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলকে বজ্জভূমি বলে মনে করার সংগত কারণ আছে।[৪]

কোন কোন ঐতিহাসিক মানভূম-সিংভূম-বীরভূম এবং বর্ধমানকে জৈনতীর্থংকর মহাবীরের নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, বর্ধমান নগর, বর্ধমান মহাবীরের স্মৃতিবাহক। বর্ধমান নামে আরো কয়েকটি স্থান প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছিল। জৈনকল্পসূত্রেও এই নগরের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, ধর্মপ্রচার কালে, মহাবীর অষ্টীয় বা অস্থিকগ্রামে প্রথম বর্ষা যাপন করেছিলেন। টীকাকার বলেন, এই অস্থিক গ্রামের পূর্বনাম ছিল বর্ধমান।

দ্বিতীয় বর্ষায় তিনি বাচাল দেশের অভিমুখে যান। বাচাল দেশটি কোথায়, তা বিতর্কমূলক। কিন্তু বাচাল দেশের দুটি নদীর নাম দেখে তার অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। নদী দুটির নাম, সুবর্ণকূলা (সুবর্ণবালুয়া) এবং রূপ্যকূলা।

৩ পশ্চিমসীমান্ত বাঙলায় রায় শব্দের সঙ্গে রূঢ়তার সম্পর্ক এখনও বর্তমান। এখনও উক্ত অঞ্চলে অমার্জিত, অসংস্কৃত, বা 'আনকালচার্ড' অর্থে রায় বা রায়ু শব্দের প্রয়োগ বর্তমান। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—

ব্যাধ গো-হিংসক রায়
চৌদিকে পশুর হাড়—

৪ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমসীমান্ত বাঙলায় ভূমিরাজ্যের সংখ্যা ছিল অনেক। সে সব ভূমিরাজ্যের নাম এখনও বর্তমান। যথাঃ বীরভূম, মানভূম, সিংভূম, মল্লভূম, শিগরভূম সামন্তভূম, বরাহভূম, তুঙ্গভূম, ভঞ্জভূম, ইত্যাদি।

এই দুটি নদীর সঙ্গে জৈনসংস্কৃতির সম্পর্ক বিশেষরূপে সংস্থাপিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এই দুটি নদী বর্তমানের সুবর্ণরেখা এবং রূপনারায়ণ।

মহাবীরের পঞ্চমবর্ষা যাপনের স্থান ভদ্দীয় নগরকে অধুনা কোন কোন পণ্ডিত বর্ধমান জেলার 'ভেদিয়া'র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে উৎসুক।

মহাবীর একাদশ বর্ষা যাপন করেছিলেন দয়ভূমিতে। বিহারের অন্তর্গত সিংভূম জেলার সুবর্ণরেখাবিধৃত ধলভুমকেই দয়ভূমি বলে মনে করা হয়।

মহাবীর তাঁর পরিভ্রমণকালের বেশ দীর্ঘ সময় যে উত্তর-পশ্চিম রাঢ় ভূমিতে যাপন করেছিলেন, তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে।

[ক্রমশঃ

চিঠিপত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

নববর্ষের সশ্রদ্ধ নমস্কার ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। শ্রমণ পাই। নিয়মিতই পাই। শ্রমণের প্রবন্ধ, কবিতা, পুনর্মুদ্রিত রচনা সবই খুব ভাল লাগে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই শ্রমণ একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা হয়েছে। জৈন সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই। অথচ আমরা না জেনেও বেশ নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছি। শ্রমণের প্রতি সংখ্যার লেখাতেই কিছু কিছু নতুন কথা জানতে পারি, যার জন্যই শ্রমণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

প্রথম বর্ষ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে 'বর্ধমান-মহাবীর',—এটি শেষ হলে বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটি অমূল্য সংযোজন বলা যাবে নিঃসন্দেহে। Select Bibliography on Jaina Painting-টি খুব কাজ দিচ্ছে। কি পরিমাণে অর্থ, উদ্যম, সময় ও সাধনা আপনি এর জন্য ব্যয় করছেন—তা অনুমান করেই স্তম্ভিত হয়ে যাই। শ্রমণ—জিন-বাণী এদেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক এই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় বর্ষে (২/১ সংখ্যা) নাহটার 'উদয়পুরের বিজ্ঞপ্তি-পত্র' প্রবন্ধটি আমার খুব কাজে লেগেছে। এই বিজ্ঞপ্তি-পত্র এক রকম দূত কাব্যের প্রেরণা দেয়। তাতে প্রায়ই কালিদাস ও মাঘের কবিতার একটি একটি চরণ পাদপূরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলছি—কালিদাসের মেঘদূত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সকলেই বলি, 'পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যে' মেঘদূতের এক একটি চরণকে অন্তিম চরণ হিসেবে জিনসেন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু জিনসেনের বই আমরা কেউ চোখে দেখিনি। জিনসেনের কিছু শ্লোক সানুবাদ উদ্ধৃত করে, মেঘদূতের চরণ ব্যবহারের সার্থকতা দেখাতে পারলে খুব উপাদেয় হবে। দেবানন্দ মহাকাব্যে মাঘের শিশুপাল বধের চরণ ব্যবহৃত হয়েছে। দেবানন্দ সিংঘী জৈন গ্রন্থমালায় বেরিয়েছিল সুতরাং দেবানন্দ কাব্য সুলভ কিন্তু জিনসেন? তাঁর কি হবে? আপনি একটু ভেবে আমাদের আরও জানার সুযোগ করে দিন।

পূরণচাঁদ নাহার আর পূরণচাঁদ সামসুখার সব প্রবন্ধই উৎকৃষ্ট। রায় চাঁদ ভাই সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না আমার। তৃতীয় বর্ষে ভাল লাগছে 'বর্ধমান-মহাবীরে'র সঙ্গে সঙ্গে 'মহাবীর বলেছিলেন', বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা। মহাবীর পত্নী যশোদা লেখাটি কারুণ্য ভাবনায় মণ্ডিত। তৃতীয় বর্ষে সব চেয়ে জরুরী কাজ করেছেন অশোক উপাধ্যায়। দুই দফায় প্রকাশিত 'বঙ্গভাষায় জৈন-চর্চা' তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু পঞ্জীটি কালক্রমিক কেন? বর্ণানুক্রমিক নয় কেন? এতে করে ব্যবহারের একটু অসুবিধে হবে। ঐতিহাসিক রামদাস সেনের রচনা থেকে এবং সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের জৈন ও হিন্দু

লেখা থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে কিছু অংশ নকল করে শ্রমণের জন্য পাঠাবার ইচ্ছে রইল। 'একটি শিশির বিন্দু' লেখাটি কবিতার লাবণ্যে মাখানো। পড়তে পড়তে পাকবিড়রার পদ্মপ্রভের ছবি মনে পড়ছিল। ইলাপুত্র গল্পটি নাটকীয়গুণে ঋদ্ধ। 'অতিমুক্তে'র ভেতরে এটি স্থান পেতে পারত অনায়াসে। এই ধরণের কথানক সংগ্রহ করে আরও একটি গল্পের বই বের করুন।

রাখালদাসের বাঙ্লা প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ করে সহজ প্রাপ্য করে দিয়েছেন। ভগবান পার্শ্বনাথের (পূরণচাঁদ নাহার) পঞ্চাশ নাম পড়ে চমৎকৃত হলাম। ৮ম সংখ্যায় পূরণচাঁদের জীবন কথা লিখে আপনি যথার্থই স্মৃতি তর্পণ করেছেন। যতদূর জানি বাঙ্লাদেশের অন্য কোনো কাগজ এই মনীষীর স্মৃতি কথা লেখেন নি। পূরণচাঁদের 'জৈন লেখ-সংগ্রহ' তিনখণ্ড বইই আমার আছে। তাঁর অসামান্য চরিত্র ও সর্বতোমুখী প্রতিভার কিছু আমাদের জানা ছিল না। নাহার মহাশয় সম্বন্ধে যত লেখা যায় ততই ভাল। তাঁর সংগ্রহে শত্রুঞ্জয় পাহাড় আর তার হাজার মন্দির নিয়ে একটি সুবৃহৎ এবং মূল্যবান বই আছে। ওই বইটির descriptive account দিয়ে ছোট একটি লেখা আমাদের জন্য শ্রমণের পাতায় দিন।

ডঃ আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যের সম্বন্ধে কোনও obituary notice বাঙ্লাদেশের আর কোনও কাগজে মনে হচ্ছে পাইনি। উপাধ্যের বিদ্যাবত্তার সঙ্গে আমার যৎ-সামান্য পরিচয় পূর্বেই ছিল। সিংঘী জৈন গ্রন্থমালায় 'ধূর্তাখ্যান' কাহিনী বেরিয়েছিল পুণ্য বিজয়জি মুনির সম্পাদকতায়। উপাধ্যে ইংরাজীতে ৫৪।৫৫ পাতায় এক চমৎকার critical study লেখেন। প্রাকৃত বা অর্দ্ধমাগধীতে আমার জ্ঞান প্রায় নেই। উপাধ্যের ভূমিকা তাই আমার খুব বড় সহায়। ঐ গ্রন্থমালাতেই হরিষেণাচার্যের 'বৃহৎকথাকোশ' বের হয় উপাধ্যের সম্পাদনায় তাতে উনি ১২০-২৫ পাতার বৃহৎ ভূমিকায় জৈন কথা-নকের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। সিংঘী জৈন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত বইগুলি অনেকে চোখে দেখেন নি। যদি ডালচাঁদ কিংবা বাহাদুর সিং সম্বন্ধে শ্রমণে কিছু লেখা কখনও বেরোয় তাহলে এই গ্রন্থমালার নামধাম পরিশিষ্ট হিসেবে ছাপিয়ে দিতে পারেন। আর এক কথা। চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'জৈন পদ্মপুরাণ' (কথাসার) যা আপনারা প্রথম বৎসরে ছাপিয়ে ছিলেন সেই বইয়েরই পিছনের মলাটে 'জিনবাণী পত্রিকার বিজ্ঞাপন ছিল। এটি কি শ্রমণে ছাপানো উচিত নয়? জিনবাণীই বাঙ্লা দেশে জৈন ধর্ম সাহিত্যের প্রথম মাসিক পত্রিকা। শ্রমণ সেই পথেরই কনিষ্ঠ পথিক। বিজ্ঞাপন দেখে কোনও ভদ্রলোক হয়ত জিনবাণী পত্রিকা আপনাদের গবেষণার জন্য ধার দিতে পারবেন।

ভরসা করি কুশলে আছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মহাবীরের জীবন ও বাণী প্রচারিত করে সুধন্য ও সর্বজনমান্য হোন।

বিনীতা

কল্যাণী দত্ত (কলিকাতা)

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

  জৈন ভবন

  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

  ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র

  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. IV No. 1 : Sraman : May 1976
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত

অতিমুক্ত

সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :

"এই সুন্দর বইখানি বাংলা ভাষার একটি ক্ষুদ্র সম্পদ হইয়াছে। জৈনধর্ম অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু বই বাংলা ভাষায় আমরা পাইতেছি। কিন্তু জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এইরূপ উপাখ্যান সংগ্রহ আমি আগে দেখি নাই।...এই ক্ষুদ্র কিন্তু অতি সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল চলিত বাংলায় লিখিত 'অতিমুক্ত' বইখানি, বোধহয়, রসোত্তীর্ণ জৈন উপাখ্যান-সাহিত্যকে বিদগ্ধ-জনসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস।"

দাম : চার টাকা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

বর্ধমান, বিকোভিল, অন্ধ্রপ্রদেশ

জৈন স্তোত্র সাহিত্য

শ্রীবিনয়সাগর মহোপাধ্যায়

জৈন স্তোত্র সাহিত্য পরিমাণ ও ভাব উভয় দৃষ্টিতেই গুরুত্বপূর্ণ। জৈন দর্শন অনুসারে তীর্থংকর মুক্ত জীব যিনি অর্হৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের উপাসনা বদ্ধ জীবকে মুক্তাবস্থার পথ প্রদর্শন করবে এ কথা চিন্তা করেই তাঁদের অর্চনা করা আরম্ভ হয়। বলাও হয়েছে ঃ

মোক্ষমার্গস্য নেতারং ভেত্তারং কর্মভূভৃতাম্।
জ্ঞাতানং বিশ্বতত্ত্বানাং বন্দে তদ্‌গুণলব্ধয়ে ॥

অর্থাৎ মোক্ষমার্গের যিনি নেতা, কর্মরূপী পর্বতের যিনি ভেদনকারী, বিশ্বের তত্ত্বকে যিনি অবগত হয়েছেন তাঁকে তাঁর গুণ প্রাপ্তির জন্য বন্দনা করছি।

এ হতে তীর্থংকর ভক্তির রহস্য জানা যায়। সমস্ত তীর্থংকরই যখন বীতরাগ সেজন্য জৈন ধর্মাবলম্বীদের বিতরাগ ঈশ্বরের উপাসক বলে বলা হয়। জৈনাচার্যেরা স্তোত্রদ্বারা নিজের শ্রদ্ধারূপ পুষ্প অর্হ'ৎদের অর্পিত করেছেন। জৈন স্তোত্রকারদের মধ্যে আচার্য মানতুঙ্গসূরি ও সিদ্ধসেন দিবাকরের নাম আবার বিশেষ। মানতুঙ্গাচার্যকৃত ভক্তামরস্তোত্র জৈন স্তোত্র সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় ও জৈন ভক্তদের কণ্ঠহারস্বরূপ। প্রবাদ যে রাজা ভোজ একবার মানতুঙ্গাচার্যকে বন্দী করেন ও তাঁকে অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করতে বলেন। বলা হয় যে আচার্য ভক্তিপ্রণত হয়ে ভক্তামর স্তোত্রের রচনা করেন ও তার এক একটি শ্লোক রচনার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীগৃহের এক একটী কুলুপ খুলে যেতে থাকে এবং নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করতেই হাতপায়ের বেড়ী সহ শেষ কুলুপও খুলে যায় ঃ

আপাদকণ্ঠমুরুশৃঙ্খলবেষ্টিতাংগাঃ
গাঢ়ং বৃহন্নিগড়কোটিনিঘৃষ্টজঙ্ঘাঃ।
ত্বন্নামমন্ত্রমনিশং মনুজাঃ স্মরন্তঃ
সদ্যঃ স্বয়ং বিগতবন্ধভয়া ভবন্তি ॥

হে দয়াল, বড় বড় শৃঙ্খলে আপাদমস্তক শরীর যার আবদ্ধ, বড় বড় বেড়ীর ঘর্ষণে যার জঙ্ঘাদেশ অত্যন্ত ছিলে গেছে, এমন মানুষ যদি তোমার নামরূপী মন্ত্র স্মরণ করে তবে সেই মুহূর্তেই সে বন্ধন ভয় হতে মুক্ত হয়ে যায়।

জৈন সমাজে এই স্তোত্রের পঠন-পাঠন বিশেষ ফলদায়িত্বের জন্যই করা হয় কিন্তু সাহিত্যিক দৃষ্টিতেও এর মূল্য কিছু কম নয়। বিবিধ দেবতা হতে অভিন্ন ও তাঁদের

বিভূতিতে সম্পন্ন জিনেন্দ্রের স্তুতি মানতুঙ্গাচার্য কিরূপ ধীরোদাত্ত স্বরে করেছেন তার দৃষ্টান্ত :

বুদ্ধস্ত্বমেব বিবুধার্চিত বুদ্ধিবোধাৎ
ত্বং শংকরোঽসি ভুবনত্রয়শংকরত্বাৎ।
ধাতাঽসি ধীর শিবমার্গ বিধের্বিধানাৎ
ব্যক্তং ত্বমেব ভগবন্ পুরুষোত্তমোঽসি ॥
তুভ্যং নমস্ত্রিভুবনার্তিহরায় নাথ
তুভ্যং নমঃ ক্ষিতিতলামলভূষণায়।
তুভ্যং নমস্ত্রিজগতঃ পরমেশ্বরায়
তুভ্যং নমো জিন ভবোদধি শোষণায় ॥

বিবুধদের দ্বারা পূজিত বুদ্ধি (জ্ঞানের) জন্য তুমিই বুদ্ধ। ত্রিলোকে মঙ্গল করবার জন্য তুমিই শংকর। হে ধীর, মঙ্গলমার্গের বিধান করবার জন্য তুমিই ধাতা। হে ভগবন্, তুমিই পুরুষোত্তম। ত্রিভুবনের আর্তিহরণকারী হে নাথ, তোমাকে আমি নমস্কার করি। পৃথিতলের বিশুদ্ধ ভূষণরূপ তোমায় প্রণাম। ত্রিলোকের পরমেশ্বর, তোমায় প্রণাম। সংসাররূপ সাগর শোষণকারী হে জিনেন্দ্র, তোমায় প্রণাম।

জিনেন্দ্রের শিব-পদত্ব ও তাঁর প্রদর্শিত পথে মানতুঙ্গাচার্যের পূর্ণ আস্থা রয়েছে :

ত্বামামনন্তি মুনয়ঃ পরমং পুমাংস
মাদিত্যবর্ণমমলং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বামেব সম্যগুপলভ্য জয়ন্তি মৃত্যুং
নান্যঃ শিবঃ শিবপদস্য মুনীন্দ্র পন্থাঃ ॥

মুনিগণ তোমাকে পরমপুরুষ, আদিত্যবর্ণ, বিশুদ্ধ ও অন্ধকারেরও পর বলে অভিহিত করেন। তোমাকে ভালভাবে প্রাপ্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে। তোমার অতিরিক্ত হে মুনীন্দ্র, শিব বা শিবপদপ্রাপ্তির পথ নেই।

জিন ভক্তিই যে তাঁর কাব্যের প্রেরণারূপ সেকথা মানতুঙ্গাচার্য বলেছেন :

অল্পশ্রুতং শ্রুতবতাং পরিহাসধাম
ত্বদ্ভক্তিরেব মুখরীকুরুতে বলাম্মাম্।
যৎ কোকিলঃ কিল মধৌ মধুরং বিরৌতি
তচ্চারুচূতকলিকা নিকরৈক হেতুঃ ॥

সিদ্ধসেন দিবাকরের কল্যাণমন্দির স্তোত্রও ভক্তামর স্তোত্রের মত জৈন সমাজে সুবিখ্যাত। সাহিত্যিক দৃষ্টিতেও সেই স্তোত্র জৈন স্তোত্র সাহিত্যমালার অনুপম মণি বিশেষ। ভক্তহৃদয়ে অপেক্ষিত বিনয়ের উপলব্ধি কল্যাণমন্দিরে ভক্তামরের চাইতেও বেশী। সিদ্ধসেন দিবাকর এর রচনা সংসার সাগরে নিমজ্জমান জীবের নৌকোর মত আশ্রয়দান-

কারী জিনেন্দ্রের স্তুতি করবার জন্য করেছেন যদিও সেই প্রয়াসকে বালকের বাহু প্রসারিত করে সমুদ্রবিস্তারকে বোঝাবার তুল্য বলে তিনি মনে করেন।

অভ্যুদ্যতোঽস্মি তব নাথ জড়াশয়োঽপি
কর্তুং স্তবং লসদসংখ্যগুণাকরস্য।
বালোঽপি কিং ন নিজ বাহুযুগং বিতত্য
বিস্তীর্ণতাং কথয়তি স্বধিয়াম্বুরাশেঃ ॥

বিনয়ের অভিব্যক্তি এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে?

স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পার্শ্বনাথ সুমেরুপর্বত সংলগ্ন নবীন মেঘখণ্ডের মত। তাঁর উদাত্ত স্বরে মেঘদর্শনের মতোই উৎকণ্ঠিত হয়ে ময়ূর তাঁকে অবলোকন করছে ঃ

শ্যামং গভীরগিরিমুজ্জ্বল হেমরত্নং
সিংহাসনস্থমিহ ভব্যাশিখণ্ডিনস্ত্বাম্।
আলোকয়ন্তি রভসেন নদন্তমুচ্চৈ
শ্চামীকরাদ্রিশিরসীব নবাম্বুবাহম্ ॥

বিশ্ববিকাসের জন্য তিনি পার্শ্বনাথকে জ্ঞানের উদ্‌গমরূপ মনে করেন। ভবসাগরের সমস্ত বিপত্তি তাঁর নাম শ্রবণ মাত্রই বিদূরিত হয়। তাঁর উদারতা ও স্তোত্রকারের বিনয়ের অভিব্যক্তি মূলক দুইটি শ্লোক ঃ

ত্বং নাথ দুঃখিজনবৎসল হে শরেণ্য
কারুণ্য পুণ্য বসতে বশিনাং বরেণ্য।
ভক্ত্যা ন তে ময়ি মহেশ দয়াং বিধায়
দুঃখাংকুরোদ্দলন তৎপরতাং বিধেহি ॥
দেবেন্দ্রবন্দ্য বিদিতাখিলবস্তুসার
সংসার তারক বিভো ভুবনাধিনাথ।
ত্রায়স্ব দেব করুণাহ্রদ মাং পুনীহি
সীদন্তমদ্য ভয়দব্যসনাম্বুরাশেঃ ॥

হে দুঃখীজন বৎসল, হে শরেণ্য, হে নাথ, হে করুণার পুণ্য নিবাসভূমি, বশীদেরও বরেণ্য, ভক্তিপূর্বক তোমায় নমস্কারকারী আমার ওপর দয়া করে আমার দুঃখ বিনাশের জন্য তৎপর হও। হে দেবেন্দ্র-বন্দ্য, অখিল বস্তুসারের জ্ঞাতা, সংসার তারক, ব্যাপক, ত্রিভুবন-নাথ, করুণাহ্রদ, ভয়প্রদ দুঃখ সমুদ্রে দুঃখ ভোগকারী আমায় রক্ষা কর ও পবিত্র কর।

জৈন স্তোত্র সাহিত্যে সবচেয়ে বেশী স্তোত্র ভগবান পার্শ্বনাথের ওপর রচিত হয়েছে। তাঁর ওপর যত স্তোত্র রচিত হয়েছে সংখ্যায় সম্মিলিতরূপে ২৪ জন তীর্থংকরের ওপরও তত স্তোত্র রচিত হয়নি। মহাবীর ও ঋষভনাথের স্তোত্র সংখ্যা পার্শ্বনাথের চাইতে অনেক কম, বাকী তীর্থংকরের আরো কম।

উপরোক্ত দুই স্তোত্র রচয়িতা ব্যতীত অন্য প্রসিদ্ধ স্তোত্র রচয়িতাদের মধ্যে হেমচন্দ্রাচার্য, ধনপাল, ধনঞ্জয়, মহাকবি বিল্হণ, ভূপাল কবি, বাদিরাজ, শোভনমুনি, জিনবল্লভসূরি ভদ্রবাহুস্বামী, সোমপ্রভাচার্য, জিনপ্রভ সূরি, জম্বু গুরু, মেরুতঙ্গ সূরি, সোমসুন্দর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্তোত্র রচনার সময় হেমচন্দ্রাচার্যের দৃষ্টি সমন্বয়বদী ছিল। তিনি তাঁর ইষ্টদেবকে প্রখ্যাত নামে নয়, গুণের দ্বারা বিভূষিত করেছেন। আচার্য রচিত বীতরাগ স্তোত্র— মহাদেব স্তোত্রে মহাদেবের গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। সেই গুণসম্পন্ন দেবতা যিনিই হোন তিনিই তাঁর ইষ্টদেব। যেমন ঃ

ভববীজাঙ্কুরজননা রাগাদ্যাঃ ক্ষয়মুপাগতা যস্য।
ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর্বা হরো জিনো বা নমস্তস্মৈ ॥
যত্র যত্র সময়ে যথা যথা যোসি সোঽস্যাভিধয়া যয়া তয়া।
বীতদোষকলুষঃ স চেদ্ ভবানেক এব ভগবন্নমোস্তুতে ॥
ত্রৈলোক্য সকলং ত্রিকালবিষয়ং সালোকমালোকিতং।
সাক্ষাদ্যেন যথা স্বয়ং করতলে রেখাত্রয়ং সাঙ্গুলি ॥
রাগদ্বেষভয়াময়ান্তকজরালোলত্বলোভাদয়ো।
নালং যৎপদলংঘনায় স মহাদেবো ময়া বন্দ্যতে ॥
যো বিশ্বং বেদ বিদ্যং জনন জলনিধের্ভগিনঃ পারদৃশ্বা।
পৌর্বাপর্যাবিরুদ্ধং বচনমনুপমং নিষ্কলংকং যদীয়ম্ ॥
তং বন্দে সাধুবন্দ্যং সকলগুণনিধিং ধ্বস্তদোষদ্বিষং তং।
বুদ্ধং বা বর্দ্ধমানং শতদল নিলয়ং কেশবং বা শিবং বা ॥

যাঁর ভবরূপী বীজাঙ্কুর উৎপন্নকারী রাগাদি ক্ষয় হয়ে গেছে তিনি ব্রহ্মাই হোন বা বিষ্ণু, শিব বা জিন তাঁকে আমার নমস্কার। যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় যে কোন নামে আপনি প্রখ্যাত হোন না কেন, আপনি যদি বিগত-দোষ কলঙ্কহীন হন তবে হে ভগবন্, আপনাকে নমস্কার। যাঁর সলোক ত্রৈলোক্য সকল ও ত্রিকাল বিষয় অঙ্গুলি সহিত করতলস্থিত রেখাত্রয়ের মতো পরিদৃষ্ট, যাঁর পদ উল্লঙ্ঘন করতে রাগ, দ্বেষ, রোগ, কাল, জরা, চপলতা, লোভ আদি কেউই সমর্থ নয় এমন মহাদেবকে আমি নমস্কার করি। যিনি পরিজ্ঞাতব্য বিশ্বকে জানেন, যিনি জন্ম বা উদ্ভবরূপ সমুদ্রের ভঙ্গিমাকে অতিক্রান্ত করেছেন, যাঁর বাক্য পূর্বাপর অবিরুদ্ধ, অনুপম ও কলঙ্ক রহিত, যিনি সাধুদের পূজনীয়, সকল গুণের ভাণ্ডার, দ্বেষরূপী দোষ ধ্বংসকারী, তিনি বুদ্ধ বা বর্দ্ধমান হোন, শতদল নিলয় কেশব হোন বা শিব তাঁকে নমস্কার করি।

এ রকম উদার দৃষ্টিকোণ খুব কম লোকেই দেখা যায়। হেমচন্দ্রাচার্যের কাছে যে যে কারণের জন্য আমরা ঋণী তার মধ্যে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীও একটি।

এ সত্বেও জৈন ধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। মহাবীর স্বামী স্তোত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইমাং সমক্ষং প্রতিপক্ষ সাক্ষিণামুদারঘোষামবঘোষণাং ব্রুবে।
ন বীতরাগাৎপরমস্তি দৈবতং ন চাপ্যনেকান্তমৃতে নয়স্থিতে ॥
ন শ্রদ্ধয়ৈব ত্বয়ি পক্ষপাতো ন দ্বেষমাত্রাদরুচিঃ পরেষু।
যথাবদাপ্তাৎ পরীক্ষয়াচ্চ ত্বামেব বীর প্রভুমাশ্রিতাঃ স্মঃ ॥

প্রতিপক্ষীদের সামনে আমি এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করি যে বীতরাগের চাইতে বড় কোন দেবতা নেই অনেকান্ত ধর্মের চাইতে বড় কোন তত্ব নেই। হে বীর, শ্রদ্ধান্ধ হবার জন্য তোমায় আমার পক্ষপাত তাও নয়, কেবল দ্বেষের জন্যই অন্যে আমার অরুচি তাও না, কিন্তু পরীক্ষাপূর্বক যথাতথ্য আপ্ত অবগত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

মহাকবি বিল্হণের শ্রীপার্শ্বনাথ স্তোত্র ভাষাপ্রবাহ, অলঙ্কারের সহজ, স্বাভাবিক প্রয়োগ ও ভাবগাম্ভীর্য সমস্ত দৃষ্টিতেই উৎকৃষ্ট। একটি উদাহরণই যথেষ্ট ঃ

কুবলয়বননীলশ্চারু বিভ্রৎ স্বভাবং
নবনয়ঘনশৈলঃ পৌরুষাদ্ ভ্রষ্টভাবম্।
বিতরতু মমতানি শ্রী জিনেন্দুঃ সুখানি
প্রিতচতুরমিতানি শ্রী জিনেন্দুঃ মুখানি ॥

জৈন স্তোত্র রচয়িতারা যে কেবল তীর্থংকরদের স্তুতিমাত্র করেছেন তা নয়, কোথাও তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে তাঁর বিগ্রহের রূপ বর্ণনা করেছেন, কোথাও জৈনধর্মের সিদ্ধান্তের আলোচনা করেছেন, আবার কোথাও তাঁদের গুণকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত প্রদর্শনও অভিপ্সিত হয়েছে, কোথাও কাব্যের ক্ষেত্রে নূতন প্রয়োগ করেছেন। জিনেন্দ্রেরা মুখ ও চোখের সৌন্দর্য জিনশতকে শ্রীজম্বুগুরু এরূপে করেছেন ঃ

অম্লানং মৌলিমালোল্ললিত কপিলরুগ্‌ধূলিলুব্ধালিজালং
ব্যালোলারালকালালকমমলকলালাংছনং যদ্বিলোক্য।
লেখালী লালিতালং প্রবলবল কুলোন্মূলিনা শৈলরাজে
পহ্লম্না লীলয়া বো দলয়তু কলিলং লোলটৃক্তাজ্জনাস্যম্ ॥

সুদীর্ঘ সমাসের প্রয়োগে ভাষা অবশ্য জটিল হয়েছে কিন্তু ভাবের দৃষ্টিতে শ্লোকটি ভারী সুন্দর।

বিভিন্ন ছন্দে ২৪ জন তীর্থংকরের স্তুতি করা হয়েছে তাতে ছন্দের নামও শ্লোকে সমাবেশিত করা হয়েছে। যথা ঃ

দ্রুত বিলম্বিত গীতরসোলস
চ্চরণ সংচরণাতি মনোহরম্।

সুরগিরৌ সুমতের্জ্জনি মজ্জনে
বিদধিরে বিবুধা নবনর্তনম্॥

আর একটি—

শ্রেয়ো লক্ষ্মী বিতরতু স বঃ শীতলস্তীর্থনাথো
যস্মিন্গর্ভে স্থিতবতি করস্পর্শ মাত্রেণ মাতুঃ।
দাহোৎসাহা জনকবপুষোঽগুঃ ক্রিয়ং বা মৃগেন্দ্রে
মন্দাক্রান্তা অপি কিমু মৃগা ন ম্রিয়ন্তেক্ষণেন॥

রচয়িতার নাম ভুবনহিতাচার্য।

জৈন স্তোত্র রচয়িতারা প্রাকৃত, অপভ্রংশ এমন কি ফারসী ভাষায়ও স্তোত্র রচনা করেছেন। প্রাকৃত ভাষায় রচিত স্তোত্রে মহাকবি ধনপালের 'ঋষভ পঞ্চাশিকা' উল্লেখযোগ্য। যথা :

তুহ রূবং পেচ্ছংতা ন হুংতি জে নাহ হরিসপডিহত্থা।
সমণাবি গয়মণচ্চিঅ তে কেবলিণো জই ন হুংতি॥
ভমিয়ো কালমণংতং ভবর্ম্মি ভীও ন নাহং দুক্খাণম্।
দিঠ্ঠে তুমম্মি সংপই জায়ং চ ভয়ং পলায়ং চ॥

তোমার রূপ দেখে যিনি হর্ষ পরিপূর্ণ না হন, তিনি যদি কেবলী না হন ত সমনস্ক হয়েও গতমনস্কের সমান। অনন্তকাল যদি সংসারে পরিভ্রমণ করতে হয়, হে নাথ, তবু দুঃখের আমি ভয় করিনা। তোমাকে দেখে তোমাতে আমার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে ও আমার ভয় দূর হয়ে গেছে।

অপভ্রংশ ভাষায় অভয়দেব সূরীকৃত জয়তিহুয়ণ স্তোত্রের এক রোলা ছন্দ দেখুন :

জয় তিহুঅণ বর কপ্পরুক্খ জয় জিণ ধন্নংতরি।
জয় তিহুঅণকল্লাণকোস দুরিঅক্করি কেসরি॥
তিহুঅণজণ অবলংঘিআণ ভুবাঘিণত্তয়সামিঅ।
কুণুসু সুহাই জিণেস পাস থংভণয়পুর অট্ঠিয়॥

হে ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ কল্পবৃক্ষরূপী তোমার জয় হোক। হে ধন্বন্তরী রূপ জিনেন্দ্র তোমার জয় হোক। হে ত্রিভুবন কল্যাণকোষ তোমার জয় হোক। দুরিতরূপী হস্তীকে দূর করতে সিংহরূপ তোমার জয় হোক। যার আজ্ঞা ত্রিলোকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না এরূপ ত্রিভুবন স্বামী স্থংভনক নগরে অবস্থানকারী পার্শ্বজিনেশ্বের আমায় সুখী কর।

কোনো প্রসিদ্ধ স্তোত্রের চরণ নিয়ে তাদের পাদপূর্তি করতে করতে স্তোত্র রচনা জৈন কবিরা প্রভূত মাত্রায় করেছেন। ভক্তামর স্তোত্রের চতুর্থ চরণের পাদপূর্তি শ্রীধর্মবর্দ্ধন গণি বীরভক্তামর স্তোত্রে ও শ্রীভাবপ্রভসূরি নেমিভক্তামর স্তোত্রে করেছেন। দুটো হতেই এক একটি পদ উদ্ধৃত করছি। ভক্তামর স্তোত্রের প্রথম শ্লোক :

ভক্তামর প্রণতমৌলিমণিপ্রভাণা
মুদ্যোতকং দলিতপাপতমো বিতানম্ ।
সম্যক্ প্রণম্য জিনপাদযুগং যুগাদা
বালম্বনং ভব জলে পততাং জনানাম্ ॥

এর চতুর্থ চরণের পাদপূর্তি দেখুন ঃ

রাজ্যর্দ্ধিবৃদ্ধিভবনাদ্ ভবনে পিতৃভ্যাং
শ্রীবর্ধমান ইতি নাম কৃতং কৃতিভ্যাম্ ।
যস্যাদ্য শাসনমিদং বরবর্তি ভূমা
বালম্বনং ভবজলে পততাং জনানাম্ ॥

-বীরভক্তামর

ভক্তামর ত্বদুপসেবন এব রাজী-
মত্যাং মমোক্তমনসো দৃঢ়তাপনুৎ ত্বম্ ।
পদ্মাকরো বসুকলোবসুখোঽসুখার্তা
বালম্বনং ভব জলে পততাং জনানাম্ ॥

—নেমিভক্তামর

জৈন ধর্মানুশাসনে পূর্ণ আস্থা রেখেও জৈন স্তোত্র রচয়িতারা অন্যদেবদেবীর স্তোত্রও রচনা করেছেন। সরস্বতীর স্তোত্র রচনা ত অনেক কবিই করেছেন। তার মধ্যে জিন-বল্লভসূরী ও জিন প্রভসূরীর ভারতী স্তোত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৈন স্তোত্রের অনেক সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি এত রকমের ও সংখ্যায় এত বেশী যে প্রবন্ধ দীর্ঘ হবার ভয়ে এই সামান্য পরিচয় দিয়েই নিবৃত্ত হলাম।

আনাইজামবাদের জৈন পুরাক্ষেত্র

শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শিবানন্দ মহারাজের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল একটু নির্জন একান্ত স্থানে আশ্রম করার। শিষ্য মারফত একদিন জায়গাটির সন্ধান পেলেন। শহর পুরুলিয়া থেকে সাত আট মাইল দূরে গ্রামীন কৌতূহল বাঁচিয়ে আধ্যাত্মিক কর্ম সাধন করার এ রকম একটি নিস্তব্ধ পরিবেশ আর কি হতে পারে। চারিদিকে বড় বড় গাছের জঙ্গল।' তারই মাঝে মাঝে তরঙ্গায়িত ডাঙ্গা-ডহর। অদূরে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির প্রান্তে ক্ষীণ স্রোতিনী কংসাবতী। কংসাবতী কেবল একটি নদীমাত্রও নয়। এ যেন আরণ্যক পুরুলিয়ার কপালকুণ্ডলা। পুরুলিয়ার পুরাক্ষেত্রগুলি পরিক্রমা কালীন অতীত ইতিহাস পথযাত্রীকে অরণ্য প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে বারে বারেই কংসাবতীর তীরে অজস্র প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়াতে হয় আর তখনই কংসাবতী রহস্যময়ী কপালকুণ্ডলার মতই কলধ্বনি তুলে বলে ওঠে, পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? ব্যাকুল পথিক বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে কংসাবতীর দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু নিরুত্তর কংসাবতী বয়ে চলে যায়। এই কংসাবতীর তীরে তীরে একদিন কত কত মন্দির গড়ে উঠেছিল, কত শত জৈন ও হিন্দু সন্ন্যাসী এই কংসাবতীর তীরে আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন আজ সে কথা কে বলবে? সে সব অতীত দিনের একমাত্র সাক্ষী কংসাবতী।

সম্ভবতঃ ১৯৫০ সালের কথা। শিবানন্দ মহারাজ যখন আসেন এখানে তখন নানান গাছগাছালির মাঝে ইতস্ততঃ প্রায় নটি ই'টের ঢিবি ছিল। এর মধ্যে একটি ঢিবির উপর বসে তিনি সাধনা করতেন। ইতিমধ্যে এখানে তিনি আশ্রম করতে চান এই খবর নিয়ে শিষ্য গেল হুটমুড়া গ্রামের চৌধুরীদের বাড়ী সম্মতি নিতে। কেননা, জায়গাটা তাঁদের। আপত্তির কারণও বিশেষ ছিল না। এরকম একটি জঙ্গল অনাবাদী জায়গা কিইবা কাজে লাগবে! যাই হোক, শিবানন্দ মহারাজ শিষ্যদের দিয়ে আশ্রম তৈরী করালেন। এর বছর দুই বাদে তিনি স্বপ্নাদেশ পান। সেই স্বপ্নাদেশ অনুসরণ করে তিনি আশ্রম সংলগ্ন সব কটি ঢিবি খননের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে ঢিবিগুলি থেকে একে একে অনেকগুলি কালপাথরে তৈরী জৈন তীর্থংকর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এইভাবে আনাইজামবাদের বিস্মৃত ইতিহাস আধুনিক সভ্যতার সামনে প্রকাশলাভ করে।

সাধারণভাবে এই পুরাক্ষেত্রটি আনাইজামবাদ নামে প্রচারলাভ করলেও জায়গাটি গ্রামের লোকেদের মধ্যে মহাদেব বেড়্যা নামে পরিচিত। জৈন পুরাক্ষেত্রটির কিছু পশ্চিমে

প্রায় কংসাবতীর তীরে একটি ইঁটের ঢিবি থেকে দুটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। জায়গাটির নামকরণ মহাদেব বেড়্যা হওয়ার কারণ সম্ভবত এই শিবলিঙ্গগুলি। তবে শিবানন্দ মহারাজ স্থানটিকে পরেশনাথ নামে অভিহিত করেছেন। সেটাও যুক্তিসঙ্গত এই কারণে যে, জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথ এখানকার মূল উপাস্য দেবতা।

পুরুলিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের পাশ দিয়ে পুরোন মানবাজার রোড। এ পথ ধরে কিছুদূর গিয়ে বাঁ-হাতি লোহারশোল গ্রাম। এই গ্রামের পাশ দিয়ে আনাইজামবাদ যাওয়ার রাস্তা। লোহারশোল গ্রাম থেকে পিঁড়্রা গ্রাম পর্যন্ত মোটামুটি রিলিফ রোড়। পিঁড়্রা গ্রাম থেকে বাঁ-হাতি যে রাস্তা আনাইজামবাদ চলে গেছে তাকে ঠিক রাস্তা বলা চলে না। পায়ে চলা সঙ্কীর্ণ পথ উঁচু-নীচু মাঠঘাট, খেত, খানাখন্দ এবং ছোট ছোট নদীনালা পেরিয়ে এসেছে আনাই গ্রাম পর্যন্ত। এই গ্রাম থেকে পশ্চিম দিকের পথটি গেছে মহাবেড়্যা, উত্তর দিকের পথ গেছে জামবাদ গ্রাম অভিমুখে। সাইকেল এ পথের একমাত্র বাহন। পুরুলিয়া শহরের উত্তর পূর্বে পাকা সড়কের উপর অবস্থিত হুটমুড়া গ্রাম থেকেও রিলিফ রোড ধরে পিঁড়্রা গ্রাম পর্যন্ত আসা চলে। তবে এ পথে দূরত্ব কিছু বেশী পড়ে।

বর্তমানে খরখরির (ধানবাদ জেলা) 'সরাক-জৈন সমিতি'-র পক্ষ থেকে মহাদেব বেড়্যার জৈন পুরাক্ষেত্রটির উপর একটি বড় আধুনিক মন্দির তৈরী করা হয়েছে। এই সমিতি পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রচীন জৈনধর্ম ক্ষেত্রগুলিতে মন্দির তৈরী এবং মূর্তি সংরক্ষণের এক ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছেন। পুরুলিয়ার উত্তর-পূর্বে পুরুলিয়া-হুড়া সড়কের উপর অবস্থিত ভাঙ্গড়া গ্রামের জৈন ধ্বংসাবশেষের উপরও তাঁরা একটি মন্দির তৈরী করিয়েছেন। মহাদেব বেড়্যার আধুনিক মন্দিরের অভ্যন্তরে এক উচ্চ বেদিকার প্রান্তে ইঁট-সিমেণ্টের চওড়া দেয়ালে এখানকার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত সব কটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি স্থায়ীভাবে গাঁথা আছে। মূর্তিগুলি যেভাবে গ্রথিত সেই ক্রম অনুসারে এগুলির বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় মূর্তিটি দেয়ালের মাঝখানে গাঁথা। এটি তীর্থংকর পার্শ্বনাথের। খোদিত পাথরটি উচ্চতায় ৪´ ৬´´ এবং চওড়ায় ২´। জৈন তীর্থংকর মূর্তির অতি পরিচিত ভঙ্গিমায় পার্শ্বনাথ এখানে সমভঙ্গে এক দ্বিস্তর বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। পাকবিড়্রার বিশালকায় কাল পাথরের সুপার্শ্বনাথের মূর্তির (যাঁকে অনেকে পদ্মপ্রভের মূর্তি বলে সনাক্ত করেছেন) মত এখানেও বিগ্রহের তুলনায় পদ্মের আকার অত্যন্ত ছোট। এর কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে কিনা জানিনে, ওতে শিল্পের বিচারে এই ভারসাম্যহীনতা দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। পার্শ্বনাথের পশ্চাদ্দেশে সপ্তমুখী সর্পের উদ্যত ফণার আচ্ছাদন। মূলমূর্তির দুপাশে খোদিত পাথরের প্রান্তভাগে ছয় জোড়ায় মোট চব্বিশটি তীর্থংকরমূর্তি দণ্ডায়মান। পার্শ্বনাথের তলজঙ্ঘের দুপাশে পদ্মাসনের নিচ থেক দুটি সর্প ছন্দায়িত

ভঙ্গীতে উঠে এসেছে। এই সর্পদ্বয়ের মুখে দুটি নারীমূর্তি জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। এই নারীমূর্তিদ্বয়ের পাশে দুটি বস্ত্রপরিহিত পার্শ্বচর পুরুষমূর্তি আভঙ্গঠামে ব্যজনরত। ঠিক এই ধরণের সজ্জাবিশিষ্ট একটি ল্যাটেরাইটের মূর্তি পাকবিড়্‌রার[১] পুরাক্ষেত্রে দেখা যায়। সেটির ঊর্দ্ধাংশ অবশ্য সম্পূর্ণ ভগ্ন। ঢীবির নীচে চাপা পড়ে থাকার দরুন শুধু পার্শ্বনাথ কেন এখানকার সব কটি মূর্তি কেবল অক্ষত নয় মূর্তিগুলির উপরিভাগ আজও তেমনিই মসৃণ যেমনটি শতশতাব্দী কাল পূর্বে ছিল। পার্শ্বনাথের মূর্তিটির সর্বাঙ্গে লাবণ্যের বিকাশ এবং মুখমণ্ডলে ধ্যানমগ্নতার নিপুণ প্রকাশ ঘটলেও পাকবিড়্‌রার বিশাল-কায় সুপার্শ্বনাথের (পদ্মপ্রভ ?) মুখমণ্ডলের দিব্য প্রশান্তি ও অপার্থিব হাস্যদ্যোতনা অনুপস্থিত।

উপরিউক্ত বড় মূর্তিটির বামদিকের মূর্তিটিও পার্শ্বনাথের। খোদিত পাথরটি উচ্চতায় প্রায় ২´ ৬´´। পরিকল্পনায়, উপস্থাপনে এবং অলঙ্করণে এই মূর্তিটি উপরে আলোচিত পার্শ্বনাথের মূর্তিটিরই অনুরূপ। ওর আগের মূর্তিটির দুপাশে যেখানে বারটি করে চব্বিশটি তীর্থংকর মূর্তি আছে সে ক্ষেত্রে এখানে মূল মূর্তির দুপাশে দুটি করে মোট চারটি তীর্থংকর মূর্তি দণ্ডায়মান। পাদপীঠের একেবারে নিম্নভাগের দুই প্রান্তে দুটি পরস্পর বিপরীত মুখী সিংহ উপবিষ্ট।

পরপর দুটি পার্শ্বনাথের মূর্তির পরে আলোচ্য মূর্তিটি জৈন তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভর। পাথরটি উচ্চতায় একফুটের মত। চন্দ্রপ্রভ এখানে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর সমভঙ্গে দণ্ডায়মান। পাদপীঠে চন্দ্রপ্রভর আপন প্রতীক অর্দ্ধচন্দ্র। মূলমূর্তির দুপাশে দুটি বস্ত্র পরিহিত পুরুষমূর্তি চামর হস্তে দণ্ডায়মান।

সর্বপ্রথমে আলোচিত মূর্তিটির ডানপাশে গ্রথিত প্রথম মূর্তিটি আদিনাথ বা ঋষভ-নাথের। খোদিত পাথরটি উচ্চতায় প্রায় ২´। ঋষভনাথ সমভঙ্গে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। ঋষভনাথের চুল চূড়াকৃতি। দু-এক গাছা চুল দুই স্কন্ধে ন্যস্ত। অন্যান্য তীর্থংকর মূর্তিগুলির কেশগুচ্ছ মস্তকের কেন্দ্রস্থলে গ্রন্থিবদ্ধ। ঋষভনাথের এই কেশসজ্জার সংঙ্গে কংসাবতীর অপর তীরে রালিবেড়্যায় প্রাপ্ত হরপার্বতী মূর্তির কেশ-বিন্যাসের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঋষভনাথের সঙ্গে পাশাপাশি অন্যান্য তীর্থংকর মূর্তিগুলির মুখমণ্ডলের গঠনগত তারতম্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেক্ষেত্রে অন্যান্য তীর্থংকর মূর্তিগুলির মুখমণ্ডলে দৈবভাব প্রকট এবং এগুলি stereo-typed বিগ্রহমুখ সেক্ষেত্রে ঋষভনাথের মুখখানি স্বতন্ত্র ধরণের এবং প্রায় পুরোপুরি মানুষিক। মূলমূর্তির দু-পায়ের পাশে দুটি বস্ত্র পরিহত পুরুষমূর্তি চামরহস্তে দণ্ডায়মান। পার্শ্বমূর্তিগুলির পাশে খোদিত পাথরের প্রান্তসীমায় একটির উপরে আরেকটি এই ক্রমে মোট চারটি করে আটটি

---

১ রুলিয়ার পূর্বসীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত পাকবিড়্‌রা একটি বিরাট জৈন পুরাক্ষেত্র।

পুরুষমূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আয়ুধ হস্তে উপবিষ্ট। এগুলির পরিচয় জানা যায় না।

বড় পার্শ্বনাথের মূর্তির সর্ব দক্ষিণের মূর্তিটি চন্দ্রপ্রভর। খোদিত পাথরটি উচ্চতায় দেড় ফুটের মত। চন্দ্রপ্রভ দু-হাত নাভিমণ্ডলে স্থাপিত অবস্থায় প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন। এতদঞ্চলে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত জৈন তীর্থংকর; মূর্তিই দণ্ডায়মান ভঙ্গিমায় খোদিত। সেই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হিসেবে কিংবা উপবিষ্ট ভঙ্গিমার তীর্থংকর মূর্তির বিরল নিদর্শন হিসেবে এই মূর্তিটির একটি বস্ত্র পরিহিত পুরুষমূর্তি চামরহস্তে দণ্ডায়মান। চন্দ্রপ্রভর পদ্মাসন পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর স্থাপিত। পদ্মের নীচে অর্দ্ধচন্দ্র। এই মূর্তিটি প্রায় পূর্ণ-রিলিফ (full relief) পদ্ধতিতে খোদিত।

উপরে আলোচিত মূর্তিগুলি ছাড়া ছোটখাট মূর্তি ও পাথরের নানান খোদিত অংশ ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেলেও সেগুলি নানাভাবে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। পদ্মের পাঁপড়ি ও শিকলের নক্সাকাটা পাথরের দুটি লিনটেল, একটি মঙ্গল-কলস, ভগ্ন আমলক, অলঙ্কৃত পাথরের কয়েকটি স্তম্ভ এবং stylised পদ্মের তিনটি বেদিকা এই পুরাক্ষেত্র-টির অন্যান্য সম্পদ। পুরাক্ষেত্রে প্রস্তরখণ্ডের অপ্রতুলতার এবং অন্যদিকে ইঁটের আধিক্য দেখে এ ধারণাই স্বাভাবিক যে এখানকার সবকটি মন্দিরই ছিল ইঁটের তৈরী। মাঝে-মধ্যে প্রয়োজন মত পাথরের ব্যবহার করা হয়েছিল।

আনাইজামবাদের এই জৈন পুরাক্ষেত্রটির কিছু পশ্চিমে দুটি ইঁটের ঢিবি থেকে কয়েকটি হিন্দু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে এ অঞ্চলে হিন্দু ও জৈন উভয়েরই উপস্থিতি অনুভূত হয়। দূর অতীতে কারা এখানে এসেছিল একথা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, জৈন ভাস্কর্য নিদর্শনগুলির শিল্পকলা অনেক উন্নতমানের এবং তা অবশ্যম্ভাবীরূপে কোন বৃহত্তর ও পরিণত শিল্পধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অপরপক্ষে হিন্দু নিদর্শনগুলি যেন অবক্ষয়িত ভাস্কর্যশিল্পের বিচ্ছিন্ন অবশেষ। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত যে, জৈন নিদর্শনগুলি হিন্দু নিদর্শনগুলি অপেক্ষা প্রাচীনকালের এবং সে কারণে জৈনরাই এখানকার প্রথম আগন্তুক। পরবর্তী-কালে হিন্দুরা এই জৈন ধর্মক্ষেত্রটি অধিকার করে।

প্রবন্ধ-চিন্তামণি

পূরণচাঁদ সামসুখা

[পূর্বানুবৃত্তি]

সংবৎ ১০৭৭ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪২ বর্ষ ১০ মাস ও ৯ দিবস রাজ্য পালন পূর্বক গুর্জরাধিপতি শ্রীভীমরাজ গতাসু হইলে তৎকনিষ্ঠ পুত্র কর্ণদেব সংবৎ ১১২০ অব্দে (১০৬৪ খৃষ্টাব্দ) চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে মীন লগ্নে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন

ভীমরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমূলরাজকুমার ইতঃপূর্বে পরলোকগত হইয়াছিলেন। ইনি সৎ ও উদার ছিলেন। কথিত আছে যে একদা গুর্জর দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অন্নাক্লিষ্ট প্রজাগণ রাজকীয় কর হইতে সেই বৎসরের জন্য অব্যাহতি পাইবার আশায় অনহিল্লপুর পত্তনে আগমন করিলে মূলরাজ তাহাদের শীর্ণ বদনমণ্ডল দৃষ্টে অনুকম্পা পরবশ হইয়া অশ্বারোহণ কলা প্রদর্শনপূর্বক নৃপতিকে পরিতুষ্ট করতঃ প্রজাগণকে করমুক্ত করিবার প্রার্থনা করেন। ভূপতিও আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই ঘটনার তৃতীয় দিবসে মূলরাজ কুমার স্বর্লোকগত হয়েন।

কর্ণাটাধিপতি জয়কেশী ভূপতির ময়নল্লদেবী নাম্নী কন্যা বহু সোমেশ্বর যাত্রীর রাজকর প্রদানে অক্ষমতাহেতু ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ অবগত হইয়া এই কর উঠাইয়া দিবার আশায় গুর্জরাধিশ কর্ণদেবকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। জয়কেশী নৃপতি কন্যার বিবাহের জন্য কর্ণদেবের নিকট অমাত্য প্রেরণ করিলে তিনি কন্যার কুরূপের কথা শ্রবণ করিয়া সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যাত হইয়া ময়নল্লদেবী অষ্ট সখী সমভিব্যাহারে চিতায় প্রবেশ পূর্বক প্রাণদানের সঙ্কল্প করিলে কর্ণদেবের মাতা উদয়মতি এই সংবাদ অবগত হইয়া পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় উক্ত কন্যাকে বিবাহ করিবার জন বারংবার অনুরোধ করায় ও বিবাহ না করিলে স্বয়ং চিতানলে দেহত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে কর্ণদেব মাতার নির্বন্ধাতিশয়ে ময়নল্লদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রথমতঃ কর্ণদেব রাজ্ঞীর প্রতি অত্যন্ত বিমুখ ছিলেন কিন্তু পরিশেষে মুঞ্জাল নামক মন্ত্রীর কৌশলে অনুরক্ত হন। কিয়ৎকালানন্তর ময়নল্লদেবী শুভলগ্নে এক পুত্র প্রসব করেন। এই বালকই উত্তরকালে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ নামে বিখ্যাত হন।

সংবৎ ১১৫০ অব্দে পৌষ মাসীয় কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ইনি ত্রিবর্ষমাত্র বয়ঃক্রমে পিতা কর্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত হন।

কর্ণদেব পুত্রকে রাজপ্রদান পূর্বক স্বয়ং আশাপল্লী নিবাসী ষট্‌লক্ষাধিপতি জনৈক ভীলরাজকে পরাস্ত করিয়া কর্ণাবতী (যাহা অধুনা আশাবরী নামে কথিত হয়) নাম্নী নগরী স্থাপন করতঃ পুত্রের শিশুত্ব নিবন্ধন স্বয়ং রাজকার্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। ইনি কর্ণাবতীপুরে জয়ন্তীদেবী ও কর্ণেশ্বর দেবের মন্দির এবং কর্ণসাগর নামক তড়াগ ও পট্টনে কর্ণমেরু নামক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

কিয়ৎকালপর কর্ণদেব মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। মহারাজ জয়সিংহদেব তখনও অপ্রাপ্তবয়স্কতাবশতঃ রাজকার্য পরিচালনে অক্ষম হওয়ায় তদীয় মাতুল মদনপাল তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। মদনপাল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অহংকারী হওয়ায় ও বহু অন্যায় আচরণ এবং প্রজাপীড়ন করিতে আরম্ভ করায় সান্তু নামক মন্ত্রীর কৌশলে নিহত হয়েন।

মদন পালের মৃত্যুর পর সান্তু মন্ত্রী রাজকার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইনি উদয়ন নামক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী জনৈক বণিককে সহকারী মন্ত্রী করেন। ইঁহারা উভয়েই জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। উদয়ন মন্ত্রী কর্ণাবতী নগরীতে উদয়ন বিহার নামক প্রসিদ্ধ জিন মন্দির প্রস্তুত করান।

জয়সিংহদেব প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে মাতা ময়নল্লদেবীর অনুরোধে সোমেশ্বর যাত্রীগণের নিকট হইতে রাজকর সংগ্রহ স্থগিত করেন।

একদা সিদ্ধরাজ সোমেশ্বর তীর্থে গমন করিলে সুযোগ পাইয়া মালবাধিপতি যশোবর্মদেব গুর্জরাক্রমণ করিতে আগমন করেন, কিন্তু প্রধান অমাত্য সান্তুর সুকৌশলে প্রত্যাবৃত্ত হন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যশোবর্মদেব কর্তৃক গুর্জরাক্রমণ বার্তা শ্রবণে ক্রোধবশে বিপুল সমরায়োজন সংগ্রহ পূর্বক মালবাক্রমণ করেন। দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ভীষণ সংগ্রামের পর ধারানগরী অবরোধ ও তাহার দুর্জয় দুর্গ ভঙ্গ করতঃ যশোবর্মদেবকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বন্দী করেন। মালবদেশে গুর্জরাধীশের জয় পতাকা উড্ডীন হইল। এই প্রসঙ্গে কোন কবি কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'বেড়ায়াং সমুদ্রোমগ্নঃ'। হেমকোষ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচয়িতা প্রখ্যাতযশাঃ শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য এ সময়ে শনৈঃ শনৈঃ কীর্তি সৌধে অধিরোহণ করিতেছিলেন। ইনি স্বগুণে জয়সিংহদেবের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অনুরোধে 'সিদ্ধহেম' নামক এক নূতন ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। হেমচন্দ্রাচার্য সিদ্ধরাজের পরবর্তী ভূপতি কুমার পালের সময় বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে যথাস্থলে প্রকটিত হইবে। নবঘন নামক জনৈক আভীররাজ একাদশবার সিদ্ধরাজের সৈন্যকে পরাজিত করায় ক্রোধবশে স্বয়ং নৃপতি বহু যুদ্ধ সম্ভার একত্রিত ও বর্দ্ধমান পুরের (অধুনা বঢ়বান নামে পরিচিত) দুর্গ সংস্কার করিয়া নবঘনকে আক্রমণ করেন। নবঘনের ভাগিনেয় রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণের ন্যায় জুনাগড়ের (নবঘন বোধ হয় জুনাগড়ের রাজা ছিলেন) দুর্গের গুহ্য পথাদি জ্ঞাত করাইলে সিদ্ধরাজ দুর্গ জয় করিয়া

নবঘনকে পরাভূত ও নিহত করেন। জয়সিংহদেব সজ্জন নামক ব্যক্তিকে সৌরাষ্ট্রের দণ্ডাধিপতির পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলে ইনি তিন বৎসরের সংগৃহীত রাজকর ব্যয় করিয়া রৈবতাচলের দ্বাবিংশতিতম তীর্থংকর শ্রীনেমিনাথ স্বামীর কাষ্ঠময় চৈত্য সংস্কার করিয়া পাষাণময় সুদৃঢ় মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। তিন বৎসর পরে ভূপতি সজ্জন দণ্ডাধিপতিকে ডাকাইয়া বর্ষত্রয়ের সংগৃহীত রাজকর আনয়ন করিতে অনুজ্ঞা করিলে সজ্জন জৈন বণিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ পূর্বক নৃপতির সম্মুখে স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "প্রভো, সৌরাষ্ট্রের সংগৃহীত রাজকর দ্বারা আমি শ্রীনেমির চৈত্য সংস্কার করাইয়াছি কিন্তু ভবদীয় ক্রোধাশঙ্কায় সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভবৎসকাশে উপস্থিত করিয়াছি, যদি জীর্ণোদ্ধারের পুণ্য লইতে অভিলাষী হন তবে সমস্ত অর্থ আমাকে প্রত্যর্পিত করুন নতুবা ইহা গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" সজ্জনের এইপ্রকার বাকচাতুর্যে প্রীত হইয়া তৎসমস্ত অর্থাদি সজ্জনকে প্রত্যর্পিত করিলেন ও পুনরায় তাঁহাকে সৌরাষ্ট্রের দণ্ডাধিপতির পদ প্রদান পূর্বক তথায় প্রেরণ করিলেন।

সিদ্ধরাজ কাপটিক বেশে জৈন তীর্থ শ্রীশত্রুঞ্জয় গিরিতে তীর্থযাত্রা করিয়া তত্তীর্থ সন্নিহিত দ্বাদশগ্রাম দেবপূজার জন্য প্রদান করেন।

সিদ্ধরাজ জয়সিংহদেব তদানীন্তন অন্যান্য হিন্দু নরপতির ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহার রাজসভা বহু পণ্ডিতের সম্মিলনে সুশোভিত থাকিত। ইঁহার সভায় বহু পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় তাৎকালীন সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দিগম্বর জৈনাচার্য শ্রীকুমুদচন্দ্র মুনির সহিত শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য বাদীপ্রবর শ্রীদেবসূরীর কিয়দ্দিবস ব্যাপী তুমুল তর্ক যুদ্ধ হয় ; তাহাতে দিগম্বর গুরু পরাজিত হইয়া ক্ষুব্ধান্তঃকরণে ও অবলাঞ্ছিত মস্তকে গুজরাত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

কোন এক সময়ে সিদ্ধরাজের মালব হইতে প্রত্যাগমনের পথ ভীলগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে সান্তূ মন্ত্রী বহু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য একত্রিত করতঃ রাজার আনুকূল্যে আগমন করিলে ভীলগণ ভীত হইয়া পলায়নপর হয়।

ইঁহার রাজ্যকালে পট্টন (অনহিল্লপুর পট্টন সংক্ষেপে পট্টন বা পাটন নামেই অভিহিত হইয়া থাকে) নগর নিবাসী আভড় নামক জনৈক জৈন বণিক জৈনগণের অনেক তীর্থস্থানে বহু অর্থ ব্যয়ে জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। কথিত আছে ইনি প্রথমে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ভাগ্যক্রমে পরে প্রভূত অর্থ উপার্জন ও সৎকর্মে ব্যয় করেন। ইনি তিন লক্ষের বেশী মুদ্রা নিজে রাখিতেন না ; বেশী হইলেই সদ্ব্যয়ে নিঃশেষ করিতেন।

সংবৎ ১১৯৯ অব্দে (১১৪৩ খৃঃ অঃ) ৪৯ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া সিদ্ধরাজ জয়সিংহদেব পরলোগত হন।

॥ ইতি সিদ্ধরাজ প্রবন্ধ ॥

প্রবাসী, মাঘ, ১৩১২ [ক্রমশঃ

মেদিনীপুরে জৈন মূর্তি আবিষ্কার

ক্ষিতিশ চন্দ্র চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

তারপর অনেকগুলি মূর্তির সন্ধান পেয়ে আবার নেপুরায় ছুটলাম। এবারে বহুদূর পাড়ি দিতে হবে এবং পদব্রজে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। পশুপতিবাবু, নিবারণ-বাবু ও গোষ্ঠবাবু আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থান ছিল বাঁকুড়া জেলায় কোলমুরারী গ্রাম। খেয়েদেয়ে প্রখর রৌদ্র মাথায় করেই প্রথম-কার সেই বুড়ো শিবকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। তখন প্রাণে অদম্য উৎসাহ। প্রথমে যাত্রামুখে কিছু দূর গিয়েই পিপাসায় কাতর হয়ে পশুপতিবাবুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার দ্বারে হাজির হওয়া গেল। সে বেচারী শীতল জল, ঘরের গাই-এর দুধ ও বাগানের ফলমূল দিয়ে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করলে সরল প্রাণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বড়ই মিষ্টি লাগলো। তারপর কোলমুরারীর পথে গোষ্ঠবাবুর শ্বশুরালয় জামদা গ্রাম পড়ল। কাজেই তাঁর জন্যেও একবার সেখানে থামতে হল। আবার সরবৎ খেয়ে সেখান থেকে কোলমুরারী যাওয়া গেল কিন্তু সেখানে যেয়ে দেখি দুটি পাথরের স্তম্ভ মাটিতে গাড়া আছে। না আছে লেখা, না আছে মূর্তি। মনটা একটু দমে গেল। তবুও নূতন আশায় বুক বেঁধে সাতপাট্টা গ্রাম অভিমুখে চললাম। অজানা পথে পথ দেখাবার জন্য একটি বাবরিওয়ালা সাঁওতাল যুবককে সঙ্গে করে নিয়ে চললাম। সে আগে আগে ঝুমুর গাইতে গাইতে চলল, আমরা সেই গানের রেশ ধরে পাছু পাছু চললাম। কোথাও ধান-ক্ষেতের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে কোথাও বা অড়হরের ঘন বনের মধ্য দিয়ে, কোথাও বা উপল সঙ্কুল ছোট নদী পার হয়ে আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ক্লান্ত চরণে সাতপাট্টা গাঁয়ে এসে পৌঁছলাম। সন্ধান নিয়ে জানা গেল শিব মন্দিরের কাছে দুটি মূর্তি রয়েছে। শিব-মন্দিরের নিকট এসে দেখি কাঁচা মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মাটির দেওয়ালে দুটি মূর্তি পাশা-পাশি গাঁথা আছে। দেখে পথশ্রমের সব ক্লান্তি ঘুচে গেল। সত্যই যার সন্ধানে ফির-ছিলাম এ সেই মূর্তি বটে। এ দুটিও জৈন মূর্তি, সেইরূপ দিগম্বর, সেইরূপ পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান, হাত দুটি রাখার ভঙ্গীও সেই এক রকমের, দু'পাশে দুজন দেবতা চামর হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তবে তফাতের মধ্যে মাথায় সাপ নেই। আছে কিরিট আর পদ্মনিম্নে বৃষমূর্তি। আশেপাশে দু'চারটি ছোটখাট মূর্তিও আছে; সেগুলি এখনও ধরতে

পারিনি। তবে এটা বেশ বোঝা গেল যে এদুটি পার্শ্বনাথের মূর্তি নয়, আর কোন জৈন তীর্থংকরের মূর্তি। [আদিনাথ বা ঋষভনাথের—সম্পাদক]

সাতপাট্টা গ্রামে শিবমন্দির সংলগ্ন জৈন মূর্তি

প্রথম মূর্তিটি ৫´.৫´´ দীর্ঘ ও ২´.৬´´ প্রস্থ ; দ্বিতীয়টি ৪´.৪´´ দীর্ঘ ও ২´ প্রস্থ। এ দুটির কোন পূজাই হয়না আর কোন বিশেষ নামও নাই। কেবলমাত্র গাজনের সময় সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়।

আলোকচিত্র নেওয়া শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যার অাঁধার ঘিরে এল। সারাদিন ১৪ মাইল রোদে রোদে হাঁটার পর শরীরটা তখন বিশ্রামের জন্য কাতর হয়ে পড়েছিল কিন্তু এমনি পোড়া দেশ—না জুটল আহার, না মিলল মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে দু'জনের সেখানে কুটুম্ব ছিলেন ; ভায়ারা ছল করে তাঁদের বাড়ী ২।১ বার ঘুরে এলেন, যদি ডাকে। কিন্তু কেউ ভুলেও ডাক দিলে না। শুনা গেল প্রায় ৪ মাইল দূরে মণ্ডলকুলি নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। সেখানে ময়রা দোকান ও হাট, গোলা, গঞ্জ সকলি আছে এবং আরও শুনা গেল সেদিন রাত্রে সেখানে যাত্রা হবে। অমনি স্থির করা গেল কোন মতে সেখানে গিয়ে ময়রা দোকানে আড্ডা নেওয়া যাবে ও রাত্রে যাত্রা শুনা যাবে। সেখানে কোন মূর্তির সংবাদ ছিল না। কেবল আশ্রয়ের জন্যই

যাওয়া গেল। ক্লান্ত চরণগুলিকে কোন রকমে টেনে নিয়ে উমেশ ময়রার দোকান পর্যন্ত পৌঁছান গেল। সেখানে কিছু লাড্ডু ও শীতল জল খেয়ে একটু সতেজ হওয়া গেল। ক্রমে ক্রমে অনেকেই এই অদ্ভুত জীবগুলিকে দেখবার জন্য সেখানে জমায়েৎ হলেন—মায় যাত্রাদলের ওস্তাদ পর্যন্ত। জনতার মধ্যে একজন পরিচিত লোককে পাওয়া গেল। সে সব কথা শুনে বললে যে গ্রামপ্রান্তে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় কতকগুলি ঐরূপ মূর্তি আছে। তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে আমরা যার সন্ধানে ফিরছি সেই মূর্তিই বটে তবে ভগ্ন।

এখানে আবার নাম হয়েছে সার্কাসিন্নি। সাঁওতালরা মাঝেমাঝে তাদের অন্য বনদেবতার সঙ্গেই পূজো করে থাকে। সকালে আলোকচিত্র নেবার ব্যবস্থা করে আবার

মণ্ডলকুলী গ্রামে ভগ্ন জৈন মূর্তি

সেই মোদকালয়ে ফিরে আসা গেল। জলযোগ সেরে যাত্রা শুনে রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার মতলব করা যাচ্ছিল। এমন সময় সেখানকার আর একটি দোকানদার ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাঁর দোকান বাটীতে শোবার জন্য আহ্বান করলেন। তারপর খানিকক্ষণ যাত্রা শুনে সেখানে গিয়ে শোয়া গেল। প্রাতঃকালে আলোকচিত্র নিয়ে গ্রামান্তরে যাবার পথে গ্রামবাসী কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন, রাত্রে তাঁরা কোন ব্যবস্থা না করতে পারায় বড়ই লজ্জিত কিন্তু সেদিন তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ না করলে গ্রাম থেকে যেতেই দেবেন না। অগত্যা সেবেলা সেখানে থাকতেই হল। সকাল বেলাটা কাটল মন্দ নয়। আমাদের সঙ্গে সুকণ্ঠ গায়ক

পশুপতিবাবু ছিলেন, তাঁদের গ্রামের অস্তাদ গোপালবাবু এসে জুটলেন। বেশ গানের মৌফিল হল, তারপর আকণ্ঠ ভোজন করে আবার সেই প্রখর রৌদ্র মাথায় করে বেরিয়ে পড়া গেল। আমাদের সহযাত্রী গোষ্ঠবাবুর মথুরাপুরীর টানটা সহসা খুবই প্রবল হয়ে পড়ল, কাজেই তিনি আবার জাম্‌দা ফিরে গেলেন। আমাদের পথটা এবারে বড়ই দুর্গম বোধ হল। আগাগোড়া ক্রোশের পর ক্রোশ শুধু ধানের ক্ষেত। দূর থেকে সেই হরিৎ শোভা দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু তার মধ্যবর্তী আইলপথ বড়ই ভীষণ। একে পিচ্ছিল তাতে আবার মাঝে মাঝে কাদা, তাও আবার ভারী প্রভুভক্ত, চরণ ধরলে আর ছাড়তে চায়না। যা হোক অনেক কষ্টে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে লাউপাড়া গ্রামে পৌঁছান গেল। এখানে এসে দেখি মূর্তির চারদিকে সেয়াকুল কাঁটার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। একটি আসন গাছ তলায় মূর্তিটি দণ্ডায়মান। পূজারী রঘু সাঁওতালকে ধরে আনা গেল। সে তাড়াতাড়ি সমস্ত কাঁটা কেটে পরিষ্কার করে দিল। কিন্তু এখানকার লোকেরা যে লিঙ্গজ্ঞানহীন

খাঁদারাণী নামে পরিচিত জৈন মূর্তি
লাউপাড়া

শিব মন্দিরের নিকট প্রাপ্ত জৈন মূর্তি
নেপুরা, বলরামপুর

এটা আমার জানা ছিলনা। পুরুষমূর্তির নাম রেখেছে 'খাঁদারাণী'। এখানের পূজা পদ্ধতি আবার অদ্ভুত। মদ দিয়েও পূজা হয়, মোরগ বলি পর্যন্ত হয়। কোথায় জৈন-

দের অহিংসা ধর্ম আর কোথায় মদ্য ও মাংস ! কালের কি কুটিল গতি ! মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে ৫'.৯'' প্রস্থে ২'.২'' । সেখান থেকে কাটলদা গ্রামে সহযাত্রী নিবারণবাবুর শ্বশুরালয়ে যাওয়া গেল । এখানে ভুরিভোজনের পর রাত্রি ৩টার সময় আবার নেপুরায় ফিরে এলাম । এ দিনও পদব্রজে প্রায় ১৪ । ১৫ মাইল ভ্রমণের কম হয়নি ।

সর্বশেষে প্রথমের সেই নেপুরা বলরামপুরের শিবমন্দিরের নিকট একটি ছোট মূর্তি পেয়েছি সেটি আমি পরিষদে নিয়ে এসেছি ।

এই শেষের মূর্তিগুলি জৈন তীর্থংকর আদিনাথের মূর্তি বলে মনে হয়, কারণ সবগুলি-তেই বৃষ চিহ্ন আছে । এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি ।

এই আমার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । এ বিষয়ে বিশেষ ঐতিহাসিক গবেষণা চাই কিন্তু সে শক্তি আমার কই ? এরপর বিস্তৃত বিবরণ ও ঐতিহাসিক তথ্য আপনাদিগকে শোনাবার ইচ্ছা রইল ।

আজ এই সব মূর্তিগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে কোন্ অতীত যুগের কত মধুর চিত্রই না চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আর এই সব অমূল্য রত্ন মূর্তিগুলির দুর্দশা দেখে বারবার মনে হচ্ছে আর কি তা ফিরে পাওয়া যায় না ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মেদিনীপুর শাখার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত । [মাধবী, ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৬]

জৈন ধর্ম ও বাঙ্‌লাদেশ

ডঃ সুধীর কুমার করণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৪ ॥

মহাবীরের নির্বাণলাভের পরে, কয়েক শতাব্দী ধরেই রাঢ়ভূমিতে জৈনধর্মের অস্তিত্ব প্রবল ভাবেই ছিল। রাজশক্তির ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণের ফলে জৈনধর্ম কিছু পরিমাণে সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু এক সময় তার প্রভাব এবং অস্তিত্ব যে প্রবল ছিল, রাঢ় অঞ্চলের ধ্বংসপ্রাপ্ত জৈনমন্দির ও জৈনতীর্থংকরদের মূর্তি দেখে তা' বোঝা যায়। শুধু রাঢ় অঞ্চল কেন, সুন্দরবন অঞ্চল থেকেও বেশ কয়েকটি জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে অনেক জৈনমূর্তি তো পাওয়া গেছেই, বীরভূমেও কিছু কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। ঐ সব মূর্তির অধিকাংশই ঋষভনাথ আদিনাথ, শান্তিনাথ, নেমিনাথ এবং পার্শ্বনাথের। পার্শ্বনাথের মূর্তির সংখ্যাই বেশী।

বীরভূম জেলায় জৈনপুরাকীর্তির অস্তিত্ব অল্প। অন্ততঃপক্ষে এখনও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই প্রসঙ্গে ঘুড়িষা গ্রামের জৈনমূর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। মল্লারপুরে মল্লেশ্বর শিবমন্দিরের সংলগ্ন একটি দালানে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট এক দেবমূর্তিকে জৈনতীর্থংকরের মূর্তি বলেই অনুমান করা হয়। মহম্মদবাজারের মহাবীর পাহাড়ীতে জৈনমন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়। তা' ছাড়া পশ্চিম বীরভূমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সরাক অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামও জৈনস্মৃতির ধারক। বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় খনন কার্য চালালে হয়তো-বা জৈন-ইতিহাসের পাতায় নোতুন কথা লেখা হতে পারে। বরাকর নদীর তীরবর্তী কোন কোন জায়গাতে জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির সান্নিধ্যে এসে লক্ষ্য করা যায়—ঐ দুটি জেলায় জৈনধর্মের অস্তিত্ব বিশেষভাবেই ছিল। মালভূম এবং তৎসন্নিহিত ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমার সঙ্গে বাঁকুড়া জেলাকে যুক্ত করলে যে অঞ্চলটি দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, সেই অঞ্চলটির মধ্যে সমগ্র রাঢ়ভূমির বৃহত্তর অংশকেই আবিষ্কার করা যায় এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,—মহাবীরের পরিক্রমণ প্রসঙ্গে উল্লেখিত বজ্‌জভূমি ও সুব্‌ভ ভূমির অস্তিত্ব ছিল

উক্ত অঞ্চলেই। আসলে ঐ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস আজও যথাযথভাবে লিখিত হয়নি। তবু, জৈনগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রের মাধ্যমেই—যার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী বলে পণ্ডিতদের অনুমান,—ঐ অঞ্চলের প্রাচীন বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। উক্ত অঞ্চলের নদীতীরবর্তী পথ ধরেই জৈনধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। প্রমাণস্বরূপ, বেগলার সাহেব উক্ত অঞ্চলে কিছু প্রাচীন পথরেখার আবিষ্কার করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

পশ্চিমসীমান্ত বাঙলায় একদা জৈনধর্মের বহু কেন্দ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের যুগে অনেক জৈনকেন্দ্রই ব্রাহ্মণ্য-উপাসনা মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। বহু জৈনতীর্থংকরের মূর্তি ভৈরব নামে অদ্যাবধি হিন্দুদের দ্বারা পূজিত। বিহারীনাথ, বহুলাড়া, ধরাপাট, হাড়মাসড়া, অম্বিকানগর, ছড়রা, পার্কবিড়রা প্রভৃতি স্থানে জৈনপুরাকীর্তির বহুবিধ নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। যথাযথভাবে খনন-কার্যের আয়োজন করলে জৈন ইতিহাসের আরও অনেক স্মারক লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বাঁকুড়া জৈন কেন্দ্র ॥ পশ্চিমসীমান্ত বাঁকুড়ার অম্বিকানগরের মাত্র কয়েক মাইল দূরে পরেশনাথের নামাংকিত একটি গ্রাম প্রাচীনকালে একটি বিশিষ্ট জৈনকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈনদেবী অম্বিকা ব্রাহ্মণ্যযুগে হিন্দুদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, এ ধারণাও অযৌক্তিক নয়। কাঁসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত অম্বিকানগরের শিবমন্দিরের পাশেই আদি তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্তি দেখে মনে হয় এক সময় সেই মন্দির ছিল জৈন মন্দির। অম্বিকানগরের সন্নিহিত চিৎগিরি বড়কোলা, চিয়াদা এবং কেঁদুয়াতে বহু জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে।

ধরাপাটের মন্দির-গাত্রে দুটি বিশাল তীর্থংকর মূর্তি সন্নিবদ্ধ। একটি আদিনাথের অপরটি পার্শ্বনাথের। সম্ভবতঃ, খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে সেখানে বিরাট জৈন-মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। পার্শ্বনাথকে কিভাবে হিন্দুদেবতা বাসুদেবের রূপদান করা হয়েছে তার কৌতুহলোদ্দীপক নিদর্শনও সেখানে বর্তমান।

বাঁকুড়া শহরের বারো মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ-তীরে বহুলাড়া নামক গ্রামের প্রাচীন শিবমন্দিরটি ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করা হয়। মন্দিরটি আসলে জৈনমন্দির ছিল কিনা, তা—অবশ্যই তর্কাতীত নয়, কিন্তু—মন্দিরের গর্ভগৃহে বিশালকায় পার্শ্বনাথের মূর্তি এবং আশেপাশে কিছু জৈনস্তূপ দেখে মনে হয়, একদা সেখানেও বেশ বড় একটি জৈনকেন্দ্র ছিল।

বাঁকুড়া থেকে প্রায় মাইলদশেক দূরে অবস্থিত হাড়মাসড়া গ্রামেও অতীতে একটি জৈন কেন্দ্র ছিল।

পুরুলিয়া জৈন কেন্দ্র ॥ সপ্তম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাম্রলিপ্ত থেকে বুদ্ধগয়া হয়ে অযোধ্যা পর্যন্ত একটি পথ ছিল।

সাধারণতঃ নদীতীরবর্তী অঞ্চল দিয়েই এই ধরণের পথ নির্মিত হতো। এ ধরণের একটি পথ নিশ্চিতভাবেই কাঁসাই সুবর্ণরেখার পটভূমির সান্নিধ্যে ছিল। পুরুলিয়া জেলায় যে সব জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান তার অধিকাংশই কাঁসাই বিধৃত অঞ্চলে।

এই জেলায় প্রাচীন জৈনকেন্দ্রের অস্তিত্ব বিশেষভাবেই ছিল। পাকবিড়রা, ছড়রা আড়সা, দেউলী, পবনপুর, পলমা প্রভৃতি স্থানে তার স্মৃতিবাহক অস্তিত্ব এখনও বর্তমান।

ছড়রা নামক গ্রামে ঋষভনাথ, চন্দ্রপ্রভ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থংকরদের মূর্তি রক্ষিত আছে। পাকবিড়রা নামক স্থানে একদা বিশিষ্ট একটি জৈনকেন্দ্র ছিল—তা' মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখে অনুমান করা যায়। বর্তমান মূর্তিগুলি সেখানে ভৈরব দেবতা নামে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা পূজাপ্রাপ্ত।

সুবর্ণরেখাতীরবর্তী দুলমী নামক স্থানেও একটি জৈনকেন্দ্রের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

বলাবাহুল্য, মহাবীর ধর্মপ্রচারের কালে যে ভূমিতে ঘোরতর বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক জৈনকেন্দ্র। এই সব কেন্দ্রের কথা মনে পড়লেই, মনে পড়ে মহাবীর কি অসীম ধৈর্যশীল এবং সহিষ্ণু ছিলেন। মানুষের হৃদয়পরিবর্তনের জন্য তাঁকে কি দুঃসহ কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। তারই ফলে অরণ্যপর্বতময় কংকরাশ্রিত সেই বজ্রকঠিন ভূমিতেও তিনি চূড়ান্তভাবে মানবিকতাবোধের ভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। সীমান্তবাঙলায় জৈনধর্ম সম্পর্কে বিশদ গবেষণার মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের জৈনকেন্দ্র এবং জৈনধর্ম সম্পর্কে প্রভূত আলোকপাত করা যেতে পারে। সে কাজ এখন সুরু করা দরকার।

প্রাচীন জৈনসংস্কৃতির অবশেষ এখনও লক্ষ্য করা যায় সরাক নামে একটি জাতির মধ্যে। সম্ভবতঃ প্রাচীন রাঢ় দেশের মধ্যে এই জনগোষ্ঠী সর্বপ্রথম জৈন ধর্মের ছত্রচ্ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে তবু, অন্যান্য হিন্দুজনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তাদের মধ্যে জৈন সংস্কৃতি প্রবাহিত।

সীমান্তবাঙলার এই সরাক জাতি মূলতঃ নিরামিষভোজী। তাদের পক্ষে জল না ছেঁকে পান করা নিষিদ্ধ। ডুমুর আর বট ফলের মধ্যে অতিসূক্ষ্মদেহী জীবের অস্তিত্ব আছে বলে—উক্ত ফল দুটি তাদের কাছে অভক্ষ্য। অহিংসক এই জাতিকে উক্ত কয়েকটি আচারের মানদণ্ডে বিচার করলে তাঁদের জৈনত্ব প্রমাণ করা সহজ হতো না, যদি না তাঁরা সযত্নে 'সরাক' শব্দটিকে আত্মবৎ রক্ষা না করতেন। স্যার হার্বার্ট রিজলি এঁদের জৈনকুলের অবশিষ্ট বলেই মনে করেছেন।[৫]

---

৫ A some what similar case is that of the Saraks of western Bengal, Chhotanagpur and Orissa who seems to be Hinduised remnants of the early Jain people to whom local legends ascribe the ruins of temples, the

ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং মেদিনীপুরের বহুগ্রামে এদের বসতি বর্তমান।

সরাকদের পদবী দেখেও অনুমান করা যায় আদিতে এদের কোন পদবী ছিল না। বর্তমানে পদবী হিসাবে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি গৃহীত উপাধি বিশেষ। মাঝি, মণ্ডল, সিং, খাঁ, পাত্র, নায়েব প্রভৃতি উপাধিতে তারা স্বীকৃত। এ হচ্ছে পরবর্তীকালের হিন্দু প্রভাবের ফল।

এ'দের কিছু কিছু গোত্রনামেও জৈনপ্রভাব এখনও জীবিত। গোত্র-নাম আদিদেব বা আদ্যেব, ঋষভদেব বা ঋষিদেব, অনন্তদেব প্রভৃতি জৈনস্মৃতির ধারক। বলাবাহুল্য সীমান্তবাঙ্‌লার বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাচীন জৈন প্রভাবের সম্যক্ ইতিহাস আবিষ্কার করার কাজ এখনও বাকী।

॥ ৫ ॥

শ্রাবক ॥ জৈনধর্মে শ্রাবক বলা হতো তাদেরই যাঁরা ছিলেন গৃহীভক্ত। শ্রাবক শব্দটি—পরবর্তীকালে সীমান্তবাঙ্‌লায় 'সরাক' রূপে দেখা দিয়েছে।

অধুনা অন্যত্র জৈন গৃহীভক্তদের শ্রাবক বা সরাক নামে অভিহিত করা হয় কি না জানি না। তা' যদি না হয়ে থাকে, তা'হলে পশ্চিমসীমান্তবাঙালায় বিশেষ একটি সম্প্রদায় বা জাতির উপর ঐ নাম আরোপিত হলো কেন এবং কেনই বা ঐ নামটিকে জাতিগতভাবে গ্রহণ করা হলো সে বিষয়ে ভেবে দেখা উচিত।

ধর্ম-উপদেশ দানের ব্যাপারে জৈন ধর্ম উচ্চনীচ বিচারের পরিপোষক নয়। জৈনধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষমাত্রকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া। আর্য-অনার্য-শূদ্র-ম্লেচ্ছ নির্বিশেষে সকলেই জিনমার্গ অবলম্বন করে মুক্তি লাভের অধিকারী হতে পারে। এখানেই মনুশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের বৈসাদৃশ্য। জিনোপদেশে—

মস্তক মুণ্ডন করলেই শ্রমণ হয় না,
ওম্ উচ্চারণ করলেই ব্রাহ্মণ,
বনে বাস করলেই মুনি হয় না,
বল্কল ধারণ করলেই তাপস।

---

defaced images and even the abandoned copper-mines of that part of Bengal. Their name is a varient of Sravak ; thay are strict vegetarians never eating flesh and on no ac:ount taping life. (*The People of India*—H. Risley.)

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি
যে জীবসমুদায়কে জানে,
যে কাহুর হিংসা করে না,
ক্রোধে বা পরিহাসে
লোভে বা ভয়ে
মিথ্যা বলে না।

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি
যে রাগদ্বেষহীন ও ভয়শূন্য,
ও পরীক্ষিত বা অগ্নিদগ্ধ
স্বর্ণের মত দীপ্যমান।*

পশ্চিমসীমান্ত বাংলার কোন এক জনগোষ্ঠী—যারা চতুর্বর্ণ প্রথার অঙ্গীভূত ছিল না, তারাই একদা জৈন প্রচারকদের প্রভাবে হিংসা বর্জন করে, সদাচার পালন করে তাদের গোষ্ঠীগত প্রথা বর্জন করেছিল। যে হেতু ওরা তখন বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত ছিল, সেই কারণে তাদের উপর 'সরাক' নাম আরোপিত হয়েছিল বলে মনে করার যুক্তি সংগত কারণ আছে। হিংসা বর্জন, মিথ্যা বর্জন, চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ, পরস্ত্রীত্যাগ, অভক্ষ্য বর্জন, দানধর্ম, সেবাধর্ম প্রভৃতি মানবিক গুণ অর্জন করে জিনদেবতার পূজা করলেই যে কোন লোকই সরাক হতে পারে। পশ্চিমসীমান্ত বাঙলার সরাকদের, একটি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলের ব্যাপারটি তাদের বর্ণবহির্ভূত অবস্থার জন্যই ঘটেছে এ কথা অসঙ্গত নয়।

ভ্রম সংশোধন

শ্রমণ, বৈশাখ, ১৩৮৩ ॥ ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
পৃঃ ২৭, লাইন ২৭। রায় স্থানে লাঢ়।
পৃঃ ২৮, পাদটীকা ৩। রায় স্থানে রাঢ়,
রায়ু স্থানে রাঢ়ু।
পৃঃ ২৮ পাদটীকা ৪। শিগরভূম স্থানে

* অনুবাদ—গণেশ লালওয়ানী।

মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যে 'সরাক'

সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহি কাটে
সর্বকালে করে নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট সাড়ী
দেখি বড় বীরের হরিষ ॥

—কবি কঙ্কণ চণ্ডী

কবি কঙ্কণ চণ্ডীতে সরাকদের নামোল্লেখ বিশেষ কৌতুহলবহ। মুকুন্দরামের সময় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক। তাই একথা বলা যায় যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকেও লোকে সরাকদের কথা জানত। বর্তমান যুগে তাদের কথা অবশ্য আমরা ভুলে যাই এবং তাদের প্রথম পরিচয় পাই য়ুরোপীয় গেজেটিয়ার লেখকদের লেখা হতে।

গুজরাট পত্তনের কথাও কম কৌতুহলদ্দীপক নয়। এ গুজরাট অবশ্য কাথিয়াওয়াড়-গুজরাট নয়, কলিঙ্গ সন্নিহিত মেদিনীপুর সীমান্তবর্তী কোনো গুজরাট। কিন্তু গুজরাট নাম কেন? কৃত্তিবাসী রামায়ণে গুজরাট নিবাসী হেমচন্দ্রাচার্যের জৈন রামায়ণের ব্যাপক প্রভাবের কথা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বলেছেন। এও কি সেই রকম কোনো প্রভাব?

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে লেখক প্রশ্ন করেছেন অধুনা অন্যত্র জৈন গৃহীভক্তদের শ্রাবক বা সরাক নামে অভিহিত করা হয় কিনা? হয়, সরাক নামে নয়, শ্রাবক নামে। কিন্তু সরাক-এর মত তা জাতি বাচক শব্দ নয়, যেমন শ্রাবক-এর বিপরীত সাধু শব্দ জাতি বাচক শব্দ নয়। এতদঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয়কালে স্বধর্ম রক্ষার জন্য শ্রাবকদের দুরধিগম্য অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। চলমান জীবন হতে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে ও ভিন্ন ধর্মীয়দের দ্বারা সরাক নামে বার বার অভিহিত হওয়ায় সরাক শব্দটী ক্রমশঃ জাতিবাচক শব্দে পরিণত হয়ে পড়ে বলে মনে হয়।

স্থূলভদ্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় দৃশ্য

[উপাশ্রয়। আচার্য চৌকীতে বসে। নবীন শিষ্য জয়ঘোষ তাঁর কাছে বসে পাঠ নিচ্ছে]

জয়ঘোষ : [জোরে জোরে]

পঢমা আবস্সিয়া নাম
বিইয়া য নিসীহিআ।
আপুচ্ছণা য তঈয়া
চউত্থী পড়িপুচ্ছণা ॥
পঞ্চমা···

ভগবন্‌!

আচার্য : কি জয়ঘোষ ?

জয়ঘোষ : সামাচারী কি জন্য প্ররূপিত করা হয়েছে ?

আচার্য : জয়ঘোষ, সামাচারীর অর্থ সম্যক ব্যবস্থা। এতে জীবনের সেই ব্যবস্থার নিরূপণ করা হয়েছে যাতে সাধুদের পরস্পরের মধ্যের ব্যবহার ও কর্তব্যের সংকেত রয়েছে। যেমন, সাধু যদি কার্যবশে বাইরে যায় তবে যেন গুরুজনদের জানিয়ে যায়, কার্যপূর্তির পর যখন ফিরে আসে তখন আবার তার সূচনা দেয়। সাধু নিজকৃত অসৎ ব্যবহারের বিষয়ে যেন সর্বদা সজাগ থাকে ও শ্রমশীল হয়। অন্যের অনুগ্রহ যেন সহর্ষ স্বীকার করে ও গুরুজনদের যথাযোগ্য সম্মান দেয় ও সেবা করে। সে সর্বদা যেন নম্র ও অনাগ্রহী হয়।

জয়ঘোষ : ভগবন্‌! একে কি কণ্ঠস্থ করা দরকার ?

আচার্য : হাঁ জয়ঘোষ। সামাচারী জীবনে রূপায়িত ত করতেই হয় কিন্তু সেই সঙ্গে কণ্ঠস্থ করাও প্রয়োজন। না করলে শাস্ত্র বিচ্ছেদ হয়। শ্রমণ ভগবান মহাবীর গোতম গণধরের প্রশ্নে অনেক বিষয়ই প্ররূপিত করেছিলেন যেগুলি আজ লুপ্ত প্রায় হতে চলেছে। কারণ আমরা তা স্মৃতিতে রাখতে পারিনি। এই জন্যই কণ্ঠস্থ করা প্রয়োজন।

জয়ঘোষ : ভগবন্ ! আপনি ঠিকই বলেছেন। নির্গ্রন্থ সংঘও এইজন্য এদের লিপিবদ্ধ করার কথা ভাবছে।

আচার্য : কিন্তু আজ পর্যন্ত ত আগমশাস্ত্র শ্রুত রূপেই চলে এসেছে। পূর্বসাহিত্যের দিকে যখন তাকাই তখন কেমন যেন নৈরাশ্য অনুভব করি। সম্ভবতঃ সেই সাহিত্য আমার পর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

জয়ঘোষ : ভগবন্ ! আপনার শিষ্যদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যে তা গ্রহণ করতে পারে ?

আচার্য : সেরকম ত কাউকে চোখে পড়ছে না। কিন্তু হাঁ, স্থূলভদ্র মেধাবী ও তেজস্বী। তবু নিশ্চিত করে এখনো কিছু বলা যায় না। আচ্ছা জয়ঘোষ, তুমি অকম্পিত, সিংহনন্দী, শান্তরক্ষিত ও স্থূলভদ্রকে এখানে ডেকে দাও। এই চাতুর্মাস্যে কে কোথায় যাবে তা নির্ণয় করে নেওয়া দরকার কারণ আগামীকাল কিছুদিনের জন্য আমি অন্যত্র চলে যাব।

জয়ঘোষ : ভগবন্ ! আমার জন্য কি প্রত্যাদেশ ?

আচার্য : জয়ঘোষ, তুমি এখানে অবস্থান করে বৃদ্ধ সাধুদের পরিচর্যা ও শাস্ত্রাভ্যাস কর।

জয়ঘোষ : যেরূপ আপনার আদেশ।

[জয়ঘোষ উঠে বাইরে যাবে। একটু পরে একে একে অকম্পিত, সিংহনন্দী, শান্তরক্ষিত ও স্থূলভদ্র প্রবেশ করবে। আচার্যকে বন্দনা করে সকলে আসনে উপবেশন করলে]

আচার্য : চাতুর্মাস্য এসে গেছে। এই চাতুর্মাস্যে তোমরা কে কোথায় যাবে ও কি তপস্যা করবে কিছু স্থির করেছ ?

শিষ্যরা : হাঁ, ভন্তে, হাঁ।

আচার্য : উত্তম। অকম্পিত, তুমি কি স্থির করেছ ?

অকম্পিত : ভন্তে, আমি স্থির করেছি গ্রামের বাইরের মরা জলের কুয়োর কাষ্ঠ পট্টিকায় বসে চার মাস জপ করব।

আচার্য : খুব ভালো। তুমি সিংহনন্দী ?

সিংহনন্দী : আমি ভন্তে, স্থির করেছি গ্রাম হতে বহু দূরে যে পাহাড় রয়েছে, সেই পাহাড়ের যে গুহায় পশুরাজ সিংহ বাস করে, সেই গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে চার মাস ধ্যান করব।

আচার্য : খুব ভালো। তুমি শান্তরক্ষিত ?

শান্তরক্ষিত : আমি ভন্তে, স্থির করেছি অরণ্যের ভেতরে অজগরের যে বিবর রয়েছে সেই বিবরের ধারে দাঁড়িয়ে চার মাস কায়োৎসর্গ করব।

আচার্য : খুব ভালো। আর তুমি স্থূলভদ্র ?

স্থূলভদ্র : আমি ভন্তে, পাটলীপুত্রের বারবিলাসিনী কোশার নাচ ঘরে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করব।

[সকলে একসঙ্গে]

অকম্পিত : কোশার নাচ ঘরে ? ছি ছি কি লজ্জা !

সিংহনন্দী : আজো কোশাকে ভুলতে পারল না যাকে ভালবেসে যার সঙ্গে দীর্ঘ বারো বছর কাটিয়ে এল।

শান্তরক্ষিত : বার বিলাসিনীর ঘরে চাতুর্মাস্য ব্রত ? এ শ্রামণ্যের অপমান।

আচার্য : তোমরা চুপ করো। [স্থূলভদ্রের দিকে চেয়ে] সে খুব শক্ত কাজ। তুমি পারবে ?

স্থূলভদ্র : ভন্তে, আপনার আশীর্বাদ লাভ করলে নিশ্চয়ই পারব।

আচার্য : তোমার যেমন অভিরুচি। [তারপর সকলের দিকে চেয়ে] আমি আগামীকাল সকালে বিশেষ এক তপস্যার জন্য নেপালের তরাই অঞ্চলে গমন করব। সমণায়ুষ ! চার মাস পর তোমাদের সকলের সঙ্গে আবার এইখানেই দেখা হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

[কোশার শয়ন ঘর। সময় প্রভাত। কোশা অর্দ্ধশায়িতা]

পরিচারিকা : স্বামিনি, এক শ্রমণ দরজায় অপেক্ষা করছেন।

কোশা : শ্রমণ !

পরিচারিকা : হাঁ স্বামিনি ! তাঁকে বললাম, আপনার কোথাও ভুল হয়েছে। এ এক গণিকার ঘর। প্রত্যুত্তরে তিনি শুধু বললেন, জানি। জিজ্ঞাসা করলাম, নাম ? বললেন, শ্রমণের আবার নাম কি ?

কোশা : [এলো চুলে গ্রন্থি দিয়ে উঠতে উঠতে] আশ্চর্য !

[স্থূলভদ্রের প্রবেশ]

পরিচারিকা : ওঃ এই যে ! আপনা হতেই এখানে চলে এসেছেন শ্রমণ।

[কোশা নির্নিমেষ চোখে স্থূলভদ্রের দিকে চেয়ে থাকে]

স্থূলভদ্র : কোশা, তোমার এখানে চাতুর্মাস্য ব্রতের উদ্‌যাপন করতে এসেছি।

কোশা : তুমি, তুমি স্থূলভদ্র ?

স্থূলভদ্র : হাঁ আমি। আমায় কি চিনতে পারছ না ?

কোশা : না, সত্যি তোমায় চিনতে পারছি না। আজ দীর্ঘ আট বছর তোমার প্রতীক্ষা করে রয়েছি। জানি তুমি আসবে—তুমি আমার। কিন্তু—এই কি

তোমার আসা ? না না সত্যি আমি সহ্য করতে পারছি না স্থূলভদ্র, সত্যি—
[ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না]

স্থূলভদ্র : কোশা ?

কোশা : এই দিনটাকে নিয়ে কত আশা কত কল্পনা ছিল আমার মনে। তুমি আসবে। বসবে আমার পাশে। আমার মাথা নিয়ে রাখবে তোমার বুকে। কিন্তু ওঃ ! তুমি কি নিষ্ঠুর।... [মূর্চ্ছা]

পরিচারিকা : স্বামিনি ! স্বামিনি !

[পরিচারিকা চোখে মুখে জলের ছিঁটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করবে। স্থূলভদ্র নিস্পন্দ ভাবে চেয়ে থাকবে]

[কোশা জ্ঞান ফিরে পেয়ে স্থূলভদ্রের দিকে তাকাবে]

স্থূলভদ্র : অনুমতি দাও, কোশা।

[কোশা বাইরের দিকে চেয়ে থাকবে। আকাশ দিয়ে আলুথালু মেঘ ভেসে যাবে]

স্থূলভদ্র : কোশা !

কোশা : [বিরক্ত স্বরে] আঃ ! অমন করে জ্বালিয়ো না। থাকবে বলেই যখন এসেছ, তখন—নাচ ঘরেই থাকবে ত ?

স্থূলভদ্র : ক্ষতি কি ? কিন্তু তোমার দামী দামী আসবাবগুলো ?

কোশা : ওগো তার তোমার ভয় নেই, সে আমি সামলাবো।

স্থূলভদ্র : ভয় কিসের কোশা ! সে ভয় যদি থাকত তাহলে আমি এখানে আসতাম না। তবে আমাদের আচার বিচার—

কোশা : আচার বিচার ? কোথায় ছিল তোমার সেই আচার তোমার সেই বিচার দীর্ঘ বারো বছর ? তোমার কাছে সদ্ভাবের পাঠ নিতে পারব না, তোমাকে আমি জানি ঠাকুর।

স্থূলভদ্র : কোশা, তখন আমি ছিলাম অজ্ঞানের অন্ধকারে। কঠিন সেই মায়ার আবরণ। মাছ যেমন ডুবে থাকে জলের গভীরে, তোমার প্রেমে আমারো ছিল সেই দশা। ভুলে ছিলাম আমি কে ? আমার অনেক কালের ঘরোয়ানা।

কোশা : ঘরোয়ানার উদ্দেশ পেয়ে তবে কেন এলে আবার অবিদ্যার ঘরে। না মনের আনাচে কানাচে এখনো রয়েছে লালসা ? স্থূলভদ্র, তোমায় বলে রাখি আমার প্রেম করবে না সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি, করবে কাঁটার অভ্যর্থনা। সে কথা ভাবনি কেন ?

স্থূলভদ্র : না কোশা, আমি পেয়েছি সত্য পথের সন্ধান। সেই পথে তোমায়ও তুলে নিতে চাই।

পারবে ? আচ্ছা দেখা যাবে। [ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

  জৈন ভবন

  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

  ফোন : ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র

  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. IV No. 2 : Sraman June 1976
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত

অতিমুক্ত

সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :

"এই সুন্দর বইখানি বাংলা ভাষার একটি ক্ষুদ্র সম্পদ হইয়াছে। জৈনধর্ম, অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু বই বাংলা ভাষায় আমরা পাইতেছি। কিন্তু জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এইরূপ উপাখ্যান সংগ্রহ আমি আগে দেখি নাই।···এই ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল চলিত বাংলায় লিখিত 'অতিমুক্ত' বইখানি, বোধহয়, রসোত্তীর্ণ জৈন উপাখ্যান-সাহিত্যকে বিদগ্ধ-জনসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস।"

দাম : চার টাকা

পরিবেশক :
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২/১ কলেজ স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

শ্রমণ

আষাঢ় । ১৩৮৩

চতুর্থ বর্ষ · তৃতীয় সংখ্যা

শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৮৩ ॥ তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

মহাবীর, বৈভার গিরি, রাজগৃহ

মধ্যকালীন

মেঘদূত ও জৈন দূত কাব্য

কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত, মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরেস্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে

—রবীন্দ্রনাথ

অমর কবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত যে যুগে যুগে বিশ্বের বিরহী হৃদয়কেই কেবল উদ্বুদ্ধ করেছে তাই নয়, বিশ্বের কবি ও ভাবুক হৃদয়কেও অনুপ্রাণিত করেছে। এর কল্পনা, এর ধ্বনি, এর শব্দবিন্যাস, এর রূপ বৈচিত্র সহজেই ভোলা যায় না। ভোলা যায় না তাই অধ্যাত্ম সাধক গৃহ পরিত্যাগী জৈন সন্ত কবিরাও ভুলে যেতে পারেন নি। পারেননি বলেই তাঁরা একদিকে যেমন মেঘদূতের মত একাধিক দূত কাব্যের রচনা করেছেন তেমনি অন্যদিকে তাঁর মেঘদূতের পদের প্রথম বা শেষ পংক্তি তাঁদের কাব্যের পাদপূর্তি রূপে গ্রহণ করেছেন। জিনসেন ত তাঁর পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যে সমগ্র মেঘদূতকেই আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। এক আধ পংক্তি বা পদের সন্নিবেশ তেমন শক্ত নয় কিন্তু একখানি সমগ্র কাব্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের কাব্যে সন্নিবেশিত করা বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক এবং তা যদি রসোত্তীর্ণ হয়। বোধ হয় এই জন্যই অধ্যাপক কাশীনাথ পাঠক জিনসেনকে কালিদাসের চাইতেও বড় কবি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ The first place among Indian poets is alloted to Kalidasa by consent of all. Jinasena, however, claims to be considered a higher genius than the author of the *Cloud Messenger*.

দূত কাব্য বিরহ বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের ওপর আশ্রিত। এতে নায়ক বা নায়িকা কোনো দূতের মাধ্যমে নিজের ভালোবাসা বা আর্তির কথা নায়িকা বা নায়ককে জানায়। অবশ্য এ ধরণের দূত প্রেরণের প্রাচীনতম উদাহরণ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে সরমা-পণি সংবাদে পাওয়া গেলেও মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতই দূত কাব্যের এক অনন্য উদাহরণ। সংস্কৃত সাহিত্যে যত দূত কাব্য রচিত হয়েছে তা এর অনুকরণে এবং এরই অনুপ্রেরণায়।

জৈন সন্ত কবিরা অবশ্য এর শৈলী গ্রহণ করলেও এতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন

করেছেন। যেমন (১) বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের স্থানে তাঁরা শান্তরস প্রবাহিত করেছেন ; (২) দূতকাব্যকে ধর্মীয় তত্ত্ব প্রতিপাদনে ব্যবহার করেছেন ; ও (৩) কাব্যাত্মক পত্র রচনায় এই শৈলীর প্রয়োগ করেছেন। জৈন বাঙ্ময়ে এ'দের বিজ্ঞপ্তি পত্র বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তি পত্র সাধারণতঃ জৈন শ্বেতাম্বর সাধুরা পর্যুষণ পর্বের পর তাঁদের আচার্যের কাছে প্রেরণ করতেন। এই ধরণের বিজ্ঞপ্তিপত্র খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক হতে বহুল পরিমাণে লিখিত হয়েছে। এ হতে মনে হয় যে দূত কাব্যের শৈলী জৈন সন্ত কবিদের বিশেষ প্রিয় ছিল। প্রিয় হবার কারণ জন মানসের সঙ্গে পরিচিত জৈন সাধুরা তাঁদের নিরস ধর্মীয় তত্ত্ব ও নিয়মকে সরস ও সাহিত্যিক রূপ দেবার জন্য এই বিধির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কৃতিত্ব এইখানে যে ধর্মীয় তত্ত্ব ও নিয়ম প্রতিপাদন করেও সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও সরসতা কোথাও ক্ষুণ্ন হতে দেন নি।

জৈন সন্ত কবিদের রচিত সমস্ত দূত কাব্যও সংস্কৃত ভাষায়। প্রাকৃত ভাষায় একটিও নয়। প্রধান দূত কাব্যে পার্শ্বনাথ ও নেমিনাথের জীবন বৃত্ত অংকিত। এর সব চাইতে প্রাচীনতম উদাহরণ জিনসেনের পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্য (খৃষ্টীয় ৭৮৩ অব্দ পূর্বের)। ১৩শতক হতে দূত কাব্যের পরম্পরায় জোয়ার আসে। তার কয়েকটি বিশিষ্ট রচনাঃ বিক্রমের নেমিদূত (খৃষ্টীয় ১৩ শতকের শেষ পাদ), মেরুতুঙ্গের জৈন মেঘদূত (১৩৪৬-১৪১৪ খৃঃ মধ্যবর্তী কোনো সময়), চারিত্র সুন্দর গণির শীলদূত (১৫ শতক), বাদিচন্দ্রের পবনদূত (১৭ শতক), বিনয় বিজয় গণির ইন্দুদূত (১৮ শতক), মেঘ বিজয়ের মেঘদূত সমস্যালেখ (১৮ শতক), অজ্ঞাত কতৃক চেতোদূত ও বিমল কীর্তি গণির চন্দ্রদূত।

নীচে এই সমস্ত গ্রন্থের সামান্য পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

পার্শ্বাভ্যুদয়ঃ এই কাব্য ৪ সর্গে বিভক্ত। ১ম সর্গে ১১৮, ২য় সর্গে ১১৮, ৩য় সর্গে ৫৭ ও ৪র্থ সর্গে ১১টি মোট ৩৬৪টি পদ আছে। এর প্রত্যেক পদ মেঘদূতের ধারাবাহিক পদের এক বা দুই পদ সমস্যা রূপে নিয়ে পূর্তি করা হয়েছে। মেঘদূতের মতই ছন্দ মন্দাক্রান্তা, ভাষাও সেইরূপ পৌঢ়।

এই কাব্যের বর্ণিত বিষয় ২৩ সংখ্যক তীর্থংকর পার্শ্বনাথের ওপর কৃত উপসর্গ। উপসর্গকারী সম্বর যক্ষের পূর্বজন্মের সঙ্গে এই কাহিনী গ্রথিত। অবশ্য পুরাণাদিতে পার্শ্বচরিত্র যেরূপ পাওয়া যায় কবি প্রয়োজন মত তার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। তবুও মেঘদূতের প্রচলিত অর্থকে ভিন্ন কথা মানসে প্রসঙ্গোচিত অর্থে তিনি যেভাবে প্রযুক্ত করেছেন তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। অবশ্য একে দূত কাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না তবুও মেঘদূতের সমস্যাপূর্তির জন্য এর এখানে উল্লেখ করা গেল।

পার্শ্বাভ্যুদয়ের রচয়িতা জিনসেন রাষ্ট্রকূট নরপতি অমোঘবর্ষের সমকালীন ছিলেন। পার্শ্বাভ্যুদয়ের উল্লেখ ২য় জিনসেন তাঁর হরি বংশ পুরাণে (৭৮৩ খৃঃ) করেছেন। তাই

এর রচনা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে অনুমান করা হয়। জিনসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা মহাপুরাণ বা আদি পুরাণ।

নেমিদূতঃ এতে ১২৬টী পদ রয়েছে। এখানে মেঘদূতের প্রতিটি পদের অন্তিম চরণ সমস্যা পূর্তি রূপে নেওয়া হয়েছে। এতে ২২ সংখ্যক তীর্থংকর নেমিনাথ ও রাজীমতী বা রাজুলের বিরহ বর্ণিত হয়েছে। তাই মেঘদূতের ওপর আধিত হলেও একে এক মৌলিক কাব্য বলা চলে। নাম নেমিদূত হলেও নেমি বা নেমিনাথ দৌত্যের কাজ করেছিলেন তা নয়। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এখানে দূত রূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

নেমিনাথ রাজীমতীকে বিবাহ করতে এসে পশুদের আর্ত চীৎকার শুনে ও তাদের তাঁর বিবাহে রাজন্যদের আহারের জন্য হত্যা করা হবে অবগত হয়ে সেখান হতেই সংসার পরিত্যাগ করে রৈবতক পর্বতে চলে যান। বধূ রাজীমতী সেই সংবাদ অবগত হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূত রূপে প্রেরণ করেন। এখানে দ্বারকা হতে রৈবতক পর্যন্ত পথের সুন্দর বর্ণনা আছে। অবশ্য শেষে রাজীমতীর বিরহ সমভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে ও তিনিও সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করে সংসার পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন।

নেমিদূত ভাষা, ভাব ও কাব্য সমস্ত গুণেই উৎকৃষ্ট। কবি বিরহিনী রাজীমতীর যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা পড়তে পড়তে চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আসে। তাই দূত কাব্য না বলে একে বিরহ কাব্যই বলা উচিত।

নেমিদূতের রচয়িতা বিক্রম কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। এই কাব্যের প্রাচীনতম যে পুঁথি পাওয়া গেছে তা ১৪৭২ সম্বতের। তাই কবি তার পূর্ববর্তী সময়ে বর্তমান ছিলেন সেকথা বলা যায়।

জৈনমেঘদূতঃ জৈন মেঘদূতও নেমিদূতের মত নেমিনাথ ও রাজীমতীর জীবন প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত। জৈন মেঘদূত হলেও মেঘদূতের সমস্যা পূর্তিরূপে আশ্রয় নেওয়া হয়নি। একমাত্র নাম ছাড়া শৈলী, রচনা বিভাগ সমস্তই স্বতন্ত্র। জৈন মেঘদূত ৪ সর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক সর্গে ক্রমশঃ ৫০, ৪৯, ৫৫ ও ৪২টি পদ রয়েছে।

এই কাব্যের বিষয় নেমিনাথের প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদে রজীমতী মূর্চ্ছিত হয়ে যাচ্ছেন। জ্ঞান ফিরে এলে মেঘকে তাঁর দুঃখিত অবস্থার বর্ণনা করে নেমিনাথকে যা জানাবার ছিল তা জানিয়ে দূতরূপে প্রেরণ করছেন। সখীরা তখন রাজীমতীকে নানাভাবে বুঝিয়ে বলছে, কোথায় মেঘ, কোথায় তোমার বিরহ আর কোথায় তাঁর বীতরাগী প্রবৃত্তি? তিনি আত্ম কল্যাণের জন্য সংসার পরিত্যাগ করে গেছেন। রাজীমতী তখন শোক পরিত্যাগ করে নেমিনাথের কাছে গিয়ে সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করছেন।

এই কাব্যে পদলালিত্য, অলঙ্কার বাহুল্য আদি থাকলেও শ্লেষপদ ও ব্যাকরণের ক্লিষ্ট প্রয়োগের জন্য একটু কঠিন হয়ে গেছে। তাছাড়া মেঘ ও নেমিনাথের পরিচয় থাকলেও ভৌগলিক স্থানের কোনো নির্দেশ নেই।

রচয়িতা মেরুতুঙ্গাচার্য প্রবন্ধ চিন্তামণির রচয়িতা মেরুতুঙ্গাচার্য নন্। ইনি অঞ্চল গচ্ছীয় মহেন্দ্রপ্রভ সূরীর শিষ্য। কাব্যে রচনা সময় দেওয়া নেই। তবু তাঁর কাল হতে বিক্রম সংবত ১৪০৩ থেকে ৭৩ এর মধ্যে কোন সময় এটি রচিত হয়ে থাকবে বলা যায়।

শীলদূতঃ কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচিত ও মেঘদূতের পদের অন্তিম চরণ সমস্যাপূর্তি রূপে গৃহীত। ছন্দ তাই মন্দাক্রান্তা। পদ সংখ্যা ১৩৭। এতে স্থূলভদ্র ও রূপজীবা কোশার প্রসিদ্ধ কথানক নিয়ে স্থূলভদ্রের ব্রহ্মচর্য রূপ শীলের বর্ণনা করা হয়েছে। কোশা নানাভাবে স্থূলভদ্রকে প্রলোভিত করে শীল হতে চ্যুত করবার চেষ্টা করছে কিন্তু স্থূলভদ্র তাঁর অনুপম উপদেশে তাকেই শীলব্রত গ্রহণ করাতে সমর্থ হচ্ছেন।

শীলরূপ ভাবাত্মক তত্বকে দূতরূপ দিয়ে কবি নিজের মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। এতে দীর্ঘ সমাস নেই বললেই চলে। অলঙ্কার ও উৎপ্রেক্ষা দর্শনীয়। মেঘদূতের শৃঙ্গার ধর্মী পংক্তিকেও শান্তরসধর্মী করতে কবি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

রচয়িতা চারিত্রসুন্দর গণি খম্ভাতে ১৪৮৪ সম্বতে এটি রচনা করেন।

পবনদূত ঃ এটি মেঘদূতের সমস্যাপূর্তি না হয়ে একটী স্বতন্ত্র রচনা। তবুও একে মেঘদূতের ছায়া বলা যায়। এতে ১০১টী মন্দাক্রান্তা বৃত্ত রয়েছে।

গল্পের বিষয় বস্তু খুব ছোট। উজ্জয়িনীর রাজা বিজয়ের রানী তারাকে অশনিবেগ নামক এক বিদ্যাধর চুরী করে নিয়ে যায়। রাজা পবনকে দূত করে তারাকে সংবাদ পাঠাচ্ছেন। পবনও সাম, দান দণ্ড ও ভেদ প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত তারাকে বিজয়ের কাছে এনে প্রত্যর্পণ করতে পারছেন।

পবনদূত এক বিরহ কাব্য। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সঙ্গে সঙ্গে কবি নৈতিক, সামাজিক ও ধার্মিক শিক্ষাও কিছু কিছু দিয়েছেন।

এর রচয়িতা ভট্টারক বাদিচন্দ্র ১৭ শতকের লোক।

১৭-২০ শতকের দূত কাব্য ঃ ১৭ শতকে মুনি বিমলকীর্তি চন্দ্রদূত নামে এক দূত কাব্যের রচনা করেন। এতে ১৬৯টী পদ আছে। মেঘদূতের পাদপূর্তিরূপে রচিত হলেও কোথাও কোথাও ভাবের স্পষ্টীকরণের জন্য অধিক পদও রচনা করা হয়েছে। কবি এখানে চন্দ্রকে সম্বোধিত করে শত্রুঞ্জয় তীর্থস্থ প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবকে নিজের বন্দনা জানিয়েছেন। কবি কোথা হতে বন্দনা জানিয়েছেন তা না জানা গেলেও কাব্য ভাব ও বিদ্বতাপূর্ণ। রচনাকাল ১৬৮১ সম্বৎ।

১৮ শতকে তিনটি দূত কাব্য পাওয়া যায়। প্রথম চেতোদূত, দ্বিতীয় মেঘদূত সমস্যালেখ, তৃতীয় ইন্দুদূত। চেতোদূতের অজ্ঞাত কবি গুরুচরণের কৃপাদৃষ্টিকে নিজের•

প্রেয়সী রূপে কল্পনা করে তাকে নিজের চিত্র পাঠাচ্ছেন। এতে গুরুর যশঃ, বিবেক ও বৈরাগ্যের বর্ণণা আছে। কাব্যটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত, ১২৯টী পদ সম্বলিত।

মেঘদূত সমস্যালেখের কবি উপাধ্যায় মেঘবিজয় ঔরঙ্গাবাদ হতে গুরুর বিরহে কাতর হয়ে মেঘকে গুজরাটের দেবপত্তনে দূতরূপে প্রেরণ করছেন। মেঘ গুরুর নিকট হতে প্রতিসন্দেশও নিয়ে আসছে। এতে ১৩০টী মন্দাক্রান্তা ছন্দের পদ রয়েছে। শেষেরটি অনুষ্টুভ। ঔরঙ্গাবাদ হতে দেবপত্তন পর্যন্ত পথের বর্ণনও মনোহর; বিষয়, ভাব, ভাষা ও শৈলী সমস্ত দৃষ্টিতেই এই কাব্য সমস্ত দূত কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই কাব্যের রচয়িতা বিদ্বান মহোপাধ্যায় মেঘ বিজয়জী। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান কাব্যের রচনাকাল সম্বত ১৭২৭।

১৮ শতকের তৃতীয় দূতকাব্য ইন্দুদূত। এতে ১৩১ টি মন্দাক্রান্তা পদ রয়েছে। ইন্দুদূতে চাতুর্মাস্যের সময় যোধপুর নিবাসী বিনয় বিজয় গণি সুরত নিবাসী গুরু বিজয়-প্রভ সূরির কাছে চন্দ্রমাকে দূত রূপে প্রেরণ করে সাংবাৎসরিক ক্ষমাপনা জানাচ্ছেন। কাব্যে যোধপুর হতে সুরত পর্যন্ত পথের জৈন মন্দির ও তীর্থের বর্ণনা আছে। তাই একভাবে একে বিজ্ঞপ্তিপত্রও বলা যায়। ভাষা প্রবাহময় ও প্রসাদপূর্ণ। দূতকাব্যের পরম্পরায় এ ধরণের প্রয়োগ নবীন।

ইন্দুদূত জাতীয় দ্বিতীয়কাব্য ময়ূরদূত ১৯৯৩ সম্বতে রচিত। এতে ১৮০টি পদ রয়েছে যার অধিকাংশই শিখরিনী ছন্দে। কবির নাম ধুরন্ধর বিজয়। ময়ূরদূতে চাতুর্মাস্যের সময় কপড়বণজ নিবাসী বিজয়ামৃত সূরি জামনগর নিবাসী গুরু বিজয়নেমি সূরিকে বন্দনা ও ক্ষমাপনা জানাচ্ছেন। এখানে দূতরূপে ময়ূরকে নেওয়া হয়েছে। ময়ূরের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কপড়বণজ হতে জামনগর পর্যন্ত পথের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত দূত কাব্য ছাড়াও আরও বহু দূতকাব্যের নাম গ্রন্থভাণ্ডারের পুস্তক তালিকায় পাওয়া যায়। যেমন জম্বূকবির ইন্দুদূত, বিনয়প্রভের চন্দ্রদূত অজ্ঞাত কবির মনোদূত, ইত্যাদি।

নন্দীসেন

[জৈন কথানক]

ভগবান মহাবীরের কাছে প্রব্রজিত হবার জন্য পিতৃআজ্ঞা নিয়ে গৃহ হতে বহির্গত হলেন রাজপুত্র নন্দীসেন। নবোষার আলোকমাত্র তখন স্ফুরিত হয়েছে। রক্তাধরা পূর্বদিগবধূদের রাগময় চুম্বনে আকাশ অনুরাগ রঞ্জিত। সেই প্রথম উষার স্নিগ্ধতায় মনের আনন্দে পথ ধরে চলেছেন নন্দীসেন।

রাজ প্রাসাদের লৌহ ও প্রস্তরের প্রাকার অতিক্রম করে শ্যাম বনভূমির উপান্ত পার হয়ে তিনি এক ক্ষীণধারা স্রোতস্বিনীর কাছে এসে থামলেন। গুণশীল চৈত্যে যাবার সেইটিই পথ।

সেই স্রোতস্বিনী অতিক্রম করে গুণশীল চৈত্যে যাবার জন্য তিনি যেই পা তুলেছেন তেমনি কার পায়ের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে পেছনের দিকে ফিরে চাইলেন। কিন্তু দু' চোখ দিয়ে যত দূর দেখা যায় ততদূরে দৃষ্টি প্রসারিত করেও কোথাও কাউকে তিনি দেখতে পেলেন না। মনে মনে ভাবলেন, আশ্চর্য। তিনি যে পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনেছেন।

আবার এগিয়ে যাবার জন্য তিনি পা তুললেন। কিন্তু এবারে শব্দ নয়, কার কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলেন। সেই কণ্ঠস্বর তাঁর খুব নিকট হতেই যেন বলছে, তুমি কোথায় যাচ্ছ নন্দীসেন? তোমার কামনা আজো অপরিতৃপ্ত। সেই কামনা পরিতৃপ্ত করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো।

স্রোতস্বিনীর তীরে দাঁড়িয়ে নন্দীসেন আবার চারদিকে চেয়ে দেখলেন। কিন্তু নিকটে দূরে, সামনে পিছনে, ওপরে নীচে, কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। তবে কি তিনি ভুল শুনেছেন? তাও ত নয়। তিনি যে স্পষ্ট শুনেছেন।

নন্দীসেন এগিয়ে যাবার জন্য আবার পা তুললেন। আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ধীমান, অসময়ে কৃত কর্ম সফল হয় না।

নন্দীসেন ফিরে তাকালেন। না, কেউই কোথাও নেই। তবু তিনি এবার প্রত্যুত্তর না দিয়ে পারলেন না। বললেন, হে অশরীরি! আপনি কে তা আমি জানি না, আপনার উপদেশ বাক্যের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মনে কোনো কামনা আমি দেখতে পাই না। তাই আমি নিজেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অধিকারী বলে মনে করি।

আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, না নন্দীসেন, তুমি তোমার অন্তস্তলশায়িনী কামনা-কে আজো প্রত্যক্ষ করো নি। কিন্তু আমি তাকে নগ্ন নিরাবরণরূপে দেখতে পাচ্ছি।

তোমার মধ্যে কামিনীর কামনা রয়েছে। তাকে দয়িতারূপে তোমায় গ্রহণ করতে হবে। তাই তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত হতে বলছি।

বিস্মিত হন নন্দীসেন। কিন্তু সমগ্র অন্তর তন্ন তন্ন করে দেখেও কোথাও কোনো কামিনী-কামনার সন্ধান পান না। তাঁর হৃদয় জলমগ্ন ওই পাষাণশীলার মতোই কঠিন, নির্মম। স্রোতস্বিনীর জলধারা তার ওপর সলজ্জ কলহর্ষ তুলে প্রবাহিত হয়েই যেতে পারে, তাকে বিক্ষুব্ধ বা দ্রবিত করতে পারে না।

তাই সেই উপদেশ উপেক্ষা করে তিনি গুণশীল চৈত্যের দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মহাবীরের কাছে দীক্ষিত হলেন নন্দীসেন।

মহাবীরও অবশ্য তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত হতে বলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি দীক্ষিত করে নিলেন।

নন্দীসেন সেই পদ শব্দ, সেই কণ্ঠস্বরের কথা মহাবীরের কাছে বলেছিলেন। কিন্তু মহাবীর তার প্রত্যুত্তর দেন নি। কেবল জ্যোৎস্নার মত এক সুস্মিত হাসি তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

কিন্তু যত দিন যায় নন্দীসেন প্রত্যুত্তরের জন্য তত ব্যাগ্র হয়ে ওঠেন। কারণ সেই পদশব্দ, সেই কণ্ঠস্বর তাঁকে সর্বদাই অনুসরণ করে চলেছে। হয়ত অশোকতরুর ছায়ায় বসে তিনি শাস্ত্র পাঠে মনোভিনিবেশ করতে যাবেন হঠাৎ শুষ্কপত্রে কার পদধ্বনি বেজে ওঠে। মরালীর মত এক ত্রস্ত মৃদুগতি তৃণদলে শিহরণ তুলে দূর বনান্তের ছায়ায় গিয়ে মিলিয়ে যায়। হয়ত ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যাবার জন্য শরীরকে ঋজু করে কায়োৎসর্গে স্থিত হয়েছেন ওমনি কার কণ্ঠস্বর দূরশ্রুত গীতধ্বনির মতো তাঁর কানে বেজে ওঠে। কে যেন বলে ওঠে, নন্দীসেন, তোমার এই কঠোর ব্রতীর জীবন বৃথা।

নন্দীসেনের মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যই কি বৃথা ?

আরো কঠোর হন নন্দীসেন। কঠোরতর করে তোলেন জীবন চর্যা। যেন কৃচ্ছ-তার প্রাকার রচনা করে সুরক্ষিত রাখবেন নিজেকে।

হাস্য করে ওঠে সেই কণ্ঠস্বর। অপেক্ষা কর নন্দীসেন, তোমার যে অঙ্কশায়িনী হবে সে তোমার মধ্যেই রয়েছে।

আমার মধ্যে ? না-না-না। বিচলিত হন নন্দীসেন। তা কি করে সম্ভব ?

কিন্তু একি দেখছেন তিনি ? দেখছেন এক যৌবনবতী নারীর লীলায়িত অঙ্গশোভা। শিথিল নিচোল, বিগলিত বেণী, চঞ্চল সমীর কৌতুকে উদ্বেলিত বসন—আষাঢ়ের সঘন মেঘের সঞ্চারের মত অশোকের নীল ছায়ায় নিস্তব্ধ হয়ে সে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই কমনীয় দেহকান্তি না জানি কেন প্রবল দাহিকারূপে তাঁর ধমনী ধারায় প্রবাহিত হয়ে যায়।

নন্দীসেন স্থির করেন উপবাস বিশীর্ণতায় জয় করবেন তিনি এই চিত্ত চাঞ্চল্য।

দীর্ঘ উপবাসে শরীর শুষ্ক হয় কিন্তু তাঁর গৌরবর্ণ দেহের রজত কান্তি দহনোত্তীর্ণ স্বর্ণের মত আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এক দীর্ঘ উপবাসের পর ভিক্ষা করতে এসেছেন নন্দীসেন। কোথায় এসেছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। কে যেন চালিত করে নিয়ে এসেছে তাঁকে কুসুমাকীর্ণ বৃক্ষ-রাজি বেষ্টিত শঙ্খধবল এক শিল্পরুচিরম্য সৌধের দ্বার প্রান্তে। সেখানে এসে নন্দীসেন থমকে দাঁড়ান। তাঁর মনে হয় এক লঘু ত্রস্ত পদধ্বনি সেই দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করে অভ্যন্তরের দিকে এগিয়ে যায়। বিস্মিত হন নন্দীসেন। বিস্মিত হন আরো যখন দেখেন সুধ্বনিময় সঙ্গীতের মুখরতা ও নিবিড় সৌগন্ধ্যের আবেশ নিয়ে এসে দাঁড়ায় তাঁর সামনে মোহময় এক নারী—বিলোল হারাবলীতে ললিত যার পীনোন্নত বক্ষ, হরিচন্দনে চিত্রিত যার চিবুক, কুন্দাভ স্মিত চন্দ্রিকার মত যার হাসি, সিন্ধুজল বিধৌত রক্ত প্রবালের মত যার অধর দ্যুতি। নন্দীসেন নিষ্পলক চেয়ে দেখেন আর ভাবেন এই কি তাঁর অন্তরশায়িনী সেই নারী যে দয়িতা রূপে তাঁর অঙ্কশায়িনী হবে।

জঠর বুভুক্ষার চাইতেও কেমন যেন দুর্বার হয়ে ওঠে দেহের বুভুক্ষা।

সেই নারীর চোখেও আবার স্ফুরিত হয় মোহময় হর্ষের বিদ্যুৎ। কে এই পথভ্রান্ত তরুণ কান্তি শ্রমণ রাজপুত্রের মত কমনীয় যার রূপ, যৌবনাঢ্য দেহ যেন শ্রামণ্যের কৃচ্ছ্রতা ঘেরা এক রমণীয় উপবন! আরো আয়ত হয় সেই নারীর আয়ত লোচন, দ্রুত হয় বক্ষের নিঃশ্বাস।

সেই নারীই প্রশ্ন করে নন্দীসেনকে, কি চান আপনি, ধীমান?

মুরজ ধ্বনির চাইতেও মধুর মনে হয় সেই কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বরে নন্দীসেনের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তারপর কিছু বলবার জন্য ধীরে ধীরে তিনি মুখ তুলে তাকান সেই বরনারীর মুখের দিকে—কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। শুধু বলেন, ভিক্ষা।

বিস্ময় জাগে সেই নারীর কজ্জলিত নয়নের শোণিমায়। ভিক্ষা! তার কেমন যেন মনে হয় এত ভিক্ষাপ্রার্থী শ্রমণের মুখ নয়, এ এক প্রণয় প্রার্থী—বিহ্বল প্রণয়ীর মুখ। তখন বিদ্যুৎলতার মত এক বক্র হাসি খেলে যায় তার রাগরক্ত অধরে। বলে আমি রূপজীবা রুচিরা। আমার রূপ ও যৌবন ছাড়া আপনাকে আমি কি ভিক্ষা দিতে পারি?

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই বিস্মিত হন নন্দীসেন। তাঁর মধ্য হতে কে যেন বলে ওঠে, আমি ধন্য হলাম বরনারী। তুমি আমার জীবনের প্রথম বিস্ময়, যৌবনের স্বপ্ন, স্বপ্নলোকের মাধুরী। তুমি ছাড়া আমার সব ধ্যান সব কৃচ্ছ্রসাধনা বৃথা।

এক প্রগল্‌ভার হাসি হেসে ওঠে বুচিরা। তারপর শ্রমণের বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্য এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে তাঁর দিকে। তারপর এক তরুণ প্রেমিকের ব্যগ্র দুই বাহুর বন্ধনে সে বিলীন হয়ে যায়।

ছয়টি লঘু মুহূর্তের মত ব্যতীত হয় ছয়টি মধুবসন্ত। নন্দীসেন তার কিছুই জানতে পারেন না। কখন আংশুমালী উদিত হন, কখন অস্ত যান, কখন নিশাপতি বিস্তৃত করেন তাঁর কুহেলী জাল। সমস্ত কিছু তাঁর লুপ্ত হয়ে যায় এক মহাশূন্যে— ত্রিভুবনে কেউ কোথাও নেই। শুধু আছেন তিনি ও তাঁর বুচিরা।

তারপর এক সময় মোহ উপশান্ত হয়। বিহগকণ্ঠকূজিত এক প্রভাতে বুচিরার আশ্লেষ হতে মুক্ত হয়ে বহির্প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ান নন্দীসেন। প্রভাতের রক্তরাগ তখন সবেমাত্র প্রস্ফুটিত হতে আরম্ভ করেছে।

বিস্মিত বুচিরা পথরোধ করে দাঁড়ায় নন্দীসেনের। প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছ, হে বরতনু?

নন্দীসেন বুচিরার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। এই কি সেই বিপুল যৌবনা তাঁর স্বপ্নের নারী যাকে দেখে তিনি একদিন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। আজ তাঁর দৃষ্টি তার দেহ সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে আরও গভীরে অবগাহন করে।

তাঁর চোখ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। তারপর বুচিরার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, আমায় ক্ষমা কর, বুচিরা।

ক্ষমা! এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠে আসে বুচিরার অন্তস্তল হতে।

ধীরে ধীরে বলেন নন্দীসেন, আজ প্রভাতী স্বপ্নে দেখেছি ভগবান মহাবীরের স্নেহসিক্ত করুণার্দ্র চোখ। সেই চোখ আমায় আহ্বান করছে।

এক বিষণ্ণ ও বেদনার্ত শঙ্কায় কম্পিত হয় বুচিরার দেহবল্লরী। আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে নন্দীসেনের প্রশস্ত বক্ষদেশে। জড়িয়ে ধরে তাঁকে একান্ত বুকের কাছে। বলে, বল নন্দীসেন, তুমি আমায় পরিত্যাগ করে যাবে না?

উত্তর দেয়না নন্দীসেন।

তাঁকে আরো আবেগে জড়িয়ে ধরে বুচিরা। বলে, বল, বল নন্দীসেন, ভীরু কেন তোমার অধর, কুণ্ঠিত কেন তোমার নিঃশ্বাস?

আসন্ন এক মৃত্যুর বজ্রনাদ যেন শুনতে পেয়েছে বুচিরা। বুঝতে পেরেছে কিছুতেই ধরে রাখা যাবে না নন্দীসেনকে। তাই ধীরে ধীরে সে তাঁকে আশ্লেষ মুক্ত করে দেয়। অশ্রু বিগলিত হয়ে বিধৌত করে সুতনুকা বহুবল্লভা বুচিরার কপোলতল। আসক্তির মৃত্যু হয়েছে। সত্য শুধু সেই প্রেম, সেই মিলন।

আর একবার সেই স্রোতস্বিনীর তীরে এসে দাঁড়ান নন্দীসেন। স্রোতস্বিনীর ক্ষীণ জলধারা কলনাদ তুলে তেমনি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জলমগ্ন পাষাণ শীলা আজো তেমন পড়ে রয়েছে।

নন্দীসেন সেই শীলার দিকে চেয়ে আর একবার প্রশ্ন করেন নিজেকে, তাঁর হৃদয় কি ওই জলমগ্ন পাষাণ শীলার মতই কঠিন, নির্মম ?

কেমন যেন এক বেদনা অনুভব করেন নন্দীসেন, যা করুণায় আদ্র্, প্রেমে মহীয়ান।

গুণশীল চৈত্যের দ্বারদেশে অপেক্ষা করেন নন্দীসেন। মহীবীর যদি আহ্বান করেন তবেই তিনি প্রবেশ করবেন নইলে সংলেখনায় পরিত্যাগ করবেন সেই মরদেহ।

কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় না অধিকক্ষণ। শুনতে পান তিনি মহাবীরের কণ্ঠস্বর, তুমি সত্যনিষ্ঠ। অরণির মতোই তুমি শুচি ও অপাপবিদ্ধ।

উচ্ছসিত বাষ্পাসারে প্লাবিত হয় নন্দীসেনের বেদনাদ্র্ চোখ।

প্রবন্ধ চিন্তামণি

পূরণচাঁদ সামসুখা

[পূর্বানুবৃত্তি]

[৩]

বিখ্যাত গুর্জরাধিপতি ভীমরাজের চাউলা দেবী নাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভে হরিপাল দেব জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিভুবন পাল তাঁহার পুত্র এবং এই ত্রিভুবন পালের পুত্র প্রথিতযশা কুমার পাল। ভীমরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র কর্ণদেব রাজত্ব প্রাপ্ত হন ও তৎপরে তৎপুত্র সুবিখ্যাত জয়সিংহদেব সিংহাসনাধিরোহণ করেন।

জয়সিংহদেব কুমার পালের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, এমন কি তাঁহার প্রাণবধ করিতে কৃত সংকল্প হইলে কুমার পাল ভয়ে সন্ন্যাসী বেশে পলায়ন করেন। কয়েক বৎসর নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া একদা গুপ্তভাবে পুনরায় গুজরাটে প্রত্যাগত হন।

এই সময়ে সিদ্ধরাজ জয়সিংহদেব পিতা কর্ণদেবের শ্রাদ্ধোপলক্ষে সর্বসন্ন্যাসিগণকে নিমন্ত্রণ করিলে কুমার পালও তাঁহাদের সহিত গমন করেন। ভূপতি স্বহস্তে সন্ন্যাসি-গণের পদপ্রক্ষালন করিতে করিতে কুমার পালের পদে ঊর্দ্ধরেখাদি রাজোচিত চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহক্রমে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কুমার পাল রাজার ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়া কোনরূপে গোপনে পলায়ন পূর্বক আলিঙ্গ নামক জনৈক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুমার পাল পলায়ন করিলে, রাজা তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য অবিলম্বে কয়েকজন অশ্বারোহীকে তাঁহার পশ্চাৎ প্রেরণ করেন। কুমার পাল এই সংবাদ অবগত হইয়া কুম্ভকার গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক ক্ষেত্রস্বামীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে সেই ক্ষেত্রস্বামী তাঁহাকে কণ্টক পরিপূর্ণ কাষ্ঠরাশির মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। অশ্বারোহীগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে তথায় আগমন করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান পূর্বক প্রস্থান করিলে কুমার পাল কণ্টকরাশির মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বেশ পরিবর্তন পূর্বক তথা হইতে পলায়ন করেন।

এই সময় কুমার পাল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। কখনও অন্নাভাবে দুই তিন দিবস উপবাস করিয়া থাকিতে হইত, কখনও বা ভিক্ষা করিতে গিয়া কত দুষ্ট লোকের নির্যাতন সহ্য করিতে হইত, আবার কখনও ধৃত হইবার আশঙ্কায় নানা প্রকার ছদ্মবেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে হইত। এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে

স্তম্ভতীর্থে (খম্বাত বা Cambay) গমন করেন। তথায় উদয়ন মন্ত্রী অবস্থান করিতেছেন জানিয়া পাথেয় ভিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। সে সময়ে সুবিখ্যাত জৈন সাধু শ্রীহেমচন্দ্রাচার্যও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার শরীরে বহু সুলক্ষণ দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে কালে এই ব্যক্তি পরাক্রান্ত নরপতি হইবেন। উদয়ন মন্ত্রী সৎকার করিয়া উপযুক্ত পাথেয় প্রদান করিলে কুমারপাল মালবাভিমুখে প্রস্থান করেন।

মালবে অবস্থানকালে কুমারপাল সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেবের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি কপর্দক শূন্য হস্তে তৎক্ষণাৎ গুর্জর প্রদেশের রাজধানী অনহিল্ল-পুর পট্টনাভিমুখে যাত্রা করেন ও পথের মধ্যে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া কয়েক দিবসের পর ক্ষুৎপিপাসা শ্রমপীড়িত দেহ লইয়া পট্টনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভগিনীপতি কাহ্নড়দেব নামক জনৈক পরাক্রান্ত সামন্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে জয়সিংহদেবের পুত্র না থাকায়, সিংহাসন লইয়া মন্ত্রীগণের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। রাজবংশীয় দুইজন কুমারকে যথাক্রমে সিংহাসন প্রদান ও ক্রমে অযোগ্য বিবেচনায় উভয়কেই অপসৃত করা হয়। ইত্যবসরে কাহ্নড়দেব কুমারপালকে লইয়া সসৈন্যে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া সর্বাগ্রে প্রণত হন। অনন্তর কুমারপাল গুর্জরাধীশ বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

সংবৎ ১১৯৯ (১১৪৩ খৃঃ অব্দ) প্রায় পঞ্চাশদ্‌বর্ষ বয়সে কুমার পাল রাজত্ব প্রাপ্ত হন।

কুমারপাল কঠোর শাসনে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন বলিয়া শত্রুমিত্র সকলেই সশঙ্ক হইয়া উঠিল। ইনি স্বয়ং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন ও বহু দেশ ভ্রমণ করায় ও জীবনে নানা কষ্ট প্রাপ্ত হওয়ায় বহুদর্শী হইয়াছিলেন ; সুতরাং মন্ত্রীগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি-তেন না। কয়েকজন প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ইঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিনাশ করিতে ষড়যন্ত্র করেন ; কিন্তু তাহা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হয়।

কাহ্নড়দেবের সাহায্যে কুমারপাল রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমনকি সভাস্থলেও রাজার অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। কুমারপাল কয়েকবার নিভৃতে ইঁহাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করেন ; কিন্তু তাঁহাতেও ইনি নিবৃত্ত না হওয়ায়, ইঁহার উভয় চক্ষু উৎপাটিত করা হইয়াছিল।

যে কুম্ভকার ও ক্ষেত্রপতি বিপদের সময় কুমারপালকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদিগকে রাজ্যপ্রাপ্তির পর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল।

কুমারপাল উদয়ন মন্ত্রীর পুত্র বাগ্‌ভট্টকে মহামাত্য পদ প্রদান করেন।

উদয়ন মন্ত্রীর অপর পুত্র বাহড় সিদ্ধরাজ জয়সিংহদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন ; এমন কি সিদ্ধরাজ তাঁহাকে পুত্রবৎ পালন করিতেন। কুমারপাল সিংহাসনারোহণ

করিলে ইনি সপাদলক্ষীয় (আজমীড়) চাহমান বংশের আনাক নামক ভূপতির শরণাপন্ন হন ও তাঁহাকে গুজরাট আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করায় চাহমান ভূপতি স্বয়ং সসৈন্যে গুজরাটের সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। কুমারপালও নিজ সামন্তগণকে একত্র করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন, কিন্তু বাহড়ের প্রদত্ত উৎকোচ দ্বারা বশীভূত হইয়া সামন্তগণ যুদ্ধের সময় অগ্রসর হইলেন না। কুমারপাল মহাবিপদাশঙ্কা করিয়াও সাহসবলে মাত্র শরীররক্ষক সৈন্য সমভিব্যাহারে আনাক ভূপতির দিকে তীব্রবেগে হস্তী চালিত করিলেন। বাহড় পথমধ্যে কুমারপালের হস্তীর উপর সশস্ত্র পতিত হইবার ইচ্ছা করিয়া স্ব-হস্তী হইতে লম্ফপ্রদান করিলে, গুর্জরাধীশের হস্তিচালকের কৌশলে ভূপতিত হইয়া তাঁহার শরীর রক্ষক সৈন্যগণ কর্তৃক বন্দী হইলেন। ইত্যবসরে কুমারপাল চাহমান ভূপতির সন্নিকটবর্তী হইয়া ভীমবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করেন। আনাক ভূপতি ও বাহড় উভয়ের পরাভবে সপাদলক্ষীয় সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে। বিজয়শ্রী কুমারপালের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

একদা গুর্জরাধিপতি স্বীয় অম্বড় নামক মন্ত্রীকে সসৈন্যে কঙ্কণদেশের নাথ-মল্লিকার্জুনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অম্বড় কঙ্কণদেশে উপস্থিত হইয়া উভয়কূল-পূর্ণা কলবিনী নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া মল্লিকার্জুনকে আক্রমণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে কঙ্কণপতি কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া অতিকষ্টে অবশিষ্ট অল্পমাত্র সৈন্যের সহিত পট্টনে প্রত্যাগমন করেন। কুমারপাল পুনরায় বহু সৈন্য ও বিপুল যুদ্ধ সম্ভার প্রদান করিয়া মল্লিকার্জুনকে জয় করিবার জন্য অম্বড়কে প্রেরণ করিলেন। এবার অম্বড় কলবিনী নদীতে সেতু নির্মাণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগ সুরক্ষিত করিয়া, মল্লিকার্জুনকে আক্রমণ করেন। ভীষণ সংগ্রামের পর অম্বড় স্বহস্তে কঙ্কণাধীশকে নিহত করিয়া তদ্দেশে গুজরাটের জয় পতাকা উড্ডীন করেন। কঙ্কণ হইতে আনীত দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে কয়েকটীর নাম আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হইল: পাপক্ষয় নামক মুক্তাহার, সংযোগসিদ্ধি সিপ্রা, শৃঙ্গারকোটি সাড়ী, বত্রিশটি স্বর্ণকুম্ভ, সার্দ্ধ চতুর্দশ কোটি মুদ্রা, চতুর্দশ হস্তী, ইত্যাদি।

এই সময়ে শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য কুমারপালের নিকট আগমন করেন। নৃপতি যথোচিত সম্মান ও ভক্তির সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ও তাঁহাকে পট্টনে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। আচার্যের সদুপদেশে কুমারপাল জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়া মদ্য ও মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করেন; স্বরাজ্যে চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত জীবহিংসা নিবারণ ও ১১৪০টি সুশোভন জিনমন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কুমারপাল জৈন সুশ্রাবকের পালনীয় দ্বাদশব্রত[১] অঙ্গীকার এবং রাজকোষে অপুত্রকের ধন গ্রহণ প্রথা স্থগিত করিয়াছিলেন।

---

১ জৈন শ্রাবককে (গৃহস্থ) এই দ্বাদশ ব্রত অঙ্গীকার করিতে হয়। যথা (১) স্থূল প্রাণাতিপাত বিরমণব্রত, (২) স্থূল মৃষাবাদ বিরমণ ব্রত (৩) স্থূল অদত্তাদান বিরমণব্রত (৪) স্থূল ব্রহ্মচর্যব্রত

সৌরাষ্ট্র দেশীয় সুংবর নামক জনৈক রাজ-বিরোধীকে দমন করিবার জন্য মন্ত্রী স্বসৈন্যে প্রেরিত হন। পথে শত্রুঞ্জয়[২] তীর্থ প্রাপ্ত হওয়ায় তত্রত্য কাষ্ঠময় মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করাইয়া পাষাণ মন্দির প্রস্তুত করাইবার জন্য এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্যন্ত পাষাণ মন্দির প্রস্তুত না হইবে, সে পর্যন্ত দিবসে মাত্র একবার আহার করিবেন। তৎপরে তথা হইতে অগ্রসর হইয়া সুংবরকে আক্রমণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মন্ত্রীর সৈন্যগণ পরাজিত হয় এবং মন্ত্রী স্বয়ং গুরুতররূপে আহত হইয়া শিবিরে আনীত হন। বাগভট্ট ও আম্রভট্ট নামক তাঁহার পুত্রদ্বয়কে শত্রুঞ্জয় ও ভৃগুকচ্ছপুরস্থিত শকুনিকা বিহার নামক জিন মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞার কথা বলিতে কয়েকজন আত্মীয়কে অনুরোধ করিয়া উদয়ন মন্ত্রী দেহত্যাগ করেন।

বাগভট্ট ও আম্রভট্ট পিতার আদেশানুসারে দুই বৎসরের মধ্যে শত্রুঞ্জয় গিরিতে পাষাণ মন্দির নির্মাণ করাইলেন কিন্তু হঠাৎ এক দিবস তাহা ভূমিস্যাৎ হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া বাগভট্ট কপর্দী নামক মন্ত্রীকে কার্যভার প্রদান পূর্বক চারি সহস্র অশ্বারোহীর সহিত স্বয়ং তথায় গমন করেন ও গিরি সান্নিধ্যে বাগভট্টপুর নামক নগর স্থাপন করিয়া পুনরায় মন্দির নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। তিন বৎসরে মন্দির নির্মাণ কার্য সংসাধিত হইলে বাগভট্ট মহোৎসব সহকারে সম্বৎ ১২১১ অব্দে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। কুমার পালও বাগভট্টপুরে পিতা ত্রিভুবন পালের নামে ত্রিভুবন পাল বিহার নামক জৈন ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথ স্বামীর মন্দির নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। শত্রুঞ্জয় গিরির মন্দির নির্মাণ করিতে এক কোটি ষষ্ঠ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

এদিকে আম্রভট্ট ভৃগুকচ্ছ পুরস্থিত শকুনিকা বিহারের জীর্ণোদ্ধার কার্য আরম্ভ করেন। মন্দির প্রস্তুত হইলে ধ্বজা রোপণ উৎসব উপলক্ষে শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য ও কুমার পাল নৃপতি-কে আমন্ত্রণ করেন এবং বিপুল আড়ম্বরে উক্ত উৎসব সমাধা করেন।

একদা বাগভট্টের অনুজ বাহড় মন্ত্রীকে (বোধ হয়, বাহড় পরে কুমার পালের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মন্ত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন) সসৈন্যে সপাদলক্ষীয় ভূপতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে, বাহড় রংবেয়া নামক স্থানের দুর্গ জয় করিয়া সপ্তকোটি স্বর্ণ মুদ্রা ও একাদশ সহস্র তুরঙ্গ লুণ্ঠন পূর্বক প্রত্যাগমন করেন।

সংবৎ ১২২৯ অব্দে (১১৭৩ খৃঃ অঃ) সুবিখ্যাত মনীষী শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য চতুরশীতি বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুতে মহারাজ কুমার পাল অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া

(৫) স্থুল পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রত, (৬) দিক্ পরিমাণ ব্রত, (৭) ভোগোপভোগ পরিমাণ ব্রত, (৮) অনর্থদণ্ড বিরমণ ব্রত, (৯) সামায়িক ব্রত, (১০) দেশাবকাশিক ব্রত, (১১) পৌষধ ব্রত, (১২) অতিথি সংবিভাগ ব্রত।

২ শত্রুঞ্জয় গিরি বা সিদ্ধাচল কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত। ইহা জৈনগণের প্রধান তীর্থরূপে পূজিত।

ছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ইনি সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন এবং জৈন শাস্ত্রের সম্যকবেত্তা ছিলেন। ইনি সটীক যোগশাস্ত্র, সটীক দেশীনামমালা, হৈম ব্যাকরণ, পরিশিষ্টপর্ব, ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত্র, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থ এখনও ইঁহার নাম জৈন সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কথিত আছে যে ইনি সার্দ্ধত্রিকোটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

আচার্যের মৃত্যুর প্রায় ছয়মাস কাল পরে মহারাজ কুমারপাল সংবৎ ১২৩০ অব্দে ৩১ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া দেহত্যাগ করেন। কুমারপাল গুণজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সঙ্গীতাদি দ্বারা মোহিত করিয়া অনেকে ইঁহার নিকট হইতে প্রভূত পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। জৈন ধর্ম অঙ্গীকার করিবার পূর্বে ইনি সোমনাথের কাষ্ঠময় মন্দিরের সংস্কার করাইয়া পাষাণময় সুদৃশ্য মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

কুমার পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অজয়দেব সিংহসনারোহণ করেন। ইনি রাজ্য প্রাপ্তিমাত্র, পিতৃকৃত সুন্দর জিন মন্দির সমূহ বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু পরে সীল নামক জনৈক ব্যক্তির বিদ্রূপ বাক্যে লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া এই কুকর্ম হইতে বিরত হন।

কুমার পালের সম্মানিত সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কপর্দী মন্ত্রীকে ইনি প্রথমতঃ প্রধান অমাত্যের পদ প্রদান করিবার ইচ্ছায় আহ্বান করেন ; কিন্তু পরে দুষ্ট লোকের পরামর্শে হঠাৎ মন্ত্রীকে বন্দী করাইয়া নিহত করেন।

সুকবি রামচন্দ্রও এই রাজা কর্তৃক হত হন।

বিখ্যাত আম্রভট্ট মন্ত্রী অজয়দেবের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক সশস্ত্র বহুলোককে নিহত করিয়া স্বয়ং হত হন।

এবংবিধ বহু অত্যাচারে জনসাধারণকে প্রপীড়িত করিয়া অজয়দেব স্বকৃত উৎকট পাপের প্রতিফল স্বরূপ বয়জলদেব নামক জনৈক দ্বারপাল কর্তৃক ছুরিকাবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সংবৎ ১২৩০ হইতে ১২৩৩ পর্যন্ত মাত্র তিন বৎসর ইনি রাজ্য করিয়াছিলেন।

তৎপরে দ্বিতীয় মূলরাজ দ্বিবর্ষকাল রাজ্যপালন করিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহার মাতা নাইকী দেবী দ্বিতীয় ভীমদেবকে দত্তক গ্রহণ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বীর্যবতী মহিলা গাডয়ার ঘাট নামক স্থানের যুদ্ধে ম্লেচ্ছ রাজকে (সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী) সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া বিতাড়িত করেন।

দ্বিতীয় ভীমদেব সংবৎ ১২৩৫ হইতে অরম্ভ করিয়া ৬৩ বৎসর রাজ্য করেন। ইঁহার সময়ে মালব রাজ সোহড় গুজরাট আক্রমণ করিতে আগমন করেন ; কিন্তু মন্ত্রীর কৌশলে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎপরে সোহড় ভূপতির পুত্র অর্জুনদেব গুজরাট আক্রামণ ও লুণ্ঠন করেন।

ভীমরাজের পর ব্যাঘ্রপল্লী নামক স্থানের সামন্ত রাজ লবণপ্রসাদ রাজ্য গ্রহণ পূর্বক বহু কাল রাজত্ব করেন। ইঁহার অপর পুত্র বীরধবল পিতৃদত্ত ও স্ববলার্জিত রাজ্য লইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য করিতে লাগিলেন।

বীরধবল তেজপাল নামক জনৈক জৈন বণিককে প্রধান অমাত্যপদ প্রদান করেন। তেজপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বস্তুপালও অন্যতর অমাত্য ছিলেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতা সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র বাহন সংযুক্ত এক বিংশতি শত জৈন সহ তীর্থ যাত্রা করেন। ইঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এক সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্তশত উষ্ট্রারোহী সৈন্যের সহিত চারিজন পরাক্রান্ত সামন্ত নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা যে যে তীর্থস্থলে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলে নূতন জিন মন্দির নির্মাণ, পুরাতন মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার, প্রভৃতি বহু সৎকার্য করিয়াছিলেন। এখনও বস্তুপাল ও তেজপালের নাম জৈন সম্প্রদায়ে অমর হইয়া আছে।

বস্তুপালের সহিত খম্বাত (Cambay) নগরের সৈয়দ নামক নৌবিত্তকের (সমুদ্র-বণিক) সংগ্রাম হয়। সৈয়দ ভৃগুকচ্ছপুরবাসী শঙ্খ নামক মহাপরাক্রমশালী পুরুষের সাহায্য লইয়া বস্তুপালকে আক্রমণ করে। বস্তুপালও গুড় জাতীয় (নীচ জাতি বিশেষ) লূণপালের সহায়তা অবলম্বন করেন। যুদ্ধে শঙ্খহস্তে লূণপাল হত হয়; কিন্তু বস্তুপাল অমিত তেজে শঙ্খের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও সৈয়দকে সংহার করেন।

দিল্লীর সুলতানের সম্মানিত আলম খাঁ নামক ফকির, গুজরাটের মধ্য দিয়া মক্কা যাইতেছেন জানিয়া লবণপ্রসাদ ও বীরধবল তাঁহাকে ধৃত করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু বস্তুপালের পরামর্শে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। ফকিরের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া সুলতান বস্তুপালের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন।

পঞ্চগ্রামের অধিকারত্ব লইয়া বীরধবলের সহিত তাঁহার শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়গণের সংগ্রাম হয়; তাহাতে বীরধবল নিহত হন। কিন্তু লবণপ্রসাদ শত্রুগণকে সমূলে ধ্বংস করেন। বীরধবলের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিশালদেব রাজ্যে অভিষিক্ত হন।

॥ ইতি কুমারপাল প্রবন্ধ ॥

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২১

স্থূলভদ্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

পঞ্চম দৃশ্য

[কোশার নাচঘর। সময় মধ্যাহ্ন। স্থূলভদ্র ধ্যানস্থ]

[কোশার প্রবেশ]

কোশা ঃ [খাবার নামিয়ে রেখে] ওগো ধ্যানী, খাবার নিয়ে এলাম আমি তোমার দাসী।

[স্থূলভদ্র চোখ খুলে কোশাকে দেখছেন]

কোশা ঃ ওত করে কী দেখছ বলত? তাড়াতাড়ি দুটো মুখে দিয়ে নাও। তোমার ধ্যানের বেলা যে বয়ে যাচ্ছে।

স্থূলভদ্র ঃ এসব আমার জন্য? সব আয়োজন ব্যর্থ হল, কোশা।

কোশা ঃ ব্যর্থ কেন? এসবত তুমি এক সময় ভালবাসতে।

স্থূলভদ্র ঃ ভালবাসতাম সত্য। কিন্তু আমি শ্রমণ। আমার জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হবে সে অন্ন আমাকে গ্রহণ করতে নেই। যার ঘরে থাকব তার ঘর হতে ভিক্ষে নিতেও না। তুমি তাই ব্যস্ত হয়ো না, কোশা। প্রয়োজন মত অন্যখান হতে ভিক্ষে করে আনব।

কোশা ঃ তুমি করবে ভিক্ষে! তুমি কেন আমায় দুঃখ দেবে?

স্থূলভদ্র ঃ এতে দুঃখ পাবে কেন? এইত শ্রমণের জীবন।

কোশা ঃ সে তুমি বুঝবে না, স্থূলভদ্র।

[আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যায়। সময় মধ্যরাত্রি। বাইরে তুমুল ঝড়। ঘরের জানালা দরজা খড় খড় করে কাঁপবে]

[কোশার প্রবেশ]

স্থূলভদ্র ঃ কে?

কোশা ঃ আমি কোশা।

স্থূলভদ্র ঃ কোশা, তুমি এত রাত্রে?

কোশা ঃ কেন, সে তুমি জাননা? ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার যখন থরথর করে কাঁপছে, ঘরের প্রদীপ যখন কেঁপে কেঁপে নিভে গেল, তখন থাকতে

পারলাম না আর। তোমার স্পর্শ দিয়ে ভরিয়ে দাও আমার চির বিরহের বেদনাকে।

স্থূলভদ্র ঃ সে হয় না, কোশা।

কোশা ঃ কেন হয় না। সেদিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে যেদিন তুমি প্রথম এসে ছিলে আমার ঘরে। কি অদ্ভুত ছিল তোমার চোখ। সেই চোখই আমায় তোমার দিকে আকর্ষণ করেছিল। আমি বারবিলাসিনী, তবু পড়েগিয়েছিলাম তোমার প্রেমে। সেই প্রেমই হল আমার কাল।

স্থূলভদ্র ঃ কোশা!

কোশা ঃ তারপর দীর্ঘ বারো বছর তুমি ছিলে আমার কাছে। সেদিনের সেই দিনগুলো মনে হয় আজ স্বপ্নের মত। তখন কি কখনো ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবে-?···তুমি চলে গেলে রাজাদেশ পেয়ে, আমি পড়ে রইলাম এইখানে। খবর এলো তোমার পিতার স্থানে মন্ত্রীপদে তোমায় নিয়োগ করা হবে। আবার খবর এলো তুমি তা প্রত্যাখ্যান করে অন্যত্র চলে গেছ। তারপর আর কোন সংবাদ আসেনি। উৎকণ্ঠিত হয়ে কত দিন কত রাত বসে রইলাম তোমার অপেক্ষায়। কিন্তু তুমি এলে না। কিন্তু আমি জানতাম মনে মনে তুমি আমার, তুমি একদিন আসবেই আসবে। তুমি একমাত্র আমার তাই তোমার না এসে উপায় নেই। তাই উপেক্ষা করলাম নূতন বন্ধুত্ব প্রয়াসীদের। কঠোর বিচ্ছেদ বেদনায় কাটিয়ে দিলাম বিরহশীর্ণ দিনগুলো। আর আজ অশ্রুভরা হৃদয় যখন বাদলা হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে কাঁপে তখন তুমি অবিচলিত।

[ধীরে ধীরে মেঘ কেটে যায়। আকাশ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়। কোশা স্থূলভদ্রের সামনে বসে পদ্মফুলের আলপনা আঁকে]

স্থূলভদ্র ঃ এ তুমি কি করছ কোশা ?

কোশা ঃ কেন দেখতেই পাচ্ছ। আজ পূর্ণিমা। চাঁদের রূপোলি আলোর প্লাবনে হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গেছে। তাই সামান্য নৃত্যগীতের আয়োজন করেছি। কেন, ভয় হচ্ছে ?

স্থূলভদ্র ঃ না, ভয় কিসের ?

কোশা ঃ আশ্বস্ত হলাম। শুনে আগেই হার মেনে বস এই ভয় ছিল। তাহলে এত আয়োজন সব ব্যর্থ হত। [আঁকা শেষ করে নেপথ্যের দিকে চেয়ে] মদনিকে!

মদনিকা ঃ [প্রবেশ করে] স্বামিনি, কি আদেশ ?

কোশা ঃ ভদ্র স্বামীকে প্রস্তুত হতে বল।

মদনিকা ঃ তিনি প্রস্তুতই আছেন। দলবল নিয়ে এখুনি এসে পড়বেন। আমি খবর দিচ্ছি

[ভদ্রস্বামীর দলবল সহ প্রবেশ ও যথাযথ স্থানগ্রহণ। কোশার উত্তেজনা নৃত্য। নৃত্য শেষে]

কোশা : শ্রমণ, তবু ভাঙ্গতে পারলাম না তোমার ধ্যান! ছাই রূপ! ছাই কলা! [ভদ্রস্বামী তাঁর দলবল নিয়ে চলে যাবে] এর এত গর্ব! [কোশা একে একে ফুলের অলঙ্কার খুলে ফেলবে]

স্থূলভদ্র ঃ কোশা! তুমি এত অশান্ত কেন?

কোশা ঃ [মুখ তুলে] অশান্ত! সে তুমি কি করে বুঝবে, স্থূলভদ্র। আমার বুকের বেদনা কি তোমার বুকে বেঁধে?

স্থূলভদ্র ঃ বেঁধে বই কী, কোশা। তাইত এসেছি তোমার এখানে চাতুর্মাস্য করতে। মনে করো কোশা সেদিনের কথা যেদিন তোমাকে ভালবেসে সব কিছু ছেড়ে এসেছিলাম। তোমার বাহুবন্ধনে সুখ হয়ত পেয়েছি, কিন্তু সেই সুখ কি ছিল অবিমিশ্র? রাত্রি রভসের পর এসেছে ক্লান্তি, অবসাদ, অতৃপ্তি, বেদনা! সত্য নয় কি, কোশা? আজ আমি পেয়েছি সেই সুখের সন্ধান যে সুখে ক্লান্তি নেই, অপূর্ণতার অতৃপ্তি নেই। আজ আমি পূর্ণ। সেইত আনন্দ। সেই আনন্দে আমি তোমাকে ভালবাসি যেমন ভালবাসি বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণুকে। তাইত এসেছি তোমাকে সেই আনন্দলোকে নিয়ে যেতে।

কোশা ঃ কিন্তু আমি পতিতা। আমিও কি সেই আনন্দলোকের অধিকারিণী।

স্থূলভদ্র ঃ কেন নয়? তোমার মধ্যেও রয়েছে সেই পরম পূর্ণতা। আবিলতার উর্দ্ধে উঠে এসো। অনুভব করো জ্যোতির্ময়ের আভাস। এই জীবনেই ঘটে যাবে জন্মজন্মান্তর।

কোশা ঃ তবে শোনাও আমায় সেই ঋষিবাক্য।

স্থূলভদ্র ঃ সংবুজ্ঝহ কিং ন বুজ্ঝহ
সংবোহী খুল পেচ্চ দুল্লহা।
নো হূবণমন্তি রাইও
নো সুলভং পুণরাবি জীবিয়ং ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

[উপাশ্রয়। আচার্যের আসন শূন্য। মাটিতে বসে অকম্পিত, সিংহনন্দী ও শান্ত রক্ষিত]

শান্তরক্ষিত ঃ এখনো ফিরল না স্থূলভদ্র।

সিংহনন্দী ঃ ও আর ফিরেছে। গণিকার চোখের জলে সংযমের বেড়া থাকবে—সে আশা দুরাশা।

অকম্পিত ঃ আচার্যত নিষেধই করেছিলেন। বলেছিলেন, সে খুব শক্ত কাজ। আচার্যের নিষেধ উপেক্ষার এই পরিণাম।

শান্তরক্ষিত ঃ তবে এখনো ফেরবার সময় সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হয়ে যায় নি।

সিংহনন্দী ঃ তুমি ওই আশায় বসে থাক। কিন্তু আমি লিখে দিতে পারি ও ফিরবে না।

[আচার্যের প্রবেশ। সকলে উঠে দাঁড়াবে। আচার্য আসন গ্রহণ করলে সকলে বসবে]

আচার্য ঃ তোমরা সকলে তপস্যা করে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছ।

শিষ্যরা ঃ হাঁ, ভন্তে।

আচার্য ঃ [চার দিক দেখে] কিন্তু স্থূলভদ্রকেত দেখতে পাচ্ছি না। ও কি এখনো আসেনি।

অকম্পিত ঃ না, ভন্তে!

সিংহনন্দী ঃ ওর ফিরে আসবার সম্ভাবনা কম।

শান্তরক্ষিত ঃ না সিংহনন্দী, ওই স্থূলভদ্র আসছে।

[স্থূলভদ্রের প্রবেশ। আচার্য উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাবেন]

আচার্য ঃ এসো এসো স্থূলভদ্র! তুমি অসাধ্য সাধন করে এসেছ।

স্থূলভদ্র ঃ [আচার্যের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে) ভন্তে, সে আপনার আশীর্বাদে।

সিংহনন্দী ঃ [নিজেদের মধ্যে] এ আচার্যের অন্যায়! এ পক্ষপাত! আমরা যারা কঠোর সাধনা করে এলাম তাদের তিনি সম্মানিত করলেন না। করলেন স্থূলভদ্রকে যে ছিল গণিকার ঘরে—হয়ত বিলাসে, বিভ্রমে। আগামী বছর আমিও করব কোশার ঘরে ব্রত উদ্‌যাপন। দেখিয়ে দেব আমিও স্থূলভদ্রের চাইতে কোন অংশে কম নই।

আচার্য ঃ সিংহনন্দী! তোমরা ওখানে কি কথা বলাবলি করছ?

সিংহনন্দী ঃ ভন্তে! আগামী বছর কে কোথায় যাব স্থির করছিলাম। আগামী বছর পাটলীপুত্রের বারবণিতা কোশার ঘরে আমি আমার চাতুর্মাস্য ব্রতের উদ্‌যাপন করব।

আচার্য ঃ তোমার সেই সামর্থ নেই, সিংহনন্দী। কেবল ঈর্ষার বশে গেলে তাতে কল্যাণ হবেনা। তুমি এই দুঃসাহস পরিত্যাগ করো।

সিংহনন্দী ঃ ভন্তে! এ দুঃসাহসের প্রশ্ন নয়। এ আমার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। আমাকে তাই যেতে হবে। আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে।

আচার্য ঃ তোমার যেমন অভিরুচি। [ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

শ্রীহরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৫ ॥

শিখী মুনির না জানি কি হয়েছে। কথা বলতে বলতে সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তর্ক ও প্রমাণে তার ধারালো বুদ্ধি কেমন যেন ভোঁতা মেরে গেছে। মনে করবার চেষ্টা করেও সে অনেক কিছু মনে করতে পারে না। আর তার সেই নির্মল হাসি যা সমস্ত উপবনকে প্রফুল্লিত করে রাখত তা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কি এক গভীর মর্মবেদনা শিখী মুনিকে অভিভূত করে ফেলেছে। এ বেদনা এমনি যা মুনি জীবনে মুখ ফুটে বলা যায় না, আবার সহ্য করাও সম্ভব হয় না।

শিখী মুনির দীক্ষাকাল ও এই মুহূর্তে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই পরিবর্তন তাদের ধরার কথা নয় যাঁদের দৃষ্টি বহিরঙ্গ কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি অন্তরগামিনী, যাঁরা সূক্ষ্ম মনোবিকারেরো অনুধাবন করতে পারেন তাঁরা শিখী মুনির মনে কোনো অদৃশ্য কাঁটা বিঁধে রয়েছে সেকথা না বলেও পারবেন না।

শিখী জন্ম দুঃখী, মা বোন বা ঐ ধরণের কারু স্নেহ সে কোনো দিনই পায় নি। তাই যখন হতে সে জালিনী মায়ের আমন্ত্রণ পেল তখন হতে সে যে মায়ের দেবদুর্লভ ভালবাসা পেয়ে এজন্মেই ভাগ্যশালী হয়ে উঠবে এই ধরণের একটি আশা মনে মনে পোষণ করতে আরম্ভ করল। ঐ আশার সুতোয় যেন এখন শিখীর সমস্ত জীবন নির্ভর করছে। যে শিখী সমস্ত রকম আসক্তিকে বন্ধন বলে মনে করে, যে সূক্ষ্ম অদৃশ্য আসক্তিকেও ছিঁড়ে ফেলতে তৎপর, সেই শিখী আজ মায়ের স্নেহভরা আমন্ত্রণের কথা ভুলতে পারছেনা। তার অবস্থা অনেকটা সেই কাঙালের মতো, দরজায় দরজার ভিক্ষে করতে করতে হঠাৎ যে কুবেরের রত্ন ভাণ্ডারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলবার অপেক্ষা মাত্র।

শিখী তার মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠেছিল। তাই সে প্রতি মুহূর্তে মায়ের সঙ্গে মিলিত হবার দিবাস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেই যে সে কিছু দেবদুর্লভ বস্তু লাভ করবে তা নয়। মহার্ঘ বস্তুতে তার কোনো

অভিলাষও নেই। সে চায় তার মা বাৎসল্যভরা দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে দেখুক। বলুক, বাবা, তুই এলি। তাহলেই তার জন্মের সমস্ত ক্ষুধা যেন তৃপ্ত হয়ে যায়।

শিখী নিহার বিন্দুর পিছনে পাগল হয়ে দৌড়চ্ছে এ কথা তাকে কে বোঝাবে? যাকে সে স্নেহ, ভালবাসা, বাৎসল্য আদি নামে অভিহিত করছে বাস্তবে তা মোহ, মমতা ও বাসনাই। গুরু কৃপাপ্রাপ্ত শিখী মুনির চোখেও আজ মোহের আবরণ!

বিজয় সিংহ সূরীর শ্রমণ সম্প্রদায় প্রব্রজন করতে করতে এক সময় কোশনগরের খুব নিকটে এসে অবস্থান করল। শিখী এরই প্রতীক্ষা করছিল। তাই অনুকূল অবসর প্রাপ্ত হয়ে সে গুরুর কাছে গিয়ে বলল, ভগবন্, আমি মার সঙ্গে দেখা করতে চাই। অনুমতি দিন।

গুরু কিছুক্ষণ আর্দ্র নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। একটা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের আশঙ্কা তাঁর মনে না জানি কেন কালো ছায়াপাত করে গেল। স্পষ্ট অনুমতি দিতে তাঁর জিহ্বা কেন যেন অসমর্থ হল। তিনি এইটুকু মাত্রই বলতে পারলেন ঃ

যদি যাবার থাকে তবে আনন্দের সঙ্গে যাও। তবু মুনি জীবনে এই দুর্বলতা, হোক না তা সূক্ষ্ম, ভালো নয়। কে জানে তা বিরাট রূপ পরিগ্রহ করবে না?

শিখী বিনম্র ভাবে প্রত্যুত্তর দিল, ভগবন্। মার স্নেহ জীবনে এই প্রথম আমি লাভ করেছি। তাই আমায় আকর্ষিত করছে। দু'তিন দিনের বেশী সেখানে থাকব না।

গুরু প্রত্যুত্তর দিলেন, তুমি যে মায়ের স্নেহের কথা বলছ তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর যদি সত্যি স্নেহ উদ্রিক্ত হয়ে থাকত তবে তিনি নিজেই এখানে ছুটে আসতেন। দু'তিন দিনের জন্য তোমাকে দূরে পাঠাতে গিয়ে আমার ত মনে হচ্ছে তোমাকে যেন চির-দিনের মতো দূরে পাঠাচ্ছি। তাই তোমায় আনন্দিত মনে অনুমতি দিতে পারছি না।

শিখী প্রত্যুত্তর দিল, ভগবন্, সেত আপনার আশঙ্কামাত্র। মার কাছ হতে আমার কি ভয়? মাকেও ধর্মোপদেশ দিয়ে সৎপথে নিয়ে আসব, এই আমার ইচ্ছা।

শিখীর এই ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত গুরু বিজয় সূরীকেও পরাভূত করে দিল। মাকে ধর্ম লাভ করানোতে মা'র পুত্রের প্রতি যে উপকার তার খানিকটা পরিশোধ হয়। এই কথা চিন্তা করে দু'তিনজন বৃদ্ধ সাধু সঙ্গে দিয়ে তিনি শিখীকে কোশ নগরে যাবার অনুমতি দিলেন।

অনুমতি তিনি দিলেন কিন্তু শিখী চলে যাবার পর পরই তাঁর মনে হল তিনি যেন ব্যস্ততার সঙ্গে এই অনুমতি দিয়ে ফেলেছেন। শিখীত এখন যুবকমাত্র, ভাবাবেগে প্রবাহিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু তিনি? শিখীর সংযম নির্বাহের দায়িত্বও ত তাঁরই ওপর। সেই দায়িত্বে কোথায় যেন তিনি একটু প্রমাদ করে ফেলেছেন। জালিনীর যে আকর্ষণকে শিখী মাতৃস্নেহ বলে মনে করছে, তা যদি জালিনীর হৃদয়ে থাকত তবে সে

কি করে এতদিন শিখীকে অবহেলা করে এসেছে ? মাতৃহৃদয়ের স্নেহ নির্ঝর যদি মুহূর্তের জন্যও রুদ্ধ হয় তবে তা পর মুহূর্তেই আরো উচ্ছ্বসিত বেগে প্রবাহিত হয়। তাই শিখীর অনিষ্ট আশঙ্কায় তাঁর মন কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ভবিষ্যৎকে কে কবে নিবারণ করতে পেরেছে—চিন্তা করে তিনি আবার মনকে শান্ত করে নিলেন।

কোশনগরীর অলিতে গলিতে আজ সাড়া পড়ে গেছে। শিখী মুনি বৃদ্ধ শ্রমণসহ মেঘবন উদ্যানে অবস্থান করছেন। তাঁরা সমস্ত গ্রাম ঘুরে এসেছেন। সাড়া পড়বার কারণ প্রথমতঃ শিখী মুনি এই গ্রামের সন্তান। দ্বিতীয়তঃ ত্যাগী, তপস্বী ও বিদ্বানদের মধ্যে শিখী মুনি সর্বাগ্রগণ্য। তাই কোশনগরীর অধিবাসীরা যে তাকে বহুমান প্রদর্শন করবে সে ত স্বাভাবিক।

কোশ নগরীতে এসেই শিখী খবর পেল সংসার সম্পর্কে তার পিতা ব্রহ্মদত্তর মৃত্যু হয়েছে। সেদিন নয় তার পরের দিনই শিখী নিজে হতে মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। জালিনী অবশ্য তার আসার খবর আগেই পেয়েছিলেন। শুনেছিলেন শিখীর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের কথা। কিন্তু বিধির বিধান এমনি বিচিত্র যে যা শিখীর প্রশংসামূলক তাই তাঁর নিজের ঘৃণা, নিন্দা ও তিরস্কার বলে মনে হল। তাঁর মনে বৈর থাকায় সেই কথাগুলোকে তিনি স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারলেন না। তাঁর মনে হল যাকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন সে যদি বহুমান পায় তা তাঁর নিন্দা। যাকে তিনি চোখের বালি বলে মনে করেন, সে বিশ্বের চোখেরও বালি হোক। তা যদি না হয় তবে তাকে শেষ করে দেওয়াই দরকার। জালিনী নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর পথের এই কাঁটাকে তিনি তাই শীঘ্রই তুলে ফেলতে চাইলেন। বাৎসল্যের নামে, ধার্মিকতার আড়ালে তিনি তাঁর মনের সঙ্কল্পকে রূপ দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন।

শিখী ভদ্র ও সরল বলে মার মুখে ক্রূরতার যে কালো ছায়া পড়তে দেখেছিল, তা দেখেও দেখল না। ভাবল মার মন শোক-সন্তপ্ত—তাই ওই কালো ছায়া। তার সেকথাও মনে পড়ল তাকে নিয়ে মা ও বাবার মধ্যে প্রত্যহই কলহ হত। পিতা সর্বদাই তার পক্ষ নিতেন। সেকথা মনে হতে শিখী কেমন যেন বেদনা অনুভব করল। কালের এই অমোঘ নিয়ম সেকথা বলে মাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল।

তার কথা শুনে জালিনী যেন অভিভূত হয়ে গেছেন এমন ভাব দেখালেন ও আত্মার উদ্ধারের জন্য ব্রতগ্রহণে উৎসুক সেকথাও বললেন। শিখী মাকে ধর্মসংস্কার দেবার জন্য উৎসুক ছিল তাই তাঁকে সহজভাবে ধর্মোপদেশ দিল। কিন্তু জালিনী সেই সময়ও তার অনিষ্টের কথাই চিন্তা করছিলেন। পাখী এবারে হাতের মুঠোয় এসে গেছে—সে যেন এবার কিছুতেই উড়ে যেতে না পারে। তাই শিখী যখন যাবার জন্য উঠল তখন বললেন, আজ যদি আমার হাতে ভিক্ষা নাও ত আমি কৃতকৃত্য হয়ে যাই।

শ্রমণের সে পথ বন্ধ বলে শিখী প্রত্যুত্তর দিল। জালিনী নিরাশ হলেন। কিন্তু আবার প্রযত্ন করবেন স্থির করে সেদিন তাকে বিদায় দিলেন। এভাবে কয়েক দিন কেটে গেল। শিখী মুনির কোশ নগর হতে বিহার করার দিনও প্রায় এসে পড়ল। যতই সে-দিন নিকটে আসে জালিনী ততই অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁর অপকীর্তি ও শিখীর কীর্তি সংসারে ঘোষিত হোক এ তাঁর পক্ষে অসহ্য।

চতুর্দশীর দিন ছিল। জালিনীর মনে হল আগামীকাল মাস কল্প শেষ হবে ও শিখী এখান হতে বিহার করে চিরকালের মতো তাঁর জাল হতে বেরিয়ে যাবে।

সে কথা মনে হতেই জালিনীর অন্তরে আক্রোশের বহ্নি ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলে উঠল। ধমনীতে তীব্রগতিতে রক্ত সঞ্চারিত হল। যে করেই হোক তাঁকে আজই কার্য সিদ্ধ করতে হবে। একাজে তিনি যে অন্য কারো সহায়তা পাবেন সে আশা দুরাশা—তাই একাজ তাঁকে একাই করতে হবে।

জালিনী তখন তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেলেন। সুমিষ্ট মোদক তৈরী করলেন। তারপর কয়েকটী মোদককে তীব্র বিষ মিশ্রিত করে একটি স্বতন্ত্র পাত্রে রাখলেন। তারপর সমস্ত মোদক নিয়ে তিনি মেঘবন উদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

শিখী মাকে মোদক নিয়ে আসতে দেখে বলল, মা, শ্রমণেরা এরূপ আহার্য গ্রহণ করেন না। তাঁদের জন্য প্রস্তুত দ্রব্য তাঁদের গ্রহণ করতে নেই। এ আমাদের আচার বিরুদ্ধ।

শিখী যদি সেই মোদক গ্রহণ না করে তবে তাঁর এত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই উৎকণ্ঠা ও ভয়ে তাঁর সমস্ত দেহ স্বেদে ভরে উঠল। তিনি দীন ও স্খলিত কণ্ঠে বললেন, আমি অজ্ঞান, শ্রমণাচারের আমি কি জানি। কিন্তু তুমি কি আমার ভক্তির দিকে একবার তাকিয়ে দেখবে না? দ্বিতীয় বার এ ভুল আমি করব না।

জালিনীর চোখের জল ও দেহস্থিতি মুহূর্তের জন্য শিখীর মনকে দুর্বল করে দিল। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে যদি একটি ধাপেরও ভুল হয় তবে মাটিতে এসেই পড়তে হয়--সেকথা জেনেও শিখী মার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তৈরী হয়ে গেল। সে অবশ্যই প্রমাদ করছে। কিন্তু প্রমাদেরও ত প্রায়শ্চিত্ত আছে। সে নিজে প্রায়শ্চিত্তই করবে, মার এই ধর্ম শ্রদ্ধাকে অনাদর করতে পারবে না।

জালিনী শেষ পর্যন্ত তাই তার হাতে বিষ মিশ্রিত মোদক তুলে দিতে সমর্থ হলেন।

জালিনী তখন ঘরে ফিরে গেছেন। আর শিখী? সেই মোদক আহার করার সঙ্গে সঙ্গে শিখীর সর্বাঙ্গে বিষের প্রভাব দেখা দিল। চোখে সে অন্ধকার দেখতে আরম্ভ করল। তারপর এক সময় মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

শিখীকে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়তে দেখে বৃদ্ধ শ্রমণেরা তার কাছে ছুটে এলেন। কিন্তু তখন কিছু করবার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে শিখী যখন শেষবারের মত চোখ খুলল তখন তার ঠোঁট হতে এ ক'টা শব্দই বার হয়ে এল ঃ আমি শান্ত ভাবে এই দেহ পরিত্যাগ করছি। আমার কথা কেউ যেন চিন্তা না করে। আমি সবাইর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও সবাইকে ক্ষমা করছি। সেই অসহ্য বেদনার সময়ও এত শান্তি ও ঔদার্যর ভাব দেখে বৃদ্ধ শ্রমণদের চোখেও জল এসে গেল।

বিজয় মুনির কাছে যখন শিখীর দেহত্যাগের সংবাদ পৌঁছুল তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁর মনে হল শিখীর মা শিখীর পূর্বজন্মের কোন শত্রু ছিলেন। তিনি যদি শিখীকে না যেতে দিতেন। কিন্তু ভবিতব্যকে কি ভাবেই বা নিবারণ করা যায়।

সমস্ত কিছু দেখে তাই মনে হয় এই সংসারই এক নাটক। নাটক ছাড়া আর কি? এই নাটকে অভিনয় করবার জন্য অগ্নিশর্মার জীব জালিনী ও গুণসেনের জীব তার সন্তান শিখী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। জালিনী যে তার সন্তানকে বিষ দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি কারণ সে নিজেই বৈর বিষে দগ্ধ হচ্ছিল।

সংসারে বৈর বিদ্বেষ আছে বলেইত উপশমের এত প্রয়োজন। একটুখানি শান্তি, একটুখানি ক্ষমা, বৈর ও বিদ্বেষরূপী কাষ্ঠকে দগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে। তাই যাঁরা পারদর্শী তাঁরা উপশমের জয়গান করেছেন। শিখীমুনির দেহের আহুতি হতে সেই উপশমের ধূপই উঠছে।

[ক্রমশঃ

পরলোকে
ভারতীয় বিদ্যার অক্লান্ত
জ্ঞান-তাপস
মুনি শ্রীজিনবিজয়

বিগত ৩ জুন, ১৯৭৬ মুনি শ্রীজিনবিজয়জী ৮৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় বিদ্যার, বিশেষ করে জৈন বিদ্যার যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়। শতাধিক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ গ্রন্থের সম্পাদন ও প্রকাশন করে তিনি তাঁর প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

জিনবিজয়জী মেবার রাজ্যের অন্তর্গত রাও পহেলী গ্রামে রাজপুত পরিবারে ২৭শে জানুয়ারী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কিষণ সিং। কিষণ সিং যে কালে খ্যাতিলাভ করবেন সে কথা সেখানকার এক জৈন যতি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ও তাঁর শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার কিছু দিন পরেই কিষণ সিং-এর পিতার সহসা মৃত্যু হয়। সেই জৈন যতিই তখন কিষণ সিংকে নিজের কাছে রেখে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। জৈন যতির কাছে থাকায় জৈন ধর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ক্রমে জৈন সাধুদের সম্পর্কে এসে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি সাধু দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কিষণ সিং প্রথমে স্থানকবাসী সম্প্রদায়ের সাধু সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি দেখতে পান যে তাঁদের জীবনে জ্ঞানের অনুশীলনের চাইতে উপবাসাদি বাহ্য আচার অনুষ্ঠানই মুখ্য। তিনি তখন সেই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করে মূর্তি-পূজক সাধু সঙ্ঘে যোগ দেন। মূর্তি-পূজক সম্প্রদায়ের সাধুদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি শেখা নিষিদ্ধ ছিল না। মূর্তি-পূজক সাধু সম্প্রদায়ে প্রবেশ করার পর তাঁর নাম হয় জিনবিজয়। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর। এর কিছু পরে তিনি প্রখ্যাত জৈনাচার্য

শ্রীবিজয়বল্লভ সূরীর সম্পর্কে আসেন ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিবন্ধাদি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে ও বিদ্বৎ মহলে তাঁকে সুপরিচিত করে দেয়। বরোদা চাতুর্মাস্যের সময় তাঁর দ্বারা সম্পাদিত 'কুমারপাল প্রতিবোধ' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট হতে গবেষণার কাজে সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসে। তিনি সেই আমন্ত্রণ স্বীকার করে দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করে পুনায় এসে উপস্থিত হন।

পুনায় থাকবার সময় লোকমান্য তিলকের সম্পর্কে এসে তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। পরে মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্যে তাঁর চিন্তাধারা আরো পরিবর্তিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী যখন দেশব্যাপী অহিংস আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তখন তিনি মহাত্মাজীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। মহাত্মাজী সে কথা ভোলেননি। তাই যখন আহমদাবাদে জাতীয় শিক্ষার জন্য গুজরাট বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হয় তখন তিনি জিন-বিজয়জীকে ডেকে পাঠান ও গুজরাত পুরাতত্ব মন্দিরের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করতে বলেন। জিনবিজয়জী সানন্দে তা স্বীকার করেন ও জৈন সাধুবেশ পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষের মত সেখানে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর বন্ধু ও শুভ চিন্তক পণ্ডিত সুখলালজী তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। গুজরাট বিদ্যা-পীঠে তিনি ৮ বছর কাজ করেন। সেই সময় তিনি যে সব গ্রন্থাদি সম্পাদন ও প্রকাশ করেন তাতে তাঁর খ্যাতি আরো বর্দ্ধিত হয়। এমন কি তিনি প্রখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যাবিদ জার্মান পণ্ডিত হারমন জেকোবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। জেকোবী গ্রন্থ সম্পা-দনের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে জার্মানী যাবার জন্য অনুরোধ জানান। মুনিজী সেই অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য ১৯২৮ সালে জার্মানী যান ও সেখানে দেড় বছর অবস্থান করেন। জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত প্রাচ্যবিদ্যার কেন্দ্রগুলি তিনি পরিদর্শন করেন ও তত্রস্থ বিদ্বৎমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচিত হন। ভারত জার্মান মৈত্রীর জন্য তিনি জার্মানীতে Hindusthan House নামে এক সংস্থা স্থাপিত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই Hindusthan House-এ কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। জার্মানীতে থাকাকালীন তিনি যে কেবল মাত্র জার্মান ও ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন তাই নয়, তাঁর চিন্তা ধারায়ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। সত্য বলতে কি জার্মানী হতে Social Revolutionary রূপে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময় স্বর্গীয় বাহাদুর সিং সিংঘী তাঁর পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ সিংঘী জৈন জ্ঞানপীঠ স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন ও সেই কার্য গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। জিনবিজয়জী সে কাজ গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে লবণ

সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ায় তিনি ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। কারাবাস হতে মুক্ত হওয়ার পর তিনি শান্তিনিকেতনে সিংঘী জৈন জ্ঞানপীঠের স্থাপনা করেন ও তার কার্য সঞ্চালন করতে থাকেন। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তিন বছর পর তাঁকে এই স্থান পরিত্যাগ করে যেতে হয়।

স্বর্গীয় কে. এম. মুন্সী সেই সময় মুনিজীকে বম্বের ভারতীয় বিদ্যা ভবনে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান ও সেখান হতে সিংঘী জৈন গ্রন্থ মালার গ্রন্থাদি প্রকাশন করবার অনুরোধ করেন। কিন্তু হঠাৎ ৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হওয়ায় তখন তখনই এই কাজে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই সময় কিছুকাল জৈসলমীরের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অবস্থান করে তিনি ২০০ প্রাচীন গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করেন ও পরে ভারতীয় বিদ্যাভবন হতে সিংঘী জৈন গ্রন্থ মালা সম্পাদন ও প্রকাশনের কাজে আত্ম নিয়োগ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর মুনিজী গ্রামে গিয়ে সর্বোদয়ের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবেন স্থির করেন কিন্তু রাজস্থানের প্রথম মুখ্য মন্ত্রী হীরালাল শাস্ত্রীর অনুরোধে রাজস্থান পুরাতত্ব মন্দির সঞ্চালনের কাজ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি রাজস্থান পুরাতত্ব মন্দিরের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তারপর তিনি সমস্ত রকম সক্রিয় কাজ পরিত্যাগ করেন ও চন্দেরীর সর্বোদয় নিবাসে নির্জন বাস করতে শুরু করেন।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি ওরিয়েণ্টাল সোসাইটী অব জার্মানীর মাননীয় সদস্য নিযুক্ত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই বোধ হয় দ্বিতীয় যিনি এই সম্মান লাভ করেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভারতীয় বিদ্যার তৃতীয় ভাগে মুনি শ্রীজিনবিজয়জী বাহাদুর সিং সিংঘীর মৃত্যুর পর তাঁর বিস্তৃত স্মৃতি কথা লেখেন। সেই স্মৃতি কথায় সিংঘী জৈন জ্ঞানপীঠের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত তথ্য সহ মুনিজীর বিচার ধারার সঙ্গেও পরিচিত হওয়া যায়। শ্রমণের পরবর্তী সংখ্যা হতে সেই স্মৃতি কথার অংশ বিশেষ ধারাবাহিক ভাবে শ্রমণে প্রকাশিত হবে।

দ্রুমপত্রক

কাল গত হলে যথা বৃক্ষপত্র পীত হয়ে ঝরে
সেরূপ মানব জন্ম, প্রমাদ করো না ক্ষণতরে।

শিশির কুশাগ্রলগ্ন হয় যথা ক্ষণকাল স্থিত
সেরূপ মানব জন্ম, হও তুমি প্রমাদ রহিত।

নাশবান এই দেহ, স্বল্প আয়ু, বিঘ্ন বহু হয়,
কর্মরজঃ করো নাশ, বৃথা নষ্ট করো না সময়।

দুর্লভ মানব জন্ম জীবগণ বহুকষ্টে পায়,
কর্মফল গূঢ় অতি, নষ্ট এরে করো না হেলায়।

দিনে দিনে জীর্ণ দেহ, শ্বেতবর্ণ হয় তব কেশ,
ইন্দ্রিয় বিকল আরো, প্রমাদে করো না আয়ুঃ শেষ।

স্বচ্ছ জল হতে যথা শরতের নির্লিপ্ত কমল
সেরূপ নির্লিপ্ত হও, কর ত্যাগ বাসনা সকল।

পরিহরি ভবপথ, মুক্তিপথ পেয়েছ উত্তম,
সেই পথ ধরি চল, কালক্ষয় করো না গৌতম।

অতিক্রমি ভব সিন্ধু, কূলে এসে দ্বিধাগ্রস্থ কেন?
পার হও সুচরিত্র, মোহবদ্ধ হইও না যেন।

শুভঙ্কর যেই লোকে সিদ্ধগণ করেন গমন,
সেই লোক পাবে তুমি, অপ্রমাদে কর বিচরণ।

উত্তরাধ্যয়ন। দশম অধ্যয়ন

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

  জৈন ভবন

  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

  ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র

  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. IV No. 3 : Sraman July 1976
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রাবণ । ১৩৮০

চতুর্থ বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮৩ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

ঋষভনাথ, ভেলোয়া, দিনাজপুর
খৃষ্টীয় ১১ শতক

প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার উত্তরণে ঋষভের অবদান

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

মানব-সভ্যতার প্রথম প্রভাতে দিব্য পুরুষদের অবদান ও লীলা বিভিন্ন জন-জীবনের উত্তরণকে প্রতিফলন করে সন্দেহ নেই। এই উত্তরণ অতীতের নানা প্রহরসমূহের সাক্ষ্যস্বরূপ এবং তার আখ্যানে রচিত হ'য়েছে প্রাসঙ্গিক পরিবেশের ইতিবৃত্ত এবং সমন্বয় সাধনের অভীপ্সা। সাংস্কৃতিক অধিনায়কত্বের এই কাহিনী ইতিহাস-শাস্ত্রের আপন ঐশ্বর্য। প্রাচীন সভ্যতার ঊষাকালে প্রীতি, মনস্বীতা, বীরত্ব, উদ্ভাবনীশক্তি অথবা নেতৃত্বের উপাখ্যান কিংবা ইতিহাস প্রায়শঃই দূরত্বের বর্ণাঢ্যতায় সমুজ্জ্বল ও স্মৃতিময়। মিশরীয় সংস্কৃতির প্রথম পর্বে দেবতা থথ্‌-এর ভূমিকা এবং গ্রীসদেশে ক্যাড্‌মাস-এর আগমন গবেষণার আলোকে যথাযথরূপে অর্থবহ। মিশরের থথ্‌ এবং ইয়োরোপার ভ্রাতা থিবস্‌-এর ক্যাড্‌মাস দুইজনেই আপনাপন ক্ষেত্রে পরিচয় দেন নবীন জ্ঞানের যা সভ্যতার উত্তরণে সহায়ক। থথ্‌ যেমন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও কৃত-কর্মের সংবাদ সংরক্ষক তথা আচার্য, ক্যাড্‌মাস তেমনি নবীন বর্ণমালার প্রবর্তক। প্রাচীন আসিরিয়ার অন্যতম মহানগরী নিনেভের ধ্বংসাবশেষে অসুর বানিপালের গ্রন্থাগারে একদা রক্ষিত ফলকাদিতে বর্ণিত হ'য়েছে বীর-শ্রেষ্ঠ গিলগামেশের কাহিনী। এরেচ নগরীর অধিপতি গিলগামেশ ও তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ইয়াবানি অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন এরেচ নগরীর শত্রু এবং দেবী ঈশতার-প্রেরিত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করবার জন্য। অমৃতের সন্ধানে একক গিলগামেশের অভিযান যেন এক বিস্মৃত 'সাগা' অথবা মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত একটি নলাকৃতি 'সীল' (সিলিণ্ডার সীল)-এ রূপায়িত আছে আক্রমণকারী বৃষভদের সঙ্গে গিলগামেশ ও ইয়াবানির যুগ্ম সংগ্রাম-চিত্র। অতীতের বিশিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য মিশরের দেবতা থথ্‌ অথবা তেহুতির কাহিনী—এ কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। প্রাচীন মেক্সিকোয় প্রতিষ্ঠিত অ্যাজ্‌টেক সভ্যতায় পরিদৃষ্ট হয় কোয়েৎজালকোৎলীর অনন্য ভূমিকা। অনুমিত হয়, এই দেবতাকে ঘিরে যে কাহিনীসমূহ রচিত হয়েছে সেখানেও খুঁজে পাওয়া যাবে প্রাক্‌-কলম্বীয় পর্বে সমুদ্র-পথে আগত কোন বীর অভিযাত্রীর কীর্তি-গাথা। এইভাবে প্রাচীন আবিষ্ক্রিয়া কিংবা অভিযানের ইতিবৃত্তগুলি বারংবার সূচিত করেছে সভ্যতার প্রগতিকে। বিভিন্ন দেশে ও জন-মণ্ডলীতে এই প্রেক্ষাপট সৃজন করেছে তার আপন প্রভামণ্ডল। এখানেই যেন নিহিত আছে গ্রীক পুরাণে বর্ণিত পরম করুণাময় দেবচিকিৎসক

এসক্লোপিয়াসের উপাখ্যান অথবা মানব-প্রেমের শাস্তি-স্বরূপ বিজন পর্বতে শৃঙ্খলিত প্রমেথিউসের মর্মস্পর্শী কাহিনীর অন্তর্লীন সংলাপ। ভারতের ইতিহাস ত' বিভিন্ন ঋষি ও বীরদের কাহিনীতে দীপ্তিময়। ইন্দ্র, সুদাস, দধীচি, অগস্ত্য, রামচন্দ্র, ভগীরথ ও অপরাপর বীর, পথিকৃত ও ব্যক্তিত্বের উপাখ্যান-মালা সুবিদিত। পাণ্ডবদের শৌর্যের উপাখ্যানসমূহে ও নানা পুরাণ-কাহিনীতেও নিহিত আছে সভ্যতার সংঘাত, আকাঙ্খা এবং পরিবেশ সম্বন্ধীয় নানা তথ্য। অনুরূপ বিবেচনায় জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনোপাখ্যানেও পরিচিত হওয়া যায় মানব-সংস্কৃতির এক অনন্য উত্তরণের সঙ্গে। নবাশ্মীয় জীবন-চর্যার অঙ্গস্বরূপ কৃষি ও পশু-পালনের ওপারে কিংবা পরবর্তী সভ্যতার উৎকর্ষকে অতিক্রম করে যে আত্মদর্শনের দিগন্ত রহস্যময় বর্ণাঢ্যতায় সঙ্কেতময় তারই বার্তা যেন প্রতিবেদিত হয় তীর্থঙ্করদের উপলব্ধিতে। মহাবীরের পূর্বে পার্শ্বনাথ এবং তারও পূর্বে কৃষ্ণের খুল্লতাত সমুদ্রবিজয়ের পুত্র অরিষ্টনেমির জীবনকে ইতিহাসের স্বচ্ছতায় অনুধাবন করা যায়। কৃষ্ণের আবির্ভাবকালে এবং স্বভাবতঃই অরিষ্টনেমির (নেমিনাথ) জীবদ্দশায় কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত মহাযুদ্ধের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে গবেষকগণ ক্রমশঃ প্রত্যয়শীল যদিও এর কাল-দিগন্ত প্রসঙ্গে বিরোধের অন্ত নেই। এই যুদ্ধ যে বিম্বিসারীয় যুগের বহু পূর্বের ঘটনা তা' স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হয়। জৈন তীর্থঙ্করদের পরম্পরায় একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আশা করা যায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, সিন্ধু-সভ্যতার এক বিশিষ্ট ভাস্কর্য-কল্পনায়ও 'কায়োৎসর্গ' ভঙ্গির প্রতিচ্ছায়া ইতিপূর্বেই পুরাতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্থির ঋজু পুরুষমূর্তিগুলির নগ্নতায় এমন এক বৈরাগ্য-নিষ্ঠা ও অবিচল সংকল্প বিধৃত যা' সাক্ষ্য দেয় সুগভীর তত্ত্বজ্ঞানের। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় জন-মানসের শ্রদ্ধার দেবায়তন এই উপলব্ধি। প্রাচীন গ্রীক বিবরণী থেকে অবগত হওয়া যায় অনাবৃত সন্ন্যাসীদের (জিমনোসোফিস্ট) কথা যারা আলেক্সেণ্ডারের ভারত আক্রমণ-কালে এদেশে অতিশয় নিরাসক্ত জীবন যাপন করতেন। প্লুটার্ক প্রদত্ত বৃত্তান্তে আছে অ্যালেক্সেণ্ডার ও তৎসঙ্গী ডায়োজেনিস-পন্থী দার্শনিক ওনেসিক্রিটাসের সঙ্গে এই নগ্ন সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। জিমনোসোফিস্টদের নিরাসক্তি ও নির্ভীকতা আক্রমণকারীদের মনে সম্ভ্রম ও বিস্ময় সৃষ্টি করে। আরিয়ানের বৃত্তান্তেও এই ধরণের কাহিনী বিদ্যমান। মৌর্যযুগে নিগ্রন্থ ও আজীবিকগণ যে, জনমানসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন সে বিষয়ে আলোক-পাত করে সম্রাট অশোকের আদেশে উৎকীর্ণ শিলা-লিপি। গ্রীক বৃত্তান্তে উল্লিখিত জিমনোসোফিস্টদের ইতিবৃত্ত অবশ্যই এক অস্পষ্ট অতীত পর্যন্ত প্রসারিত। এই ইতিহাসের দূরত্ব বিবেচিত হ'তে পারে ব্রোঞ্জযুগ কিংবা তাম্রযুগের প্রেক্ষাপটে। এখানে উল্লেখ্য ঃ মানবসভ্যতার ইতিহাসে, বিশেষতঃ যে ভূখণ্ডে সাংস্কৃতিক স্রোত বহুকাল প্রবহমান সেখানে ধর্মীয় কিংবা প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতাও দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে। বিভিন্ন

জনমণ্ডলীর সমাজ-জীবনে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ম্যাসিডন-বীর এবং তাঁর গ্রীক সহচর ও অনুগামীদের অভিজ্ঞতা হয়ত এমন এক শ্রেণীর তাপস ও দার্শনিকদের প্রসঙ্গে স্মরণীয় যাদের ভাব-মূর্তি পার্শ্বনাথ ও অরিষ্টনেমির জীবন-কাল থেকে মোহেঞ্জো-দারোর কাল-অধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত। এ সবই ইতিহাসের অধিকতর তথ্য ও গবেষণার আলোকে বিবেচ্য। সম্রাট অশোকের দিল্লী-টোপরা শিলা-স্তম্ভে উৎকীর্ণ সপ্তম অনুশাসনে সংঘ ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিগ্রন্থ ও আজীবিকগণের উল্লেখ যেন আলেক্সেণ্ডারের সমকালীন যুগের 'জিমনোসোফিস্ট'দের বর্ণনাকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে।[১] সংসার ও বাসনার প্রতি পরম নিস্পৃহতা এই নগ্ন সন্ন্যাসীদের আদর্শকে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেছে যা' প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অবশ্যই তাৎপর্যময়।

জৈন তীর্থঙ্করদের পরম্পরার সূত্রপাত ঋষভনাথ থেকে। এই প্রথম জিন অথবা অর্হৎ-এর আবির্ভাব কল্পনা করা যায় এক সবিশেষ কাল-গত দূরত্বে কারণ পার্শ্বনাথ ও নেমিনাথেরও বহু পূর্বে তাঁর স্থান। যদিও আদি তীর্থঙ্করদের ইতিহাস আরও তথ্য-সাপেক্ষ তবুও ঋষভনাথের মহান জীবন-কাহিনীর তাৎপর্য প্রশ্নাতীত। ভাগবতে তিনি বর্ণিত হ'য়েছেন বিষ্ণুর অবতাররূপে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তাঁর উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারিত। ঋগ্বেদে ঋষভ মহান দেবতা, অর্হন এবং বিশ্বের প্রথম প্রশিক্ষকরূপে বর্ণিত হ'য়েছেন। এই ঋষভ যে অভিন্ন সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দু'টি ক্ষেত্রেই ঋষভ মহান শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেছেন। জৈন সাহিত্যে প্রথম তীর্থঙ্করের বিভিন্ন অবদান বর্ণিত হ'য়েছে। কি গৃহ-নির্মাণ, কি রথ-সৃষ্টি, কি প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, কি কারু-শিল্পের প্রবর্তন অথবা মৃন্ময় তৈজসপত্রাদি নির্মাণ সবই ঋষভদেবের স্বীয় প্রতিভার ফল। তাঁর আরও এমন সব অবদান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নতির সহায়ক ছিল। কথিত আছে, হস্তী-বাহিনী, অশ্বারোহী সেনা, পদাতিক যোদ্ধৃবৃন্দ এবং শান্তি-রক্ষকদের তিনিই সাজিয়ে তুলেছিলেন। ভারতের প্রাচীন 'ব্রাহ্মী' লিপির নামটিও গৃহীত হ'য়েছে ঋষভ-কন্যার নাম অনুসারে। সভ্যতার পথিকৃতরূপে ঋষভের স্থান স্মরণীয়। সুসভ্য সমাজ-জীবনের কল্যাণ-নিমিত্ত তাঁর সুগভীর মনীষা ও মৌলিকতা প্রদর্শিত হ'য়েছে সংসার-ত্যাগের পূর্বে। এরপর সবই পরমার্থে নিবেদিত ও একাঙ্গীভূত। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে স্মরণ করা যায় যোড়শ শতাব্দীর সৃষ্টি একটি চিত্রিত পুঁথি যার একটি পৃষ্ঠায়

১ 'সংঘ' এখানে স্বভাবতঃই বৌদ্ধধর্মের পরিচায়ক। সুলতান ফিরোজ শাহ্-র ঐতিহাসিক শামস্-ই-সিরাজ-এর বিবরণ অনুসারে এই শিলা-স্তম্ভটি একদা শিবালিকে আম্বালা ও সিরসাওয়ার মধ্যবর্তী টোপরায় দণ্ডায়মান ছিল। ফিরোজের আদেশে স্তম্ভটি দিল্লীতে আনীত হয় এবং তাঁর প্রাসাদ-গৃহ 'কোটলা'র উপর-তলে স্থাপিত হয়। এই সপ্তম অনুশাসন একমাত্র দিল্লী-টোপরা শিলা-স্তম্ভেই উৎকীর্ণ আছে।

চিত্রিত আছে হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় ঋষভদেব। চিত্রে দেখা যায় হস্তীর শুণ্ডধৃত 'প্রথম নির্মিত' কলস এবং করি-কুম্ভে স্থাপিত কুম্ভকারের চক্র।[২] এখানে ঋষভদেবের পরিচয় পাওয়া যায় সভ্যতার আলোকবাহী আবিষ্কারক ও সংস্কারকরূপে। প্রকৃতপক্ষে, ঋগ্বেদে ও বিশেষতঃ জৈন সাহিত্যে ঋষভের যে উল্লেখ আছে তার দ্বারা মানব-সভ্যতার অগ্রগতির প্রসঙ্গটিই উল্লিখিত হ'য়েছে। আপাতজ্ঞানে এই উত্তরণ পশ্চিম-এশিয়া এবং ভারতের পটভূমিকায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা' নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন প্রাচ্যভূমিতে তাম্র অথবা ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সঙ্গে যে নাগরিক সভ্যতার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয় তারই প্রসঙ্গে ঋষভদেবের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। এই সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ইতিহাসে প্রথম দেখা যায় কৃষক, ব্যাধ ও ধীবরদের উপর নির্ভরশীল কারিগরদের অভ্যুদয়। পুরাতাত্ত্বিক গরডন চাইল্ড এর ধারণায় এই সময়েই উদ্‌বৃত্ত খাদ্য অথবা সঞ্চয়ের তথা কেন্দ্রীভূত সম্পদের সূত্রপাত হয় যার দ্বারা সম্ভব হয় নগর অথবা অতীতের কীর্তিসমূহের সৃষ্টি ("দি প্রিহিস্ট্রি অব ইয়োরোপিয়ান সোসাইটি"র অন্তর্ভুক্ত "আরবান রেভল্যুশান ইন দি ওরিয়েণ্ট" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সাধারণক্ষেত্রে পূর্বের নবাশ্ময় (নিওলিথিক) অর্থনীতিতে এতটা সুযোগ ছিলনা। চাইল্ড-এর মতে ধাতুর এই প্রচলন বহু পরবর্তীকালের শ্রম-বিপ্লবের ন্যায়ই সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। তিনি এই বিপ্লবের নাম দিয়েছেন 'আরবান রেভল্যুশান'। এই পরিবর্তনের মূলেও আছে দীর্ঘকালের ইতিবৃত্ত। বিপ্লবের এই পটভূমিকায় যে নির্মিত হ'য়েছে প্রাচীন মিশর, সুমের, হরপ্পা ও মোহেঞ্জো-দারোর কীর্তিনিচয় সে বিষয়ে তিনি তথ্য-প্রমাণাদির অবতারণা করেছেন। ঋষভদেবের অবদানসমূহের বৃত্তান্ত সভ্যতার এক প্রথম উজ্জ্বল প্রভাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে এর মূল্যায়ন অপেক্ষমান। ঋগ্বেদের প্রসঙ্গে এর বৃত্ত প্রসারিত হ'তে পারে বহির্ভারতে, পশ্চিম এশিয়ায়।

২ শ্রীগণেশ লালওয়ানী সম্পাদিত "জৈন জারনাল" চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল, ১৯৭০), ২২নং চিত্র ও পৃষ্ঠা: ২৪৫ দ্রষ্টব্য।

মৃগাপুত্র কথা

[শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা অবলম্বনে]

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

একদা মৃগাপুত্র গিয়ে
কহেন পিতামাতায়ঃ
আজ্ঞা দেহ, প্রব্রজ্যা নেই—
যাহা আমারে মাতায়।
ভোগেতে মন আর তো নেই,
হব যে সংযমী।
এসংসার বড় অসার
হেথা যে সুখ কমই।
আপাতমধুর সে-সুখ যেন
ফল সে কিংপাক,
আগুন হয়ে পুড়ায়ে তাই
করবে কালে খাক।
এই এ দেহ অনিত্য কী—
কয়না বিচক্ষণ?
অশুচি অপবিত্রতার
জন্ম-লক্ষণ!
দুঃখ-ক্লেশের আকর আরো
বড় যে ভঙ্গুর,
রোগ-শোক আর জরা-মরণ
করবে তাকেই চুর!
সেই শরীরে সুখবোধ তো
একটুও মোর নাই,

সংসারে জীব যারাই থাকে
দুঃখভোগী তাই।
ধনজন-স্ত্রী-পুত্র-জমি
বন্ধু ও বান্ধব—
এমন কী এই শরীরটাও
কালে বিবশ সব!
পাথেয় না নিয়ে যেজন
দীর্ঘপথের পথিক,
ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় তার
হয় যেমনই গতিক,
ধর্মাচরণ না করে যে
পরলোকে যায়,
আধি-ব্যাধির ভারে সেজন
তেমনি কষ্ট পায়।
ঘরে আগুন লাগলে যেমন
গৃহস্থ সজ্জন
অসার ফেলে পালায় নিয়ে
সঙ্গে বুকের ধন,
তেমনি জরামরণরূপ এ
সংসারাগ্নি থেকে--
আজ্ঞা দেহ, পালাতে চাই
আত্মাটিকে ঢেকে।

এসব কথা শুনে মৃগা-
পুত্রের মা কন:
শ্রমণ-ধর্ম কঠিন বড়
শক্তি প্রয়োজন।
শরীর তোমার কোমল, কম-
নীয় বলেই ভয়,

সুখে মানুষ—দুঃখসাধন
সে কী তোমার হয় ?
শ্রমণ হওয়ার নিয়ম
লোহার মতোই গরুভার,
সারা জীবন পেলেও তো
নিষ্কৃতি কই তার ?
আকাশগঙ্গা পার হওয়া সে
যেমনই দুষ্কর,
খরস্রোতের প্রতিকূলে
বাহুর রেখে ভর
সমুদ্র পার হওয়ার আশা
যেমন অতি ক্ষীণ,
সংযমরূপ সাগরবিজয়
তেমনি সুকঠিন !
সংযম কী নয় সে নীরস
বালুকাভক্ষণ ?
তপশ্চরণ—অসিধারার
উপর বিচরণ ?
লোহার যব চিবিয়ে খাওয়া
যেমন সহজ নয়,
সংযমও তাই পালন করা
বড়ই দুর্জয় !
এই এ কাঁচা বয়সকালে
শ্রমণ-ধর্ম গ্রহণ,
প্রদীপ্ত সেই অগ্নিশিখা—
পানেরই তো দহন !
হীনবীর্য যে করে এই
সাধনমার্গ সার,

থলের ভিতর বাতাস ভরার
ব্যর্থ প্রয়াস তার !
তুলাদণ্ডে যেমন মাপা
যায় না মেরু পাহাড়,
সন্দেহ কী শঙ্কাবিহীন
সেই বিচরণ তাহার ?

মৃগাপুত্র বলেন তখন ঃ
যা কহ মা ঠিক,
তবে গততৃষ্ণ কাছে
সবই স্বাভাবিক !
অনন্তবার শরীর এবং
মনের যাতনায়,
দুঃখভারে কাতর আমি
চলেছি ছুটে ধায় !
জরামরণরূপ সে বনের
দেখেছি ভীষণ রূপ,
জন্ম এবং মৃত্যুজ্বালা
অসহ তদ্রূপ !
অগ্নিজ্বালা কঠিনতম
জানি তো ভুবনেতে,
অনন্তগুণ দহন তারও
সয়েছি নরকেতে ।
তীক্ষ্ণধার ছুরিকা মোরে
করেছে কর্তিত,
চর্ম মোর শরীর হতে
হয়েছে অপনীত !
মৃগের মতো বিবশ স্নায়ু
পড়েছি জালে বাঁধা,

বদ্ধ ধৃত বুদ্ধ মোর
শোনেনি কেউ কাঁদা !
মৎস সম বঁড়শি-জালে
হয়েছি পড়ে হত,
অনন্তবার বুদ্ধ আমি
ছিন্ন বিক্ষত !
পক্ষীসম শ্যেনের মুখে
কত যে আয়ু শেষ,
আঠায় সংলগ্ন জীব—
জীবন অনির্দেশ !
বৃক্ষ হয়ে কুঠারাঘাতের
সয়েছি যন্ত্রণা,
খণ্ড-বিখণ্ড দেহ—
সেকথা ভুলব না।
ছাড়িয়ে ছাল হয়েছে নেওয়া
এই অঙ্গ থেকে,
হাজারবার মৃত্যু তার
গিয়েছে ডাক ডেকে !

সেকথা শুনে কহেন মৃগা-
পুত্র-পিতা, শোনো,
শ্রমণাচারে আছে যে মানা
সেবাদি নেওয়া কোনো।
অসুখ হলে তাই তো ভাবি-
কী হবে প্রতিকার ?
দুঃখ সারা সে হবে ঠিক—
অসুখ হবে যার !

শুনে তা মৃগাপুত্র বলেন,
কথা তো পিতা ঠিক,
কিন্তু যবে পীড়িত হয়
বনের আবাসিক—
সে-সব পশু-পক্ষীকুলে
কে করে প্রতিকার ?
বন্য প্রাণী তারা তো জানে
এড়াতে রোগভার !
আমিও তাই বেড়াব একা
বন্য মৃগবৎ,
তপস্যা আর সংযমেতে
আত্মা রেখে সৎ।
মৃগ যেমনি খাদ্য খুঁজে
ফেরে অনেক স্থান,
স্থানবিহারী তেমনি হব
আমিও আগুয়ান।
মৃগ যেমনি খাদ্য খুঁজে
ফেরে বনান্তর,
মুক্তিপথে তেমনি হব
আমিও অগ্রসর।

সেকথা শুনে পিতা ও মাতার
মনে জাগে তো প্রীতি,
কহেন তবে ঃ বৎস দিলাম
তোমারে নিষ্কৃতি।
ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হউক—
মনে-প্রাণে চাই,
মোক্ষে যার পড়েছে মতি,
আঁতি তার নাই !

জৈন তত্ব জ্ঞান এবং চারিত্র

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

জৈন তত্ব জ্ঞান (Philosophy) বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হইয়া সকলেরই এই প্রকার একটা ধারণা এবং বিশ্বাস হইতে পারে যে ইহার সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর সম্বন্ধ রহিত, সামান্য রকমের, মূলীভূত তত্ব বুঝি ইহাদিগের একটিও নাই। তাঁহারা অবশ্য এটাও মনে করিবেন যে এই প্রকার একটা অব্যবস্থিত ধর্ম স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া উঠিল কি করিয়া? এবং এই দাঁড়ানোর আবশ্যকতাই বা কি? কিছুদিন পূর্বে আমারো এমনি রকমের একটা ধারণা ছিল। অবশ্যই সেটা ভুল ধারণা, ভুলটা ভাল করিয়াই চোখে পড়িয়াছে। এখন আমি এক নূতন আলোকে জৈন ধর্মকে দেখিতে পাইয়াছি। আমি বুঝিতে পারিয়াছি এর নিজস্ব কিছু আছে, একটা বাস্তব ভিত্তি আছে; এর তত্বগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং খাঁটি, ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধমতের অনুকরণ নহে। এখানে আমি এই বিষয়টিই যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সেই অতি প্রাচীনকালে যে ভারতে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের (আত্মার) নিত্যত্ব এবং মুখ্যত্ব কীর্তন করিয়াছেন, যেখানে মহাবীর স্বামীর সমসাময়িক মহাত্মা গৌতমবুদ্ধ ক্ষণিকবাদ প্রচার করিয়াছেন, সেই খানেই অন্তিম জৈন তীর্থংকর মহাবীর স্বামী জৈন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ এই দুই পরস্পর পৃথক ধর্মের মাঝখানে এই জৈন ধর্মকে একটা নির্দিষ্ট স্থান লইতে হইয়াছিল এবং সেইখানেই স্বতন্ত্র অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উপনিষদের ঋষি যে সমস্ত সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান এবং মহত্তম এইটি ঃ প্রত্যেক পদার্থে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এক অখণ্ড নিত্য আত্মা বিদ্যমান। উপনিষদকার, এই শাশ্বত অবিনাশী তত্বের সহিত জড় জগতের কি সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া যদিও কিছু বলেন নাই, তথাপি একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই দেখিবেন, এই দৃশ্য জগৎ সত্য এবং বাস্তব বিবেচিত। এই কথাটিকে বেদানুসরণকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিচার করিয়াছেন।

এই নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষণিকবাদ, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই ধ্বংসশীল, ক্ষণিক—বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন। আত্মবাদ, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের মূলে এক শাশ্বত আত্মা বিদ্যমান, বৌদ্ধগণ একথা মানেন না। এই না মানাই, অর্থাৎ যাবতীয়

পদার্থ একটা দৃশ্য (phenomena) মাত্র, বৌদ্ধদিগের প্রধান কথন বুদ্ধের কথায়,—ইহা ধর্মমাত্র, ইহার কোনো আধার বা কোনো ধমনী নাই, যাহাকে এই ধর্ম আশ্রয় করিতে পারে।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণগণ এবং বৌদ্ধগণ আত্মা সম্বন্ধে পরস্পর বিভিন্ন মত স্থাপন করিলেন। ইহার কারণ একমাত্র এই যে, তাঁহারা আত্মাকে একভাবে দেখেন নাই, বিভিন্নভাবে দেখিয়াছেন। আত্মা এক নিত্য অদ্বিতীয়, আত্মা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের এই ধারণা। তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা যখন বিচার করি, তখন এই সিদ্ধান্তকেই সত্য বোধ হয়। আর যখন স্বকীয় অনুভব দ্বারা বিচার করি তখন বৌদ্ধদিগের সমস্ত জগৎ জন্মমরণের পরম্পরা মাত্র, এই সিদ্ধান্তকেই সত্য বোধ হয়। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞাত বস্তুর নির্ণয় করিতে ব্রাহ্মণগণের তাত্বিক প্রতিপাদনের (*apriori*) কিংবা বৌদ্ধদিগের অনুভবালম্বী মতের (*aposteriori*) যে কোনটির সাহায্য গ্রহণ করনা কেন, প্রত্যেকটির ভিতরেই বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। গৃহীত সিদ্ধান্তে যে পর্যন্ত অন্ধ বিশ্বাস না জন্মিবে, সেই পর্যন্ত এই সকল আপত্তি থাকিবেই।

এই তত্ত্ব সম্বন্ধে জৈনদিগের কিরূপ মত, একবার দেখা যাক্ ঃ

উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ।

প্রত্যেক পদার্থই উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ এই ত্রিবিধ অবস্থাযুক্ত। জৈনগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে অনেকান্তবাদ বলেন। বেদান্তের নিত্যবাদ এবং বৌদ্ধগণের বিনাশবাদ হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্যই এই নামকরণ হইয়াছে। জৈন মত এই দাঁড়াইল, ধর্মী নিত্য কিন্তু উহার ধর্ম বা গুণ (attributes) অনিত্য। গুণ সমুদয় যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি বিনাশপ্রাপ্তও হয়। প্রত্যেক জড় পদার্থ পুদ্গল স্বরূপাপেক্ষা (মূল দ্রব্যাপেক্ষা) নিত্য ; জড়পদার্থের পরমাণু সময় সময় পৃথক পৃথক আকার এবং গুণ ধারণ করিয়া থাকে, এই পর্যায়াপেক্ষা জড় পদার্থ অনিত্য। পদার্থত্ব (পদার্থের মূলত্ব) অপেক্ষা মৃত্তিকা শাশ্বত এবং অবিনাশী, কিন্তু ঘট (আকৃতি) অথবা রং (গুণ) অপেক্ষা মৃত্তিকা অনিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশ উভয়ই সম্ভব।

সাধারণভাবে বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্তে যে একটা বিরাট মহত্ব নিহিত রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইবে না। বোধ হইবে, ইহাতে কোনো জটিলতা এবং গুরুত্ব নাই। যাহাই হউক এইটিই সমস্ত জৈন তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি। স্যাদ্বাদন্যায় (সপ্তভঙ্গীন্যায়) দ্বারা বিচার করিলে ইহার বাস্তব মহত্ব বেশ উপলব্ধি হয়।

'জৈন প্রবচন' স্যাদ্বাদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের জাল হইতে নিস্তার পাইবার উপায় এই 'জৈন প্রবচন' জৈনদিগের একটি গর্বের বিষয় সন্দেহ নাই। স্যাদ্বাদের মোটামুটি কথা অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তায় উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় এই তিনটী

বিরুদ্ধগুণের একত্র সমাবেশ। প্রত্যেক অস্তিত্ব গুণ যুক্ত পদার্থে এই প্রকার অনেকান্ততা (অনেক ধর্ম) বিদ্যমান। যে সিদ্ধান্ত এক দৃষ্টিতে সত্য, তাহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও অন্য আর এক দৃষ্টিতে সত্য। এই প্রকারে প্রত্যেক পদার্থকে 'স্যাদ্ অস্তি', 'স্যাদ্ নাস্তি' প্রভৃতি সপ্ত ভঙ্গী ন্যায়াপেক্ষা বিচার করা যাইতে পারে। স্যাদ্‌শব্দের অর্থ—কথঞ্চিৎ, এক প্রকারের, কোনো অপেক্ষায়। 'স্যাদ্' 'অস্তি'র বিশেষণ এবং অস্তিত্বের অনেকান্ততা প্রকট করে। এই প্রকার বলা যাইতে পারে 'স্যাদস্তি ঘটম্' অর্থাৎ একপ্রকারে ঘট আছে। 'ঘট আছে', কখন যখন স্বকীয়াপেক্ষা ধরা যায়। আর 'ঘট নাই' কখন, যখন পরকীয়াপেক্ষা ধরা হয় অর্থাৎ ঘটাপেক্ষা ঘট আছে, পটাপেক্ষা ঘট নাই।

এই স্যাদ্বাদ সিদ্ধান্তের উপযোগিতা ভাসা ভাসা রকমে বিচার করিলে অত্যন্ত রুক্ষই প্রতিপন্ন হইবে, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এবং 'সর্বব্যাপী পরব্রহ্মবাদ' এই মূল মহাসত্য নিরাকরণ করিবার জন্য ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

অস্তি নাস্তি অবক্তব্য এই তিন পদাভিধেয়, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে এই তিন পদ দ্বারা প্রকটিত বাক্য স্বীকার করিতে হয়। কোনো পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষায় 'অস্তি' এবং 'নাস্তি' এই দুই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে, তৃতীয় 'অব্যক্ত' উল্লিখিত পরস্পর বিরুদ্ধগুণের উল্লেখ, এই শব্দ (অবক্তব্য) দ্বারাই করিতে হয়, কেননা একই সময়ে একই পদার্থের বিরুদ্ধ গুণ, অর্থাৎ একই সময় বস্তু আছে এবং নাই, প্রকাশ করিতে পারে এমন কোনো শব্দ কোনো ভাষায় নাই। সেই জন্যই এইটিকে 'অবক্তব্য' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই তিন পদাভিধেয়কে গুণাকার করিলে সাত ভাগ হইয়া পড়ে। এই সাত ভাগকে সপ্তভঙ্গী ন্যায় বলে।[১]

সপ্তভঙ্গ ঃ (১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তি নাস্তি, (৪) স্যাদ্ অবক্তব্য, (৫) স্যাদস্তি অবক্তব্য, (৬) স্যান্নাস্তি অবক্তব্য, (৭) স্যাদস্তি নাস্তি অবক্তব্য—এই সপ্তভঙ্গকে স্যাদ্বাদ্ বা সপ্তভঙ্গী ন্যায়ও বলা হয়। এই সিদ্ধান্তের সম্যক ব্যাখ্যা এখন নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইমাত্র বলি এই অনেকান্তবাদ হইতে উৎপন্ন সপ্তভঙ্গী ন্যায় এবং সপ্ত নয় সকল সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনে সমর্থ।

পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের প্রকাশ করিবার পদ্ধতি সমূহকে নয় বলা হয়। নয় সাত প্রকার ঃ (১) নৈগম, (২) সংগ্রহ, (৩) ব্যবহার, (৪) ঋজুসূত্র, (৫) শব্দ, (৬) সমভিরূঢ়, এবং (৭) ভূত। ইহাদের ভিতর চার অর্থ নয় এবং তিন শব্দ নয়। জৈন মতের মন্তব্য এই সপ্তনয়ের প্রত্যেকটি একান্তিক (one-sided), কেননা একটি

১ সপ্ত ভঙ্গীর বিস্তৃত বর্ণনা 'সপ্তভঙ্গী তরঙ্গিনী' এবং সপ্তনয়ের বিস্তৃত বিবরণ 'মোক্ষশাস্ত্রে'র টীকা 'আলাপ পদ্ধতি' এবং 'নয়চক্র' নামক জৈন গ্রন্থে আছে। 'নয়চক্র' প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, অন্যান্য কয়টি সংস্কৃতে। —সংকলনকর্তা।

নয় পদার্থের এক অংশমাত্র বিষয় করিয়া থাকে এবং পদার্থের সত্য সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞানমাত্রই প্রকট করে।

এই সব বিচারে বিশেষ গভীরতা নাই বটে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত উপনিষদের পরস্পর বিরুদ্ধ কথন সমূহকে সহজ করিয়া বুঝাইবার একটি সুন্দর পদ্ধতি। বৌদ্ধ মত ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান ইহার অভিপ্রায় নহে, একথা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও সত্য। মহাবীর স্বামীর সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে অনেক বিভিন্ন।

এখন সাংখ্য যোগের সহিত জৈন সিদ্ধান্তের কি সম্বন্ধ, দেখা যাক। এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। কেননা উভয়ই একই শ্রেণীর ধর্মবীরদ্বয় কর্তৃক প্রবর্তিত। একই শ্রেণী শ্রমণ, সন্ন্যাসী, যোগী। এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে যোগ শিক্ষার উদ্দেশ্য, হেতু এবং মার্গ, ব্রাহ্মণ, জৈন এবং বৌদ্ধ এই তিন ধর্মের প্রায় একই। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে এই তিন ধর্ম একই মূল প্রস্রবণের বিভিন্ন ধারা। এখানে কেবল সাধু ধর্মের (সন্ন্যাস জীবনাভ্যাস) আবশ্যক কথা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক কল্পনা দ্বারা বিচার করা যাইবে।

বাইরে অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপনিষদের মত, সাংখ্যমত এবং সাধারণ বুদ্ধি যাহা বলে, তাহাতে পরস্পরের একরকম বেশ মিল আছে। সাংখ্যমতে আত্মা অথবা পুরুষ নিত্য, পর্যায়রহিত (without change) প্রকৃতি অর্থাৎ জড় পদার্থ অনিত্য নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই মতে আত্মা অর্থাৎ পুরুষ ব্যতীত সমস্তই জড়, বিশ্ব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জৈন মতানুসারে আত্মা জীব ছাড়া সমস্ত জগৎ পুদ্‌গল (matter) হইতে জাত। পুদ্‌গল এক রকমেরই মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে সাংখ্য ও জৈন মত এই বিষয়ে (পুদ্‌গল হইতে সমস্ত জড় উৎপন্ন হইয়াছে) একমত, এই মত অতিশয় প্রাচীন।

প্রাচীনগণ এটিকে বিশ্বসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন যে জড় জগতে যে পরিবর্তন হইতেছে, তাহা স্বাভাবিক অথবা মন্ত্রাদি উপায়েই হউক এই সিদ্ধান্ত দ্বারাই স্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায়। বলা যাইতে পারে, সাংখ্যবাদ এবং জৈন মত জড়দ্রব্য সম্বন্ধে এই প্রকার কল্পনার ছায়া অবলম্বনে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছে।

সাংখ্যরা বলেন, অত্যন্ত সূক্ষ্ম (বুদ্ধি) হইতে স্থূল জড় পদার্থ পর্যন্ত সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি এবং বিনাশের ক্রম নিশ্চিত এবং নিয়মিত। জৈনগণ এই বিষয়ে একমত নন। তাঁহারা বলেন, বিশ্ব অনাদি নিধন এবং নিত্য স্থিত। জড় সৃষ্টি পরমাণু হইতে হইয়াছে। এবং তাহার (জড় সৃষ্টির) স্বরূপে এবং রচনাতে (মিশ্রণে) পরিবর্তন হইয়া থাকে। কতকগুলি পরমাণু সূক্ষ্ম অবস্থায় (পৃথক্ পৃথক্) কতকগুলি পরমাণু স্কন্ধাবস্থায় (পিণ্ডাকৃতি)।

জৈনাদিগের মতের বিশেষত্ব এই যে অসংখ্য সূক্ষ্ম পুদ্গল পরমাণু এক স্থূল পরমাণুর স্থানে অবস্থান করিতে পারে। এই মতের সহিত তাঁহাদের আত্মবাদের সম্বন্ধ কি এখন তাহাই দেখা যাক।

সাংখ্যেরা বলেন, বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলভূত সমষ্টি পর্যন্ত সমস্ত প্রকৃতিগত পদার্থই নির্দিষ্ট নিয়মেই আবির্ভূত হয় এবং জগতের সৃষ্টি ও লয়ের সেই নিয়মই অনুসৃত হয়। জৈন মতে এরূপ নয়। জৈন মত এই বিষয়ে অত্যন্ত সরল এবং স্পষ্ট। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এইরূপ ঃ জীবের শুভ এবং অশুভ পরিণামানুসারে কর্ম পরমাণু জীবের সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকে এবং জীবকে অশুদ্ধ করিয়া তাহার স্বাভাবিক গুণ ঢাকিয়া ফেলে। জৈনগণ স্পষ্টই বলেন, কর্ম একপ্রকার পুদ্গল পরমাণু (জড় পরমাণু)। তাহাদের এই কথা আলঙ্কারিক নহে, যথার্থই (literally) সত্য। আত্মা অর্থাৎ জীব অত্যন্ত লঘু (light), এই কারণে তাহার স্বভাব ঊর্দ্ধগতি, কিন্তু ইহাকে কর্ম পরমাণু প্রভাবে জড় বস্তুর ন্যায় নীচে থাকিতে হয়। যখন ইহা কর্ম পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন সরল রেখায় ঊর্দ্ধে গমন করিয়া লোকাগ্রভাগে সিদ্ধশীলায় (the domicile of the released souls) অবস্থান করে। কর্ম যে জড় পরমাণু তাহার অন্যতম প্রমাণ এই—যে সকল-কর্ম পরমাণুর আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ধারণ করিয়া থাকে। কর্ম পরমাণু কোনো সময় ঘোলা জলে মিশ্রিত মৃত্তিকার ন্যায় উদয়াবস্থায় থাকে। কোনো সময় ঐ মাটি নীচে-বসিয়া যায়, উপরের জল স্বচ্ছ হয় ; মাটির এই অবস্থার ন্যায় যখন কর্ম পরমাণুর উদয়াভাবাবস্থা হয় তখন এই অবস্থাকে উপশমাবস্থা বলে। যখন ঐ মাটি জল হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া যায়, কেবল মাত্র শুদ্ধ জল থাকে, কর্ম পরমাণুর এই প্রকার অবস্থাকে অর্থাৎ জীব হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার অবস্থাকে কর্মের ক্ষয় অবস্থা বলে। তখনই সেই কর্মের আত্মাকে (আত্মার গুণকে) অভিভূত করিবার শক্তি লোপ পায়। যদিও কর্ম পরমাণু মৃত্তিকা পরমাণুর অপেক্ষা অনন্তগুণ সূক্ষ্ম তথাপি ইহাকে পুদ্গল বা জড়ই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আত্মার কৃষ্ণ, নীল, কপোত (পারাবত সদৃশ), পীত, পদ্ম, শুক্ল এই ছয় লেস্যার[২] এবং তাহাদের রংএর বিচার করিলেও এটি স্পষ্টই অনুভব করা যায়। অজীবিক নামক সম্প্রদায়েরও এই মন্তব্য। এই বিষয়ে Dr. Hoernle সাহেব *Encyclopaedia of Religion & Ethics* নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন।[৩] লেস্যার রং কর্মপরমাণুর সহিত মিশ্রিত হওয়ায় আত্মা এবং শরীর অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। এই জন্যই কর্ম জড় (পৌদ্গলিক)।

২ কাষায়ানুরঞ্জিত যোগ প্রবৃত্তির্লেস্যা।—সর্বাসিদ্ধি।

৩ Vol. i, pp. 259 sq.

যে সকল কর্মপরমাণু আত্মার প্রদেশে একক্ষেত্রাবগাহী হয়, সে সকল কর্ম আট প্রকারের। যে প্রকার ভুক্ত পদার্থ রক্ত রস মজ্জাদি অষ্টধাতু রূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার কর্মও আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অষ্ট প্রকৃতিতে পরিণত হয়। সংগৃহীত কর্মপরমাণুসমূহ দ্বারা একটি সূক্ষ্ম (কার্মণ) শরীর উৎপন্ন হয়। যে পর্যন্ত জীবের মোক্ষ লাভ না হয়, সে পর্যন্ত বরাবর জীবের (আত্মার) সহিত এ শরীর লাগিয়াই থাকে। জৈনদিগের এই সূক্ষ্ম কার্মণ শরীর সাঙ্খ্যদিগের লিঙ্গ শরীরের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।[৪] এই কার্মণ শরীরের কার্য বুঝিতে হইলে, অষ্টপ্রকার কর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। অষ্টপ্রকার কর্ম—(১) জ্ঞানাবরণীয়, (২) দর্শনাবরণীয়, ইহাদের দ্বারা আত্মায় জ্ঞান ও দর্শন গুণের (দর্শন—সামান্য জ্ঞান) ব্যাঘাত হইয়া থাকে। (৩) মোহনীয় কর্মদ্বারা মোহ (অতত্ত্ব-শ্রদ্ধা) ও কষায়ের (ক্রোধ, মান, লোভ, মায়াদির) উৎপত্তি হয়, (৪) বেদনীয় কর্ম সুখ দুঃখদায়ক সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দেয়, (৫) আয়ুকর্ম জীবকে নিয়মিতকাল পর্যন্ত শরীরে অবস্থান করায়, (৬) নাম কর্ম দ্বারা শরীর সম্বন্ধীয় যা কিছু রচিত হয়, (৭) গোত্র কর্ম ফলে জীব উচ্চনীচকুলে জন্মগ্রহণ করে, (৮) অন্তরায় কর্ম দ্বারা দান, লাভ, ভোগ, উপভোগ এবং বীর্য প্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া থাকে। এই অষ্টপ্রকার কর্মের পরিণাম (পরিপাক অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি) ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্ধারিত সময়ে হইয়া থাকে। ফল ভোগের পর সেই সকল কর্মের নির্জরা হয় (নির্জরা—আত্মা হইতে কর্মের ঝরিয়া পড়ন বা স্খলন)। আত্মায় কর্মপরমাণুর আগমনকে আস্রব বলে। মন বচন কায় এই যোগত্রয়ের ক্রিয়া দ্বারা কর্মের আস্রব হইয়া থাকে। মিথ্যা দর্শন, অব্রত, প্রমাদ এবং কষায় দ্বারা আত্মার সঙ্গে কর্মপরমাণুর সম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধকে বন্ধ বলে। যে ক্রিয়া দ্বারা কর্মাস্রবকে রুদ্ধ করা যায় এবং যাহা বন্ধ হইতে দেয় না, তাহাকে সংবর বলে।

জৈনগণ স্বকীয় তত্ত্বজ্ঞানের প্রাসাদ এই সকল সরল এবং স্পষ্ট কল্পনার উপর খাড়া করিয়াছেন এবং সংসারের অবস্থা এবং মুক্তির উপায় প্রকাশ করিয়াছেন। সাঙ্খ্যবাদীরাও এই প্রকারের বিচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রণালী বিভিন্ন রকমের।

মন বচন কায়াকে বশ করা, সম্যকচারিত্র পালন, ধর্মধ্যানাদি তপশ্চরণ করা সুখে দুঃখে মাধ্যস্থভাব রাখা প্রভৃতি কর্মদ্বারা সংবর হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে তপশ্চরণই সর্বোত্তম। ইহার দ্বারা কেবল কর্মের নিরোধ মাত্রই হয় না পূর্বসঞ্চিত কর্মের ক্ষয়ও হইয়া থাকে। এই জন্যই এটি মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। জৈন মতে তপশব্দের অর্থ একটু বিলক্ষণ রকমের। তপশ্চরণ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভেদে দুই প্রকার। অনশন, অবমৌদর্য (অল্পাহার), বৃত্তি পরিসংখ্যান (ভোজনাদি ব্যাপারে

---

৪ জৈনদের মতে শরীর পাঁচ প্রকারের : "ঔদারিকবৈক্রিয়িকাহারকতৈজসকার্মণানি শরীরাণি" (তত্ত্বার্থ সূত্র) অর্থাৎ ঔদারিক বৈক্রিয়িক, আহারক, তৈজস এবং কার্মণ।

কঠিন প্রতিজ্ঞা), রসপরিত্যাগ, কায়ক্লেশ, বিবক্ত-শয়নাসন (একান্ত স্থানে শয়ন ও আসন) এই ছয় প্রকার বহিরঙ্গ তপ। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্য (monastic duties), স্বধ্যায়, ব্যুৎসর্গ, ধ্যান এই ছয় অন্তরঙ্গ তপ। সাঙ্খ্যযোগের সঙ্গে জৈন ধর্মের তুলনা করিবার সময়, এই সকল ধ্যানের মাহাত্ম্য প্রকট করা হইবে। সাঙ্খ্য মতে জৈন-তপের কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে কিন্তু তাহাদের মাহাত্ম্য ধ্যানাপেক্ষা কম বলা হইয়াছে। সুতরাং ধ্যানই যোগের মধ্যে মুখ্য, অন্যান্য তপ গৌণ। যাঁহারা জ্ঞানকেই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের এই তিনটি স্বাভাবিক। সাঙ্খ্য মত যে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রকৃতির পরিণতি বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছে, তাহা বোধ হয়, ধ্যানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই। সাংখ্য যোগে যতি ধর্ম যে প্রকার আলোচিত হইয়াছে, জৈনগণ তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের বলেন। জৈন যতিধর্মেরও উদ্দেশ্য আত্মাকে কর্ম হইতে মুক্ত করা। প্রাচীনকালে যতিধর্মে শরীরকে অত্যাধিক কষ্ট প্রদান করা হইত। জৈন ধর্ম এই আধিক্য নষ্ট করিয়াছে, একটা মাঝামাঝি রকমের করিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণ ধর্মের এবং যোগ (system) আবিষ্কারের পূর্বে যে সন্ন্যাস ধর্ম ছিল, তাহাকেই জৈন ধর্ম পুনরুজ্জীবিত করিয়া লইয়াছে।

উপসংহারে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের (Philosophy) মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উল্লেখ আবশ্যক বোধ হইতেছে। সংস্কৃত ভাষাবিদ্ সকল ব্যক্তির সাধারণ বিচার পদ্ধতিকে নিশ্চিত করা এবং নিয়ম বদ্ধ করিয়া সাজাইয়া তোলা এই দর্শনের কার্য। অনুভব জ্ঞানের দিকে যাহাদিগের ঝোঁক তাহাদিগের এই প্রকারের ন্যায় দর্শনের উপর প্রীতি হওয়াটা স্বাভাবিকই। অনেক জৈনাচার্য ন্যায় বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।[৫] আধুনিক সময়ের মত মহাবীর স্বামীর সময়ে নৈয়ায়িকগণ বৈদিক ধর্ম হইতে সর্বদা পৃথক ছিলেন না। জৈন গ্রন্থে এরূপ অনুসন্ধান পাওয়া যায়, মহাবীর হইতে অষ্ট স্থবিরমহাগিরির শিষ্য জৈন চালুহ্য রোহগুত্ত (Caluya Rohagutta) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। বৈশেষিকের পরমাণুবাদ জৈন ধর্ম গ্রন্থে উহার স্থাপনের অনেক আগে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এটি একটি স্থির সিদ্ধান্ত যে ন্যায় দর্শন জৈন ধর্মের অনেক পরে স্থাপিত হইয়াছে।

জৈন ধর্ম সর্বথা স্বতন্ত্র ধর্ম। আমার বিশ্বাস এই ধর্ম কোনো ধর্মের অনুকরণ নহে। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞানের এবং ধর্ম পদ্ধতির বিষয় অবগত হইতে অভিলাষী তাঁহাদের নিকট এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং মহৎ বস্তু।

জার্মানীর সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত প্রফেসর H. Jacobi কর্তৃক
অক্সফোর্ডে ধর্মেতিহাস পরিষদে পঠিত প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত

---

৫ ন্যায়বিনিশ্চয়ালঙ্কার, ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়, প্রমেয়-কমলমার্তণ্ড, আপ্তমীমাংসালঙ্কৃতি (অষ্ট সহস্রী), আপ্তপরীক্ষা, পরীক্ষামুখ, প্রমেয়-রত্নমালা, শ্লোকবার্তিকালঙ্কার প্রভৃতি অনেক ন্যায় গ্রন্থ বিদ্যমান।

স্থূলভদ্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

সপ্তম দৃশ্য

[আসবাবপত্রহীন কোশার নাচঘর]

সিংহনন্দী ঃ তুমি কোশা ?

কোশা ঃ হাঁ, প্রভু।

সিংহনন্দী ঃ তোমার এখানে চাতুর্মাস্য ব্রতের উদ্‌যাপন করতে এসেছি।

কোশা ঃ সেত আমার ভাগ্য। আজ হতে এক বছর অগে শ্রমণ স্থূলভদ্রও এসেছিলেন। আর আজ আপনি। আপনাদের পাদস্পর্শে এই পতিতার গৃহ পবিত্র হল, ধন্য হল। আপনি কোন ঘরে থাকবেন ?

সিংহনন্দী ঃ যে ঘরে স্থূলভদ্র ছিল।

কোশা ঃ এই সেই ঘর।

সিংহনন্দী ঃ এই সেই ঘর ! কিন্তু সেত নাচঘর ছিল ?

কোশা ঃ এইটাই নাচঘর। আসবাবপত্র আর নেই। সব বিক্রী করে ফেলেছি। তাতে আর আমার প্রয়োজন ছিল না।

সিংহনন্দী ঃ কিন্তু তুমিই কি কোশা ?

কোশা ঃ হাঁ, প্রভু ! আপনি সেই একই প্রশ্ন কেন বারবার করছেন ?—তাতেকি কোনো সন্দেহ আছে ?

সিংহনন্দী ঃ না। তবে এক সময় আমিও এখানকার অধিবাসী ছিলাম কিনা। যদিও তোমাকে দেখবার বা তোমার এখানে আসবার সৌভাগ্য আমার হয় নি তবে তোমার খ্যাতির কথা অনেক শুনেছি। তুমি অসম্ভব রূপবতী ছিলে।

কোশা ঃ আপনি সে কি বলছেন। রূপত গাছের মগডালের আলো। এই আছে, এই নেই।

সিংহনন্দী ঃ সে কথা বোলোনা কোশা, এখনো তোমার গায়ের কাঁটালী চাঁপার রঙ অনেক মল্লকুমারীদের লজ্জা দেবে। তবে তোমার মধ্যে সেই উচ্ছলতা দেখছি না তাই…

কোশা : [মনে মনে, ছি ! ছি !] আপনিত এই ঘরেই থাকবেন ? আমি পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সে আপনার থাকবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেবে।

[কোশার প্রস্থান]

সিংহনন্দী : এই নারী কোশা !' এর ভয় ! হুঁ ! স্থূলভদ্র, তুমি কিছু অসাধ্যসাধন করোনি। অসাধ্যসাধন করেছি আমি পশুরাজ সিংহের গুহার বাহিরে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে। আর এও করে দেখিয়ে দেব যে আমিও কোন অংশে তোমার চাইতে কম নই।

অষ্টম দৃশ্য

[কোশার নাচঘর]

সিংহনন্দী : তোমার স্বামিনি কোথায় ?

পরিচারিকা : তিনি আর্তগৃহে আছেন।

সিংহনন্দী : আর্তগৃহ ? সেখানে তিনি কি করেন ?

পরিচারিকা : আর্ত ও পীড়িতের সেবা। স্থূলভদ্র চলে যাবার পর তিনি তাঁর অলঙ্কার ও আসবাবপত্র বিক্রী করে দিয়ে আর্ত গৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে তিনি দুঃস্থ, আর্ত ও পীড়িতের সেবা করেন।

সিংহনন্দী : তবে তিনি তাঁর কুলব্যবসা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন।

পরিচারিকা : সে অনেক দিন। যে দিন মন্ত্রীপুত্র স্থূলভদ্র প্রথম এখানে আসেন সে দিন হতে। স্বামিনীর মা তাঁকে কত বোঝালেন। বললেন যার যা কুল-ধর্ম, সেই ধর্ম পালন করতে হয়। প্রেমে পড়া রূপোপজীবিনির শোভা পায়না। কিন্তু স্বামিনী কারো কথা কানে নিলেন না। এ তারি পরিণাম।

সিংহনন্দী : কিন্তু আর্তগৃহের ব্যয় তাহলে কী করে চলে ?

পরিচারিকা : এতদিন পূর্ব সঞ্চিত অর্থ দিয়ে চলছিল। এখন ভিক্ষে।

সিংহনন্দী : বুঝেছি। তুমি একবার তাঁকে গিয়ে বল যে আমি ডেকেছি।

পরিচারিকা : যাই বলি। [পরিচারিকার প্রস্থান]

সিংহনন্দী : কোশা ! কোশা ! কোশা ! কিছুতেই তাকে ভুলতে পারি না। তার নাম রিন রিন করে আমার রক্তে, আমার সমস্ত সত্বায়। আগে সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত। এখন একেবারেই আসে না। তার আসবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে আমার সমস্ত দেহ। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা ; এ এক অপূর্ব অনুভূতি। এই অনুভূতির কাছে সব কিছু হেয় মনে হয়।

[কোশার প্রবেশ]

কোশা ঃ প্রভু, আমায় স্মরণ করেছেন।

সিংহনন্দী ঃ হাঁ, কোশা।

কোশা ঃ আদেশ করুন।

সিংহনন্দী ঃ না কোশা, আদেশ নয় ; কিন্তু তার আগে তুমি বল—আগে তুমি এখানে মাঝে মাঝে আসতে, এখন এদিকে আর একেবারেই আসনা। কেন কোশা ?

কোশা ঃ সময় পাইনা প্রভু, অনেক কাজ।

সিংহনন্দী ঃ কাজ তোমার আগেও ছিল।

কোশা ঃ প্রভু !

সিংহনন্দী ঃ শোন কোশা ? কেন তা আমি জানি। কিন্তু কি জান, তুমি না এলে সময় আমার কাটতে চায় না। সব কিছু বিস্বাদ মনে হয়।

কোশা ঃ [মনে মনে] ছিঃ ছিঃ ! কি লজ্জা ! [সিংহনন্দী কোশার মুখের দিকে চেয়ে থাকে] আমায় আর কিছু বলবেন ?

সিংহনন্দী ঃ হাঁ বলব। যে কথাটা অনেকদিন হতে বলব বলব করছিলাম সেই কথাটা আজ বলব। তুমি কি সুন্দর কোশা ! তোমায় দেখে আমার তৃপ্তি হয় না। মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ বছর তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি—

কোশা ঃ প্রভু, আমি যাই। [যাবার উপক্রম]

সিংহনন্দী ঃ [পথ রোধ করে] না, না কোশা, এখুনি তুমি যেয়োনা। শোনো, আমাকে সমস্ত কথা বলতে দাও। আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি।

কোশা ঃ [নিজেকে সংযত করে] আপনি হবেন আমার অতিথি সেত ভাগ্য। কিন্তু আমি গণিকা। ভালবাসার বিনিময়ে গ্রহণ করি দান। স্থূলভদ্র যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিন এই অঙ্গুরীয়ক আমায় দিয়েছিল যার মূল্য এক কোটি নিষ্ক। আর সব বিক্রী করে ফেলেছি। এটি আজো বিক্রী করতে পারিনি। বলুন, আমি আপনাকে পরিচর্যা করব তার বিনিময়ে আপনি কি আমায় দেবেন দান ?

সিংহনন্দী ঃ আমি তোমাকে কি দেব দান ? এবার তুমি আমায় ভাবনায় ফেললে কোশা ! আমি শ্রমণ আমি তোমায় কি দিতে পারি ?

কোশা ঃ কি দিতে পারেন ? হাঁ এক উপায় আছে। শুনেছি, নেপালাধিপতি সাধু শ্রমণদের রত্ন কম্বল দান করেন। সেই কম্বলের একটীরই মূল্য এক কোটি নিষ্ক। সেই কম্বল যদি একটী আপনি এনে দিতে পারেন।

সিংহনন্দী ঃ সে কি আর এমন শক্ত কাজ কোশা ! আমি আজই যাচ্ছি নেপাল। মাস খানেকের মধ্যেই রত্নকম্বল নিয়ে ফিরে আসব। তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি চোখের সামনে রেখে মরতেও আমার ভয় ?

নবম দৃশ্য

[কোশার শয়ন গৃহ]

সিংহনন্দী ঃ কোশা !

কোশা ঃ [ধড়ম্রড় করে উঠে বসে] ওঃ আপনি !

সিংহনন্দী ঃ হ্যাঁ আমি। তুমি কি ভেবেছিলে আমি ফিরব না ! এই নাও তোমার রত্ন কম্বল। তোমার সর্ত পূর্ণ হয়েছে, কোশা।

কোশা ঃ দেখি।

[কোশা রত্ন কম্বল হাতে নিয়ে দেখে ছুঁড়ে ফেলে দেয়]

সিংহনন্দী ঃ তুমি কি পাগল হোলে, কোশা ?···তুমি এত বুদ্ধিহীনা তা জানতাম না। যদি জানতে এর জন্য কি কি কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে, কত পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে আনতে হয়েছে, তবে এভাবে এর অমর্যাদা করতে পারতে না।

কোশা ঃ সি কি আমিও জানতাম শ্রমণ, সমস্ত জীবনে অনন্য সাধনায় যে চারিত্র লাভ করা যায়, সেই চারিত্র এক পতিতা নারীর জন্য ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় এক মুহূর্তে।

সিংহনন্দী ঃ [নিজের ভুল বুঝতে পেরে] সত্যি বলছ কোশা, সত্যি। অন্ধ আমি। এসে দাঁড়িয়েছিলাম এক বিরাট পতনের মুখে। তুমি আমায় বাঁচিয়ে নিলে। স্পর্দ্ধা করেছিলাম কামজিৎ স্থূলভদ্রের সঙ্গে। ভেবেছিলাম তোমার নাচ ঘরে চাতুর্মাস্য ব্রতের উদ্‌যাপন করে সে অসাধ্য সাধন করেনি। অসাধ্য সাধন করেছি আমি পশুরাজ সিংহের গুহার দ্বারে ধ্যান করে। সেই অহমিকা আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। তাই আচার্যের সাবধান বাণী উপেক্ষা করে তোমার এখানে চাতুর্মাস্য ব্রত উদযাপন করতে এসে ছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম আমার মনের অবচেতনে রয়েছে যে শাসন না মানা অবোধ। ভুলে গিয়েছিলাম, পশুরাজের গুহার দ্বারে আর যাই থাক চারিত্র্য পরিক্ষার অবসর ছিলনা। ছিল তোমার ঘরের কুলহারা কামনার ধারে। সেখানে আমার হার হয়েছে। কোশা, কিন্তু তুমি আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছ—তোমাকে আমার শতকোটি প্রণাম। তবে চলি—আচার্য আমায় ক্ষমা করুন। স্থূলভদ্র, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

প্রশ্নোত্তরে জৈন তত্ত্ব

[জৈন তত্ত্ব সংগ্রহ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছে ঃ "এই পুস্তক পণ্ডিত শ্রীউমাচরণ স্মৃতি-রত্ন দ্বারা জৈন ধর্মের প্রশ্নোত্তরমালা রূপে সংগৃহীত হইয়া কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদের ব্যয়ে মুদ্রিত হইল। প্রকৃত তত্ত্ব-বুভুৎসুগণের সহজে বোধগম্য হওয়ার নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বিষয় সমূহ প্রশ্নোত্তররূপে এবং অতি সুসঙ্গত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—যাহাতে পাঠকবর্গের বিরক্তি উৎপন্ন না হয় তন্নিমিত্ত সংক্ষেপাকারে সকল বিষয় গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান, সম্যগ্ চারিত্র প্রভৃতি অতি বিশদভাবে বর্ণিত আছে, এবং জৈন মতে পদার্থ সকলের বিভাগ, অনুবিভাগ স্বল্পাবিস্তর সন্নিবেশিত আছে। শোক, মোহ, দুঃখাদি দ্বারা বদ্ধ জীবগণ কি উপায়ে শোকাদি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে এবং বিশুদ্ধ কর্মানুসমূহের আকর্ষণ দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন ও মুক্তিপথ উদ্‌ঘাটিত হইবে এই পুস্তক পাঠে সুধীগণ সে সকল বিষয় অবগত হইবেন।" জৈন তত্ত্ব সংগ্রহ বর্তমানে পাওয়া যায় না। তাই প্রশ্নোত্তর রূপে ও অতি সুসঙ্গত ভাবে লিপিবদ্ধ গ্রন্থটি 'শ্রমণে'র পৃষ্ঠায় পুন-র্মুদ্রিত করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জৈনধর্ম ও শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসারে আরা নিবাসী স্বর্গীয় কুমার দেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈনের অর্থব্যয়, শ্রম ও আন্তরিকতা স্মরণ না করে পারা যায় না।—সম্পাদক]

১। প্রঃ সাংসারিক জীবমণ্ডলীর আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু কি ?

১। উঃ সুখ ও দুঃখ-মোচন। প্রাণী মাত্রই প্রার্থনা করে আমার সুখ হউক ও দুঃখ না হউক।

২। প্রঃ এমন কোন অবস্থা আছে কি যখন প্রাণীগণকে কখনও আর দুঃখ পাইতে হয় না এবং নিরন্তর তাহারা সুখসাগরে নিমগ্ন থাকিতে পারে ?

২। উঃ আছে। মোক্ষাবস্থা লাভ করিতে পারিলে জীবগণকে আর দুঃখাতিশয্য-পূর্ণ-সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না এবং মোক্ষ প্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত জীব চিরস্থায়ী পরমানন্দে মগ্ন থাকে।

৩। প্রঃ মোক্ষাবস্থা লাভ করা যায় কিরূপে ?

৩। উঃ সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান, সম্যগ্ চারিত্র—এই ধর্মত্রয়কে প্রাপ্ত হইলে। তাই সূত্রকার বলিয়াছেন—সম্যগ্‌দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি-মোক্ষমার্গঃ[১] অর্থাৎ উক্ত ধর্মত্রয়ই

১ তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র (.-১-১)। সম্যগ্ জ্ঞান হইতে মুক্তি বা নির্বাণ সকল দর্শনের সিদ্ধান্ত একরূপ। শব্দতঃ নানা দর্শনের মুক্তি বিভিন্ন হইলেও অর্থতঃ একরূপ।

মোক্ষধাম গমনের মার্গ (পথ) স্বরূপ। (এই ধর্মত্রয় আত্মার অকৃত্রিম স্বভাব বা গুণাত্মক —সেই জন্যই) এই ধর্ম-ত্রয়কে আত্মার স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম বলে।

৪। প্রঃ সম্যগ্ দর্শন কাহাকে বলে ?

৪। উঃ বস্তুর স্বরূপ সহিত জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ,—এই সপ্ত পদার্থের শ্রদ্ধাকে সম্যগ্ দর্শন বলে।

৫। প্রঃ সম্যগ্ দর্শনে কি কি ভেদ আছে ?

৫। উঃ সম্যগ্ দর্শন প্রথমতঃ দুই প্রকারের ঃ (১) নিসর্গজ, (২) অধিগমজ। পরের উপদেশ ব্যতিরেকে স্বভাবতঃ আত্মার যে সম্যগ্ দর্শন হয় তাহাকে 'নিসর্গজ' বলে। আর শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ অনুসারে যে সম্যগ্ দর্শন উৎপন্ন হয় তাহাকে 'অধিগমজ' বলে। নিশ্চয় ও ব্যবহারিক ভেদে সম্যগ্ দর্শন আবার দ্বিবিধ।

৬। প্রঃ নিশ্চয় সম্যগ্ দর্শন কিরূপ ?

৬। উঃ অন্যান্য বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক রূপে জানিতে পারিয়া আত্মাতে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়াকে নিশ্চয় সম্যগ্ দর্শন বলে।

৭। প্রঃ ব্যবহারিক সম্যগ্ দর্শন কি প্রকার ?

৭। উঃ জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ এই সপ্তবিধ পদার্থে দৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রদ্ধাকে ব্যবহারিক সম্যগ্ দর্শন কহে। যথার্থ দেব, যথার্থ গুরু (সদ্‌গুরু), যথার্থ শাস্ত্র এতৎ ত্রিতয়ে শ্রদ্ধা থাকাকেও সম্যগ্ দর্শন বলে ; কারণ সদ্দেব, সদ্‌গুরু ও সচ্ছাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলে উক্ত সপ্ত পদার্থের বিশ্বাস অবশ্যই জন্মে। অর্থাৎ যথার্থ (সৎ) দেব, গুরু ও শাস্ত্রের শ্রদ্ধা এবং পূজা দ্বারা যে উপদেশাদি লাভ হয়, তাহাতেই পূর্বোক্ত সপ্ত পদার্থে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়।

৮। প্রঃ যথার্থ (সৎ) দেব কাহাকে বলে ?

৮। উঃ যিনি বীতরাগ, সর্বজ্ঞ এবং হিতোপদেশক বা প্রাণীগণের হিত সাধনকারী তাঁহাকে যথার্থ দেব বা আপ্ত বলে।

৯। প্রঃ বীতরাগ কাহাকে বলে ?

৯। উঃ যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, জন্ম, মরণ, বার্দ্ধক্য, রোগ, ভয়, গর্ব, রাগ, দ্বেষ, মোহ, চিন্তা, রতি, অরতি, খেদ, স্বেদ, আশ্চর্য এই অষ্টাদশ প্রকার দোষ হইতে বিমুক্ত[২] তাঁহাকে বীতরাগ বা বীতরাগী বলে।

১০। প্রঃ সর্বজ্ঞ কাহার নাম ?

১০। উঃ যিনি সমস্ত পদার্থের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই ত্রৈকালিক যাবতীয় বৃত্তান্ত

২ অর্থাৎ যিনি ক্ষুধাদি দ্বারা কাতর হন না 'বীতরাগ জন্মাদর্শনাৎ'—ন্যায়দর্শনের মতে বীতরাগের জন্মমরণাদি নাই।

সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে অবগত আছেন, যাঁহার অবিদিত কিছু নাই তাঁহাকে 'সর্বজ্ঞ' বলিয়া জানিবে।

১১। প্রঃ হিতোপদেশক কাহাকে কহে ?

১১। উঃ যাঁহার উপদেশ দ্বারা দেব, মনুষ্য, তির্ধক, নারকী এই চতুর্গতিসম্পন্ন প্রাণীমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও অমঙ্গল সাধিত হয় না, অথচ সমস্ত জীবেরই কল্যাণ উৎপাদিত হয়, তাঁহাকে হিতোপদেশক কহে।

১২। প্রঃ উক্ত বীতরাগত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, হিতোপদেশকত্ব, এতদ্গুণত্রয় বিশিষ্ট যথার্থ দেব কে ?

১২। উঃ চতুর্বিংশতি তীর্থংকর। বর্তমানকল্পে ভারতবর্ষে চব্বিশ তীর্থংকর হইয়াছেন, ইঁহারাই যথার্থ দেব বলিয়া অভিহিত হন।

১৩ প্রঃ ভারতক্ষেত্রের চতুর্বিংশতি তীর্থংকরের নাম কি ?

১৩। উঃ (১) শ্রীঋষভদেব, (২) অজিতনাথ. (৩) সম্ভবনাথ, (৪) অভিনন্দন নাথ, (৫) সুমতিনাথ, (৬) পদ্মপ্রভ, (৭) সুপার্শ্বনাথ, (৮) চন্দ্রপ্রভ, (৯) পুষ্পদন্ত, (১০) শীতলনাথ, (১১) শ্রেয়াংশনাথ, (১২) বাসুপূজ্য, (১৩) বিমলনাথ, (১৪) অনন্তনাথ, (১৫) ধর্মনাথ, (১৬) শান্তিনাথ, (১৭) কুন্থুনাথ, (১৮) অরনাথ, (১৯) মল্লিনাথ, (২০) মুনিসুব্রত, (২১) নমিনাথ. (২২) নেমিনাথ, (২৩) পার্শ্বনাথ, (২৪) বর্দ্ধমান বা মহাবীর।

১৪। প্রঃ যথার্থ গুরুর লক্ষণ কি ?

১৪। উঃ যে মহাত্মা ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয়রূপ কুহকীর মোহ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মায়াবিনী ভোগ বাসনার কঠিন প্রেমশৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত, যাঁহার কোন প্রকার হিংসা নাই, যিনি দশবিধ বাহ্যপরিগ্রহ ও চতুর্দশ অন্তরঙ্গ পরিগ্রহ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, যাঁহার চিত্ত প্রতিনিয়ত তপস্যা, জ্ঞান, ধ্যান, ধারণাদি ধর্মকর্মে নিমগ্ন তাদৃশ সম্যগ্ দর্শনাদি বিশিষ্ট পুরুষ পুঙ্গবই যথার্থ গুরু বা সদ্গুরু।

[ক্রমশঃ

স্মৃতি চারণ

মুনি জিন বিজয়

১৯২৯ এর ডিসেম্বর মাসে আমি জার্মানী হতে ফিরে আসি ও লাহোর কংগ্রেসে দ্রষ্টারূপে উপস্থিত হই। যদিও জার্মানী যাবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যিক কাজে বিশেষ ধরণের ও অধিক যোগ্যতা লাভ করা কিন্তু সে বিষয়ে আমি সেখানে কোন অনপেক্ষিত বা অজ্ঞাত বস্তু দেখতে পেলাম না। কিন্তু তৎকালীন সেখানকার সমাজবাদী, সাম্যবাদী, অরাজকবাদী আদি সিদ্ধান্তের আবহাওয়া আমার মূল লক্ষ্যকেই শিথিল করে দিল এবং আমি সেই সব বিচার ও আন্দোলনের ছাত্র হয়ে গেলাম। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বহুবিধ বিদ্বানের সেখানে অত্যধিক সম্পর্কে আসার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়ায় আমার চিন্তাধারাতেও অনেক কিছু বিপ্লব ঘটে গেল। জীবনের চলমান প্রবাহে জিজ্ঞাসা রূপে আর্বতের সৃষ্টি হতে থাকল। সাহিত্যিক সংশোধন ও সম্পাদনের কাজে শিথিলতা এল। নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতা ও অর্থহীন ধার্মিকতা সম্বন্ধে উদ্বেগ দেখা দিল। জীবনকে অন্য কোনো খাতে প্রবাহিত করবার ইচ্ছা মনে তরঙ্গিত হতে থাকল। এই বিক্ষুব্ধ মনোভাব নিয়ে আমি জার্মানী হতে এখানে ফিরে এলাম ও শুষ্ক সাহিত্য সেবার চাইতে কোন সজীব সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জাগৃতির কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। কংগ্রেস হতে পুনরায় আহমদাবাদে ফিরে এলাম ও নিজের মনের নূতন ইচ্ছানুকূল কার্য ক্ষেত্রের বিষয় চিন্তা করতে লাগলাম। এক একবার বিদেশে ফিরে যাবার কথাও ভাবছিলাম। সেখানে কোন কেন্দ্র যার বীজ বার্লিনে বপন করে এসেছিলাম স্থাপন করবার কথাও মনে হচ্ছিল।

লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারে দেশের স্বরাজ্য সিদ্ধির জন্য কোন জোরদার আন্দোলন প্রারম্ভ করার কথা মহাত্মা গান্ধী চিন্তা করছিলেন যার জন্য দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন বেশ গরম ছিল। একদিন আমি এমনি মহাত্মাজীর কাছে আমার আবার বিদেশ যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, এখনত আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য জোরদার আন্দোলনের সূত্রপাত করতে হবে এবং তাতে তোমার মত বিদ্যাপীঠের সেবকদের অগ্রগামী ভূমিকা নিতে হবে। এই সময় দেশই নিজের কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত না বিদেশ ইত্যাদি। মহাত্মাজীর কথা শুনে আমি চুপ করে গেলাম এবং পুনরায় বিদেশ যাবার ইচ্ছাকে মন হতে দূরে করতে লাগলাম।

মার্চ মাসে পাটনা হতে কয়েকজন জৈন সজ্জনের আগ্রহ পূর্ণ আমন্ত্রণ পত্র পেলাম। —শ্রীবাহাদুর সিংজী সিংঘী তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

শ্রীসিংঘীজী অনেকদিন হতেই তাঁর স্বর্গত পিতা পুণ্যশ্লোক ডালচাঁদজী সিংঘীর স্মৃতিরক্ষার্থ গবেষণা মূলক কোনো ভালো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার কথা চিন্তা করছিলেন কিন্তু তার জন্য তিনি কোনো উপযুক্ত পরামর্শদাতা বা সংগঠক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীসুখলালজীর নিকট তিনি আমার আহমদাবাদস্থিত পুরাতত্ত্বমন্দিরের কাজ ও তারপর বিদেশ গমনাদি বিষয় নিয়মিত অবগত হতে থাকতেন। আমি বিদেশ হতে ফিরে এসেছি শুনে ও পণ্ডিতজীর সমর্থন পেয়ে সিংঘীজীর এমন ইচ্ছা হল যে আমি কলকাতা বা ঐদিকেই কোনো জায়গায় গিয়ে বসি ও এই কাজ গ্রহণ করি। এই সম্পর্কে সাক্ষাৎ বিচার বিনিময় হতে পারবে ভেবে আমি পাটনা চলে এলাম। কিন্তু আমার পাটনা পৌঁছবার আগেই হঠাৎ কোনো জরুরী কাজের জন্য সিংঘীজীকে কলকাতা চলে যেতে হল। তাই সেখানে আমাদের সাক্ষাৎ হল না।

…আমি যখন পাটনায় ছিলাম তখন একদিন কলকাতা হতে সিংঘীজীর টেলিগ্রাম পেলাম যাতে তিনি কমপক্ষে একদিনের জন্যও আমি কলকাতা যাই সেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমারও তাঁর সঙ্গে দেখা করার ছিলই তাই কলকাতা যাওয়াই স্থির করলাম।

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

চতুর্থ খণ্ড

॥ ১ ॥

বৈশ্রমণ সার্থবাহের ঘরে যখন ধনদেব কুমারের জন্ম হল তখন বৈশ্রমণ যক্ষোপাসনার ফল বলেই তাকে গ্রহণ করলেন। বৈশ্রমণ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীদেবী অনেক দিন হতেই পুত্র কামনায় যক্ষের পূজো করে আসছিলেন তাই যখন তাঁরা পুত্র লাভ করলেন তা যক্ষের দয়া বলেই ধরে নিলেন ও তার নামও যক্ষের নামানুসারে ধনদেব রাখলেন। যক্ষ কৃপার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাঁরা তাঁদের পূর্বজন্মের সুকৃতিও যে এর পেছনে কাজ করেছে তাও মনে করলেন। ধনদেব যেই কিছু বড় হল ও অন্য বালকদের সঙ্গে খেলাধূলো করতে আরম্ভ করল তখন তার প্রকৃতি একটু বিচিত্র বলে তাঁদের মনে হল। তাঁরা দেখলেন ধনদেব প্রায়শঃই নিজের কোনো নূতন ও মূল্যবান কাপড়, গয়না বা খেলনা হারিয়েই ঘরে আসে, হয়ত কেউ তার কাছ হতে তা কেড়ে নেয়। কিন্তু সে তার কোনো প্রতিকার করে না। এতে মনে হল যে সে স্বভাবতঃই দুর্বল বা ভীতু। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে সুন্দর কাপড় গহণাদিতে ধনদেবের কোনো মোহ নেই ; অন্য কেউ যদি তা তার কাছে চায় ত তা দিয়ে দিতে তার একটুও সংকোচ হয় না। তখন তার মা বাবার মনে হল যে তাদের ঘরে যক্ষ কৃপায় কোনো মহা পুণ্যশালী জীব জন্ম গ্রহণ করেছে। সেদিন হতে ধনদেব কুমার কেবল মাত্র তাঁদের স্নেহ পাত্রই রইল না, আদর ও সম্মানের অধিকারীও হয়ে উঠল।

ধনদেব কুমার যখন আরো একটু বড় হল তখন তার স্বভাবে আবার এক পরিবর্তন দেখা দিল। আগের মত চাওয়া মাত্রই এখন সে অকারণে আর কোনো কিছু দেয় না, বাধ্য হলেই তবে দেয়। দীন দরিদ্রের অন্নবস্ত্র দিতে তার আনন্দই ছিল কিন্তু দান দেবার সময় কে যেন তার হাত ধরে নিত বা ভেতরে ভেতরে মানা করত এরকম মনে হত। ধনদেবের বাপ মা বা অন্য গুরুজন তাকে দান করতে মানা করেছেন তা নয়, বরং তাঁরা এতে খুশীই হতেন। পূর্বজন্মের পুণ্যের জন্যই যদি ধনদেব তাঁদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে ও অন্ন ও বস্ত্র দিয়ে আনন্দ পায় তবে সে আনন্দ তাকে পেতে দেওয়া হোক এই ছিল তাঁদের মনো-

ভাব। তাহলে ধনদেব কঞ্জুষ কি করে হয়ে গেল? তার মুখের সদা প্রফুল্ল ভাব কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল? সে কথা তার নিকটবর্তী বন্ধুরা বা গুরুজনেরা কেউই বুঝতে পারলেন না।

একদিন ধনদেব রাজপথে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক তার সামনের এক বিরাট সৌধের জানালায় বসে এক শ্রেষ্ঠী দীন দুঃখী পঙ্গু ও বৃদ্ধদের তাদের প্রয়োজন মত অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করছিলেন। ক্ষুধা পীড়িত কাঙ্গালেরা প্রয়োজন মত অন্ন ও বস্ত্র প্রাপ্ত হয়ে যখন ফিরছিল তখন তাদের মুখের ওপর যে আনন্দ নৃত্য করছিল ধনদেব তা গভীর তন্ময়তা নিয়ে দেখছিল আর না জানি কোন গভীর চিন্তায় নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছিল। এমন সময় তার এক বন্ধু সোমদেব এসে তাকে জাগৃত করল ও বলল, আজ কার্তিকী পূর্ণিমা। আমি ভেবেছিলাম তুমি কোনো উদ্যানে বা রঙ্গ শালায় গেছ। এই কাঙ্গালদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তুমি কি দেখছ?

ধনদেব সোমদেবের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। তার জিভও একটু যেন নড়ল কিন্তু তার মনে হল তার অন্তর বেদনা সোমদেব ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে না। তবুও ধনদেব, এইমাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে সেই ভাবে সংক্ষেপে বলে উঠল, এই দীন দরিদ্রের মুখে যে আনন্দ রেখা ফুটে ওঠে তার সামনে জগতের সমস্ত আনন্দ উল্লাস কৃত্রিম বলে মনে হয়। তাই যখনই এই দৃশ্য দেখতে পাই তখনই দাঁড়িয়ে পড়ি। চোখ ও মনের এই বাসনা কখনো যেন তৃপ্তই হয় না।

তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে ঘরে বসেই গরীবদের দান দিয়ে আনন্দ পেতে পার। —মাঝখানে সোমদেব বলে উঠল। জীবন ভর যদি খরচ করো তবু তা ফুরোবে না এত ঐশ্বর্য তোমার পিতা সংগ্রহ করেছেন। তোমাকে কি কেউ দান করতে মানা করেছে?

ধনদেব এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসই তার একমাত্র উত্তর এরূপ ভেবে সে চুপ করে গেল। তার বেশী কিছু বলতে তার কেমন যেন সংকোচ করতে লাগল। না জানি কিছু বলতে গিয়ে সে পিতামাতার মনে কষ্ট দিতে পারে। তবু সোমদেবের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত তাকে বলতেই হল, পিতার উপার্জিত অর্থে আমার কি অধিকার? পিতার সম্পত্তি আমি দান করি তাতেই বা কি পুরুষার্থ?

সোমদেব ধনদেবকে বুঝল কিনা তা কে বলতে পারে কিন্তু ধনদেব যে নিজের পুরুষার্থ প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ও নিজের শ্রমোপার্জিত অর্থ দান করতে চায় তা এ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। সোমদেব এর মধ্যে ধনদেবের সরলতাই দেখতে পেল, আর কিছু নয়।

বৈশ্রমণ সার্থবাহ বিদেশ যাত্রা করেই এই ধন একত্রিত করেছিলেন এবং এ ধন এক দিন ধনদেবই লাভ করবে। ধনদেবও তা জানত। কিন্তু যখন সে বড় হল তখন তার মনে হল পিতার মত সাহস করে বিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হয়ে যত দিন না সে নিজে

ধন উপার্জন করছে ততদিন তা সে অকাতরে দান করতে পারে না। পিতার ধন দান করে দানী হওয়া সস্তায় খ্যাতি লাভের মত তার মনে হল। যদিও তার বন্ধুবান্ধবদের সকলেই পিতার ধনে বিলাসব্যসন করত তবু তাতে তাদের কাঙালীপনাই তার চোখে পড়ত। তা-ই দান বা ত্যাগ করা যায় যার ওপর নিজের নৈতিক অধিকার আছে। পিতার ধনকে নিজের বলতে তার মন সায় দিচ্ছিল না এবং একথা স্পষ্ট করে বলতেও তার সংকোচ হচ্ছিল।

সোমদেব ও ধনদেব সেদিন এক সঙ্গেই ঘরে ফিরল। ধনদেবের সেই উক্তি ধীরে ধীরে বৈশ্রমণের কানে গিয়েও পড়ল। পুত্রের উদাসীনতার কারণ তখন তিনি বুঝতে পারলেন। সার্থবাহের পুত্রত সার্থবাহই হবে। এতে তাঁর কিছু অযৌক্তিক মনে হল না এবং ধনদেবকে বিদেশ যাত্রার অনুমতি দিতে তাঁর কোনো বাধাও ছিল না।

কিন্তু সে যুগে যাতায়াত এত সুগম ছিল না। তাই বহু লোক একত্রিত হয়েই সেকালে বিদেশযাত্রা করত। এবং যাত্রা করলেই যে তারা নির্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছবে তাও নয়; দস্যু তস্করের উপদ্রবত পথে ছিলই।

কিন্তু ধনদেবের সার্থবাহ হবার সাধ পূর্ণ হল। দু'মাসের রসদ ও বিরাট সংঘ নিয়ে পিতামাতার সহযোগিতায় তাম্রলিপ্ত নগরীতে বাণিজ্য করতে যাবার জন্য সে একদিন বেরিয়ে পড়ল। সেই নগরের অনেক ব্যবসায়ী তার সঙ্গ নিলেন। ধনদেবের স্ত্রী ধনশ্রী ও তার এক আত্মীয় মিত্র নন্দনও তার সঙ্গে গেল।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

  জৈন ভবন

  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

  ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র

  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

Vol. IV No. 4 : [illegible]n August 1976
Registered with the Reg[illegible] of Newspapers for India
under No. [illegible] 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :

"এই সুন্দর বইখানি বাংলা ভাষায় একটি ক্ষুদ্র সম্পদ হইয়াছে। জৈনধর্ম, অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু বই বাংলা ভাষায় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এইরূপ উপাখ্যান সংগ্রহ আমি আগে দেখি নাই।...এই ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল চলিত বাংলায় লিখিত 'অতিমুক্ত' বইখানি, বোধহয়, রসোত্তীর্ণ জৈন উপাখ্যান-সাহিত্যকে বিদগ্ধ-জনসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস।"

মূল্য : চার টাকা

পরিবেশক :
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২/১ কলেজ স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

ভাদ্র । ১৩৮৩ চতুর্থ বর্ষ । পঞ্চম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮৩ ॥ পঞ্চম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

শান্তিনাথ, মাণ্ডোইল, দিনাজপুর
খৃষ্টীয় ১১ শতক

জৈন ধর্মের বৈশিষ্ট্য

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সর্বপ্রথম যখন জৈনধর্মের আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে আমি জৈন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি তখন আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়াছিলেন—'বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ বিবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন জৈনধর্ম সম্বন্ধে তাদৃশ প্রচুর আলোচনা হয় নাই সত্য, তবে জৈনধর্মে আলোচনা করিবার উপযোগী তেমন বিশিষ্ট original বা মৌলিক কোন বিষয় আছে বলিয়া মনে হয় না।' বর্তমান পর্যন্ত আমি জৈনধর্মাবলম্বিগণের বিশাল শাস্ত্রীয় গ্রন্থভাণ্ডারের মধ্য হইতে অতি অল্প যে কয়েকখানি সংস্কৃত বা প্রাকৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইয়াছি তাহাতেই আমার একরূপ দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে আমার পূর্বোক্ত বন্ধুগণের অভিমত আদৌ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী জৈনধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন তাহা তাঁহাদের জৈনধর্ম সম্বন্ধে তাদৃশ আলোচনার অভাবই সূচিত করে। ফলতঃ যে কোন ব্যক্তি পক্ষপাতশূন্য চিত্তে স্থিরভাবে জৈনদিগের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে তাহাদের মধ্যে বুঝিবার ও ভাবিবার বহু জিনিষ রহিয়াছে—বুঝিবেন, জৈন শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ কেবল প্রাচীন পূর্ব-প্রচলিত মত ও ভাব সমূহের চর্বিত চর্বণ বা পিষ্ট পেষণের ফল নহে, তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারা এবং মৌলিক গবেষণার বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন শাস্ত্রের সেই সকল স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে স্থূলভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে। জৈনধর্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বর্তমান লেখকের কোনও পক্ষপাতের আশঙ্কা করিবার কারণ নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার মতগুলি সাধারণের আলোচ্য বিষয় হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, ক্ষুদ্র প্রবন্ধের দীর্ঘ মুখবন্ধ না করিয়া এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

জৈনধর্মের—জৈন দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হইল স্যাদ্‌বাদ। বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য দার্শনিকগণ এই যে নবীন পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা সত্য সত্যই তাঁহাদের অসাধারণ চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করে। জৈন দার্শনিকগণ

স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কোন বস্তু সম্বন্ধেই কোন একটী মাত্র ধর্মের আরোপ করিলে এ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না ; বিভিন্ন দিক (stand point) হইতে দেখিলে একই বস্তুতে বিভিন্ন রূপ ধর্মের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি কোন একটি দিক হইতে দেখিয়া বস্তু বিশেষে কোন একটি ধর্মের আরোপ করিলাম। কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়া সেই বস্তু বিশেষেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্মের আরোপ করিতে পারেন। ইহাতে আমাদের দুইজনের মধ্যে কাহারও মত সম্পূর্ণরূপে ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে না। অবশ্য সত্য কথা বলিতে গেলে, এরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ দুইজনের মধ্যে কাহারও মত সম্পূর্ণ নিছক সত্যও হইতে পারেনা।

একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য সরল হইয়া আসিবে। কোনও মধ্যমাকৃতি, পুরুষকে দেখিয়া কেহ তাঁহাকে এক ক্ষুদ্র বালকের সহিত তুলনা করিয়া বলিল, তিনি দীর্ঘ। অপর একজন এক অতি দীর্ঘ পুরুষের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া বলিল তিনি দীর্ঘ নহেন। এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই দুই ব্যক্তির কাহারও উক্তি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও সম্পূর্ণ ভ্রান্তও নহে। দেখা যাইতেছে দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব আপেক্ষিক ধর্ম—একের অপেক্ষায় যাহা দীর্ঘ, অপরের অপেক্ষায় তাহাই হ্রস্ব। সুতরাং বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে এই অপেক্ষা দৃষ্টিতেই তাহার বিচার করিতে হইবে—অপেক্ষা দৃষ্টিতে বিচার না করিয়া কোন একটির উপর—একমাত্র ধর্মের উপর আগ্রহ রাখিলে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ কখনই নির্ণীত হইতে পারেনা।

অপেক্ষা দৃষ্টিতে বা তুলনাত্মক পদ্ধতিতে বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা না করিলে উহা আংশিকরূপে নির্ণীত হইতে পারে বটে কিন্তু কখনই পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারেনা। এই বিষয়টি সম্যক্ অবধারণ করিয়াই জৈন দার্শনিকগণ 'স্যাদ্‌বাদ' বা 'অনেকান্তবাদে'র অবতারণা করিলেন। এই মতানুসারে কোন বস্তুকে একটিমাত্র বিশেষণে বিশেষিত করিলে বা উহাতে একটিমাত্র ধর্মের আরোপ করিলে উহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হইল না ; সুতরাং যে কোনও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে তুলনাত্মক পদ্ধতিতে বা অপেক্ষা দৃষ্টিতেই উহার সম্বন্ধে বিচার করা সঙ্গত। ইহাই হইল স্যাদ্‌বাদের মূল তত্ত্ব। স্যাদ্‌বাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইবে না। জৈন দার্শনিকগণ স্যাদ্‌বাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিবিধগ্রন্থে নানারূপ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠক এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে স্যাদ্‌বাদ মঞ্জরী, সপ্তভঙ্গী তরঙ্গিনী প্রভৃতি স্যাদ্‌বাদ বিষয়ক গ্রন্থ আলোচনা করিতে পারেন।

স্যাদ্‌বাদ সম্বন্ধে যে স্বল্প পরিচয় প্রদান করা হইল তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে উহা যে ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা নিতান্ত অদৃঢ় নহে। বস্তুতঃ যে যুক্তি-

বাদের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অতি সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং স্যাদ্‌বাদের মূলীভূত এই সকল যুক্তি পরম্পরার দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে প্রশংসা করা বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

হয়ত স্যাদ্‌বাদের চিন্তা প্রণালীর অনুরূপ চিন্তা প্রণালীর সূচনা প্রাচীন উপনিষদে বা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] তথাপি জৈন দার্শনিক গণই সর্বপ্রথমে ইহাকে নবীন আকারে জন সমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব, চিন্তাশীলতা ও মনস্বীতা বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

তাহার পর, সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যবহার জগতেই হউক বা দার্শনিক বিচারেই হউক, প্রত্যক্ষতঃ এই স্যাদ্‌বাদের প্রামাণ্য স্বীকার করি আর নাই করি, ইহার প্রবর্তিত মতবাদের অনুসারে জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। ব্যবহার জগতেও যে অপেক্ষা দৃষ্টিতে বস্তুর স্বরূপ বিচার করা সঙ্গত তাহা স্যাদ্‌বাদ বর্ণন প্রসঙ্গে যে উদাহরণ দিয়াছি তাহা হইতেই বুঝা যায়।

আবার, ন্যায়াদি দর্শনে স্যাদ্‌বাদের প্রামাণ্য স্বীকৃত না হইলেও স্যাদ্‌বাদের যাহা ফল তাহা উহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। উপাধি ভেদে একই বস্তুতে বিভিন্ন ধর্মের সদভাব নৈয়ায়িকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন; পরমাণু তাঁহাদের মতে নিত্য হইলেও পরমাণুসমষ্টি অনিত্য—জলীয় পরমাণু নিত্য বটে তবে জলীয় পরমাণুসমষ্টি রূপ যে জল পদার্থ তাহা অনিত্য—একথা তাঁহারা অবাধে স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্যকার পুরুষকে মুক্ত, অসংসারী বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রকৃতি সম্পর্কে তাহার বদ্ধাবস্থা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। বৈদান্তিক নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাসনার অতীত বলিয়া মানিলেও সগুণ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব ও ব্যবহারিকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এই যে একটি বস্তুতে উপাধি ভেদে বিভিন্ন ধর্মের আরোপ ইহা স্যাদ্‌বাদের প্রতিকূল হওয়া ত দূরের কথা—স্যাদ্‌বাদ এই সত্য প্রচার করিবার জন্যই ত আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং স্যাদ্‌বাদের প্রামাণ্য স্বীকার করুন আর নাই করুন স্যাদ্‌বাদের প্রচারিত যে সত্য—স্যাদ্‌বাদের যাহা মূল তত্ব তাহা সকল দার্শনিককেই মানিয়া লইতে হইয়াছে এবং ব্যবহারিক জগতেও সকল বিচার বিষয়েই সেই তত্ব আবহমান কাল হইতে মানিয়া আসিতে হইতেছে। জৈন দার্শনিক সেই অখণ্ড সত্যকে (Universal truth) ভাষায় প্রকাশিত করিয়া নবীন স্যাদ্‌বাদের অবতারণা দ্বারা যে কীর্তি ও যে গৌরব অর্জন করিয়াছেন তাহা সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধার বিষয়।

১ জৈন দর্শনে স্যাদ্‌বাদ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১, পৃ, ৬-৮।

সত্য বটে, দার্শনিক প্রবর শঙ্করাচার্য স্বীয় বেদান্ত ভাষ্যে স্যাদ্‌বাদকে খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—সত্য বটে, জৈনেতর বহু দার্শনিকই ইহার প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয় তাঁহাদের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। দার্শনিক কুলচূড়ামণি শঙ্করাচার্য স্যাদ্‌বাদ বুঝিতে পারেন নাই এরূপ কথা বলা উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে একথা ঠিক যে হয়ত তিনি স্যাদ্‌বাদের পূর্ণ আলোচনা করেন নাই, অথবা আলোচনা করিলেও উহার পূর্ণতত্ত্ব বিরোধির মতবাদ বলিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থে স্থান দেন নাই এবং সাধারণের দৃষ্টিতে উহাকে দোষদুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন।

ফলতঃ, শঙ্করাচার্যকৃত স্যাদ্‌বাদ খণ্ডন যে সফল হয় নাই তাহা যে কেহ স্যাদ্‌বাদের আলোচনা করিবেন তিনিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।[২] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে শঙ্করাচার্য স্যাদ্‌বাদ খণ্ডন করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছেন তাঁহারই গ্রন্থমধ্যে স্যাদ্‌বাদের চিন্তা প্রণালীর অনুরূপ ধারা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, ইহা স্যাদ্‌বাদ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত।[৩]

ভারতীয় সমস্ত দর্শনই (একমাত্র চার্বাক দর্শন ছাড়া) মোক্ষের উপায় আলোচনা ও নির্দেশ করিবার জন্যই উদ্‌ভূত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই জন্য এই সকল দর্শনই ধর্মপরতন্ত্র—ইহাদের মধ্যে কেহ বা বেদোদিত ধর্মের অনুমোদিত বিষয়ালোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছে—কেহবা বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ধর্মোৎকর্ষের উপায় অনুধাবনে যত্নবান হইয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সকলেরই অনেকটা অনুরূপ।

জৈন দর্শন সম্বন্ধেও উপরিলিখিত উক্তি প্রযোজ্য। জৈন দর্শনও জৈনাগম সম্মত মোক্ষোপায় নির্দেশ করিবার জন্যই প্রণীত হইয়াছিল। উহার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত স্যাদ্‌বাদ জৈন পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিলেও উহা সেই মোক্ষ লাভের উপায় রূপেই আলোচিত হইয়াছে—কেবল বাহ্যিক জগতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার জন্য উহা আদৌ বিরচিত হয় নাই। মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে জীবাদিতত্ত্বের পূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় আর সেই জীবাদির যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে স্যাদ্‌বাদের উপযোগিতা কতদূর তাহা ইতঃপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং মোক্ষ বিষয়ে স্যাদ্‌বাদের মুখ্য উপযোগিতার জন্যই ইহাকে জৈন ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করা হইল। স্যাদ্‌বাদ খণ্ডন বিষয়ে জৈনেতর দার্শনিকগণের একান্ত আগ্রহও ইহার বৈশিষ্ট্যের বিষয়ই সূচিত করে। যাহার

---

২ স্যাদ্‌বাদ আলোচনা করিয়া মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা, স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ শঙ্করাচার্যকৃত স্যাদ্‌বাদ খণ্ডন-প্রয়াসকে পণ্ডশ্রম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যার্থদর্পণ, অজিতকুমার শাস্ত্রী, পৃঃ ৪-৪২।

৩। জৈন দর্শনে স্যাদ্‌বাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩১, পৃঃ ৭-৮।

কোনও বৈশিষ্ট্য নাই বা যাহা অতি নগণ্য তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য পণ্ডিত সমাজে এত প্রয়াস দেখা যায় না।

জৈন ধর্মের অপর বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই অহিংসার কথা মনে উদিত হয়। অবশ্য জগতে বোধ হয় এমন কোন ধর্মই নাই যাহাতে অহিংসার আদর করা হয় নাই—আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঘোর হিংসাময় হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রেও অহিংসার ভূয়সী প্রশংসার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক ধর্মে অহিংসাকে অতি উচ্চ স্থানই প্রদান করা হইয়াছে। বেদমতাবলম্বী মহর্ষি পতঞ্জলি অহিংসার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিয়াছেন—যাঁহার হৃদয়ে অহিংসার ভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহার সম্মুখে হিংস্র জীবও বৈরভাব পরিত্যাগ করেন।[৪] অহিংসার এমনই মাহাত্ম্য। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রেও অহিংসার স্থান অতি উচ্চেই কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু জৈনশাস্ত্রে অহিংসার আসন কেবল অতি উচ্চস্থানে স্থাপিত হইয়াছে তাহা নহে, অহিংসার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য ঐ শাস্ত্রে যে প্রকার অবলম্বিত হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই বিস্ময় উৎপাদন করে। কোন চিত্তবৃত্তি হইতে হিংসার সূত্রপাত হয় —অহিংসা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কোন চিত্তবৃত্তি দমন করিতে হয়—কত উপায়ে কত প্রকার হিংসা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—হিংসার কার্য করিয়াও অনেকে কিরূপে অহিংস বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন এবং কি কারণেই বা কার্যতঃ হিংসার অনুষ্ঠান না করিয়াও কেহ কেহ হিংসাদোষে দুষ্ট হইয়া থাকেন—যে চিত্তবৃত্তি হৃদয়ে হিংসার বীজ উপ্ত করিয়া থাকে, হিংসার অনুষ্ঠান দূরীভূত করিতে হইলে সর্বাগ্রে সর্বপ্রযত্নে সেই চিত্ত বৃত্তি দমন করাই প্রধান কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়গুলি যেভাবে জৈন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহা একদিকে যেমন জৈন শাস্ত্রকারের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দেয় অপর দিকে তেমনিই পাঠকের হৃদয় অহিংসার দিকে আকৃষ্ট করে।[৫] আমার মনে হয় হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন অথবা অন্য ধর্মাবলম্বীই হউন প্রত্যেকের পক্ষেই জৈন শাস্ত্রের যে অংশে হিংসা ও ও অহিংসার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে সেই অংশ পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। এই অংশে সাম্প্রদায়িকতা বা কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। সুতরাং এই অংশ পাঠ করিলে কাহারও স্বধর্মের প্রতি কোনরূপ বিরাগ উপস্থিত হইবার আশঙ্কাও করা যায় না। পক্ষান্তরে ইহার অধ্যয়নে হৃদয়ে অহিংসার মহনীয়ত্ব স্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠে। মনোবিজ্ঞানের (Psychology) দিক হইতে দেখিলেও এই অংশ দর্শন জগতে অতি উচ্চস্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪ অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ, যোগসূত্র, ২।৩৫।

৫ এই এই বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহারা 'পুরুষার্থ সিদ্ধ্যুপায়' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ করিলেই সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

দুঃখের বিষয় অনেকে জৈন শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া জৈন শাস্ত্রোক্ত অহিংসাব্রতকে অতি কঠোর এবং সমাজের পক্ষে অহিতকারক বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ অহিংসার এই আদর্শকেই ভারতের অধঃপতনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। জৈনশাস্ত্রের তাৎপর্য আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় জৈন শাস্ত্র বর্ণিত অহিংসা সম্বন্ধে ঐ সকল ধারণা সত্য নহে—উহারা সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত। ইতিহাসও এই ধারণা ভ্রমপূর্ণ বলিয়াই প্রমাণ করে। অহিংসাকেই জীবনের আদর্শ করিয়াও জৈন ধর্মাবলম্বী অমোঘবর্ষ প্রভৃতি কতিপয় রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতি এবং অন্যান্য রাজসমূহ বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে ইহলোকে প্রচুর উন্নতি লাভ করিয়া বিপুল খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অহিংসাব্রত তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয় নাই।

অহিংসার মহনীয় উচ্চ আদর্শ জৈন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে সত্য কিন্তু ঐ আদর্শের অনুরূপ কার্য করা যে সমাজের সকল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর বা ঐ আদর্শ লাভ করিবার জন্য প্রথম হইতেই সর্ববিধ হিংসা পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত একথা জৈনশাস্ত্রকারগণ মনে করেন নাই। ক্রমিক উন্নতিই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল।

[ক্রমশঃ

স্মৃতি চারণ

মুনি জিন বিজয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

পাটনা-সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন হয়ে কলকাতা যাবার সময় পথের মধ্যে শান্তিনিকেতন পড়ে। বিশ্বভারতীর জন্য বিশ্বের সংস্কৃতিপ্রিয় জনপদে সুপরিচিত ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বাসভূমি রূপে পবিত্র এই তীর্থস্থান দেখবার বাসনাও অনেকদিন হতেই ছিল কিন্তু তা সফল করার এতদিন কোনো সুযোগ পাইনি। কিন্তু এবার কলকাতা যাবার সময় সেই অবসর অনায়াসই এসে উপস্থিত হল। আমি একদিনের জন্য বোলপুর স্টেশনে নেমে শান্তিনিকেতন হয়ে এলাম। আমার চিরপরিচিত সহৃদয় ও সদ্বন্ধু আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন তখন সেখানেই ছিলেন। কিন্তু গুরুদেব তখন কোথাও গিয়েছিলেন তাই তাঁর দর্শনের সৌভাগ্য হল না কিন্তু আশ্রম বাহ্য ও কিছুটা আন্তরিকভাবে আমি অবলোকন করে নিলাম। গুরুদেবের গীতাঞ্জলির মনন ও পাঠ অনেকদিন হতেই করে আসছি কিন্তু যে পুণ্যভূমিতে বসে গুরুদেব বাক্‌দেবীর সেই লোকোত্তর ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন সেই ঋদ্ধিসম্পন্ন মাটির চিরাকাংক্ষিত দর্শন জীবনে প্রথমবার করে সেই দিনকে আমার জীবনের সব চাইতে বেশী আনন্দদায়ক ও সুধন্য বলে মনে করলাম। শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত, প্রস্ফুটিত ও প্রমুদিত তপোবন দেখে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেখানকার অনবদ্য অনাড়ম্বর ও অনাকুল পরিবেশেরও অনুভূতিতে অন্তরাত্মা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মনে আপনা আপনি এই ভাব এল যে যদি কখনো অবসর আসে ত এই তপোবনে কমপক্ষেও চার ছয় মাস এসে অবশ্যই থাকতে হবে ও গুরুদেবের জ্ঞানগরিমাপূর্ণ অপ্রতিম প্রতিভার প্রত্যক্ষ উপাসনা করে জীবনে এক মূল্যবান স্মৃতিরত্নের বৃদ্ধি করতে হবে।

দ্বিতীয় দিন আমি সেখান হতে কলকাতায় গেলাম। সিংঘীজী তারে জানিয়েছিলেন যে কলকাতায় যাবার ও কোন গাড়ীতে কলকাতা যাব সে খবর যেন আমি তাঁকে তারে দেই। কিন্তু আমি তা না দিয়ে ঘোড়াগাড়ী করে খুঁজতে খুঁজতে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। নীচে দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল। সে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করল ও ওপরে গিয়ে সিংঘীজীকে খবর দিতেই তিনি নীচে নেমে এলেন ও সোজা আমাকে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, আমি ত তিন দিন হতে

আপনার টেলিগ্রামের প্রত্যাশা করছিলাম আর আপনি জানান না দিয়ে এমনি চলে এলেন। খবর পেলে স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিতাম।

সিংঘীজীর সঙ্গে এই আমার একরকম প্রথম সাক্ষাৎ। যদিও এর প্রায় দশ বছর আগে (১৯২৯ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতাতেই তাঁর স্বর্গীয় পিতা ডালচাঁদজীর সঙ্গে আধঘণ্টার জন্য যে আমার সাক্ষাৎকার হয় তখন তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সরাসরি কথা বলার তখন কোনো সুযোগ হয়নি। এর আগের দিন কলকাতার এক জৈন সভার সামনে আমি এক অভিভাষণ দি যাতে আমার রাজনৈতিক চিন্তা কিছু ব্যক্ত করেছিলাম ও সে সময় মহাত্মা গান্ধী অসহযোগের যে অভিনব কার্যক্রম উপস্থিত করেছিলেন তাতে জৈন সমাজ কি ভাবে ভাগ নিতে পারে সে কথাও ব্যক্ত করেছিলাম। শ্রীবাহাদুর সিংজী বরোদার স্বর্গীয় লালভাই কল্যাণভাই ঝাভেরী (আমার নিকট পরিচিতদের মধ্যে যিনি একজন ছিলেন)-র সঙ্গে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অভিভাষণ শেষে লালভাই আমাকে ডালচাঁদজীর কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। সে সময় পুনায় নূতন স্থাপিত ভাণ্ডারকার রীসর্চ ইন্সটিট্যুট-এর জন্য জৈন সমাজের পক্ষ হতে ৫০০০০ টাকা দান দেওয়ার এমন আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং সেই কাজে লালভাই এবং কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ জৌহুরী শ্রীবদ্রীদাসজীর পুত্র শ্রীরাজকুমার সিংজী আমায় সর্বাধিক সহায়তা দিয়েছিলেন।

লালভাই সিংঘীজী ও তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন। তাই তাঁর ইচ্ছা হল যে আমি ডালচাঁদজীর সঙ্গে দেখা করি ও ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্সটিট্যুট-এর বিষয়ে তাঁকে সবিশেষ তথ্য জানাই। সেখানে জৈন সাহিত্যেরও সংগ্রহ রয়েছে এবং সেখান হতে জৈন সাহিত্যের প্রকাশন করবার বিষয় চিন্তা করা হচ্ছে যেন তাও জানাই। দ্বিতীয় দিন রাত্রে আটটার সময় লালভাই আমাকে ডালচাঁদজীর কাছে নিয়ে গেলেন। আধ ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল। আমি ইন্সটিট্যুট-এর পরিচয় দিলাম ও জৈন সাহিত্যের প্রকাশন বিষয়েও নিজের পরিকল্পনার কথা বললাম, সঙ্গে সঙ্গে আহমদাবাদে নূতন স্থাপিত বিদ্যাপীঠ ও তদন্তর্গত পুরাতত্ত্ব মন্দিরের বিষয়েও কিছু বললাম। ডালচাঁদজী জ্ঞানপ্রেমী ও বিদ্যানুরাগী ত ছিলেনই এবং সাহিত্য প্রকাশনের কাজে তিনি যথোচিত সাহায্যও করতেন। আমার আসার উপলক্ষে ভাণ্ডারকার রীসার্চ ইন্সটিট্যুট-এর জন্য তিনি সেই সময়ই ১০০০ টাকা দান দিলেন এবং লালভাইকে তা নিয়ে যেতে বললেন। সে দিন স্বপ্নেও কি কেউ কল্পনা করেছিল যে এর দশ বছর পর ডালচাঁদজী সিংঘীর পুণ্য স্মৃতিতে আমার শেষ জীবনের সমগ্র সাহিত্য সাধনা মূলীভূত হবে এবং আমার এই সাহিত্য সাধনায় তাঁর পুত্র শ্রীবাহাদুর সিংজী অনন্য সহায়ক হবেন। সিংঘীজীর সঙ্গে এবার যখন প্রথম দেখা হল তিনি তখন সে কথা মনে করিয়ে দিলেন। এ সময় সামান্যই কথা হল। তারপর স্নান, খাওয়াদাওয়া ও

বিশ্রামের পর তিনটে সাড়ে তিনটের সময় সেই বিষয় নিয়ে বিচার বিমর্শ করতে বসলাম। নিজের স্বর্গীয় পিতার পুণ্যস্মৃতিতে জ্ঞান প্রসার বা সাহিত্য প্রকাশের কোনো সুন্দর ও স্থায়ী কার্যক্রমের কথা তিনি যে অনেকদিন হতে ভাবছিলেন সে কথা তিনি বিনয়ের সঙ্গে উপস্থিত করলেন। ও'র এই ইচ্ছা সম্বন্ধে বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীসুখলালজীর মাধ্যমে আমি অনেক কিছুই জানতাম ও আমার জীবন ও কার্য সম্বন্ধে তিনিও অনেক কিছুই জানতেন। তাই এই জিনিষ বুঝতে বা বোঝাতে কারু বিশেষ সময় লাগল না। বার্তালাপের সারাংশ এই ছিল যে আমি তাঁর কাছাকাছি কোথাও এসে বসি এবং এই কার্যের পরিচালনার ভার আমার ওপর নেই। এর জন্য যা খরচ হবে তিনি তা বহন করবেন। এ সম্পর্কে পণ্ডিতজীর সঙ্গে যে কথাবার্তা আগেই হয়ে ছিল তাও তিনি সব বললেন। ও'র সঙ্গের এই প্রাথমিক বার্তালাপ তাঁর ও আমার মধ্যে মুক্ত ও অনাবিল আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত করে দিল।

প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আমরা কথাবার্তা বললাম। জৈন সাহিত্য সংশোধক ও পুরাতত্ব আদি পত্রে আমার যে সব প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। জৈন ইতিহাসের বেশ ভালোভাবেই তিনি চর্চা করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে এ সব বিষয়েও কথা হল। এর আগে এমন কোনো জৈন গৃহস্থকে আমি দেখিনি যাঁর তাঁর মত এ সব বিষয়ের গভীর জ্ঞান ছিল।

তাঁর সঙ্গের এই ৩-৪ ঘণ্টার প্রথম সাক্ষাতেই আমি বুঝে নিলাম যে তিনি সংস্কার-প্রিয় ও কলাভিজ্ঞ মানুষ। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো পড়েন নি তবু অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বড় বড় পদবীধারীদের চাইতে অনেক বেশী ছিল। ভারতীয় স্থাপত্য-কলা ও চিত্রকলার তিনি একজন মর্মজ্ঞ ছিলেন। প্রাচীন মুদ্রায় ছিলেন তিনি পারদর্শী। প্রসঙ্গক্রমে কথাবার্তার সময় নিজের সংগ্রহের চিত্র ও মুদ্রার কিছু কিছু বার করে দেখালেন যা ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর সংগ্রহের একটী। এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও ঔৎসুক্য এত বেশী ছিল যে এ সব দেখাতে বা বলতে তিনি ক্লান্তি অনুভব করতেন না। সেদিন সন্ধ্যার খাওয়ার পর আবার আমরা গল্প করতে বসলাম। তিনি বলতে বলতে ও সংগ্রহ দেখাতে দেখাতে রাত তিনটে হয়ে গেল। সে সব সংগ্রহ দেখে ত আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমি বললাম, আপনার কাছে যে অমূল্য ও অপূর্ব সংগ্রহ রয়েছে কমপক্ষে তার একটী সূচী করে দিন যাতে যারা গবেষক তারা জানতে পারে যে অমুক জিনিষ এই সংগ্রহে রয়েছে। আপনার কাছে এমন অনেক জিনিষ আছে যা বোধহয় পৃথিবীতে কোথাও নেই। এর উত্তরে তিনি হেসে বললেন, এই জন্যই ত আপনাকে ডাকছি। সংগ্রহ করবার কাজ আমি করেছি। একে প্রকাশে আনবার কাজ আপনি করুন। তাঁর সত্যিকার মন হতে বেরিয়ে আসা সেই কথা শুনে আমি অবাক হয়ে

গেলাম। সেই কথা আজো আমার কানে শুনতে পাচ্ছি। তারপরেও কয়েকবার তাঁর সেই মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

তিনটের পর গিয়ে আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিন্তু আমার ভালো ঘুম হল না। আমি তাঁর বিচার ও ভাবের নিজের মনে পৃথকীকরণ করছিলাম। কারণ দ্বিতীয় দিন আমর নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসবার ছিল ও সিংঘীজীকে তদনুরূপ উত্তর দেবার ছিল।

[ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তরে জৈন তত্ত্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৫ প্রঃ বাহ্য পরিগ্রহ কি কি ?

১৫ উঃ ধন,[৩] ধান্য দ্বিপদ (দাসদাসী প্রভৃতি), চতুষ্পদ (গো, মহিষ, অশ্বাদি,) গৃহ, বাসন, পাল্কী, জলাশয়, শয্যাসন (বিশ্রামোপকরণ), ভূমি এই দশ প্রকার।

১৬ প্রঃ অন্তরঙ্গ পরিগ্রহ কি কি ?

১৬ উঃ মিথ্যাত্ব, বেদ (স্ত্রীপুংনপুংসকানুরাগ), রাগ, দ্বেষ, হাস্য, রতি (বিষয় সতৃষ্ণতা), অরতি (বিষয়গ্রহণ শৈথিল্য), শোক, ভয়, জুগুপ্সা, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ এই চতুর্দশটি অন্তরঙ্গ পরিগ্রহ।

১৭ প্রঃ কোন শাস্ত্রকে যথার্থ বা সৎশাস্ত্র বলে ?

১৭ উঃ যে শাস্ত্র পূর্বোক্ত বীতরাগত্বাদি গুণত্রয় যুক্ত যথার্থ দেব বা আপ্ত কর্তৃক অভিহিত তাহাই সৎশাস্ত্র।

১৮ প্রঃ পদার্থ বা তত্ত্ব কয় প্রকার ও কি কি ?

১৮ উঃ সাত প্রকার ঃ জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জরা ও মোক্ষ এই সাত প্রকার তত্ত্বই সপ্ত পদার্থ।

১৯ প্রঃ উক্ত সপ্ত পদার্থ বা তত্ত্ব ও সম্যগ্‌দর্শনাদির অভিজ্ঞান হয় কিরূপে ?

১৯ উঃ 'প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ' প্রমাণ এবং নয় দ্বারা সমস্ত পদার্থ ও সম্যগ্‌ দর্শনাদির জ্ঞান জন্মে।

(ক) প্রঃ প্রমাণের লক্ষণ কি ? এবং প্রমাণ কয় প্রকার ?

(ক) উঃ 'প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্' যদ্দ্বারা পদার্থের সর্বাংশের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাকে প্রমাণ বলে।[৪]

ধন—গোমহিষাদি, ধান্য-ক্ষেত্র, গৃহ, টাকা-পয়সা, সুবর্ণ, দাসী, বস্ত্রাদি, বাসন।

সাংখ্য মতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এই তিনটি প্রমাণ।

বেদান্ত মতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি।

বৌদ্ধ মতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান এই দুইটি প্রমাণ।

ন্যায় মতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এই চারিটি প্রমাণ।

যোগ মতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এই তিনটি প্রমাণ।

প্রমাণ দ্বিবিধ ঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। আত্মা যে জ্ঞান দ্বারা পদার্থান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে পদার্থ নিচয়ের নিশ্চয় করিতে পারেন, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। এবং যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা গ্রহণে আত্মার বিষয় জ্ঞান হয় তাহাকে পরোক্ষ প্রমাণ কহে। ইন্দ্রিয় করণক ও শাস্ত্র বা তর্কাদি দ্বারা জ্ঞান (অনুমান) ইহারা পরোক্ষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) প্রঃ নয় কাহাকে বলে* ও তাহার ভেদ কি কি?

(খ) উঃ যে জ্ঞান পদার্থের একদেশাবগ্রাহী অর্থাৎ একাংশকে বিষয় করে তাহাকে নয় কহে। নয় দুই প্রকার—দ্রব্যার্থিক ও পর্যায়ার্থিক। পুরুষার্থ সিদ্ধি, দ্রব্য সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে নয়ের নিশ্চয় ও ব্যবহার এই প্রকারান্তর ভেদদ্বয় বর্ণিত আছে।

২০ প্রঃ নিশ্চয় নয় কিরূপ?

২০ উঃ যে নয় দ্বারা পদার্থের নিজ স্বরূপকে প্রধান রূপে জানা যায় তাহাকে নিশ্চয় নয় বলে। এই নিশ্চয় নয়ও দুই প্রকার ঃ শুদ্ধ নিশ্চয় নয় ও অশুদ্ধ নিশ্চয় নয়। মোক্ষ শাস্ত্রোক্ত দ্রব্যার্থিক ও পর্যায়ার্থিক নয় নিশ্চয় নয়েরই প্রকারান্তর ভেদ স্বরূপ।

২১ প্রঃ ব্যবহার নয় কি প্রকার?

২১ উঃ যে নয় দ্বারা প্রয়োজন বিশেষের বশবর্তী হইয়া পদার্থান্তরের ভাব পদার্থান্তরে আরোপ করে বা পরিমিতাধীন উৎপন্ন নৈমিত্তিক ভাবকেই বস্তুর স্বকীয় ভাব রূপে উপলব্ধি করে তাহাকে ব্যবহার নয় বা উপচার নয় অথবা উপনয় বলে।

২২ প্রঃ ব্যবহার বা উপচার নয় কত প্রকার?

২২ উঃ সদ্ভূত ব্যবহার, অসদ্ভূত ব্যবহার ও উপচারিত ব্যবহার এই তিন প্রকার।

২৩ প্রঃ দ্রব্যার্থিক নয় কাহাকে কহে?

২৩ উঃ যে পর্যায়কে উদাসীন রূপে ও দ্রব্যকে মুখ্যরূপে প্রকাশ করে তাহাকে দ্রব্যার্থিক নয় বলে।

২৪ প্রঃ পর্যায়ার্থিক নয় কিরূপ?

২৪ উঃ যে দ্রব্যকে প্রধানরূপে না বলিয়া পর্যায়কেই মুখ্যরূপে ব্যক্ত করে তাহাকে পর্যায়ার্থিক নয় কহে।

মীমাংসা মতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি।
কণাদ মতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ।

* 'প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ'—জীব প্রভৃতি সাত পদার্থের স্বরূপজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা এবং দ্রব্যার্থিক ও পর্যায়ার্থিক নয় দ্বারা হইয়া থাকে।

২৫ প্রঃ দ্রব্যার্থিক নয় কয় প্রকার ?

২৫ উঃ তিন প্রকারঃ নৈগম, সংগ্রহ ও ব্যবহার।

২৬ প্রঃ নৈগম নয় কিরূপ ?

২৬ উঃ যত দ্রব্য আছে, সে সমস্তই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কালীন স্ব স্ব পর্যায়ে সম্বন্ধ, কোন দ্রব্যই নিজ নিজ পর্যায় হইতে ভিন্ন নহে। যদ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যায়ের বর্তমানবৎ জ্ঞান ও প্রয়োগ হয় তাহাকে নৈগম নয় বলে। যেমন যদি কেহ অন্ন পাকের দ্রব্য জল, তণ্ডুল, কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়াছে তখন কেহ জিজ্ঞাসা করে কি করিতেছ ? সে বলিল অন্ন প্রস্তুত করিতেছি। অন্ন প্রস্তুত রূপ পর্যায় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কেবল অন্ন প্রস্তুতের সামগ্রীই উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি নৈগম নয় দ্বারা সে এইরূপে বলিতে পারে যে আমি অন্ন পাক করিতেছি।

২৭ প্রঃ সংগ্রহ নয় কিরূপ ?

২৭ উঃ যদ্বারা জাতি ও পর্যায় সংগৃহীত হইয়া একরূপে ব্যক্ত হয় তাহাকে সংগ্রহ নয় কহে। যেরূপ ঘট বলিলে সমস্ত ঘট ও দ্রব্য বলিলে জীব অজীবাদি দ্রব্যের সমস্ত ভেদ ও প্রভেদ সংগ্রহ নয় দ্বারা উপস্থিত হয়।

২৮ প্রঃ ব্যবহার নয় কাহাকে বলে ?

২৮ উঃ যদ্বারা (সংগ্রহ নয় দ্বারা) গৃহীত পদার্থের বিধি পূর্বক ব্যবহারানুকূল ভেদ প্রভেদাদি বিশেষরূপে জানা যায়, তাহাকে ব্যবহার নয় বলে। যেমন সংগ্রহ নয় দ্বারা দ্রব্য বলিলে সামান্যতঃ ভেদ প্রভেদ সহিত দ্রব্যের জ্ঞান হয়, পশ্চাৎ বিশেষরূপ ব্যবহারোপযোগী ভেদ প্রভেদের পরিজ্ঞান (পুদ্গল, ধর্ম, অধর্ম, ইত্যাদি জ্ঞান) ব্যবহার নয় দ্বারা হইয়া থাকে।

২৯ প্রঃ পর্যায়ার্থিক নয়ের ভেদ কি ?

২৯ উঃ ঋজুসূত্র, শব্দ, সমভিরূঢ়, এবম্ভূত এই চতুর্বিধ।

৩০ প্রঃ ঋজুসূত্র নয় কিরূপ ?

৩০ উঃ অতীত অনাগত পর্যায়দ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বর্তমান কালীন পর্যায় ঋজুসূত্র নয় দ্বারা গৃহীত হয়। কালের অতি সূক্ষ্ম সময়বর্তী পর্যায়কে অর্থপর্যায় বলে। এই অর্থ পর্যায় ঋজুসূত্র নয়ের বিষয়।

৩১ প্রঃ শব্দ নয়ের স্বরূপ কি ?

৩১ উঃ যদ্বারা ব্যাকরণ-সম্বন্ধী—লিঙ্গ, বচন, কারক, কাল প্রভৃতির ব্যাভিচার (দোষ) নিরাকরণ পূর্বক জ্ঞান বিশেষ জন্মে বা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে তাহাকে শব্দ নয় বলে। যেমন রাম যাইতেছে, এখানে রামকে যাইতেছে এরূপ প্রয়োগ হইবে না। কেন না রাম কর্তা, কর্তাতে প্রথমা বিভক্তি হয়, রামকে এইরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে না ইত্যাদি।

৩২ প্রঃ সমভিরূঢ় নয় কাহাকে বলে ?

৩২ উঃ যে নানার্থক শব্দের এক অর্থ বিশেষ রূঢ়তা অর্থাৎ প্রসিদ্ধতা জ্ঞাপক তাহাকে সমভিরূঢ় নয় বলে। যেরূপ গো শব্দের গরু, পৃথিবী, গমন প্রভৃতি অনেক অর্থ আছে তন্মধ্যে মুখ্যরূপে গো শব্দ গরুকেই উপস্থিত করে, কারণ লোক গরুর চলা, বসা, শোওয়া সর্বত্র গো শব্দেরই ব্যবহার করে। এইরূপ নয়কেই সমভিরূঢ় নয় বলে।

৩৩ প্রঃ এবম্ভূত নয় কিরূপ ?

৩৩ উঃ যে যে সময়ে যাদৃশ ক্রিয়াশীল তাহাকে তৎকালে তাদৃশ ক্রিয়া বিশেষ পুরস্কারে জানা বা বলা, এইরূপ নয় দ্বারা সাধিত হয়। যে প্রকার পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দেব-রাজকে ইন্দ্র বলা এবং যুদ্ধ ব্যাপৃত দেবরাজকে শক্র বলা এইরূপ ক্রিয়ানুরূপ অভিধান এই প্রকার নয়ের বিষয়।

৩৪ প্রঃ প্রমাণ ও নয় দ্বারা যেরূপ জীবাদি ও সম্যগ্ দর্শনাদির জ্ঞান হয় সেই রূপ আর কোন্ কোন্ নিমিত্ত দ্বারা জীবাদি ও সম্যগ দর্শনাদির অনুভব করা যায়।

৩৪ উঃ নির্দেশ, স্বামিত্ব, সাধন, অধিকরণ, স্থিতি, বিধান এবং সৎ, সংখ্যা, ক্ষেত্র, স্পর্শন, কাল, অন্তর, ভাব, অল্প, বহুত্ব এই সকল দ্বারাও জীবাদি ও সম্যগ্ দর্শনাদির অধিগম অর্থাৎ জ্ঞান হয়।

নির্দেশ—বস্তুর নাম মাত্র কথন। স্বামিত্ব—বস্তুর অধিকারত্ব। সাধন—বস্তুর উৎপত্তি কারণ। অধিকরণ—বস্তুর আধার। স্থিতি—বস্তুর স্থিতি কালের সীমা। বিধান—বস্তুর ভেদ-প্রভেদ। সৎ—অস্তিত্ব। সংখ্যা—বস্তুর পরিণাম গণনা। ক্ষেত্র —পদার্থের বর্তমান নিবাস। স্পর্শন—যে অধিকরণে সর্বদা বাস করে। কাল—বস্তুর অবস্থান কাল-পরিমাণ। অন্তর—বিরহ কাল। ভাব—ঔপশমিকাদি ভাব। অল্প-বহুত্ব—এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে ছোট কি বড় নির্দেশ করা। উক্ত নির্দেশাদি ছয় প্রকার বিষয়ের জ্ঞান হইলে এবং সৎ সংখ্যা প্রভৃতি আট প্রকার বিষয়ের জ্ঞানে জীবাদি ও সম্যগ্ দর্শনাদির অধিগম হয়।

৩৫ প্রঃ জীবের লক্ষণ কি ?

৩৫ উঃ 'উপযোগো লক্ষণং' উপযোগ অর্থাৎ চেতনা। যাহার চেতনা আছে তাহাকে জীব বলে।

৩৬ প্রঃ চেতনা কয় প্রকার ?

৩৬ উঃ দর্শন চেতনা ও জ্ঞান চেতনা এই দুই প্রকার।

৩৭ প্রঃ দর্শন চেতনা কিরূপ ?

৩৭ উঃ বস্তুর অস্তিত্ব মাত্র প্রকাশক জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুর সত্তা মাত্রের জ্ঞানকে দর্শন চেতনা বলে।

৩৮ প্রঃ জ্ঞান চেতনা কি প্রকার ?

৩৮ উঃ বস্তুর বিশেষ প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্মপুরস্কারে বস্তুর জ্ঞানকে জ্ঞান চেতনা কহে।

৩৯ প্রঃ জীবের কি কি ভেদ আছে ?

৩৯ উঃ জীবের বহু প্রকার ভেদ, তন্মধ্যে কেহ বলেন জীব তিন প্রকার—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা।

৪০ প্রঃ বহিরাত্ম জীব কাহাকে বলে ?

৪০ উঃ যে মিথ্যা দর্শন যুক্ত তত্ব অজ্ঞানী শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে করে তাহাকে বহিরাত্ম জীব (মিথ্যাদৃষ্টি) বলে।

৪১ প্রঃ অন্তরাত্ম জীব কিরূপ ?

৪১ উঃ যাহার আত্মজ্ঞান অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি আছে, তাহাকে অন্তরাত্ম জীব বলে।

৪২ প্রঃ অন্তরাত্ম জীব কত প্রকার ?

৪২ উঃ উত্তম, মধ্যম, অধম ভেদে অন্তরাত্ম জীব তিন প্রকার।

উত্তম—চব্বিশ প্রকার পরিগ্রহ শূন্য, শুদ্ধ পরিণামী আত্ম ধ্যানী মুনি।

মধ্যম—দেশ ব্রতী (দ্বাদশ বিধ ব্রতচারী শ্রাবক) ও আগারী (পঞ্চানুব্রতচারী শ্রাবক) এই দুই প্রকার।

অধম—অবিরত অর্থাৎ দ্বাদশ বিধ ব্রত রহিত কেবল সম্যগ্ দৃষ্টি যুক্ত গৃহস্থ।

৪৩ প্রঃ পরমাত্ম জীব কি প্রকার ?

৪৩ উঃ (যাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না তাহাকে পরমাত্ম জীব বলা যায়)। পরমাত্ম জীব দ্বিবিধ : সকল পরমাত্মা ও নিষ্কল পরমাত্মা। যিনি বক্ষ্যমান ঘাতি কর্ম সমূহকে নাশ করিয়াছেন এইরূপ লোকালোক দর্শক শ্রী অর্হৎ ভগবান দেহ সহিতকে সকল পরমাত্মা বলে। আর যিনি ঘাতি অঘাতি সমস্ত কর্ম ফল বর্জিত জড় শরীর শূন্য শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ সেই মহান সিদ্ধ ভগবানকে নিষ্কল পরমাত্মা বলে।

৪৪ প্রঃ জীবের প্রকার ভেদ কিরূপ ?

৪৪ উঃ জীব আবার দুই প্রকার : সংসারী ও সিদ্ধ।

সংসারী—অর্থাৎ যে কর্মের সহিত ও কর্মের বশীভূত হইয়া নানারূপ জন্ম মরণশীল এবং দ্রব্য সংসরণ, ক্ষেত্র সংসরণ, কাল সংসরণ, ভব সংসরণ ও ভাব সংসরণ পঞ্চবিধ সংসরণ রত তাহাকে সংসারী জীব বলে।

সিদ্ধ—অর্থাৎ মুক্ত, যে কোন রূপ কর্ম দ্বারা আবদ্ধ নয়।

কেহ কেহ উক্ত সংসারী জীবকে ব্যবহারিক জীব বলেন ও সিদ্ধ জীবকে নিশ্চয় জীব বলিয়া থাকেন।

৪৫ প্রঃ সংসারী জীবের কি কি ভেদ আছে ?

৪৫ উঃ সংসারী জীব চার প্রকারঃ দেব, মনুষ্য, তির্যক ও নারকী। উক্ত চার প্রকার জীবের মধ্যে কেহ সমনস্ক অর্থাৎ সংজ্ঞী ও কেহ অমনস্ক অর্থাৎ অসংজ্ঞী, অপর স্থাবর ও ত্রস এই দুই প্রকার ভেদও আছে। যাহার মন আছে, তাহাকে সমনস্ক বলে ও যাহার মন নাই তাহাকে অমনস্ক বলে।

৪৬ প্রঃ স্থাবর জীব কিরূপ ?

৪৬ উঃ জল, পৃথিবী, তেজ, বায়ু, বনস্পতি ইহারা স্থাবর জীব। এই পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ও বনস্পতি কায়িক স্থাবর জীবের একমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়, শারীরিক বল, আয়ু ও শ্বাস-প্রশ্বাস আছে।

[ক্রমশঃ

বজ্জ ও সুব্ভ ভূমি প্রসঙ্গে

[সংকলন]

জৈনদিগের সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র পাঠে জানা যায়,—(২৪শ তীর্থংকর মহাবীর বা) বর্দ্ধমান স্বামী 'লাঢ়' দেশে 'বজ্জভূমি' ও 'সুব্ভভূমি'র মধ্যে অতি কষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয়া ছিলেন। তৎকালে বজ্জভূমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন সূত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঢ় দেশে ভ্রমণ করা কঠিন।[১] জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও আর্য বা পুণ্য ভূমিসমূহের মধ্যে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।[২]

জৈনদিগের সর্বপ্রাচীন অঙ্গ আচারাঙ্গ সূত্রে যে বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমির উল্লেখ আছে তাহাই আমাদের পুরাণে বর্দ্ধমান ও সুহ্ম নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীনকালে প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান রাঢ় দেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মেরই অপর নাম 'রাঢ়' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৩] এদিকে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক পাঠ করিলে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মনে হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাঢ়ের উল্লেখ না করিলেও সুহ্ম ও বর্দ্ধমান পৃথকভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। উপরিউক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিরের সময়ে যে স্থান সুহ্ম ও বর্দ্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে সেই উভয়স্থানই একত্র রাঢ় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—তবে সুহ্ম নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। সুতরাং পূর্বকালে সুহ্ম, রাঢ় ও বর্দ্ধমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুঝাইত।

যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বর্দ্ধমান নামটি নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহু পূর্বে মার্কণ্ডেয় পুরাণের সময় হইতেই বর্দ্ধমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ২৪শ তীর্থংকর বর্দ্ধমান স্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈন সমাজে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান স্বামীর পুণ্য সমাগমে এইস্থান বর্দ্ধমান নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে।

১ আয়ারঙ্গ সুত্ত ১।৮।৩

২ কোডিবরিসংবলাঢ়া, পন্নবণা।

৩ সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ, মহাভারত, সভাপর্ব, ৩৩।২৪ নীলকণ্ঠ টীকা।

আচারাঙ্গসূত্রের মতানুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্টপর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ বজ্রভূমি ও সুহ্ম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া যায়। গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভাব খর্ব হইলে নানা সামন্তগণের স্বাধীনতা গ্রহণের সহিত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুহ্ম ও বর্দ্ধমান আবার স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমার চরিতে দামলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্গত[৪] বলা হইয়াছে। এ অবস্থায় বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকটা তৎকালে সুহ্ম বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাজের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ কর্ণ-সুবর্ণপতি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, কর্ণ-সুবর্ণ বা বর্দ্ধমানপতি শশাঙ্করাজের সময় সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত[৫] ও উৎকল পর্যন্ত রাঢ়দেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণ রাঢ়ের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ অদ্যাপি অধিবাসীগণের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত।

বর্দ্ধমানের ইতিকথা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, ৪-৫।

৪ দশকুমার চরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

৫ জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ পন্নবণা বা প্রজ্ঞাপনা সূত্রের মতে "তাম্রলিপ্তি বঙ্গায়" অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে তাম্রলিপ্ত। এই প্রমাণে বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়ে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের মধ্যেও পরিগণিত হইত।

ক্ষমাপনা সুত্ত

সব্বস্স জীব রাসিস্স ভাবও ধম্ম নিহিয় নিয় চিত্তো ।
সব্বং খমাবইত্তা খমামি সব্বস্স অহিয়ংপি ॥

সব্বস্স সমণ-সংঘস্স ভগবও অংজলিং করিয় সীসে ।
সব্বং খমাবইত্তা খমামি সব্বস্স অহিয়ংপি ॥

খামেমি সব্ব জীবে সব্বে জীবা খমংতু মে ।
মিত্তী মে সব্ব ভূএসু বেরং মজ্ঝং ন কেণই ॥

জং জং মণেণ বদ্ধং জং জং বায়াএ ভাসিয়ং পাবং ।
জং জং কাএণ কয়ং মিচ্ছামি দুক্কডং তস্স ॥

খমিঅ খমাবিও মই খমীহ সব্ব জীব নিকায় ।
সিদ্ধহ সাখ আলোয়ণহ মঝহ বইর ন ভাব ॥

সব্বে জীবা কম্ম বস চউদহ রাজ ভমংতু ।
তে মে সব্ব খমাবিআ মঝবি তেহ খমংতু ॥

অনুবাদ

ধর্মে স্থির বুদ্ধি হয়ে সবার নিকট
ক্ষমা ভিক্ষা করি আমি, চিত্ত অকপট,
সদ্ভাব সবার প্রতি বক্ষে মোর ধরি
সকলের অপরাধ ক্ষমা আমি করি।

অঞ্জলি করিয়া বদ্ধ হয়ে নতশির
যেখানে রয়েছে যত শ্রমণ স্থবির
সংঘ সহ সকলের করিয়া প্রণাম
ক্ষমা যাচি, ক্ষমা করি, হয়ে পূর্ণকাম।

কারু প্রতি কোনখানে বৈর ভাব নাই,
সকল জীবের কাছে আমি ক্ষমা চাই,
তাহাদের ক্ষমা যেন করি আমি লাভ,
সকলের প্রতি শুধু আছে মৈত্রী ভাব।

সঙ্কল্পেতে যেই পাপ করি মনে মনে,
প্রকাশিত হয় যাহা আমার কথনে,
আচরণে যেই পাপ করি আমি আরো,
মিথ্যা যেন হয়, চিহ্ন নাহি রহে কারো।

জীবগণ তোমরাও ক্ষমা ভিক্ষা করি
ক্ষমা কোরো আমাকেও পাপ পরিহরি,
সিদ্ধ সাক্ষী আলোচনা করি বারবার
বৈর যেন কারু প্রতি না রহে আমার।

নিজ নিজ কর্ম বশে সর্ব জীবগণ
চতুর্দশ রাজলোক করয়ে ভ্রমণ,
ক্ষমা আমি করিয়াছি তাদের সবারে,
তারাও করুক ক্ষমা সদ্ভাবে আমারে।

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যেমন অনেক মহাপুরুষের নামে অমরত্ব এনে দিয়েছে তেমনি অনেক নগরের নামে অভূতপূর্ব এক রোমাঞ্চ। তাম্রলিপ্ত সেই সব নগরের মধ্যে একটী যার বৈভব ও সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ভারত সমুদ্রে যে সব দ্বীপপুঞ্জ মালার মত ছড়িয়ে রয়েছে সেই সব দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশের সিংহ-দ্বার ছিল এই তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত হতে ভারতীয় বণিক ও সাহসী নাবিক দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে গেছে। সেখানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার করেছে। জাভা, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দেশ ছিল তাম্রলিপ্তর অধিবাসীদের কাছে গৃহ ও অঙ্গনের মত।

ধনদেব সেই তাম্রলিপ্ত নগরে এসে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করল এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিত্তবান বণিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করলেও তার লোভ বা লোলুপতা ছিল না। তাই যা সে উপার্জ্জন করত তার বেশীর ভাগই সে দান করে ফেলত। তার দানশালার দ্বার ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত। এমন কি দ্যূত-ক্রীড়ায় যে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলত, আত্মহত্যা ছাড়া যার অন্য পথ থাকত না সেও এখানে এসে অভয় লাভ করত। কিন্তু ধনদেবের এতেও পরিতৃপ্তি ছিল না।

তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের তীরে বলে ধনদেব মধ্যে মধ্যেই তার কূলে এসে বসত ও সমুদ্রের রঙ্গলীলা তন্ময় হয়ে দেখত। অস্তোন্মুখী সূর্যের যে কিরণ জলে সোনা ছড়িয়ে দিত বা আকাশে নানা রঙের ইন্দ্রজাল রচনা করত তা দেখতে দেখতে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলত। তার মনে হত সমুদ্রের সেই ঊর্মি তার পূর্ব জন্মের সাথী। তারা যেন তাকে সহাস্য আমন্ত্রণ জানাতে জানাতে কূলে এসে আছড়ে পড়ছে আবার পেছনে সরে যাচ্ছে।

সমুদ্রের সঙ্গে ধনদেবের পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং যতই এই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হতে লাগল ততই তার স্ত্রী ধনশ্রী ও বন্ধু নন্দনের সঙ্গে তার সম্পর্ক শিথিল হতে লাগল। অনেক সময় তার মনে হত এর জন্য সে নিজেই দায়ী। আবার কখনো কখনো তার

মনে হত ধনশ্রী তার স্ত্রী হলেও তারও নিজস্ব এক ব্যক্তিত্ব আছে। ধনশ্রীর সঙ্গে তাই যদি নন্দনের একটু বেশী ঘনিষ্ঠতাই হয় তবে যে তারা অধঃপাতে যাচ্ছে সে কথা সে কেন মনে করছে? আর যদি অধঃপাতেই যায় তবে তাদের সাজা দেবারই বা তার কি অধিকার? বস্তুতঃ ধনদেবের মধ্যে এক সহজ বৈরাগ্য ছিল, সেই বৈরাগ্যই তাকে দৈনন্দিন সংসারের সমস্ত কিছু হতে অলিপ্ত রাখত, দূরে রাখত।

কিছুদিন তাম্রলিপ্ত সহরে বাস করে ধনদেব সমুদ্র যাত্রায় যাওয়া স্থির করল এবং একদিন তার স্ত্রী ধনশ্রী ও বন্ধু নন্দন সহ রত্নদ্বীপগামী এক জাহাজে উঠে বসল। কিন্তু যে কারণেই হোক কিছু দিন যেতে না যেতেই ধনদেবের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল এবং এমন মনে হতে লাগল যে সে রত্নদ্বীপে গিয়ে পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ। ধনদেবের অবশ্য মৃত্যু ভয় ছিল না। না ছিল দেহের আসক্তি। কিন্তু যে দিন হতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল সেদিন হতে ধনশ্রীকে কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখাতে লাগল। তার ভয় তার দুষ্কৃত্যের কথা অন্যে যেন না জেনে যায়। নন্দন অবশ্য ধনদেবের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু ধনশ্রীর কাছে নন্দনের এই কৃতজ্ঞতাও অসহ্য বলে মনে হত। অনেক দিনই সে নন্দনের কাছে এ অভিলাষ ব্যক্ত করেছে, আমি ধনদেবের হাত হতে মুক্তি পেতে চাই। ধনদেব যদি এমনিতে না মরে তবে এই কাঁটা আমাকেই তুলে ফেলতে হবে।

সে দিন অন্ধকার রাত ছিল। জাহাজের সামান্য ক'জন খালাসী ছাড়া আর কেউই জাগ্রত ছিল না। ধনদেবও অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রিত। হঠাৎ তার মনে হল সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। কে বা কারা যেন তাকে ধরে জলে ফেলে দিচ্ছে। পিঠে একটা কোমল হাতের স্পর্শও যেন সে অনুভব করল। তারপর সাগরের যে ঊর্মিমালা এত-দিন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিল তা তাকে গ্রহণ করে নিল।

সে দিন হতে ধনশ্রী ও নন্দনের পথ নিষ্কণ্টক হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

কৌশাম্বীতে প্রতিদিনই দীপ মালার উৎসব হয়। কারণ সেখানে সবাই ধনী, সবাই সম্পন্ন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাই প্রত্যেকের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় যা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জ্বলে এবং তারই আলোয় পথ আলোকিত হয়ে থাকে। তারপর মধ্যরাতে প্রদীপ মালার আলো যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন রাজপথে এক বিলাসী ও অভিসারিকা ছাড়া আর কেউ থাকে না কারণ কৌশাম্বীতে চোর বা ডাকাত কেউ ছিল না।

এ হেন কৌশাম্বীতে সমুদ্র দত্ত নামে এক বণিক কিছু দিন হতে এসে বাস করছে। লোকে তার কুল বা বংশ পরিচয় কিছু জানে না তবে যে পরিমাণ ঐশ্বর্য তার কাছে রয়েছে তাতে যে সে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন সে কথা সবাই বিশ্বাস করেছে।

সেই সমুদ্র দত্তের স্ত্রী একদিন মধ্যাহ্নে কেমন যেন সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তারপর তার দাসীকে ডাক দিয়ে বলল, আজ অষ্টমী। আজ আমার উপোষ। মধ্য রাতে শ্মশান মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজো দিতে হবে। নৈবেদ্য ঠিক করে রাখিস ; তোকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

দাসী একটু আশ্চর্যান্বিত হল। শ্মশানদেবীর পূজোত তার গৃহস্বামিনী কোনো দিনই দেয়নি। সহসা শ্মশানদেবীর পূজো দেবার কথা তার কি করে মনে এল ? এবং সেও মধ্যরাতে। অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তিও মধ্যরাতে সেখানে যেতে ভয় পায়। কিন্তু আদেশ আদশেই।

তারপর কৌশাম্বীর দীপমালা যখন একটু স্তিমিত হল তখন সমুদ্রদত্তের স্ত্রী দাসী ও একজন অনুচর নিয়ে শ্মশান দেবীর মন্দিরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারপর শ্মশানে পৌঁছে অনুচরকে দূরে দাঁড় করিয়ে দাসীর হাত হতে নৈবেদ্যের থালা নিয়ে তাকে মন্দিরের দরজায় অপেক্ষা করতে বলে সে ভিতরে প্রবেশ করল।

দেবীপূজা ভান মাত্র ছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেই শ্রমণের সন্ধান যাকে আজ দ্বিপ্রহরে সে আহার ভিক্ষা দিয়েছিল। আহার ভিক্ষা দেবার পরই তার মনে এই সংকল্পের উদয় হয় এবং সেই জন্যই সে সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।

মন্দিরে প্রবেশ করবার সময় তার বুক একটু কেঁপে উঠেছিল কিন্তু হৃদয়কে আরো কঠোর করে সে চারিদিক দেখে এল। কিন্তু শ্রমণকে সে কোথাও দেখতে পেল না। প্রথমে সে কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল তারপর আরো ভালো করে দেখতে লাগল। তার ত এইখানেই থাকবার কথা। হাঁ ওই ত। সহসা গাছের তলায় দাঁড়ানো কায়োৎসর্গ স্থিত শ্রমণের ওপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল।

নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোয় শ্রমণের মুখ কেমন যেন উদ্ভাসিত দেখাচ্ছিল। সেই মুখ শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। কিন্তু সেই মুখ সমুদ্র দত্তের পত্নীর মনে কোন শ্রদ্ধা উৎপন্ন করল না। সে খানিকক্ষণ সেই মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে উঠল, এই সেই ধনদেব। আজ ভোর হবার আগেই একে আমাকে সংসার হতে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কি ভাবে সরাব। সে যদি পুরুষ হত তবে সে তার গলা টিপে মেরে ফেলত বা ছুরিকাঘাত করত কিন্তু সে শক্তি তার বাহুতে নেই। কিন্তু সরিয়ে তাকে ফেলতেই হবে। সহসা তার চোখ মন্দিরের একপ্রান্তে রাখা শুকনো কাঠের ওপর গিয়ে পড়ল। সে তখন ছুটে গিয়ে সেই কাঠ নিয়ে এল ও একটি একটি করে তার চার দিকে সাজিয়ে দিল। তারপর মন্দিরের ভেতর হতে প্রদীপ এনে সেই প্রদীপের আগুনে কাঠে অগ্নি সংযোগ করল। আগুন একটু ধরে উঠতেই সে সেখান হতে একছুটে বেরিয়ে এল ও তার দাসী ও অনুচর সহ ঘরে ফিরে গেল।

॥ ৪ ॥

পরদিন সকালে যখন একথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাল রাত্রে কে বা কারা এক শ্রমণকে পুড়িয়ে মেরেছে তখন চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। কৌশাম্বীতে এমন দুষ্কৃত্য কেউ করতে পারে তা সকলের কল্পনার অতীত। শ্রমণ ত কারু কোনো অনিষ্ট করেনি তবে কেন কেউ তার প্রতিশোধ নেবে? কোনো দৈবশক্তিই তবে এর জন্য দায়ী। এই উপাসর্গ তাই দৈবসৃষ্ট।

কিন্তু কৌশাম্বীরাজ দৈব বলে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। তাই নগর পালকে তিনি এর অনুসন্ধান নিতে বললেন।

অনুসন্ধান নিতে গিয়ে সেই রাত্রে দাসী ও অনুচরসহ সমুদ্রদত্তের স্ত্রী শ্মশান মন্দিরে গিয়েছিল সেকথা নগরপাল জানতে পারল। তখন সে তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল ও তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত করল।

রাজা স্ত্রীলোককে যতটা সম্মান দিতে হয় সেই সম্মান দিয়ে বললেন, তুমিই কি সমুদ্রদত্তের স্ত্রী।

সমুদ্রদত্তের স্ত্রী একটু কুটিল হেসে বলল, কৌশাম্বীর অধিবাসীরা তাই জানে।

এই প্রত্যুত্তরে রাজার মনে আরো সন্দেহ জাগল। তিনি বললেন, সমস্ত কথা স্পষ্ট করে খুলে বল, নইলে কঠিন সাজা পাবে।

সে তখন ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করল, আমি যাকে রাত্রে ভস্মীভূত করেছি বাস্তবে সেই আমার স্বামী। তাঁর বন্ধু নন্দন যে আজ পালিয়ে গেছে তার সঙ্গে আমরা সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিলাম। এর বেশী আপনাকে জানাবার আবশ্যকতা আমি দেখিনা।

আমারো জানবার প্রয়োজন নেই কিন্তু তোমার নিজের স্বামীর প্রতি তুমি এত ক্রূর হলে কি করে?

কি করে এত ক্রূর হলাম, সেকথা আমি নিজেও জানি না। একবার এর আগেও আমি এমনি ক্রূর হয়েছিলাম ও ভেবেছিলাম এর পুনরাবৃত্তি আর করতে হবে না। কিন্তু আমার ভাগ্যলিপিতে এই লেখা ছিল।

তুমি কি এর আগেও ওকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে?

না। এর আগে ও'র অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ও'কে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলাম। আজ সকালে যখন আমার ঘরে ভিক্ষা নিতে এলেন তখন বুঝলাম সমুদ্রে ও'র মৃত্যু হয়নি। এখন আমি কি করি। ও'কে যদি হত্যা না করি তবে উনি সমুদ্র দত্ত যে নন্দন ও আমি ধনশ্রী সে রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেবেন। তাই আমায় এই কুকৃত্য করতে হল। কিন্তু এখন আমার পশ্চাত্তাপ হচ্ছে। জানিনা কোন জন্মের বৈর আমায়

দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিয়েছে। কতবার চেষ্টা করেছি এই বৈর ভাবনার উর্দ্ধে উঠতে, কিন্তু পারি নি।

সমস্ত শুনে কৌশাম্বী অধিপতি তাকে তাঁর রাজ্য হতে নির্বাসিত করলেন।

কিন্তু ধনশ্রীর এতে কোন দোষ ছিল না। এই জন্মে গুণসেন ধনদেব ও অগ্নিশর্মা ধনশ্রী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল।

[ক্রমশঃ

নীলাঞ্জনা

[জৈন কথানক]

দেবরাজের কুণ্ডলদ্যুতিতে সহসা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নীলাঞ্জনার পারিজাতবনের চিরপ্রফুল্লতা। বৈদূর্য মণির কিরণপ্রবাহে তারা যেন আরো প্রস্ফুটিত হয়।

স্বর্গনটী এই নীলাঞ্জনা। অম্লানকুসুম পারিজাতের মতোই যার যৌবন শোণিমা, বিশ্ব সৌন্দর্যের সারভূত যার বরতনু।

সেই কুণ্ডলদ্যুতি আরো অগ্রসর হয়ে মন্দার কুঞ্জের সেই নিভৃত লতা বাটিকার সম্মুখে এসে স্তব্ধ হয় যেখানে কেতকী পত্রের সুকোমল শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম সুখ অনুভব করে সেই লোকললামা।

সহসা পদপাতে চোখ তুলে তাকায় নীলাঞ্জনা। দেবরাজকে কুঞ্জদ্বারে সমাগত দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ললাট স্পর্শ করে প্রণাম জানায় ঈষৎ আনত হয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে। বলে, আজ আমার কুঞ্জবিতান ধন্য হল আপনার পদপাতে।

স্মিতহাস্য ফুটে ওঠে দেবরাজের ওষ্ঠাধরে। বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে আসতে হল—

বিশেষ প্রয়োজনে? কেমন যেন ব্যথাহত শোনায় নীলাঞ্জনার কণ্ঠস্বর। কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হয় নীলকুবলয় তুল্য তার নয়নদ্যুতি। বলে, অপ্রয়োজনে কি আসতে নেই দেবরাজ?

বিস্মিত হন বাসব। বলেন স্বর্গলোকে এ ধরণের প্রশ্ন কেউ করে না। সেকথা কেন বলছ নীলাঞ্জনা?

চোখের দৃষ্টি আনত করে বলে নীলাঞ্জনা, প্রয়োজনে হৃদয় ভরে না। অপ্রয়োজনের উচ্ছলতাই হৃদয়ের সম্পদ।

বিস্ময়ে বাসবের দৃষ্টি আয়ত হয়।

বলতে থাকে নীলাঞ্জনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নৃত্যে গীতে হাস্যে লাস্যে আমি আপনাদের আনন্দ দিয়ে থাকি, কিন্তু সে আনন্দে আমার আনন্দ নেই।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় দেবরাজের। বলেন এ তুমি কি বলছ নীলাঞ্জনা, স্বর্গলোকে তোমার আনন্দ নেই! এমন অসম্ভব কথা এখানে কেউ কখনো বলে নি, শোনে নি।

সত্যি বলছি দেবরাজ, আমি সবাইকে আনন্দ দান করলেও আমার হৃদয় শুষ্ক মরুস্থলীর মত।

কিন্তু কেন?

কেন ঠিক জানি না। তবে অনেক সময়ই আমার মনে হয় যে আপনাদের কাছে আমার জন্য আমার মূল্য নয়। আমার নৃত্য গীত হাস্য লাস্যর জন্য আমার মূল্য। আমি চাই আমার জন্যও কারু হৃদয়ে একটু বেদনা জাগুক।

উচ্চহাস্য করে ওঠেন দেবরাজ। বলেন, তুমি কি জানো না নীলাঞ্জনা, স্বর্গলোকে বেদনা নেই, অশ্রুবাষ্প নেই, ক্রন্দন নেই, হয়ত হৃদয়ও নেই। এখানে আছে শুধু হর্ষ। অমরার সুধাময় হৃদয় সর্বদাই হর্ষে তরঙ্গিত।

সে হর্ষ আমার নীরস মনে হয়। আমি চাই আমার জন্য কারু নয়নপ্রান্তে ফুটে উঠুক দুই বিন্দু অশ্রুজল।

আশ্চর্য তোমার প্রার্থনা। কিন্তু তা মর্তলোকেই সম্ভব, স্বর্গলোকে নয়।

তবে সেই মর্তলোকেই আমায় প্রেরণ করুন, দেবরাজ।

যে প্রার্থনা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম, সেই প্রার্থনা তুমি নিজে হতে করছ বরনারী। সে প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করব। কিন্তু জানো তার পরিণাম?

জানি দেবরাজ, মৃত্যু। যদি জানি কারু ভালবাসায় আমি অমর হয়ে রয়েছি তবে সেই মৃত্যুই আমার অমৃত।

আদি নৃপতি ঋষভের নৃত্য সভা। মণিমাণিক্য বিজড়িত কাঞ্চন সিংহাসনে বসেছিলেন তিনি স্বর্ণশৈলের সুদূরতা নিয়ে। তেমনি ধ্যান গম্ভীর, তেমনি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। তাঁর হতে যথোচিত দূরত্ব রক্ষা করে বসেছিল মন্ত্রী, রাজকুমার ও পার্ষদের দল। সামনে পঞ্চবর্ণ পুষ্প বলয়বেষ্টিত নৃত্যস্থলী। এই নৃত্যস্থলীতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে নৃত্যগীতে বিনীতার রাজপ্রাসাদ উৎসব মুখরিত করে যায় বিনীতার কলাভিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ রূপসী বারাঙ্গনারা।

এই অবসর্পিণীর শেষ কুলকর নাভির পুত্র এই ঋষভ। শালপ্রাংশু যাঁর বাহু, তরুণ দেবদারুর মতো যৌবনাঢ্য বজ্র নারাচ-সংহনন যাঁর দেহ। কর্মভূমির তিনিই আদি প্রজাপতি। তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে এই নগরী, সর্বকামপূরণ রাজপ্রাসাদ যেখানে পার্থিব কামনার সমস্ত ভোগপকরণ একত্রিত। কিন্তু স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিবৃত হয়ে এই ভোগের মধ্যেও তিনি আছেন অবিচলিত দূরত্ব নিয়ে— রূপ রস গন্ধ স্পর্শ-কাতরতার অনেক উর্দ্ধে যেখানে মানবীয় হর্ষ বিষাদের সঞ্চার হয় না। তাইত যখন কলাভিজ্ঞা রূপসী বারাঙ্গনাদের নৃত্য গীতে বৃদ্ধ বৃদ্ধ মাণ্ডলিকদের হৃদয় দলিত মথিত হয়, তখনো তিনি অবিচলিত ধৈর্যে নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকেন। তরুণ মাণ্ডলিকদের ত কথাই নেই—তাদের কেউ কণ্ঠ হতে গন্ধ পুষ্পের মালিকা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নর্তকীদের মঞ্জরিত চরণের ওপর, কেউ উপহার দেয় মাথার উষ্ণীষ হতে খুলে হৃদয়ের অনুরাগ-রক্ত রক্তকান্ত মণি। কেউ বা হস্ত প্রসারিত করে তুলে নেয় নৃত্য পটিয়সী নর্তকীর কবরীচ্যুত কুসুম কলিকা নিজের বক্ষে ধারণ করবার জন্য। ঋষভদেবের ওষ্ঠ-সন্ধি স্মিত হাস্যে তখন সামান্য বিশ্লিষ্ট হয় মাত্র।

প্রতিদিনের মত সেদিনো বারাঙ্গনারা নৃত্য স্থলীতে নৃত্য করছিল। বিবিধ ধাতব-দান হতে উঠছিল পোড়া শিলারসের গন্ধ। ওরি মধ্যে সহসা নীলকান্ত মণির নীলাভ আলোকে স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করে কোথা হতে এক আবির্ভাবের মতো এসে দাঁড়ায় পুঞ্জীভূত মেঘের কবরী সম্ভারে অসাধারণী এক নারী। সমস্ত নৃত্যস্থলী সহসা চঞ্চলিত হয়ে ওঠে এক বিস্ময়ের চমকে। বিস্ময়ের চমক জাগে আদি প্রজাপতি ঋষভের চোখেও। কেমন যেন নিস্প্রভ দেখায় বিনীতার শ্রেষ্ঠ রূপসীদের।

সভাস্থলের আর এক প্রান্তে উপবিষ্ট বাদকদের কোলে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বাদ্য-যন্ত্রগুলো আবার জাগ্রত হয়ে ওঠে। মুখরিত হয় বীণা, বিপঞ্চী, মন্দিরা ও মৃদঙ্গ। ক্বণিত হয় কঙ্কণ, ধ্বনিত হয় মঞ্জীর। কেবল সভাস্থলেই নয় তার অনুরণন জাগে তৃণাঞ্চিত বনতলে, আকাশের নীলিমায়, দিগন্তের বিস্তারে।

বাসবের অভিপ্রায়ে রাত্রির মধ্যম যাম পর্যন্ত লীলায়িত বাহু বিক্ষেপে, ছন্দায়িত অঙ্গ-হারে স্বরতরলিত কটাক্ষ ধারায় রূপ মাধুরী কণিকা উৎক্ষীপ্ত করে নৃত্য করে শিরীষ-মৃদু-লাঙ্গী নীলাঞ্জনা।

তারপর এক সময় নৃত্য বন্ধ হয়। চম্পক সদৃশ হস্ততল কটিতটে ন্যস্ত করে অপাঙ্গে সে চেয়ে দেখে ঋষভদেবের মুখের দিকে।

স্বমহিমায় তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন নৃপতি ঋষভ। তাঁর দৃষ্টি আজ যেন বহু দূরে প্রসারিত হয়ে গেছে।

নৃত্যস্থলী হতে নেমে আসে নীলাঞ্জনা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় নৃপতি ঋষভের দিকে। নিকটে গিয়ে চোখ তুলে তাকায় নৃপতি ঋষভের মুখে।

কি দেখছ নীলাঞ্জনা, প্রশ্ন করেন নৃপতি ঋষভ।

দেব, যা দর্শনীয়, তাই দেখছি।

কি দর্শনীয়, সুন্দরী।

আপনার সুন্দরপ্রভ মুখের লাবণ্য মহিমা।

হেসে উঠেন ঋষভ। বলেন, নীলাঞ্জনা, স্বর্গের বাসবের চাইতেও কি এই মুখ মণ্ডলের লাবণ্য মহিমা আরো বেশী সুন্দর ?

দেব, অনেক বেশী সুন্দর। তারপর একটু থেমে বলে, স্বর্গের প্রেমে বেদনা নেই। তাই সেই প্রেম আনন্দের শিহরণ তোলে না। সে শুধু হর্ষ। সে হর্ষ আমি চাই না। আমি চাই আমার জন্য কারু চোখে ফুটে উঠুক দুই বিন্দু অশ্রুজল।

আশ্চর্য তোমার কামনা।

সেই কথাই বলেছেন বাসব। আরো বলেছেন, সে মর্ত্যলোকেই সম্ভব।

তার পরিণামের কথা বলেন নি তোমায় বাসব ?

বলেছেন। বলেছেন তার পরিণাম মৃত্যু। আমি মৃত্যু বরণ করেই এসেছি আপনার নৃত্যস্থলীতে। সেই মৃত্যুই আমার অমৃত।

ঋষভ ভাবেন, কি সেই প্রেম, যে প্রেমে বলতে পারে নীলাঞ্জনা মৃত্যুই আমার অমৃত।

সিংহাসনে আর বসে থাকতে পারেন না ঋষভ। ধীরে ধীরে সিংহাসন হতে নেমে আসেন। দাঁড়ান নীলাঞ্জনার সামনে। বলেন, প্রিয়া নীলাঞ্জনা!

নীলাঞ্জনা দুই চক্ষু মুদ্রিত করে। ওষ্ঠ স্পন্দিত হয়। ধীরে ধীরে বলে ওঠে, প্রিয় ঋষভ!

হস্ত প্রসারিত করেন ঋষভ নীলাঞ্জনাকে বাহু বন্ধনে গ্রহণ করবার জন্য। কিন্তু বাসবের অভীপ্সা মৃত্যুর জ্বালা নিয়ে ছুটে আসে, নিরুদ্ধ হয়ে আসে নীলাঞ্জনার নিঃশ্বাস, দেহবন্ধ শিথিল হয়।

প্রিয়া নীলাঞ্জনা! —আর এক বার বলেন ঋষভ।

প্রিয় ঋষভ! শেষ নিঃশ্বাসের ঠিক পূর্ব মূহূর্তে চেয়ে দেখে নীলাঞ্জনা ঋষভের নয়ন প্রান্তে ফুটে উঠেছে দুই বিন্দু অশ্রুজল।

ঋষভের মনে প্রশ্ন জাগে। কি এই প্রেম যা মর্ত্যলোকের ক্ষণিকতাকে অনাস্বাদিত শাশ্বতী আনন্দে পর্যবসিত করে দিয়েছে। ঋষভের চোখের সামনে অবারিত হয় নুতন দিগন্ত। নীলাঞ্জনা ছড়িয়ে যায় আকাশে বাতাসে অনলে জলে স্থলে, কোথাও তার সীমা নাই। তারি রূপে সব কিছু রূপময় হয়ে ওঠে, আনন্দময়।

মস্তক হতে ধীরে ধীরে মুকুট উত্তোলন করেন ঋষভ। তারপর বিনীতার সিংহাসনে তা স্থাপিত করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসেন বিনীতার সর্বকাম পূরণ রাজ প্রাসাদ হতে।

পেছন হতে আর্তনাদ করে উঠে সুনন্দা সুমঙ্গলা, রাজ্যেশ্বর—

সে আহ্বানে সাড়া দেন না ঋষভ। তাঁর দৃষ্টি তখন সুদুর অষ্টাপদের অধিত্যকাবর্তী কুহেলিকা ও অরণ্যের ছায়াঞ্চল অতিক্রম করে চলে গেছে।

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৫'০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন

পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র

৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. IV No. 5 : Sraman September 1976

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. R. N. 24582/73

কার্তিক । ১৩৮৩ চতুর্থ বর্ষ । সপ্তম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮৩ ॥ সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

সাসবহু জৈন মন্দির, গোয়ালিয়র

জৈনমন্দির

জৈনধর্ম ঃ জৈন মন্দিরের বর্ণনা করিবার পূর্বে, জৈনমতের বিষয়ে কিছু বলা বিহিত। ২৪ জন তীর্থংকর ছিলেন। ইঁহাদিগকে জিন অর্থাৎ জয়ী বলা যায়। ইঁহাদিগের মত অবলম্বন করিলে ইঁহাদিগের নির্মিত বাঁধের উপর দিয়া লোকে মরণান্তে ভবসমুদ্র পার হইয়া অবশেষে নির্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়। এইমত বৌদ্ধমতের অনুরূপ তবে বৌদ্ধমত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈন মতাবলম্বীরাও মহান সৃষ্টি কর্তা মানে না; কতকগুলি ধর্ম শিক্ষককে বড় মানে। বর্ণ, আকৃতি ও পরমায়ুর হ্রস্বদীর্ঘতা দ্বারা ইহারা বর্তমান কালের ২৪ জন জিনের পরস্পর ভিন্নতা জানিয়া লয়। প্রথম জিনের নাম ঋষভ; ইনি ৫০০ ধনু দীর্ঘ ছিলেন এবং ৮৪০০০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তৎপরবর্তী জিনের পরমায়ু ৭২০০০০০ বৎসর ও দীর্ঘতা ৪৫০ ধনু। তৎপরবর্তী—জিন গণ ক্রমেই অল্পায়ু ও খর্বকায় হইয়া পড়েন। পার্শ্বনাথ ও মহাবীর নামক তীর্থংকরদ্বয় আয়ু ও দেহাবয়ব বিষয়ে সাধারণ মানুষের ন্যায় ছিলেন। ইঁহারাই শেষ তীর্থংকর। মহাবীর বুদ্ধদেবের প্রায় সমকালবর্তী।

মহাবীরের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত কাহিনী জৈন-গ্রন্থে লিখিত আছে, সে সকলের সহিত বুদ্ধদেবের জন্মসংক্রান্ত কাহিনীর অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবীরের পিতা সিদ্ধার্থ কুণ্ডগ্রামের জমিদার বা রাজা ছিলেন। তাঁহার মাতা ত্রিশলা বৈশালীর রাজা চেতকের ভগিনী ছিলেন। তাঁহার জন্ম রাত্রে স্বর্গীয় দেবাপ্সর-গণ স্বর্গ হইতে ধরাতলে অবতরণ ও উত্তরণ দ্বারা স্বর্গীয়ালোক বিকীর্ণ করেন এবং দেবগণের মহা সমারোহে মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। ২৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত মহাবীর পিতৃগৃহে ছিলেন শেষে গৃহ ও পৈতৃক ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে ধনদান করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মস্তকের কেশ উৎপাটন করতঃ সংসার পরিত্যাগ করেন। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে তিনি সিদ্ধপুরুষ হয়েন। ইহার পরে তিনি ৩০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করেন। সংসার ত্যাগের দ্বিচত্বারিংশ, বোধি প্রাপ্তির ত্রিংস এবং জীবনের ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীর মানবলীলা সংবরণ করেন। বহু ধ্যান ও চিন্তার পরে বুদ্ধ বিজয়ী হয়েন, কিন্তু মহাবীর শারীরিক বহু ও কঠিন ক্লেশ ভোগের পরে জিন বা তীর্থংকর পদ লাভ করেন।

জৈনদিগের দুইটি সম্প্রদায়ঃ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। বোধহয় খ্রীষ্টাব্দের ১ম শতাব্দীর পূর্বে এই দলভেদ জন্মে।

জৈন দিগের মধ্যে যাহারা উদাসীন, তাহাদিগকে যতি (সাধু) ও যাহারা গৃহী তাহাদিগকে শ্রাবক বলে। যতিরা বিবাহ করে না। মুখে একখানি পাতলা কাপড় রাখে (সকলে নয়) পাছে পোকামাকড় প্রবেশ করে; তাহাদিগের হাতে ঝাঁটা (রজোহরণ) থাকে ঝাঁটি দিয়া গন্তব্যপথ হইতে কীটাদি সরাইয়া দেয়; কোন স্থানে বসিতে হইলে ঝাঁটি দিয়া লইতে হয়। প্রাণীহিংসা শ্রাবকের পক্ষেও নিষিদ্ধ, তাহাকে নানা ধর্ম কর্মানুষ্ঠান ও সাধুগণের উপাসনা করিতে হয়। চারিটা গুণের চর্চা করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। তাহা এই—দান, নম্রতা, ধার্মিকতা এবং ত্যাগ স্বীকার। সময় বিশেষে লবণ, ফুল, কাঁচাফল, মূল, মধু, আঙ্গুর ও তামাকু পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ইহারা তিন বার ছাঁকিয়া তবে জল খায়; এবং পানীয় কোন দ্রব্য খোলা রাখে না। অতি যত্নে ঢাকিয়া রাখে, পাছে তাহাতে কোন কীট গিয়া পড়ে। প্রতিদিন কোন মন্দিরে যাওয়া, মন্দিরস্থ মূর্তিকে প্রণাম, ফুল বা ফল উৎসর্গ করতঃ তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করা শ্রাবকের নিত্য কর্তব্য। মন্দিরে একজন করিয়া পাঠক থাকে। কিন্তু পূজারি প্রায়ই ব্রাহ্মণ। কেননা জৈন দিগের নিজের পুরোহিত নাই। অস্থি রাখিবার জন্য বৌদ্ধদিগের যেমন দাগাবা আছে, জৈন দিগের সে প্রকার কিছু নাই। সুতরাং তীর্থংকরদিগের অস্থি বা আর কোন স্মরণ চিহ্ন কোথায়ও নাই। ইহারা আত্মার অস্তিত্ব মানে, কিন্তু বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা মানে না। জৈন দিগের মতে কাষ্ঠে, পাথরে, মাটীতে, জল-বিন্দুতে, অগ্নিকণায় সকল বস্তুতেই আত্মা থাকিতে পারে।

'যথার্থ বিশ্বাস', 'যথার্থ জ্ঞান' ও 'যথার্থ ব্যবহার' (চারিত্র্য) ইহাই জৈনদিগের ত্রিরত্ন ও বুদ্ধ, ব্যবস্থা (ধর্ম) ও সংঘ ইহাই বৌদ্ধ দিগের ত্রিরত্ন। অহিংসা যে পরম ধর্ম এইকথা বৌদ্ধদিগের অপেক্ষা জৈনরা বেশী মানে।

জৈনদিগের স্তোত্রমালা বৌদ্ধদিগের ত্রি-আশ্রয় হইতে অনেক ভিন্ন। সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায় ও সমস্ত সাধুর স্তব করা জৈনদিগের প্রধান কর্ম।

হিন্দুধর্মের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হেতু জৈন ধর্মে অনেক হিন্দুয়ানী প্রবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ও মুরশিদাবাদে অনেক জৈন মতাবলম্বীর বসতি। জৈনদিগের সংখ্যা বড় বেশী নহে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ১, ৪১৬, ৬৩৮ জৈন ছিল। রাজপুতানা ও পশ্চিম ভারতেই অধিকাংশ জৈনের বসতি।

এক্ষণে কয়েকটি প্রধান প্রধান জৈন মন্দিরের বিষয় বলিব।

পার্শ্বনাথ—কলিকাতা হইতে ১৭০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে। ২০টি ছোট ছোট জৈন মন্দির থাকাতে এই পর্বতের নাম বিখ্যাত হইয়াছে। পর্বতটির চারিদিকে সমভূমি।

ইহা দীর্ঘাকার, অতি অপ্রশস্ত। •প্রধান শিখরটি সমুদ্র হইতে ৩২৪ হাত উচ্চ। এই চূড়াটিকে জৈনরা 'সম্মেদশিখর' বলে। এই পর্বতের নানা চূড়ায় ২০টি মন্দির আছে।

জৈনরা বলে, তাহাদিগের ২৪ জন তীর্থংকরের ২০ জন এই পবিত্র পর্বতে নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ত্রয়োবিংশ তীর্থংকরের নাম ছিল পার্শ্বনাথ। তদনুসারে এই পর্বতকে পার্শ্বনাথ বলা হয়। এই স্থলে ২০ জন তীর্থংকরের নির্বাণ হইয়াছে। মন্দিরগুলি হয় সেকেলে, না হয় আধুনিক। যদি সেকেলে হয়, তবে অনেক মেরামত করা হইয়াছে। মন্দিরগুলি পাথরের। কোন কোন মন্দির বড় সুন্দর। একটি মন্দির শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত। দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহার নির্মাণ কার্যে ৮০,০০০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে।

সাসবহু মন্দির, গোয়ালিয়র—ষষ্ঠ তীর্থংকর পদ্মনাভের নামে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। কেবল বারাণ্ডার খানিকটা এখন আছে। তাহাই ৬৬ হাত লম্বা ও ৪২ হাত চওড়া। মন্দিরের বাকিটার কেবল ভিত মাত্র আছে। বারাণ্ডাটা তেতালা। ইহার আর সকলই এক প্রকার ভাল অবস্থায় আছে, কেবল ছাদ ফাটিয়া গিয়াছে। ইহার বহির্ভাগে মানুষ, পশু, পক্ষী, ফুল ইত্যাদি খোদা। মধ্যস্থলে একটা দালান আছে, তাহা চতুষ্কোণ ; দৈর্ঘে প্রস্থে ২০ হাত। তাহাতে চারিটা থাম আছে, সেই থামের উপরে প্রকাণ্ড গুম্বুজের আকার ছাদ। ছাদে ও থামে নানা কারুকার্য।

পর্বতের সম্মুখভাগে পাহাড় কাটিয়া যে সকল মূর্তি প্রস্তুত হইয়াছে, গোয়ালিয়রে তদ্রূপ চমৎকার কারুকার্য জৈনদিগের আর নাই। অন্যূন ১০০ মূর্তি আছে। কোনটা এত প্রকাণ্ড যে প্রায় ৪০ হাত উচ্চ। কোনটা আবার তিন চারি হাত উচ্চ। ১৮টী মূর্তি ১৪ হাতের অধিক উচ্চ। ইহার অধিকাংশই প্রথম তীর্থংকর আদিনাথের মূর্তি। ইঁহার বাহন (লাঞ্ছন) ষাঁড়। দ্বাবিংশ তীর্থংকর নেমিনাথের এক বসা মূর্তি আছে। ইহা ২০ হাত উচ্চ। ইঁহার বাহন (লাঞ্ছন) শংখ। খ্রীষ্টাব্দের ১৪৪১ হইতে ১৪৭৪ সাল পর্যন্ত ৩৪ বৎসরের মধ্যে এই সকল খোদিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ

রেবতী

[কথানক]

কোবিদার তরুর ছায়াতলে দাঁড়িয়ে পোষধ শালার দিকে তাকিয়ে থাকে সতৃষ্ণ নয়নে গাথাপতি মহাশতক পত্নী রেবতী। সেই তাকিয়ে থাকার যেন শেষ নেই। কারণ সেই পোষধশালার অভ্যন্তরে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন গাথাপতি মহাশতক। মহাবীরের কাছে দীক্ষিত হয়ে ধর্মজাগরণা করে এসেছেন তিনি দীর্ঘ বারো বছর। এখন নিজেকে সম্পূর্ণ কর্ম বিমুক্ত করে নিয়েছেন।

কিন্তু রেবতী ত নিজেকে সমস্ত কর্ম হতে বিমুক্ত করে নেয়নি। তিলাঞ্জলি দেয়নি সমস্ত রকম জাগতিক সুখ ভোগে। সে চায় স্বামীর নিকট ও নিবিড় সান্নিধ্য, হৃদয়ের উষ্ণতা। তরুণী রেবতীর হৃদয়ত শুষ্ক মরুস্থলী নয়। তার চোখে রতিরভসের স্বপ্ন, বুকে প্রেমকেলিকামিনীর পিপাসিত বাসনা। কিন্তু সেই পোষধ শালায় তার প্রবেশের অধিকার নেই।

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় কিন্তু রেবতীর আনন্দহীন দিন যেন আর অতিক্রান্ত হতে চায় না। কতদিন তার মনে হয়েছে কি করে তার নয়নের এই আবেদন বিস্মৃত হয়ে ধর্ম জাগরণায় ব্যাপৃত হয়ে রয়েছেন মহাশতক। তাঁর মনে কি তাকে নিকটে পাবার একটুখানি ইচ্ছা কখনো জাগ্রত হয় না। যদি না হয় তবে ব্যর্থ অভিসারে শুধু চরণ ক্লান্ত করে লাভ কি? অতনুতাপিত তনুর দুর্ধর তৃষা নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে যাবারই বা কি প্রয়োজন? কিন্তু না—এভাবে তার যৌবনময় জীবনকে সে অধঃপতিত জ্যোৎস্নার মত ধূলিপুঞ্জের ওপর পড়ে থাকতে দিতে পারে না? তাঁকে সে জাগ্রত করবে। আহ্বান করবে তার যৌবন সলীলে অবগাহন করে তাপদগ্ধতনু শীতল সিক্ততায় লিপ্ত করার জন্য। তিনি কি সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারবেন?

শেষে মনঃস্থির করে ফেলে রেবতী।

সময় মধ্যরাত্রি। নিশাবসানের তখনো অনেক বাকী। উদ্যানের কোকিল কূজন বন্ধ করেছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই এক মহানৈঃশব্দ ছাড়া। পোষধশালা অন্ধকার। সেই পোষধশালার নিভৃত কক্ষে ধর্মজাগরণায় একাকী বসে রয়েছেন গাথাপতি মহাশতক। সহসা রত্ননুপুরের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে সেই নিভৃত কক্ষের কুট্টিম তল। রেবতী সমস্ত বাধা ও নিষেধ উপেক্ষা করে মদালস যৌবনের সমস্ত সৌরভ নিয়ে মহাশতকের সামনে এসে দাঁড়ায় অমরেশ্বর ইন্দ্রের অমরাপুরীর শতরত্নভূষিতা এক প্রমদার মত।

মহাশতক তেম্‌নি স্থির ও অচঞ্চল।

সহসা উচ্চকিত হাস্যে সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে প্রশ্ন করে রেবতী, আমায় কি চিনতে পার, স্বামি?

গন্ধ তৈলের প্রদীপ জেলে দিয়ে যায় কিঙ্করী। বিকীর্ণ হয় আলো। সেই আলোয় দীর্ঘ হয়ে ছায়া পড়ে রেবতীর মহাশতকের গায়ে। কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর আসেনা।

আরো উচ্চকিত হাস্যে সেই নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় রেবতী। বলে, বল্লভ, তুমি চোখ তুলে তাকাও। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমার দিকে তাকালে তুমি ধর্ম হতে চ্যুত হবে না।

তবু নিরুত্তর থাকেন মহাশতক।

লীলায়িত বাহুক্ষেপে শিথিল করে দেয় রেবতী মণিস্তবকিত বেণী, শিথিলিত হয় স্তোকোৎফুল্ল বক্ষের স্বচ্ছ অংশুক বসন, মৌক্তিক নির্ঝরের মত ঝরে পড়ে কণ্ঠের একাবলী হার।

মহাশতকের আরো নিকটে এসে বলে রেবতী, প্রিয় চোখ তুলে তাকাও, দেখ। এই নারীকে দেখে তোমার লোভ হয় না কি—

মহাশতক কোনো প্রত্যুত্তর দেন না।

নিজের মধ্যে নিজে মরে যায় রেবতী। নারী দেহের সৌন্দর্য দিয়েও কি সে আকর্ষণ করতে পারবে না এক পুরুষ হৃদয়?

রেবতীর নিভে যাওয়া নয়নের তৃষ্ণালস দৃষ্টি সহসা চকিত তড়িল্লেখার মত ক্ষণলাস্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর প্রগল্‌ভার হাসি হেসে বলে, তোমার লোভ হয় না, না হোক, কিন্তু লুব্ধ হয়েছেন শ্রেষ্ঠী সুপ্রিয়। তুমি যদি প্রত্যাখ্যান করো তবে আমি চলে যাব তাঁর প্রমদোদ্যানে। তিনি আমায় গ্রহণ করবেন তাঁর বিশাল বক্ষপটে। এই রত্নভূষণ তাঁরই উপহার। আজ আমার আশ্রয় হবে অতিবদান্য সুপ্রিয়র বৈদুর্য খচিত শয়ন পর্যঙ্ক।

নিজের অজ্ঞাতসারেই চক্ষু উন্মীলিত হয় মহাশতকের। তাঁর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় রেবতীর মুখের ওপর।

উচ্চকিত হাসিনী প্রগল্‌ভা রেবতী দুর্বলা লতিকার মত সহসা লুটিয়ে পড়ে মহাশতকের পায়ে। বলে, স্বামি, একবার লুব্ধ হও, নিমিষের মত লুব্ধ হও। আমি একান্ত তোমারই। আমি যে কথা এখন উচ্চারণ করেছি তা সত্য নয়। দেখো, চেয়ে দেখো আমার মুখের দিকে।

দৃষ্টি উত্তোলন করেন মহাশতক যে দৃষ্টিতে অনুরাগ নেই, বিরাগ নেই, সান্ত্বনা নেই, উষ্মা নেই, নিস্পৃহ নিরাসক্ত সেই দৃষ্টি। বলেন, ঘরে ফিরে যাও রেবতী।

মহাশতকের পায়ের ওপর মাথা রেখে বলে রেবতী, ফিরে যেতে আমি আসি নি। আমি চাই তোমার প্রশস্ত বক্ষপুটের আশ্রয়।

মহাশতক বলেন, তারপর?

তারপর আমরা শুধু দুজন।

তা হয় না, বলেন মহাশতক।

লুণ্ঠিত দেহভার তুলে উঠে দাঁড়ায় রেবতী। শান্ত দৃষ্টি তুলে তাকায়। তারপর সহসা অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ে। বলে, ধর্ম তোমায় কি দিতে পারে যা আমি তোমায় দিতে পারি না? স্বর্গের অপ্সরার বাহুবন্ধন কি আমার বাহুবন্ধনের চাইতেও আরো বেশী সুখকর?

দৃষ্টি উত্তোলন করেন না মহাশতক।

আর একবার অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ে রেবতী। চঞ্চল নিঃশ্বাস সংবরণের জন্য শান্ত হয় মুহূর্তের জন্য। তারপর বেপথুভঙ্গা ভামিনীর মত কৌতুক তরল নেত্রান্ত সমুত্তিত করে হাস্য চঞ্চল স্বরে কিঙ্করীকে ডাক দিয়ে বলে, নূতন আভরণে সাজিয়ে দে কিঙ্করী। নিয়ে আয় ইন্দ্রনীলের কণিকা দিয়ে রচিত নূতন মণিহার।

বাহিরে অপেক্ষমান কিঙ্করী কক্ষে প্রবেশ করে, সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকায়।

হেসে বলে রেবতী, কি দেখছিস, যা নিয়ে আয় সেই স্বর্ণ বিনির্মিত দুটী হংসক কলহংস কণ্ঠের চেয়েও মধুর যার নিঃস্বন। আর সেই সূক্ষ্ম ক্ষৌম বসন—

এবার হেসে ওঠে কিংকরী। বলে, এমন করে সকল রত্নাভরণে ভূষিত হয়ে কোন স্বপ্নের দেবতাকে বন্দনা করবে, স্বামিনি?

সেই স্বপ্নের দেবতা যে-সংকেত-গৃহে আমার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে। জানিস কিঙ্করী, সেই দেবোপম কান্তি প্রেমিকের বিশাল তৃষ্ণ দুটি চোখের সম্মুখে আমি যেন দাঁড়িয়ে রয়েছি। হারিয়ে গিয়েছে আমার সমস্ত রত্নাভরণ, কেয়ূর, কাঞ্চী, মঞ্জীর ও মৌক্তির হার। তারপর অপাঙ্গ নেত্রে চেয়ে দেখে মহাশতকের দিকে।

আর চুপ করে থাকতে পারেন না মহাশতক। বলেন, রেবতী, সুরাপান করে কি উন্মত্ত হয়ে এসেছে?

রহস্যময় হাসি হেসে বলে রেবতী, হাঁ, পান করেছি সেই ফেনিল চসক যা অগ্নির মত ছড়িয়ে গেছে আমায় দেহের রক্ত কণিকায়। কিন্তু কেন? ধর্ম? থুঃ! যে ধর্ম হৃদয়ের সুকোমল ভাবনাকে দলিত মথিত করে যায় সে ধর্ম আমি মানি না।

নিশ্চুপ থাকেন মহাশতক।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলে রেবতী, স্বামি, এখনো সময় আছে। ফিরিয়ে নাও আমাকে। আশ্রয় দাও তোমার ক্রোড়ে।

মহাশতক নিরুত্তর।

দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে ফিরে দাঁড়ায় রেবতী। চেয়ে দেখে মহাশতকের দিকে। ভাবে এই বিস্তৃত বক্ষপটের অন্তরালে কি অনুরাগ নেই, ফুল্লকুবলয় সদৃশ চক্ষু দুটি কি অকারণে নীলিম? তার হৃদয়ের বেদনা কি বুঝতে পারে না তার দয়িত না তার সঙ্কল্প কুলিশ কঠোর?

এক পা এক পা করে নিকটে এসে দাঁড়ায় রেবতী। নতজানু হয়ে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত জড়িয়ে ধরতে যায় নিশ্চল দেবদারুর মত স্থির মহশতকের যৌবনাঢ্য দেহ।

রূঢ় হস্তে সরিয়ে দেন তাকে মহাশতক। বলেন, এত বিমূঢ়া হয়ো না রেবতী। আমি দেখতে পাচ্ছি এক নির্দিষ্ট অবধির মধ্যে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে তুমি মৃত্যু প্রাপ্ত হবে।

বিত্রস্ত উঠে দাঁড়ায় রেবতী। কি যেন বলতে চায় কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফোটে না। কেমন যেন এক মৃত্যু শীতল আতঙ্ক তার সর্বদেহে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তার অসিত নয়নে কেমন যেন অনুভব করে এক বিদ্যুতের জ্বালা, ভীরু ভ্রূলতায় খর গ্রীষ্মবায়ুর আঘাত।

চীৎকার করে উঠতে চায় রেবতীর অন্তঃসত্বা—না না না। কিন্তু—

রেবতী আর থাকতে পারে না সেখানে। এক ছুটে পালিয়ে আসে।

প্রভাত হয়। নবীনার্ক কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে দিগ্‌মণ্ডল। বিহগের কাকলী ও মধুপের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে বনস্থলী। কিন্তু সেই আলোক ও আনন্দের রশ্মি প্রবেশ করে না রেবতীর রুদ্ধদ্বার শয়ন কক্ষে।

অকস্মাৎ পদপাত হয় পৌষধশালার দ্বারে আর্য গৌতমের।

মহাশতক উঠে দাঁড়ান। প্রণিপাত করেন দূর হতে।

গৌতম আসন পরিগ্রহ করে বলেন, মহাশতক, ভগবানের কাছে হতে অনুযোগ নিয়ে এসেছি। গাথাপত্নী রেবতীর প্রতি তোমার আচরণ নিন্দনীয়। অনিষ্ট কথনের জন্য তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর।

মাথা নীচু করে নেন মহাশতক।

প্রশ্নোত্তরে জৈন তত্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

৮৫ প্রঃ দর্শনাবরণীয়-কর্ম কাহার নাম ?

৮৫ উঃ যে কর্মদ্বারা দর্শন অর্থাৎ সামান্য-আকার জ্ঞানের নিরোধ হয়—তাহাই দর্শনাবরণ নামে অভিহিত।

৮৬ প্রঃ মোহনীয় কর্মের স্বরূপ কি ?

৮৬ উঃ যে কর্ম দ্বারা মোহ অর্থাৎ আত্মবিভ্রম উৎপন্ন হয় তাহাকে মোহনীয় কর্ম বলে।

৮৭ প্রঃ মোহনীয় কর্মে কি কি ভেদ আছে ?

৮৭ উঃ মোহনীয় দ্বিবিধ—দর্শন মোহনীয় ও চারিত্র মোহনীয়।

দর্শন মোহনীয়—যদ্বারা দেব, গুরু, শাস্ত্র, জীব, অজীব প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্বাস বিনষ্ট বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহা তিন প্রকার—সম্যকত্ব, মিথ্যাত্ব ও সম্যক্-মিথ্যাত্ব।

চারিত্র মোহনীয়—যদ্বারা আমাদের চিত্ত এতদূর ভ্রান্তির বশবর্তী হয় যে কায়িক, বাচনিক, মানসিক সর্বপ্রকার সমুচিত ব্যবহারই একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়।

৮৮ প্রঃ চারিত্র মোহনীয় কর্ম কি কি ?

৮৮ উঃ হাস্য, রতি, অরতি, শোক, ভয়, জুগুপ্সা, স্ত্রীবেদ, নপুংসক-বেদ পুরুষ-বেদ (বেদ—অনুরাগ) এই নববিধ অকষায় ও ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ এই চতুর্বিধ কষায়। ইহার প্রত্যেক কষায় অনন্তানুবন্ধী, অপ্রত্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যান ও সংজ্বল এই চতুর্বিধ, সুতরাং ভেদ সহিত কষায় ষোল প্রকার ও নয় প্রকার অকষায়। এই পঞ্চবিংশতি প্রকারকে চারিত্র মোহনীয় কর্ম বলে।

৮৯ প্রঃ অন্তরায় কর্ম কি প্রকার ?

৮৯ উঃ যে কর্ম দান, লাভ, ভোগ, উপভোগ, উৎসাহাদির প্রতি-বন্ধকতা সম্পাদন করে, তাহাকে অন্তরায় কর্ম বলে।

৯০ প্রঃ বেদনীয় কর্ম কাহার নাম ?

৯০ উঃ যে কর্ম-প্রভাবে জীবগণ সুখ-দুঃখ কারক বিষয় রাশিকে গ্রহণ করে।

৯১ প্রঃ বেদনীয় কর্মের ভেদ কি ?

৯১ উঃ বেদনীয় দ্বিবিধ—সৎ ও অসৎ। সদ্বেদনীয় দেবত্ব, রাজত্ব, ঐশ্বর্য্যাদি সুখ

জনক বিষয়ে মগ্নত্বকারক কর্ম। অসদ্বেদনীয় নরকাদি যাতনাময় অবস্থায় দুঃখানুভব সম্পাদক কর্ম।

৯২ প্রঃ আয়ুকর্ম কাহাকে বলে?

৯২ উঃ যে কর্ম দেব, মনুষ্য, তির্যক, নারকী এই চতুর্বিধ জীবের তত্তৎ শরীরে অবস্থিত কালের মর্যাদা (পরিমাণ) করে তাহাকে আয়ু কর্ম কহে।

৯৩ প্রঃ গোত্র-কর্ম কিরূপ?

৯৩ উঃ যাদৃশ কর্ম ফলে জীবকে উত্তম অধম কুলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তজ্জন্য ইহা উত্তম ও অধম দুই প্রকার।

৯৪ প্রঃ নাম কর্মের আকার কি?

৯৪ উঃ যে কর্মদ্বারা জীবের জাতিগত, যোনিগত, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিগত অবস্থা বিশেষ পরিণত হয় তাহাকে নাম কর্ম বলে।

৯৫ প্রঃ দ্রব্যাস্রব কয় প্রকার?

৯৫ উঃ সাম্পরায়িক ও ঈর্যাপথ ভেদে দ্রব্যাস্রব দুই প্রকার।

৯৬ প্রঃ সাম্পরায়িক আস্রবের স্বরূপ কি?

৯৬ উঃ কষায় (ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ) সহিত জীবে যে আস্রব হয় অর্থাৎ যে আস্রবের কর্ম স্থিতিবন্ধ প্রাপ্ত হয় ও অপর কর্মাশ্রবের হেতু হয়, তাহাকে সাম্পরায়িক আস্রব কহে।

৯৭ প্রঃ ঈর্যাপথ আস্রব কিরূপ?

৯৭ উঃ কষায় রহিত জীবের যে আস্রবে কর্ম স্থিতি লাভ করিতে পারে না, তাহাকে ঈর্যাপথ আস্রব বলে। (উপশান্ত কষায়, ক্ষীণ কষায়, সযোগ-কেবলী ও অযোগ-কেবলী এই চতুর্বিধ গুণস্থানবর্তী জীবের উক্ত ঈর্যাপথ আস্রব হইয়া থাকে।

৯৮ প্রঃ ভাবাস্রব কি প্রকার?

৯৮ উঃ যাদৃশ কর্মাস্রব হইতে মিথ্যাত্ব, অবিরতি (পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ও মনের অসংযম এবং দয়ার অভাব), প্রমাদ (ভাল কার্যে অনুৎসাহ), কষায় প্রভৃতি অশুভভাব এবং দান ব্রতাদি শুভ কর্মের সঙ্কল্পাত্মক শুভ ভাব সমুদিত হয়, তাহাকে ভাবাস্রব বলে।

৯৯ প্রঃ সাম্পরায়িক আস্রবের কারণ কি?

৯৯ উঃ পাঁচ ইন্দ্রিয়, চার কষায়, পাঁচ অব্রত ও পাঁচিশ ক্রিয়া।

১০০ প্রঃ পাঁচ অব্রত কি কি?

১০০ উঃ হিংসা, মিথ্যাভাষণ, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ এই পাঁচটীকে অব্রত বলে।

১০১ প্রঃ পঞ্চবিংশতি ক্রিয়া কি?

১০১ উঃ (১) সম্যক ক্রিয়া—সদ্দেব, গুরু ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবর্দ্ধিনী ক্রিয়া।

(২) মিথ্যাত্ব—কুদেব, গুরু ও শাস্ত্রের স্তবনাদি ক্রিয়া।
(৩) প্রয়োগ—শরীরাদি হইতে গমন আগমনাদি প্রবর্তনা।
(৪) ঈর্যাপথ—পথ দেখিয়া গমনানুকূল ক্রিয়া।
(৫) প্রদোষিকী—ক্রোধজ ক্রিয়া।
(৬) কায়িকী—দুষ্টতা-নিমিত্ত উদ্যম।
(৭) আধিকরণিকী—হিংসোপকরণ শস্ত্রাদি গ্রহণ।
(৮) সমাদান—অবিরতির নিকট সংযমীর আগমন।
(৯) পারিতাপিকী—স্বকীয় ও পরকীয় *দুঃখোৎপাদন।*
(১০) প্রাণাতিপাতিকী—আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়, বল, শ্বাসোচ্ছ্বাস প্রাণের হানি করণ।
(১১) দর্শন—রাগাদি প্রমাদ-বশবর্তী হইয়া রূপ অবলোকন।
(১২) স্পর্শন—প্রমাদ পরতন্ত্র হইয়া স্পর্শন প্রভৃতি।
(১৩) প্রাত্যয়িকী—বিষয়ের নূতন কারণ উদ্ভাবন।
(১৪) সমন্তানুপাত—স্ত্রীপুরুষাদির শয়নাদি স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ।
(১৫) অনাভোগ—স্থান বিচার না করিয়া উপবেশনাদি।
(১৬) স্বহস্ত—অন্যদ্বারা সাধন যোগ্য কর্মের স্বয়ং অনুষ্ঠান।
(১৭) নিসর্গ—পাপ জনক প্রবৃত্তির সম্মতি বা অনুমতি।
(১৮) বিদারণ—আলস্যবশত প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠান বা অন্যকৃত পাপ আচরণের প্রকাশ করা।
(১৯) আজ্ঞাব্যাপাদিকী—চারিত্রমোহের উদয় হেতু তত্বজ্ঞের আজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইয়া অন্য প্রকার করা।
(২০) অনাকাঙ্খা—প্রমাদ বা অজ্ঞানতা নিবন্ধন তত্বজ্ঞের উপদেশে অনাদর করা।
(২১) প্রারম্ভ—ছেদন ভেদনাদি কর্মে তৎপরতা বা অন্যকৃত ছেদনাদিতে আনন্দলাভ।
(২২) পারিগ্রাহিকী—পরিগ্রহ রক্ষা নিমিত্ত প্রবৃত্তি।
(২৩) মায়া—জ্ঞান দর্শনাদিতে কপট উপায়।
(২৪) মিথ্যা দর্শন—মিথ্যাত্বের কার্য বা মিথ্যাকারীর অনুষ্ঠানে দাঢ্যত্ব স্থাপন।
(২৫) অপ্রত্যাখ্যান—সংযম-খ্যাতি কর্মের উদয় বশতঃ সংযমরূপে অপ্রবৃত্তি।

১০২ প্রঃ আত্মার কিরূপ অবস্থা হইলে আস্রব হয়?[১]

[১] তীব্রভাব, মন্দভাব, জ্ঞাতভাব, অজ্ঞাতভাব, অধিকরণ, বীর্য এই সমস্তের বিশেষত্ব (ন্যূনাধিকত্ব) নিবন্ধন আস্রবেরও ন্যূনাধিকত্ব হয়।

১০২ উঃ শরীর, বাক্য ও মন এই তিনটির প্রত্যেকের যোগে আত্মার সংকল্পাত্মক ভাব হয়, ঐ সঙ্কল্পাত্মক ভাব হইতে আত্মার যোগ (যোগ) শক্তির চপলতার আকর্ষণে কর্মের আস্রব হয়।

১০৩ প্রঃ কায় যোগ, বাক্য যোগ ও মনোযোগ কিরূপ ?

১০৩ উঃ বীর্যান্তরায় কর্মের ক্ষয়োপশম হইলে ঔদারিকাদি সপ্তবিধ কায়যোগ আত্মার প্রদেশে স্পন্দন হওয়াকে কায়যোগ বলে। বীর্যান্তরায় ও সত্য ক্ষয়াদি আবরণের ক্ষয়োপশম হইতে প্রাপ্ত বাগ্‌লব্ধি সান্নিধ্য দ্বারা বাক্যের পরিণাম বিশেষের সম্মুখবর্তী আত্মার চলন হওয়াকে বাগ্‌যোগ বলে। এবং আভ্যন্তরীণ বীর্যান্তরায় ও নো (?) ইন্দ্রিয় আবরণের ক্ষয়োপশম রূপ মনোলব্ধির নৈকট্য দ্বারা বাহ্য ও উক্ত নিমিত্তের অধীন মনঃ পরিণামের সম্মুখ আত্মার সংকল্প হওয়াকে মনোযোগ বলে।

১০৪ প্রঃ বন্ধের স্বরূপ কি ?

১০৪ উঃ "সকষায়ত্বাজ্জীবঃ কর্মণো যোগ্যান্ পুদ্‌গলান্ আদত্তে স বন্ধঃ।" অর্থাৎ জীব কষায়ের যোগ দ্বারা কর্মোৎপাদক যোগ্য পুদ্‌গলের গ্রহণ করে, সেই গ্রহণই বন্ধ। সমগ্র লোক পুদ্‌গল-পরমাণু দ্বারা পূর্ণ, কার্মণ বর্গণাও সর্বত্রই আছে ; যখন আত্মা কষায় সহিত ও কায়বাকমনোযোগ দ্বারা সঙ্কল্পাত্মক ভাব যুক্ত হয়, তখন চতুর্দিকে ব্যাপ্ত কার্মণবর্গণা কর্মরূপ হইয়া আত্মার সহিত সম্বদ্ধ হয়, ইহাকেই কর্ম বন্ধ বা বিজাতীয় বন্ধ বলে।

১০৫ প্রঃ বন্ধ কত প্রকার ?

১০৫ উঃ চার প্রকার—প্রকৃতি বন্ধ, স্থিতি বন্ধ, অনুভাগ বন্ধ ও প্রদেশ বন্ধ।

১০৬ প্রঃ প্রকৃতি বন্ধ কিরূপ ?

১০৬ উঃ (পূর্বে উক্ত হইয়াছে) কর্ম—জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র, অন্তরায় এই আট প্রকার। জ্ঞানাবরণ—প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত করা ; দর্শনাবরণ—দর্শন অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানকে আবরণ করা, বেদনীয়—সুখ দুঃখ জন্মান ; মোহনীয়—মদ্য ধতুরাদির ন্যায় মোহ উৎপাদনকারী, আয়ু—এই কর্মের স্বভাব মর্যাদা (সীমা) বদ্ধ শরীর বিশেষে আত্মাকে আবদ্ধ রাখা, নাম—সাঙ্গোপাঙ্গ শরীর রচনা, গোত্র—উচ্চ নীচ কুলে উৎপত্তি করান এবং অন্তরায়—আত্মার বীর্য। দান, লাভ, ভোগ, উপভোগ প্রভৃতিতে বিঘ্নোৎপাদন করা। কর্মের এই প্রকার স্বভাব হওয়াকে প্রকৃতি বন্ধ বলে।

১০৭ প্রঃ স্থিতি বন্ধাদি কিরূপ ?

১০৭ উঃ উক্ত আট প্রকার কর্মপ্রকৃতি আত্মার প্রদেশে বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া যাবৎকাল পর্যন্ত নিজ ফল প্রদান করিয়া আত্মার সত্তাকে পরিত্যাগ না করে, সে পর্যন্ত উক্ত বন্ধকে স্থিতিবন্ধ বলে। এবং যে, যেরূপ গো মহিষাদির দুগ্ধে অল্পরস অধিক রস থাকে,

সেইরূপ কর্মের তীব্র মন্দাদি ফলোৎপাদক শক্তি প্রকট হওয়ার নাম অনুভাগ বন্ধ বা অনুভব বন্ধ। উক্ত আটপ্রকার কর্মের আত্মার প্রদেশে নিজ নিজ ভিন্ন সংখ্যা লইয়া এক ক্ষেত্রাবগাহী সম্বন্ধ হওয়াকে প্রদেশ বন্ধ বলে।

১০৮ প্রঃ জ্ঞানাবরণাদি অষ্টবিধ মূল কর্মের অষ্ট প্রকৃতির ভেদ বা উত্তর প্রকৃতি কত প্রকার ?

১০৮ উঃ জ্ঞানাবরণের পাঁচ, দর্শনাবরণের নয়, বেদনীয়ের দুই ও মোহনীয়ের অষ্টাবিংশতি, আয়ুর চার, নামকর্মের দ্বিচত্বারিংশৎ, গোত্রকর্মের দুই এবং অন্তরায় কর্মের পাঁচ প্রকার ভেদ। জ্ঞানাবরণের পাঁচ প্রকার ভেদ ও বেদনীয়ের দুই প্রকার ভেদ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

১০৯ প্রঃ দর্শনাবরণের প্রকার ভেদ কি কি ?

১০৯ উঃ চক্ষুর্দর্শনাবরণ, অচক্ষুর্দর্শনাবরণ, অবধিদর্শনাবরণ, কেবলদর্শনাবরণ, নিদ্রা, নিদ্রা নিদ্রা, প্রচলা, প্রচলা প্রচলা ও স্ত্যান-গৃদ্ধি এই নয়টি দর্শনাবরণের নয় প্রকৃতি।

১১০ প্রঃ মোহনীয়াদি কর্মের প্রকৃতি ভেদ কি কি ?[১০]

১১০ উঃ দর্শন মোহনীয় ৩ প্রকার ও চারিত্র মোহনীয় ২৫ প্রকার। মোহনীয় কর্মের এই ২৮ প্রকৃতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আয়ুঃ কর্মের দেব নারকী তির্যক মনুষ্য ভেদে দেব ৪ প্রকার প্রকৃতি। নাম কর্মের গতি, জাতি, শরীর, অঙ্গ, উপাঙ্গ নির্মাণ, বন্ধন, সংঘাত, সংস্থান, সংহনন, স্পর্শ, রস গন্ধ, বর্ণ, আনুপূর্বী, অগুরু-লঘু, উপঘাত, পরঘাত, আতপ, উদ্যোত, উচ্ছ্বাস, বিহায়গতি এবং প্রত্যেক শরীর ত্রস, সুভগ, সুস্বর, শুভ, সূক্ষ্ম, পর্যাপ্তি, স্থির, আদেয়, যশ, কীর্তি ও সাধারণ শরীর, স্থাবর, দুর্ভগ, দুঃস্বর, অশুভ, স্থূল, অপর্যাপ্তি, অস্থির, অনাদেয়, অবশকীর্তি তীর্থংকরত্ব এই ৪২ প্রকার প্রকৃতি। ইহাদিগেরও অবান্তর প্রকৃতি ধরিলে নাম কর্মের ৯৩ প্রকৃতি ভেদ হয়।

গোত্রকর্মের উচ্চনীচ দুই ভেদ, অন্তরায় কর্মের দান, লাভ, ভোগ উপভোগ বীর্য ভেদে—দানান্তরায় প্রভৃতি পাঁচ প্রকার ভেদ।

১১১ প্রঃ সজাতীয় বন্ধ কিরূপ ?

১১১ উঃ পুদ্গলের সহিত পুদ্গলের বন্ধকে সজাতীয় বন্ধ বলে।

[ক্রমশঃ

১৭ চক্ষুর্দর্শনাবরণ ফল—অন্ধত্বাদি নেত্রদোষ। অচক্ষুর্দর্শনাবরণ—নেত্রেতর ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্যতা। অবধিদর্শনাবরণ—অবধি দর্শন না হওয়া। কেবলদর্শনাবরণ—কেবল দর্শন না হওয়া। নিদ্রা—নিদ্রা। নিদ্রা-নিদ্রা—গাঢ় নিদ্রা। প্রচলা—শোকাদি দ্বারা অনিদ্রা অবস্থারই অনুভব শক্তি হারক বিকার বিশেষ (বসিয়া বসিয়া ঝিমান)। প্রচলা-প্রচলা—প্রচলারই আতিশয্য। স্ত্যান-গৃদ্ধি—নিদ্রার পর লোক কোন গুরুতর কার্য করিয়া আবার নিদ্রাভিভূত হয়, পরে নিদ্রান্তে নিদ্রার মধ্যবর্তী সেই কর্ম স্মরণ করিতে পারে না।

নাগিলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গ্রাম পথ। আগে আগে ভবদত্ত চলেছেন, পেছনে পেছনে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভবদেব। সামনে হতে শ্রীমন্ত মালী আসছে। ভবদেবকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছে]

শ্রীমন্ত : আমি আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

ভবদেব : কেন?

শ্রীমন্ত : একটা দুর্লভ জাতীয় ফুলের মঞ্জরী পেয়েছি সেইটে আপনাকে দেবার জন্য। আপনি ফুল বড্ড ভালোবাসেন তাই।

ভবদেব : [শ্রীমন্তর হাত হতে মঞ্জরী নিয়ে] দেখি দেখি।

[শ্রীমন্ত ফুলের মঞ্জরী বার করে ভবদেবের হাতে দেয়]

ভবদেব : সত্যিইত অপূর্ব সুন্দর। এ তুমি কোথায় পেলে শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত : সেকথা এখন আমি ভাঙব না। তবে শুনেছি হিমালয়ের দুরধিগম্য উপত্যকায় যখন বরফ গলে যায় তখন এই ফুল ফোটে, অন্যখানে নয়।

ভবদেব : তাই বুঝি। সেইজন্যই এমন মঞ্জরী আগে কখনো দেখিনি। নীলরঙের কি সমারোহ। কোথাও হাল্কা কোথাও গাঢ়। তার ওপর সাদা রঙে অপূর্ব কাজ। কোন চিত্রকারের তুলিকা এমন তৈরী করতে পারবে না। নাগিলাকে সুন্দর মানাবে…কিন্তু কি বিপদেই না পড়া গেছে!

শ্রীমন্ত : বিপদ? কি বিপদ?

ভবদেব : সে এমন কিছু নয়, তাছাড়া সে তুমি বুঝবে না। ইচ্ছে করছে এই ভিক্ষাপাত্রটাকে এইখানে ফেলে দিয়ে চলে যাই।

শ্রীমন্ত : তা আপনি ভিক্ষা পাত্র নিতে গেলেন কেন?

ভবদেব : নিতে কি সাধে গেলাম? ওই যে দেখছ ওই শ্রমণকে। উনি আমার দাদা হন। ওঁকে একটু এগিয়ে দিতে যাচ্ছি। গ্রামের সীমা হতে আবার ফিরে আসব।

শ্রীমন্ত : তবে কি আপনার ফিরতে দেরী হবে?

ভবদেব ঃ না না একটুও না। তুমি বাড়ীতে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর। আমি এখুনি আসছি।

শ্রীমন্ত ঃ আচ্ছা।

[শ্রীমন্ত চলে যায়]

ভবদেব ঃ [সামনের দিকে চেয়ে] কি আশ্চর্য! আমিও যত এগিয়ে যাই উনিও তত এগিয়ে যান। আমাদের দূরত্বের ব্যবধান যেন আর কিছুতেই কমে না। এখন কি করি? ও'কে দাঁড়াতে বলি। আমার ডাক ত অতদূর পৌঁছবে না, আর উনিও এদিকে তাকাচ্ছেন না। ওদিকে নাগিলা আমার জন্য পথ চেয়ে বসে রয়েছে। এমনি এখান হতে ফিরে যাই। না না সে ভালো দেখায় না। তাছাড়া ভিক্ষাপাত্র···কে ও?

সুদেব ঃ আমি সুদেব। এই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কোথায় চলেছ? সাত দিনেই কি তুমি সংসারে বীত শ্রদ্ধ হয়ে গেলে যে সংসার ছেড়ে দিল?

ভবদেব ঃ কে বলল সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি সংসার ছেড়ে দিয়েছি।

সুদেব ঃ কে আর বলবে? তোমার হাব ভাবই সেকথা বলছে। বলি বৌঠানের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে?

ভবদেব ঃ কে বলল ঝগড়া হয়ে গেছে?

সুদেব ঃ হতে ত পারে। বলি সংসারে কি স্বামীস্ত্রীতে ঝগড়া হয় না—তাই বলে তুমি তাকে ফেলে সংসার ছেড়ে চলে যাবে? বল ত দৌত্য করি?

ভবদেব ঃ তোমায় দৌত্য করতে হবে না কারণ আমি সংসার ছেড়ে যাচ্ছি না বা আমাদের কোনো ঝগড়াও হয়নি।

সুদেব ঃ তবে এই ভিক্ষাপাত্র?

ভবদেব ঃ এই ভিক্ষাপাত্র? ওই সামনে দেখ।

সুদেব ঃ দেখছি এক শ্রমণ চলেছেন।

ভবদেব ঃ বলতে পার উনি কে?

সুদেব ঃ না।

ভবদেব ঃ আমার দাদা ভবদত্ত।

সুদেব ঃ যিনি দশ বছর আগে সংসার ছেড়ে ছিলেন?

ভবদেব ঃ ঠিক বলেছ। আজ সকালে উনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। ও'কে একটু এগিয়ে দিতে যাচ্ছি।

সুদেব ঃ এগিয়ে দিতে? আর কত এগিয়ে দেবে? গ্রামের সীমা যে পেছনে পড়ে রইল তার খেয়াল আছে? উপাশ্রয়ে পৌঁছে গেলে কি সেখান হতে আবার ফিরে আসতে পারবে?

ভবদেব ঃ পারব। শুধু পারবই নয়। আমায় ফিরেও আসতে হবে। আমার জন্য নাগিলা উঠোনে অপেক্ষা করে বসে রয়েছে। সুদেব…কই? সুদেব কোথায়? তবে আমি এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছিলাম। [চার দিকে চেয়ে] এ আমি কোথায় এলাম? ওই যে সামনেই উপাশ্রয় দেখা যাচ্ছে। দু' এক জন সাধু আনাগোনা করছেন। একজন যেন এদিকেই আসছেন। কিন্তু ভবদত্ত কোথায় গেলেন? তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন? আমি কি তবে স্বপ্ন দেখছিলাম? না না তবে…

[একজন শ্রমণের প্রবেশ]

শ্রমণ ঃ এই যে ভবদেব, তুমি এসে গেছ।

ভবদেব ঃ [আশ্চর্য হয়ে] আপনি আমায় চিনলেন কি করে?

শ্রমণ ঃ তোমায় চিনব না? তোমার সঙ্গে আমাদের কত দিনের পরিচয়…তাছাড়া আজ তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। তুমি আজ দীক্ষিত হবে। সব আয়োজন প্রস্তুত।

ভবদেব ঃ আমি দীক্ষিত হব? সব আয়োজন প্রস্তুত অথচ…

শ্রমণ ঃ আর্য ভবদত্ত তোমায় বলেন নি সেকথা? তিনি তোমায় নিতে গিয়েছিলেন।

ভবদেব ঃ আমায় নিতে গিয়েছিলেন? দাঁড়ান দাঁড়ান আমার সব কিছু যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। হাঁ আর্য ভবদত্ত তাই বলেছিলেন বটে—আমি তোমায় নিতে এসেছি। কিন্তু আমি ত দীক্ষিত হতে আসি নি।

শ্রমণ ঃ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে উপাশ্রয়ে এসেছ অথচ দীক্ষিত হতে আসনি সে কথা কে বিশ্বাস করবে?

ভবদেব ঃ কিন্তু আমি সত্যি বলছি।

শ্রমণ ঃ ভবদেব, এখান হতে এমনি ফিরে গেলে আর্য ভবদত্তের অপমান করা হবে।

ভবদেব ঃ কিন্তু আমার ঘরে স্ত্রী রয়েছে।

শ্রমণ ঃ যারা দীক্ষিত হতে আসে তারা বিবাহিত হলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে আসে।

ভবদেব ঃ আমি কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করতে পারব না। আমি তাকে আমার প্রাণের চাইতে বেশী ভালবাসি।

[শ্রমণকে দেখা যাবে না। নেপথ্য হতে স্বর ভেসে আসবে]

ঃ সেইজন্যই ত তোমাকে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। অনন্ত জ্যোতিপুঞ্জের মধ্যে আমি তোমায় দেখেছি।

ভবদেব ঃ আপনি কি?

ঃ আমি তোমার অন্তরাত্মা।

[ক্রমশঃ

জৈন উৎসব

জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তীকালে প্রচারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের যেমন একাধিক বুদ্ধ কল্পিত হয় ; জৈনধর্মে তদ্রূপ কতিপয় তীর্থংকর বিদ্যমান আছেন, এবং ভবিষ্যৎ কালেও তীর্থংকর হইবেন এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। হিন্দু ধর্মের সহিত মূলে ঐক্য না থাকিলেও স্বর্গ ও ইন্দ্রাদি দেবতাসমূহে জৈনগণের বিশ্বাস আছে। মহাভারত, রামায়ণাদিতে যে প্রকার বর্ণনা আছে, জৈন পুরাণাদিতেও তদ্রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, কেবল মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জৈনগণ স্বর্গে বিশ্বাস করেন তথাপি হিন্দুর ন্যায় একমাত্র জগৎকর্তা পরমেশ্বরে জৈনদের বিশ্বাস নাই।

জৈনগণের ধর্মোপদেষ্টা তীর্থংকরগণকে আমাদের অবতারগণের ন্যাম বিবেচনা করা চলে। [পার্থক্য এই যে ইহারা ঈশ্বরের অংশ নন, সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করিতে করিতে বহু জন্ম লাভের পর তীর্থংকরত্ব অর্জন করেন। —সম্পাদক] এই তীর্থংকরগণের জীবনী বর্ণনার সহিত দেশের পুরাতন ধর্ম ও রাজকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা জৈন পুরাণ নামে খ্যাত।

জৈনগণের আদি জিন ঋষভদেব। তাঁহার পিতার নাম নাভি এবং মাতা মরুদেবী। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে ব্রহ্মমহাযোগে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই আদি জিন ঋষভদেবের জন্ম মহোৎসব অতি সমাদরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার জন্মকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া ছিলেন।[১]

এই ঋষভদেবের[২] সহিত কৈলাসের সম্বন্ধও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; তিনি কৈলাসে নির্বাণ গমন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনগণের নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণে কোন প্রকার বাধা ছিল না। কারণ আদি জিন ঋষিভদেব ইন্দ্রনর্তকী নীলাঞ্জনার নৃত্য দর্শন করিয়াছেন। ইহা জৈন হরিবংশে বর্ণিত রহিয়াছে। [ঋষভদেব যখন সংসার পরিত্যাগ করেন নাই— তাঁহাকে সংসার সুখের অসারতা দেখাইবার জন্য দেবগণ নীলাঞ্জনার নৃত্যের আয়োজন করেন। নীলাঞ্জনা নৃত্য করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হওয়ায় ঋষভদেব সংসার পরিত্যাগ করেন। জৈন গৃহীদের অবশ্য নৃত্যগীতাদি দর্শনে বাধা নাই। তবে সংসার পরিত্যাগী সাধুদের অবশ্যই আছে। —সম্পাদক]

---

১ আদি পুরাণ (জৈন), ১৩।

২ এই ঋষভদেবের জন্মগ্রহণের সময় তাঁহার মাতা মরুদেবী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে ঋষভ দেব তাঁহার গর্ভে বৃষরূপে প্রবেশ করিতেছেন।—অরিষ্টনেমি পুরাণ (হরিবংশ)।

এই আদি জিনদেবের ব্যাপারটি হিন্দুধর্মের মহাদেবের অনুরূপ। মহাদেবের সহিত কৈলাসের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁহার পূজাদি করিয়া থাকেন। আদি জিনদেব ঋষভের ঐ প্রকার বিবরণ দেখিতে পাই। ঋষভের জন্মমহোৎসব ও পূজাদি ব্যাপার, গম্ভীরার অঙ্কুর বলিয়া বিবেচিত হয়। জৈন পুরাণাদিতে বসন্তোৎসবের উপাখ্যান সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।[৩] এই প্রকার উৎসবাদিই যে জৈন ধর্মের অঙ্গ তাহা নহে। জৈনগণ জিনদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা ও উৎসব করিতেন। বসুদেব পার্শ্বনাথকে পূজা করিবার জন্য তাঁহার মন্দিরে যাইয়া বসন্তোৎসব সম্পাদন করেন।[৪] [মন্দিরে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। —সম্পাদক]

জৈনগণ তাঁহাদের তীর্থংকর জিনদেবগণের আবির্ভাবকালের স্মরণার্থ উৎসবাদি করিয়া থাকেন। জিনেন্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসে জন্মগ্রহণ করিবার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার সম্মানার্থ উৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই প্রকারে চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠাদি মাসে সেই জিন-দেবগণের জন্মমহোৎসব হইত।[৫] সেই সময়ে জৈন আজীবকগণ [আজীবক ভিন্ন সম্প্রদায়, জৈন নহে। —সম্পাদক] জৈন বিহারে জিন দেবতার সন্নিকটে আগমন করিয়া ধূপ, দীপ ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা প্রদান করিতেন এবং স্তবস্তুতি করিয়া মঙ্গলগীত গাহিতেন। রাত্রে জৈনমন্দির আলোকমালায় বিভূষিত হইত।

এই চৈত্র কৃষ্ণনবমী তিথির জন্মমহোৎসব পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের জন্ম ও পরিনির্বাণ মহোৎসবের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল। চৈত্র ও বৈশাখাদি মাসের এই উৎসব বর্তমান গাজনের অঙ্গীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। ফলতঃ জৈনোৎসব কালক্রমে বৌদ্ধোৎসবাদির সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। পরে উক্ত উৎসবাদি এ দেশবাসিগণ আপনার নিজস্ব উৎসব বলিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে।

জৈনধর্মের সহিত শৈব ধর্মের যে সুন্দর সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় জৈন ধর্ম ও জিনদেবগণ ক্রমে হিন্দুধর্মে বিলীন হইয়া গিয়াছে। [?—সম্পাদক]

জৈন তীর্থংকরগণের মধ্যে জিনদেব পার্শ্বনাথ অন্যতম। তিনি বারাণসীরাজ অশ্বসেনের ঔরসে এবং বামাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে মাতৃজঠরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার বর্ণ নীল [সবুজ—সম্পাদক] দেখা গিয়াছিল এবং দেহ সর্প চিহ্নে চিহ্নিত ছিল। তাঁহার যখন জন্ম হইল, তখন দেবতাগণ স্বর্গ হইতে দুন্দুভি বাদন করিলেন, পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং দেবকন্যাগণ সুতিকাগারে গিয়া পুষ্পবৃষ্টি ও মাঙ্গলিক

---

৩ অরিষ্টনেমি পুরাণ (হরিবংশ), ৮।

৪ অরিষ্টনেমি পুরাণ, ১০ ; সম্মুখের হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া কালিন্দীপুলিনে বসন্তোৎসবের কথা। [?]

৫ অরিষ্টনেমি পুরাণ (হরিবংশ), ২২-২৪।

অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে দেবদেবীগণ পার্শ্বনাথের জন্মমহোৎসব সম্পাদন করিলেন। অশ্বসেন "কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিলেন এবং দিব্যাঙ্গনাদিগকে আনয়ন করিয়া নৃত্য, গীত, জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলকার্য সম্পাদন করিলেন।"৬

জৈনগণের জন্মোৎসব এই প্রকার দান, নৃত্য, গীত বাদ্য সহকারে সম্পাদিত হইত। প্রাপ্ত বয়সে পার্শ্বনাথ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জৈন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পতিতোদ্ধার তাঁহার জীবন ব্রত হইয়াছিল। তিনি কাশীধামে ধাতকী তরুতলে চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে, চন্দ্র বিশাখানক্ষত্রে গমন করিলে, পূর্বাহ্ণ সময়ে অনন্তবৈভব কেবলজ্ঞান লাভ করিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার আলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। তিনি জৈনগণের মঙ্গলকামনায় দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্ড্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে পুণ্ড্রদেশ জৈনগণের পবিত্র তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ৭

পার্শ্বনাথের চৈত্রমাসীর "অনন্তবৈভব জ্ঞান লাভ" স্মরণার্থ জৈনগণ উৎসব ও পার্শ্বনাথের পূজাদি করিয়া থাকেন। এইরূপে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠাদি মাসে জৈনগণের উৎসব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

পুণ্ড্রদেশে এই চৈত্র ও বৈশাখের জৈন মহোৎসব পার্শ্বনাথের গমনকালের পর হইতেই অনুষ্ঠিত হইত। এই প্রকারে গোরক্ষনাথ, নেমিনাথ এবং গোবিন্দ্রচন্দ্রের মাতার জৈন প্রীতি নিবন্ধন পুণ্ড্রদেশে বহু জৈনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মও একদা পুণ্ড্রদেশে যথেষ্ট অনুষ্ঠিত হইত।

জিনমূর্তিগুলি ধ্যানস্থ যোগীর মূর্তির ন্যায় এবং সর্পভূষণে ভূষিত বলিয়া পরবর্তী কালে শিবের সহিত তাহাদের অভেদ কল্পিত হইয়াছে। [সুপার্শ্ব ও পার্শ্ব ব্যতীত অন্য জিনমূর্তিতে সর্প থাকে না। সুপার্শ্ব ও পার্শ্বের মাথায় সর্পছত্র থাকে। —সম্পাদক] জৈন উৎসবাদিও ক্রমে গম্ভীরায় পরিণত হইয়াছে। পুণ্ড্রদেশান্তর্গত মালদহে জৈনাশ্রম যথেষ্ট ছিল। সমগ্র বঙ্গে জৈনপ্রভাব একদা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। আজিও বগুড়া জিলায় জৈনধর্মের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৭ খৃষ্টাব্দে মথুরায় অক্রিয়াবাদিগণের৮ আবির্ভাব হইলে আর্যরক্ষিত গোষ্ঠ সহিলের দ্বারা তাহাদের পরাজিত করেন। সেই সময়ে মথুরাসঙ্ঘ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই সঙ্ঘেই পুষ্পদন্ত আচার্য ১৫৭ খৃষ্টাব্দে জৈনাঙ্গ লিপিবদ্ধ করেন। [?] তখন শ্বেতাম্বর জৈন প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই সময় হইতে জৈনপ্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত, 'আদ্যের গম্ভীরা', ১৩১৯, ১৮০-১৮৪ পৃঃ হতে সংকলিত।

---

৬ বিশ্বকোষ—পার্শ্বনাথ শব্দ।

৭ জৈনগণের নন্দীশ্বর পর্ব আট দিন ব্যাপী নৃত্য, গীত, বাদ্য ও পূজা ব্যাপারে শেষ হয় এবং কার্তিক, ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসের অষ্টমী হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত হইয়া থাকে, প্রত্যেক জৈনমন্দিরে এই উৎসব হয়। [?]

৮ আজীবক ও নিগ্রন্থ মধ্যে আজীবকগণ অক্রিয়াবাদী বলিয়া খ্যাত ছিল।

স্মৃতি চারণ

মুনি জিন বিজয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

এভাবে দু'দিন দু'রাত্রি তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম। আমার মতামত প্রকাশ করলাম, তাঁর মতামতও শুনলাম। মানুষের সামান্য সম্পর্কে এসে তার প্রকৃতি আমি বুঝতে পারি এ রকম আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে আমার মনে হল সিংঘীজী একজন আদর্শ বিচারবাদী মানুষ ও বিশ্বস্ত ভাবুক সজ্জন।...

এমনিতে স্বভাবতঃ আমি সংকোচশীল ও ভীড় হতে দূরে থাকতে চাই। তার উপর ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক করার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। নিজে হতে চালিয়ে কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি সে রকম উৎসাহ বা বিদ্যা আমাতে নেই। বাহাদুর সিংজী সিংঘীর কাছে এই সংকোচের সঙ্গেই গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ও দু'দিন কথাবার্তার পব তাঁর প্রতি আমার মন উন্মুখ হয়ে উঠল ও তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর অভিলষিত পিতৃ স্মারকের পবিত্র কাজে যোগদান দিতে সহজেই রাজী হয়ে গেলাম।

একাজ কোথায় ও কিভাবে করা হবে সে প্রশ্ন যখন সামনে এল তখন সিংঘীজী এ কাজ আমি কলকাতায় থেকে প্রারম্ভ করি এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যাতে তিনি সেই কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা স্বভাবতঃই শান্তি-নিকেতন হতে প্রারম্ভ করার ছিল। এবং সেকথা যখন তাঁকে বললাম তিনি তখন তাতে সহজেই সম্মত হয়ে গেলেন। কি কি কাজ কিভাবে করা হবে তারো সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রস্তুত করা হল এবং আনুমানিক ব্যয়েরও একটা অঙ্ক স্থির করা হল। প্রথমে ৩ বছরের জন্যে শান্তিনিকেতনে সিংঘী জৈন চেয়ার স্থাপনা করা হবে এবং তার জন্য বার্ষিক ৬-৭ হাজার টাকা ব্যায় করা হবে। সামনের জুলাই হতে আমার শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকা ও কাজ শুরু করা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল।...

এভাবে 'সিংঘী জৈন জ্ঞানপীঠ' স্থাপনের কার্যক্রম নির্ণয় করে আমি সেখান হতে পাটনায় ফিরে গেলাম ও সেখানকায় কাজ শেষ হতে নিজের আস্তানা আহমদাবাদে।

এরিমধ্যে মহাত্মাজী দেশের সামনে লবণ সত্যাগ্রহের কার্যক্রম উপস্থিত করলেন ও ১২ই মার্চ সত্যাগ্রহ আশ্রম পরিত্যাগ করে ডাণ্ডী অভিযান সুরু করলেন।...ধারাসনায় লবণের সরকারী আড্ডা সত্যাগ্রহীদের মুখ্য আন্দোলন ভূমি হল......মহাত্মাজীর এক ছোট অনুগামীরূপে আমিও কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির আদেশানুসারে ৭৫ জন স্বয়ং সেবকসহ

ধারাসনায় গেলাম। পথে আমাদের ধৃত ও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। আমাকে প্রথমে বম্বাইর বরলীচাল জেলে রাখা হল। পরে সেখান হতে নাসিক সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হল।

সিংঘীজী প্রথমে এসব বিষয়ে কিছু জানতে পারেন নি। আমিও কিছু জানাইনি। ...কিন্তু গুজরাটে যখন এই আন্দোলন বেশ জোর হয়ে উঠল তখন তাঁর মনে হল যে হয়ত আমিও এই আন্দোলনে জড়িয়ে যেতে পারি। তাহলে তাঁর অভিলষিত কাজে বাধা উপস্থিত হবে। সেজন্য তিনি পণ্ডিত সুখলালজীকে এক পত্র দিলেন।...কিন্তু তিনি সেই পত্র পাবার আগেই আমি সত্যাগ্রহে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গহণ করেছিলাম ও কারারুদ্ধ হলাম। তাই সিংঘীজীর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল ও শান্তিনিকেতনে সিংঘী জৈন চেয়ার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সব ওলট পালট হয়ে গেল।...

১৯৮৬ সম্বতের বিজয়া দশমীর দিন আমি নাসিক সেণ্ট্রাল জেল হতে মুক্তি লাভ করলাম। যদিও জেলে থাকা কালে লেখাপড়ার কাজেই আমি ব্যপৃত থাকতাম ও সেই দিকেই আমার মন আকর্ষিত হয়ে চলেছিল তবু দেশের পরিস্থিতি ও জনতার ক্ষোভ থেকে থেকে আমার মনকে অস্থির করে তুলছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তি-নিকেতনে যেয়ে পূর্ব নির্ণয়ানুসারে আমি যেন জৈন সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করি সিংঘীজীর এরূপ আগ্রহপূর্ণ পত্র ও পরম সুহৃৎ পণ্ডিতপ্রবর সুখলালজীর তদনুরূপ প্রত্যাদেশ পেয়ে আমি ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে কয়েকজন বিদ্যার্থী ও সহবাসীসহ শান্তিনিকেতনে গিয়ে উপস্থিত হই। বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন অধ্যাপনার আবহাওয়া আমার মনকে জ্ঞানোপাসনায় স্থির করে দিল ও আমাকে আমার চিরকল্পিত ভাবনাকে রূপ দেবার জন্য উত্তেজিত করে দিল। সেই ভাবনাকে রূপ দেবার জন্য যে সব সাধন সামগ্রী প্রয়োজন বলে আমার মনে হত তারো বেশী সামগ্রী বিদ্যানুরাগী ও বদান্য বাহাদুর সিংজী সিংঘীর কাছ হতে অনায়াসে প্রাপ্ত হয়ে আমি সিংঘী জৈন জ্ঞানপীঠ সংচালনের ভার গ্রহণ করলাম।

যদিও গোড়াতে আমি জৈন বাঙ্‌ময়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্যাই নিযুক্ত হয়েছিলাম তবু সেই চিরকল্পিত ভাবনা অনুকূল আবহাওয়ায় আমাকে সিদিকে ক্রমশঃ ঠেলতে লাগল। আজ পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক সামগ্রী আমি সংগ্রহ করেছিলাম ও রত্নপেটিকার মত যা সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলাম তা আমার মানসচক্ষে উদিত হতে লাগল। তাদের প্রকাশে আনবার জন্য আমার মন লালায়িত ও উৎসুক হয়ে উঠল।

আমি অমার এই ঔৎসুক্যের কথা বাহাদুর সিংজী সিংঘীকে জানালাম ও 'জ্ঞান পীঠে'র সঙ্গে সঙ্গে 'গ্রন্থমালা'র স্থাপনা করে রত্নতুল্য বিশিষ্ট গ্রন্থ সমূহ সুসম্পাদিত রূপে জনসমক্ষে আনবার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি তা শোনা মাত্রই তাঁর সহজ সম্মতি দিয়ে দিলেন এবং তার জন্য যে ব্যয় হবে তা বহন করতে

সহর্ষ স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। এর ফল স্বরূপ সিংঘীজীর পিতা পুণ্যশ্লোক ডালচাঁদজীর স্মৃতিতে 'সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

শান্তিনিকেতনে আসবার পর হতে কলকাতা ও অন্যান্য স্থান হতে জৈন বিদ্যার্থীদের চিঠিপত্র আসতে আরম্ভ করল। সেখানে অবস্থান করে যাতে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে তার জন্য তখন ছোট একটী জৈন ছাত্রাবাসের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সিংঘীজীর নিকট আত্মীয়দের মধ্যেও অনেকে তাঁদের সন্তানদের শান্তিনিকেতনে রেখে আমার সাহচর্যে তারা শিক্ষালাভ করুক এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সিংঘীজীকে সেকথা জানাতে সিংঘীজী বললেন যে শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের জায়গা দেন তবে আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই সেখানে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতনে সেই সময় জায়গার বড় অভাব ছিল। তবুও সেখানকার কর্তৃপক্ষ ও বিশেষ করে গুরুদেব নিজে আগ্রহ দেখালেন ও বাগানবাড়ীর দুই ভাগ যাতে ২০।২৫ জন বিদ্যার্থী থাকতে পারে তা দান করলেন। স্থান পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি সিংঘীজীকে পত্র দিলাম—তিনি এখন নিজে এসে স্থান পরিদর্শন করে গুরুদেবের কাছ হতে লিখিত স্বীকৃতি পত্র নিয়ে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করুন।

সেই বছর গ্রীষ্মাবকাশে আমি আহমদাবাদে গেলাম ও পণ্ডিতজী ও কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পাটনে গেলাম। উদ্দেশ্য পাটন জ্ঞান ভাণ্ডারের সাহিত্যিক সামগ্রী একত্র করা ও গ্রন্থের প্রতিলিপি তৈরী করা ও করানো। মাস দুই সেইখানে রইলাম।···প্রকৃতপক্ষে সেখান হতে সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা সম্পাদনের কাজ সুরু হল। পাটনের কাজ শেষ করে আমি বম্বে গেলাম। সেখানে নির্ণয় সাগর প্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'প্রবন্ধচিন্তামণি' ছাপতে দিলাম।

জুলাইর গোড়ার দিকে আমি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম ও সিংঘী জৈন ছাত্রাবাসের কাজ সুরু করলাম।···সিংঘীজীর পত্র পেয়ে আমি কলিকাতা গেলাম ও এই ব্যাপারে সাক্ষাতে সমস্ত কথাবার্তা হল। জৈন ছাত্রাবাসের জন্য আসবাবপত্র তৈরী করাবার ছিল। ভোজনাগারের জন্য কোনো স্থান না পাওয়ায় নূতন ঘর তৈরী করার নিশ্চয় করা হল। শান্তিনিকেতনে সেই সময় সমস্ত বাড়ীই কাঁচা তৈরী করা হত। মাটির দেওয়াল, ওপরে ঘাসের ছাদ। আমরাও ওই ধরণের বাড়ী করার সিদ্ধান্ত করলাম। কেবল দরজা ও জানালার জন্য কাঠের ব্যবহার করা হবে। এবং স্থির হল কলকাতা হতে তৈরী হয়ে দরজা জানালা সেখানে যাবে। বিদ্যার্থীদের ব্যবহারের জন্য ডেস্ক, বুক সেলফ, চৌকী আদিও কলকাতা হতে তৈরী করে পাঠানো হবে।

তিন চার দিন কলকাতায় কাটিয়ে আমি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলাম

ও নিজের কাজ করতে আরম্ভ করলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আসবাবপত্রও তৈরী হয়ে এল। বিদ্যার্থীও কিছু কিছু এসে গেল। তাদের ভর্তি করানোর কাজও সুরু হল। খাবার জিনিষও কলকাতা থেকে আসতে লাগল। কারণ তখন এ সব জিনিষ সেখানে পাওয়ার সুবিধা ছিল না। [ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্রসূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৩ ॥

সমরাদিত্যের নববধূদের অনেক কথা বলার ও নিজের প্রস্তাব স্বীকার করানোর ছিল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে সে সব কথা কিভাবে বলা যায় সমরাদিত্য তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। কুমারের সামনে বসা কুন্দলতা প্রথম মৌনভঙ্গ করল। অতিমুক্তক ফুলের মালা হাতে নিয়ে সে কুমারের কাছে গিয়ে বলল, এই মালা আপনার প্রিয়তমারা স্বহস্তে গেঁথেছে ও পূর্ণ অনুরাগে আপনার গলায় অর্পণ করবার জন্য আমায় অনুমতি দিয়েছে।

সমরাদিত্য একটু নত হয়ে সহজেই সেই মালা গ্রহণ করলেন। কুন্দলতার সঙ্গে মালিনী নামে এক সহচরী ছিল এবং এই দুই সহচরীর পেছনে সমরাদিত্যের দুই বধূ সঙ্কুচিত হয়ে বসেছিল।

কথা প্রারম্ভ করবার উদ্দেশ্যে সমরাদিত্য বললেন, কিন্তু কুন্দলতা, তোমার দুই সখির আমার প্রতি এত অনুরাগ কি করে হল তা বলতে পার? এর আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কি সহচরী কি নববধূরা এই ধরণের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবু কুন্দলতা কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু পেছন হতে কে যেন তাকে নিরস্ত করে দিল যার অর্থ চুপ করে থাক, এখানে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

নিজের প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ও সখী ও বধূদের চিন্তামগ্ন দেখে সমরাদিত্যই আবার বলতে লাগলেন, অনুরাগ যে ভাবেই হোক তার গভীরতায় যাবার এখন কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি তোমাদের একথা বলে দিতে চাই যে এই অনুরাগে যদি কারু অহিত হয় তবে সেই অনুরাগে কি কাজ?

ফুলশয্যার রাতে যেন কেউ শ্রাদ্ধ বাসরের কথা বলছে নববধূদের সেরূপ মনে হল। স্থান কাল পাত্র হিসেবে এই ধরণের উক্তি নিতান্তই অসঙ্গত। যে সময় হাস্যপরিহাসের সেই সময়ে মোহমুদ্‌গরের অবতারণায় তাদের মনে হল নন্দন বনের সুরম্য পরিবেশ হতে কে যেন তাদের বহিষ্কৃত করে দিল।

সেই শুষ্ক নিরস আবহাওয়ায় ব্যাকুল হয়ে বিভ্রমবতী বলে উঠল, অনুরাগের সঙ্গে অহিতের কি সম্পর্ক ?

সমরাদিত্য বললেন, অনুরাগ অর্থাৎ মৃগতৃষ্ণা। তৃষিত মৃগ এই মরীচিকার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে কি ভাবে নিজের জীবন হারায় সে যদি বুঝতে পারতে তবে অনুরাগ ও অহিত যে এক সুতোয় গাঁথা তা অনুভব করতে।

মাঝখানে কামলতা বলে উঠল, মৃগ ও মনুষ্যে কি কোনো প্রভেদ নেই ?

সহচরীদের মুখে এক স্মিত হাস্য বিকসিত হয়ে উঠল। কামলতা কুমারের প্রশ্নের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পেরেছে এমন তাদের মনে হল। কথায় বার্তায় সজীবতা এল।

কুমার বললেন, মৃগ মূর্খ কারণ সে পশু। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ যখন মূর্খতা করে তখন তার সীমা থাকে না।

মানুষ ব্যাধি বৃদ্ধত্ব ও মৃত্যুকে অহরহ ঘটতে দেখেও না দেখা করে যাচ্ছে সমরাদিত্য সেকথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে হল এখনো তার সময় হয়নি।

বিভ্রমবতী প্রশ্নকে আরো অগ্রসর করে দিয়ে বলল, অনুরাগ ও অহিতে কি সত্যই কোনো সম্পর্ক আছে ?

কুমার তখন উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগলেন, আছে বৈকী ? মনে করো কোন যুবতী রাজকন্যা সুসজ্জিত হয়ে বাতায়নে বসে রয়েছে। যৌবনের উন্মাদনা তাকে আতুর করে তুলেছে। এমন সময় কোন যুবককে নীচে পথ দিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। রাজকন্যা দাসী প্রেরণ করে তাকে আমন্ত্রিত করছে ও বলছে, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ হয়েছে। তুমি কামদেব সদৃশ। আমার সর্বস্ব আমি তোমায় অর্পণ করছি। যুবকও যৌবনাবেশে উন্মত্ত হয়ে উঠছে। এমন সময় সেই রাজকন্যার কোন নিকট আত্মীয় সেখানে এসে উপস্থিত হচ্ছে। যুবক ভীত হচ্ছে। রাজপুরুষেরা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করছে। অনুভব করো সেই যুবকের দয়নীয় পরিস্থিতি। বলত, অনুরাগ কি এক্ষেত্রে যুবকের অহিতের কারণ হয়নি।

সমরাদিত্য গল্পটি এভাবে উপস্থিত করলেন যাতে সেই যুবকের দয়নীয় পরিস্থিতিতে বিভ্রমবতী ও কামলতার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল।

বিভ্রমবতী বলল, অনুরাগ অহিত করেছে বলার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রে এও বলতে হবে যে সেই রাজকন্যা দেশকালের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। ক্ষণিক আবেশে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কামলতা বলল, আমি ত বলি তা অনুরাগই ছিল না। সে যে অন্যের অধীন সে কথা মায়াবী মোহ তাকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

সমরাদিত্য বললেন, তোমাদের দু'জনার কথাই ঠিক। কিন্তু আমরাও কি অন্যের

কম অধীন ? কাম ক্রোধ লোভ ও মোহরূপ কষায়ের অধীন হয়েই না আমরা মানব জন্মের মহত্ব ভুলে যাই।

সমরাদিত্য সেকথা বলে দুজনার মুখের দিকে চাইলেন। দেখলেন তাদের মুখ কেমন যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তখন তিনি বুঝলেন যে তিনি যা বলেছেন তা অস্থানে বলা হয়নি।

এরপর সমরাদিত্য জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর কথা বললেন। বললেন এরা মানুষের কত পুরনো বৈরী। এদের প্রভাবেই না মানুষ জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে কত দুঃখ ভোগ করে আসছে। এদের হাত হতে কিভাবে মুক্ত হওয়া যেতে পারে তিনি সেকথাও শেষে বললেন।

সমরাদিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ দুই বোন তাঁর কথা শুনলেন। রাত্রিও যত গভীর হতে লাগল সমরাদিত্যের বাগধারাও তত দূরশ্রুত বীণধ্বণির মত তাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের চিত্তকে আপ্লাবিত করতে লাগল। স্পর্শমণির ছোঁয়ায় লোহাও যেমন সোনা হয় তেমনি সমরাদিত্যের অন্তর-বৈরাগ্যে নববধূদের অন্তরও রঞ্জিত হয়ে গেল এবং ভোর হবার পূর্বেই তারা সমরাদিত্যের শ্রদ্ধালু শিষ্যা ও উপাসিকায় পরিণত হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

নব পরিণীতা বধূদের সংযম মার্গে স্থিত করে সমরাদিত্যের মনে হল যে গৃহ পরিত্যাগের পথ তার অনেকখানি নিষ্কণ্টক হয়ে গেছে। মাতাপিতার অনুমতি পেলেই এখন তিনি সংসার পরিত্যাগ করতে পারেন। নিজের অন্তর ত বৈরাগ্যের রঙে রঞ্জিত ছিলই, এখন তাঁকে তাঁদেরও সেই রঙে রাঙিয়ে দিতে হবে।

যাঁর ত্যাগ ও বৈরাগ্য স্বাভাবিক তাঁর ধৈর্য ও গাম্ভীর্যও অপরিসীম। যত শীঘ্র সম্ভব সংসার পরিত্যাগের ভাবনা যে এঁদের থাকে না তা নয় তবে তাড়াহুড়ো তাঁরা করেন না। পরিস্থিতিকে তাঁদের অনুকূল করবার প্রয়াস করেন। শ্রমণ জীবনে উপসর্গ রূপ প্রতিকূলতাকে সহন করবার এইভাবেই তাঁরা শিক্ষালাভ করেন।

সমরাদিত্য এখন প্রায়ই পিতার কাছে যান, তাঁর নিকটে বসেন এবং যাতে মন প্রসন্ন থাকে সেইরূপ ব্যবহার করেন। যদিও তিনি জানেন যে তাঁর বিচার সরণির সঙ্গে তাঁর মাতাপিতা সহমত নন, বিশেষ নববধূদের সংযমে স্থিত করবার পর তাঁদের অসন্তোষ ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছে। তাই তাঁকে আরো বেশী সহনশীল হতে হবে, প্রযত্নশীল হতে হবে। তিনি জানেন যদি তাঁর হৃদয় স্বচ্ছ হয় তাঁর বিচারধারা আত্মহিতকারক তবে একদিন না একদিন তাঁর মাতা পিতা তাঁর সাথে সহমত হবেন ও এই সংসার পরিত্যাগ করে যাবেন।

প্রসঙ্গক্রমে পুরুষ সিংহ একদিন বললেন, পুত্র, আমার কেবল একটা বিষয়েই দুঃখ যে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে তোমার মত বৈরাগ্যবান আজ পর্যন্ত কেউ বসে নি। রাজ্য পরম্পরার দুর্ভর ভার তুমি কিভাবে বহন করবে সেই আমার ভয়।

পিতা, সংসারে যা হয়ে এসেছে তাই যদি হতে থাকে তবে জীবন কত রিক্ত হয়ে যায়—সেকথা কি আপনার মনে হয় না। নিরক্ষরের পুত্র যদি মনে করে আমার নিরক্ষরই থাকা উচিত, কারণ পিতা নিরক্ষর ছিলেন বা যদি দরিদ্রের পুত্র মনে করে আমার চিরদিন দরিদ্র থাকা উচিত তবে তো প্রগতিই হয় না। উজ্জয়িনীর উত্তরাধিকার আমার পুরুষার্থে আরো বেশী উজ্জল হবে না এই যদি আপনার বিশ্বাস হয় তবে তার জন্য আপনার মিথ্যা মোহই দায়ী। সমরাদিত্য যেভাবে কথাটি বললেন তাতে যেন মনে হল তিনি যেন নিজেকেই নিজে বোঝাচ্ছেন—তাঁর মনের শান্তি কোথাও যেন একটুও বিক্ষুব্ধ হয়নি।

কিন্তু ভোগোপভোগ বিষয়ে তুমি এত উদাসীন কেন ?—সেই মুহূর্তেই পুরুষ সিংহ প্রশ্ন করলেন।

ভোগোপভোগ বা ঐশ্বর্যে আমার আকর্ষণ নেই সেকথা আমি বলি না কিন্তু যেই তা পেতে চাই তখন দেখি আমি যেন এক ভারী পাথরের তলায় চাপা পড়ে গেছি। আমার নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। এমনি কত লোকই না সেই পাথরের তলায় পিষ্ট হচ্ছে। তাদের কথা যখন চিন্তা করি তখন বুক কেঁপে ওঠে। এই কারণেই ঐশ্বর্য ও ভোগোপভোগ বিষয়ে আমি উদাসীন। —এভাবে পাণ্ডিত্যের দম্ভ না করে তাঁর মানসিক স্থিতি তিনি পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

একদিন পিতা ও পুত্র এক জায়গায় বসে কথা বলছিলেন এমন সময় দূর হতে ক্রন্দনের ধ্বনি ভেসে এল। সমরাদিত্য ও পুরুষ সিংহের কথায় ছেদ পড়ল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পুরোহিত পুরন্দর মরমর। সেই সঙ্গে তাদের ঘরের একটি কুকুরও মরতে চলেছে।

স্বাস্থ্যবান যুবক পুরন্দর হঠাৎ কি করে মরতে চলল ও সেই সঙ্গে তাদের ঘরের একটী কুকুর তা পুরুষসিংহ বুঝতে পারলেন না কিন্তু সমরাদিত্য মুহূর্তেই বুঝে নিলেন এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে। কিন্তু সেকথা তখন বলা তাঁর উপযুক্ত মনে হল না। শুধু এইমাত্র বললেন, পিতা, পুরন্দর ও সেই কুকুরকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে। ওদের যদি বাঁচাতে হয় তবে শীঘ্র রাজ বৈদ্যকে সেখানে প্রেরণ করুন।

পুরুষসিংহ সমরাদিত্যের অনুরোধ মত তখনি সেখানে রাজ বৈদ্যকে প্রেরণ করলেন। রাজবৈদ্যও বিধিমত উপচারে তাদের সুস্থ করে তুললেন।

এ সংবাদ যখন পুরুষসিংহের কাছে এল তখন সমরাদিত্যের দীর্ঘ দৃষ্টির জন্য তাঁর মনে আদর ভাব জাগ্রত হল। তিনি তখন সমরাদিত্যকে এ বিষয়ে বিশদ প্রশ্ন করলেন।

পিতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সমরাদিত্য বললেন, সাধারণতঃ রাগদ্বেষের জন্যই ষড়যন্ত্র রচিত হয়। পুরন্দরের স্ত্রী ছাড়া তার খাবার মধ্যে আর কে বিষ দিতে পারে? আর বিষ প্রয়োগ ছাড়া পুরন্দরের মত হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান যুবক সহসা মরতেই বা বসবে কেন? কিন্তু কুকুরের কথা সহসা বোঝা যায় না। তবে অনেক সময়ই দেখা গেছে যে নিজের নিকট সম্বন্ধীই রাগদ্বেষের কারণে ঘরের কুকুর বেড়াল হয়ে আসে। পুরন্দরের স্ত্রীর যে মৃত প্রেমিক যার মূর্তি অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে সে দিন রাত উপাসনা করে সেই এই কুকুর হয়ে তার কাছে ঘুর ঘুর করছে। পুরন্দরের স্ত্রী সে কথা জানে না অথচ এই নৈকট্য তার অসহ মনে হয়। তাই সে তাকেও বিষ প্রয়োগ করেছে। সংসার সম্পর্কের কি বিচিত্র এই ইতিহাস!

পুরুষসিংহ তখন এর পূর্ণ অনুসন্ধান করালেন। অনুসন্ধানে সমরাদিত্যের কথা যে যথার্থ তা প্রমাণিত হল।

তারপর পিতাপুত্রের সম্পর্ক যত গাঢ় হতে লাগল, সমরাদিত্যের নির্মল দৃষ্টির পারদর্শিতা যতই তিনি অনুভব করতে লাগলেন তখন তাঁর মনে হল সমরাদিত্য সামান্য মানুষ নয়। তাকে ঘরে ধরে রাখার অর্থ হয় না। সে এক ধরণের স্বার্থপরতা।

শেষে পুরুষসিংহই একদিন সমরাদিত্যকে বললেন, পুত্র, তুমি যেমন বলে থাক সংসার সেই রকমই এক ইন্দ্রজাল। এর মধ্যে কোনো তথ্য নেই। তুমি পুত্রস্থানীয় হলেও আমার গুরু। আমি তোমার আত্মকল্যাণের বাধক হব না। তোমার মায়েরও এ বিষয়ে সম্মতি রয়েছে।

সমরাদিত্যের নীরব ও একক তপশ্চর্যা এ ভাবে সফল হল। কেবল সমরাদিত্যই নয়, তাঁর সঙ্গে পিতা পুরুষসিংহ ও মাতা সুন্দরীও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। পুরুষসিংহের অন্য কোনো পুত্র না থাকায় উজ্জয়িনীর সিংহাসন তাঁর এক মাতুল পুত্র মুনিচন্দ্রকে অর্পণ করা হল।

৫ ॥

দীর্ঘদিন প্রব্রজন করে সমরাদিত্য আবার উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন। সেখানে এক উদ্যানে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন।

একদিন রাত্রে তিনি যখন ধ্যানাবস্থিত ছিলেন তখন গিরিসেন নামে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এল। অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে দেখতে থাকল। মনে হল সে যেন তাঁকে চিনতেও পেরেছে। তারপর সহসা বিড়বিড় করে উঠল। বলে উঠল—ভারী সাধু! সব ঢং! ধ্যান করবার ছিল ত ঘরে বসে করো নি কেন? সব লোক দেখানো। অমন বকধার্মিক আমি বহু দেখেছি। আচ্ছা দেখছি তুমি কত বড় সাধু—

তারপর বিড়বিড় করতে করতেই সে সেখান হতে উঠে গেল। তারপর কোথা হতে ছেঁড়া ন্যাকড়া সংগ্রহ করল—একটু খানি তেল ও আগুন। তারপর সেখানে আবার ফিরে এল।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার চারদিক চেয়ে দেখল। না কেউ কোথাও নেই। তখন সে সেই ছেঁড়া নেকড়া তাঁর গায়ে বেশ ভালো করে জড়িয়ে দিল। শেষে তেল ঢেলে অগ্নি সংযোগ করল। আগুন জ্বলে উঠতেই সে সেখান হতে পালিয়ে গেল।

সমরাদিত্য যেমন ধ্যানে অবস্থিত ছিলেন তেমনি ধ্যানে অবস্থিত রইলেন। সেই আগুনের প্রচণ্ড জ্বালাও তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে পারল না। সেই অবস্থায় তাঁর মনে হচ্ছিল পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্মরজঃ সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ও তাঁর আত্মা শুদ্ধ হতে শুদ্ধতম রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আবহাওয়া যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখন স্বাভাবিকরূপেই স্বেদ নির্গত হয়ে দেহকে শীতল করে। তেমনি ঘোর তপস্বী সমরাদিত্যের শরীর হতে প্রশমধারা প্রবাহিত হতে লাগল। এবং সেই প্রশমধারার কাছে আগুনের লেলিহান শিখাও ম্লান হতে লাগল। সমরাদিত্য সেইখানে সেই অবস্থায় কেবল জ্ঞান লাভ করলেন। আগুন নির্বাপিত হল।

প্রভাত হতে না হতেই সেই খবর সবখানে ছড়িয়ে গেল। তাঁর দর্শন বন্দনার জন্য মুনিচন্দ্রসহ উজ্জয়িনীর লোক সেই উদ্যানে ভেঙে পড়ল।

কথা প্রসঙ্গে মুনিচন্দ্র এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, আপনার ওপর অকস্মাৎ কেন এই উপসর্গ হল?

প্রত্যুত্তরে সমরাদিত্য বললেন, রাজন, এই উপসর্গ অকস্মাৎ হয়নি। যে গতরাত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করেছিল সে বিগত নয় জন্ম ধরে আমার বৈরতা করে এসেছে। কিন্তু এই শেষ? কর্ম কখনো নিরর্থক যায় না। বৈরর সূক্ষ্মতম বীজও এই ভাবেই পল্লবিত হয়।

মুনিচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, যে নয় নয় জন্ম ধরে আপনার বৈরতা করে এসেছে সে কবে মুক্ত হবে?

রাজন্, যে এই উপসর্গ করেছে সেও ভব্যাত্মা। আমাকে অকারণ নির্যাতন করার জন্য তার মনে আজ অনুতাপ দেখা দিয়েছে। এই অনুতাপই একদিন তাকে উদ্ধার করবে।

উপসংহার

সমরাদিত্য কথা এক হাজার বছরেরও উপর হতে জৈন সমাজে প্রচলিত। হরিভদ্রসূরী এই কথানককে কাব্যময় রূপ দিয়ে সুন্দর ও শাশ্বত করে গেছেন। এই কাহিনী কর্মের বিচিত্রগতি ফুটিয়ে তুলে মানুষকে অসৎকর্ম হতে নিবারিত হতে প্রেরণা দেয়। শুধু মানুষই নয় যে কোনো প্রাণীকে কোনো ভাবেই কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। সেই কষ্টই বৈরতায় পর্যবসিত হয়ে জন্ম জন্মান্তরে মানুষকে দুঃখ ভোগ করায়। মানুষকে তাই শান্ত ও সুসমাহিত হতে হবে।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫'০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন

পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র

৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. IV No. 7 : Sraman : November 1976
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

অগ্রহায়ণ । ১৩৮৩ চতুর্থ বর্ষ । অষ্টম সংখ্যা

শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ
শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ ॥ অষ্টম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

তীর্থংকর ঋষভ, জৈন মন্দির, আবু

জৈন মন্দির

[পূর্বানুবৃত্তি]

আবু—আবু নামে রাজপুতানার দক্ষিণে একটি বিখ্যাত পর্বত আছে। চারিদিকে সমভূমি—প্রকাণ্ড মাঠ—মধ্যস্থলে এই পর্বত, ঠিক যেন একটা দ্বীপ। উপরিভাগে সমভূমি, মধ্যে মধ্যে চূড়া আছে। প্রধান চূড়াটি সমুদ্র হইতে ৩৮০০ হাত উচ্চ। এই উপরিভাগস্থ সমভূমির মধ্যস্থলে একটি হ্রদ, তাহার নাম নখ হ্রদ। কথিত আছে যে, মাহিক নামক অসুরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দেবতারা আর কোন অস্ত্র না পাইয়া নখ দ্বারা এই হ্রদ খনন করেন।

আবু পর্বতে জৈন দিগের যে মন্দির আছে, তেমন সুন্দর মন্দির ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি নাই। পর্বতের যে স্থানে এই সকল মন্দির স্থাপিত, সে স্থানকে দেউলারা বলে। এ স্থান ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ [?] দূর। এখানে সর্বসমেত পাঁচটি মন্দির। সকলকার বড়টি ঋষভ নামক তীর্থংকরের নামে স্থাপিত। মন্দিরের যে স্থলে মূর্তি স্থাপিত তাহার চারি দ্বার। মূর্তিটি চতুর্মুখ; ও দেশের লোক চৌমুখ বলে।

চতুর্মুখের পশ্চিম দিকে যে দুটী মন্দির আছে তাহাই সর্বাপেক্ষা সুন্দর একটিকে বিমল সার মন্দির বলে। এটি আদিনাথের নামে প্রতিষ্ঠিত। ইহার বিপরীত দিকে উত্তর ভাগে বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দির, দ্বাবিংশ তীর্থংকর নেমিনাথের নামে প্রতিষ্ঠিত। উভয় মন্দিরই শ্বেত প্রস্তর নির্মিত। ১৫০ শত ক্রোশ দূর হইতে এই সকল প্রস্তর আনিয়া, এই উচ্চ ও দুরারোহ পর্বতে তোলা হইয়াছে, ব্যাপারটি সহজ নহে। যৎকালে মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল, তৎকালে এদেশে শিল্পবিদ্যার যে অবস্থা ছিল, তাহা বিবেচনা করিতে গেলে, এই মন্দিরদ্বয়ে যে কারুকার্য আছে, তাহা অতি চমৎকার বলিয়া মানিতে হইবে। ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিমলসার ও ১১৯৭ হইতে ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাস্তুপালের মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

বিমলসার মন্দিরের যে কক্ষে বিগ্রহ আছে তাহার ভিতরে যাইবার যো নাই, দ্বার দিয়া হাত বাড়াইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিতে হয়। এ কক্ষে ঋষভের একটি পিত্তলময়ী প্রতিমা আছে, ঋষভ যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। প্রতিমার সম্মুখে একটা বেদির মত স্থান আছে। প্রতিমার কক্ষ ও বেদী মন্দিরের মেঝে অপেক্ষা দুই ধাপ উচ্চ। এই বেদি বা চাতাল ও প্রাঙ্গণের অধিকাংশের উপরে একটা বারাণ্ডা আছে, ইহাকে মণ্ডপ কহে। ইহা

ক্রুশাকৃতি, ইহাতে ১৮ টি স্তম্ভ। মধ্যস্থলের আটটি প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপরে প্রকাণ্ড গম্বুজ, তাহাতে অতি চমৎকার কারুকার্য, সমগ্র মন্দিরটি দেখিতে বড় চমৎকার। সমগ্র মন্দিরের চারিদিকে উঠান। উঠানটী ১০০ হাত দীর্ঘ ও ৬০ হাত প্রস্থ। উঠানের চারিদিকে ৫৫ টী কুঠরী, প্রত্যেক কুঠরীতে কোন না কোন তীর্থংকরের যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তি স্থাপিত। এই সকল কুঠরীর চৌকাঠে ও কপালিতে নানা মনুষ্য মূর্তি ও লতাপাতা খোদিত। দক্ষিণ কোণের একটি কুঠরীতে দেবী অম্বাজীর মূর্তি স্থাপিত।

মন্দিরের দ্বারদেশে ৯টী শ্বেত প্রস্তরের হাতী আছে। প্রত্যেক হাতীর উপরে কয়েকটী করিয়া মনুষ্যমূর্তি। কয়েকটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ সকল বিমলসার সপরিবারে মন্দিরে যাওয়ার প্রতিরূপ। এক্ষণে বিমলসার যে মূর্তি আছে, সেটি মৃণ্ময়ী, ঘোড়াটিও মৃণ্ময়, সাবেক পাথরের মূর্তি মুসলমানেরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

বাস্তুপালের মন্দিরেও ঐরূপ মূর্তি আছে, কিন্তু সেগুলি কুঠরীর মধ্যে না রাখিয়া, দেবালয়ের পশ্চাদ্দিকে একটা প্রস্তরময় মঞ্চের উপরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রাঙ্গণ ও এই মঞ্চের মধ্যস্থলে অতি চমৎকার কারুকার্য যুক্ত পাথরের একটা পর্দা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পশ্চাদ্দিকেই অতি সুন্দর দশটি পাথরের হাতী। এই সকল হাতীর সাজগোজই বা কি সুন্দর। হাতীর উপরে শোয়ারি নাই, কে লইয়া গিয়াছে। তাহাতে বড় আইসে যায় না, কারণ উক্ত হাতীতে যাহারা আরোহণ করিত বা করিয়াছে বা করিবে পশ্চাদ্দিকের দেওয়ালের কুলঙ্গিতে তাহাদিগের মূর্তি স্থাপিত আছে। বাস্তুপাল একমাত্র স্ত্রী সহ, তেজপাল দুই স্ত্রী সহ দাঁড়াইয়া আছেন। স্ত্রীদ্বয়ের খুড়া বা মাতুল তিনটি স্ত্রী-সহ প্রস্তর মূর্তিতে বিরাজিত। ইহাদের চেহারা খুব চমৎকার। সকলেরই লম্বা লম্বা দাড়ি। স্ত্রী দিগের মূর্তি খুব সুন্দর।

বিমল সা সওদাগর ছিলেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতা অনহিলাপত্তনের প্রধান ধনী ছিলেন। গুজরাটের ওয়াখেলা রাজবংশের প্রথম রাজার ইঁহারাই দেওয়ান ছিলেন।

পালিতানা—পালিতানা পালিতানা নামক করদ রাজ্যের প্রধান নগর। কাথিবার প্রায়দ্বীপের পূর্বদিকে স্থিত। শত্রুঞ্জয় নামে একটি পর্বত আছে। নগরটি এই পর্বতের পূর্ব দিকের পাদমূলে স্থিত। জৈনরা পাঁচটি পর্বতকে পবিত্র বলিয়া মানে; শত্রুঞ্জয় পর্বত তন্মধ্যে প্রধান। অবশিষ্ট চারি পবিত্র পর্বতের নাম গির্ণার, আবু, পার্শ্বনাথ ও গোয়ালিয়র।

শত্রুঞ্জয় পর্বত সমুদ্র হইতে অন্যূন ১০০০ হাত উচ্চ। ইহার দুই দিকে দুইটি চূড়া, মধ্যভাগে উপত্যকা ভূমি আছে। পর্বতের উপরিভাগে কেবল মন্দির। তন্মধ্যে আদিনাথের, কুমারপালের, বিমল সার, সম্প্রীতি রাজার ও চতুর্মুখ বা চৌমুখ মন্দিরই সর্বপ্রধান। চতুর্মুখের মন্দিরটী সর্বাপেক্ষা উচ্চ। অন্যূন ১৯ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন দিগের মতে এই পর্বত সমস্ত তীর্থের মধ্যে প্রধান তীর্থ, যাহারা অনন্ত-

বিশ্রাম পাইবে, তাহাদিগের বাসর গৃহ। ভারতবর্ষে এমন নগর নাই, যে নগরের জৈনেরা কোন না কোন সময়ে এই পর্বতে মন্দির নির্মাণ কার্যে সাহায্য দান না করিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায়, চকে চকে, জৈনদিগের এই সকল মন্দির বিরাজিত। কোনটী কিয়ৎপরিমাণে রাজাট্টালিকার ন্যায় কোনটী দুর্গবৎ, কোনটীর চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর; এই সকল শ্বেতপ্রস্তরময় মন্দির বিশালকায় শত্রুঞ্জয় পর্বতের শিরোদেশে শোভা পাইতেছে।

পর্বতে উঠিবার পথ যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে কতকগুলি কুলুঙ্গির মতন কুঠীর আছে, তাহাতে শ্বেতপ্রস্তরে সাধুদিগের পদচিহ্ন অঙ্কিত। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত পথের পার্শ্বে এই প্রকার বিস্তর পদাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তাটী প্রস্তরময়। যে সকল জৈন ভক্ত মন্দির নির্মাণ করাইতে পারে না তাহারা এই প্রকার পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করে। রাস্তার স্থানে স্থানে পাথরের ধাপ আছে। আর একটু উপরে হনুমানের মন্দির। আরও উপরে মুসলমানদিগের দরগা। পর্বতের চূড়ায় উঠিলে দেশটীর অতি চমৎকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পর্বতটিকে মন্দিরময় নগর বলিলেও হয়। কয়েকটি পুষ্করিণী ব্যতীত আর কিছু নাই। এখানে সকলই নিতান্ত নিস্তব্ধ। সকালবেলা মধ্যে মধ্যে রহিয়া রহিয়া ঘণ্টার শব্দ কানে আইসে, পর্বদিনে বড় বড় মন্দিরে স্তবপাঠের শব্দও শুনা যায় কিন্তু বৈকাল বেলা সকলই নিস্তব্ধ; কেবল বড় বড় কপোতের দল যখন এক মন্দিরের চূড়া হইতে উড়িয়া অন্য মন্দিরে যায়, তখন সেই শব্দ কানে আইসে। এই পর্বতে কপোতাদি নানা পক্ষী থাকে। দেওয়ালের বাহিরে ময়ূরও আছে। মন্দিরগুলির চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। সূর্যাস্তকালে সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

চতুর্মুখ মন্দিরে আদিনাথের চারিটি প্রকাণ্ড মূর্তি আছে। দেবালয়ের চারিটি দ্বার, এক একটি মূর্তি এক একটি দ্বারের দিকে মুখ করিয়া যোগাসনে বসিয়া আছে। আসন হইতে মূর্তির মস্তক ৭ হাত উচ্চ। এই সকল ও অন্যান্য মূর্তির ভাব বড় আশ্চর্য রকমের প্রায়ই মূর্তিগুলির ভ্রূতে ও বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে সোনা বা রূপা দিয়া হীরকখণ্ড বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে; আবার প্রায়ই বক্ষঃস্থল সোনা বা রূপা দিয়া মোড়া; অথচ মধ্যে মধ্যে কাঁধে, কনুইতে ও হাঁটুতেও সোনার পদক এবং মাথায় মুকুট আছে। কিন্তু চক্ষুই বেশি চমৎকার। সম্মুখে দাঁড়াইলে বোধ হয় যেন মূর্তিটা আমারই দিকে তাকাইয়া আছে, চক্ষুগুলি যেন রূপার বলিয়া বোধ হয়। তাহার উপরে কাঁচের টুকরা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ভাল করিয়া জোড় মিলে নাই।

কোন কাজে লাগুক আর নাই লাগুক কেবল পুণ্যলাভ জন্য ভক্ত জৈনরা মন্দির স্থাপন করেন। যাত্রীরা অতি প্রাতঃকালে পাহাড়ে দেবদর্শনে আসে ও দেবসেবা শেষ

হইলেই নামিয়া আইসে। সেখানে কেহ রাত্রে বাস করে না। এই পবিত্র পর্বতে গিয়া কিছু আহার বা পাক করিতে নাই; রাত্রি যাপন বা নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ। ফলে এটি দেবতাদিগের বাসস্থান, মানুষের এখানে বাস করা নিষিদ্ধ।

অধিকাংশ মন্দিরই আধুনিক। তবে দুই একটি খুব প্রাচীনও আছে।

গির্ণার—শত্রুঞ্জয় পর্বতের পরেই গির্ণার পাহাড়। কাথিবার রাজ্যের পশ্চিম দিকে জোনাগড় নগর হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব দিকে। এই পাহাড় সমুদ্র হইতে অনুমান ২৪০০ হাত উচ্চ। এই পর্বতের গোড়ায়, নগরের বাহিরে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরে, খ্রীষ্ট জন্মের আড়াই শত বৎসরের পূর্বে খোদিত আশোক রাজার নাম সম্বলিত লিপি আছে।

এই পর্বতস্থ নেমিনাথের মন্দিরে উঠিবার পথের পার্শ্বে ছয়টি বিশ্রাম করিবার স্থান বা গৃহ আছে। পাহাড়ের প্রথম চূড়াতেই অম্বামাতার মন্দির। নানা শ্রেণীর নব বিবাহিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ কন্যারা এই মন্দিরে বেশি ভাগ গিয়া থাকে। বরের কাপড়ের সহিত কন্যার আঁচল বাঁধা থাকে। আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, এই ভাবে মন্দিরে যান। দেবীকে যে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তন্মধ্যে নারিকেলই প্রধান। বিবাহের পরে অষ্টাহের মধ্যে এই দেবী দর্শন করিলে ও তাঁহার পূজা দিলে দম্পতী দীর্ঘকাল সুখে থাকে—ইহাই লোকের বিশ্বাস।

পর্বতের চূড়া হইতে প্রায় ৪০০ হাত দূরে পাথরের একটা চাতালের মত আছে। সেইখানে ১৬টি মন্দির স্থাপিত। এইগুলি এই পর্বতের প্রধান মন্দির শ্রেণী। তন্মধ্যে নেমিনাথের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা বড় ও প্রাচীন। ইহাতে খোদিত অক্ষরে লেখা আছে যে, ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটী একবার মেরামত হইয়াছিল। ১৩০ হাত দীর্ঘ ও ৮৮ হাত প্রস্থ একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি স্থাপিত। প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীরের গায়ে ৭০টি কুঠরী, এগুলি বন্ধ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক কুঠরীতে হয় নেমিনাথের যোগাসনে বসা মূর্তি, না হয়, তাঁহার জীবনকালের নানা ঘটনার স্মরণার্থ প্রস্তরময়ী মূর্তি বা চিত্র রহিয়াছে।

এই মন্দিরের পশ্চাদ্দিকেই তিনটি কক্ষ বিশিষ্ট এক মন্দির আছে। তেজপাল ও বস্তুপাল নামক দুই ভ্রাতায় ইহা নির্মাণ করেন। ইঁহারা বড় ধনবান ছিলেন। আবু পর্বতের প্রধান প্রধান মন্দিরও ইঁহাদিগের নির্মিত।

এক সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে বহু সংখ্যক জৈন ধর্মাবলম্বী লোকেদের বাস ছিল। সে অঞ্চলেও ইহারা অনেক মন্দির ও তন্মধ্যে তীর্থংকরগণের মূর্তি স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান দিগের অত্যাচারে সে সকলের অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাটির ভিতর হইতে অনেক মূর্তি বাহির হইয়াছে। মাদ্রাজের যাদুঘরে ঐরূপ কতকগুলি মূর্তি আনিয়া রাখা হইয়াছে। পাণ্ড্য রাজবংশীয় কোন রাজা বড়

গোঁড়া শৈব ছিলেন। তাঁহার উৎপাতে জৈন দিগের সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে। মদুরার প্রধান মন্দিরের চারিদিকে পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর চারিদিকে প্রাচীর আছে। এই মন্দিরস্থ মীনাক্ষী দেবালয়ের সম্মুখে, প্রাচীরের গায়ে পাথরে খোদা কতকগুলি মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি জৈনমতাবলম্বীদিগের। বেচারাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের গাত্রের ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে, আর কুকুরেরা চাটিয়া খাইতেছে; আকাশে কাক, চিল উড়িয়া বেড়াইতেছে—তাহাদিগের চক্ষু তুলিয়া খাইবার আশায়।

শ্রী এইচ, সি, রাহা *The Great Temples of India Cey on and Burma* বর্দ্ধিতাকারে বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ ক্রিশ্চান লিটেরারী সোসাইটী কর্তৃক ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়ে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত প্রবন্ধ ও তৎসংলগ্ন চিত্র দুটী সেখান হতে সংগৃহীত।

ভদ্রা

[কথানক]

নগরপ্রান্তের যক্ষমন্দিরে পূজো দিতে এসেছিল সহ-সহচরী কোশল রাজতনয়া ভদ্রা।

সেই মন্দিরের অনতিদূরে এক বৃদ্ধ বট বৃক্ষতলে বাস করেন শ্রমণ হরিকেশ বল। কৃষ্ণবর্ণ, জাতিতে চণ্ডাল, কুৎসিৎ ও কদাকার। জরা ও দীর্ঘ তপশ্চর্যায় বিশীর্ণ তনু। দূর হতে দেখলে মনে হয় ত্বগস্থির যেন এক ধূলিক্লিন্ন স্তূপ।

যক্ষ পূজা শেষ করে ঘরে ফিরবার পথে চোখ পড়ল ভদ্রার সেই ধূলিক্লিন্ন ত্বগস্থির স্তূপের ওপর। নিরূদক সরোবরের মত বলিক্লিষ্ট সেই অবয়ব। ভ্রূ কুঞ্চিত হয় ভদ্রার। বলে, কে ওই ঘৃণ্য ভিক্ষুক যে শ্যাম বনস্থলীর শোভা অপহরণ করে ওখানে বসে রয়েছে। ওকে দূর করে দাও এই মুহূর্তে। বলে রূঢ় রীঢাকটাক্ষে জরা-ধূলি-সমাচ্ছন্ন বিগত যৌবন কুৎসীৎ তপস্বীকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় ভদ্রা, এগিয়ে যায় নারীর মত্ত যৌবনের অহঙ্কারে।

শুনে কানে আঙুল দেয় সহচরীরা। বলে, সখি, প্রত্যাহার কর ওই তপস্বী সম্পর্কে তুমি যা কিছু বলেছ। তোমার অহংকার চূর্ণ করবার শক্তি আছে ওই তপস্বীতে। ওঁর নিন্দাবাদ করবার দুঃসাহস কেউ করে না।

শুনে হেসে ওঠে ভদ্রা। বলে, যা কুৎসীৎ ও কদাকার তাকে কুৎসীৎ ও কদাকার বলবার দুঃসাহস আমার আছে। যৌবন চিরকালই নিন্দাবাদ করে এসেছে জরার। তাই আমার বাক্য প্রত্যাহারের কোনো প্রয়োজন আমি দেখিনা। যা ঘৃণ্য তা ঘৃণ্যই, বলে সেই তপস্বীর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে এগিয়ে যায় বিপুল লাস্যে লীলায়িত তনু রূপ-মঞ্জুলা ভদ্রা, অনুতাপহীন, ভয়লেশহীন।

কাঁদছিল ভদ্রার মা। কাঁদছিল সহচরীরা। কোশলরাজ কৌশলিক ভদ্রার সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, না, আর কোনো উপায়ই নেই তপস্বীর কোপ হতে রক্ষা পাবার, না আর কোনো উপায়ই নেই।

রাজপ্রাসাদের সর্বত্র এক আতঙ্কের বিভীষিকা। হরিকেশ বলের ক্রোধ বাড়বানলের মত প্রজ্বলিত হয়ে ছুটে আসছে সমগ্র কোশল রাজ্যকে গ্রাস করবার জন্য।

ধিক্কার ধ্বনিত হয় কৌশলিকের কণ্ঠে। বলেন, গর্হিত তোমার আচরণ, গর্বিনী।

ভুল আমি করেছিলাম পিতা। কিন্তু—

কিন্তু নয়, ভদ্রা। ক্রুদ্ধ হরিকেশ বলের ক্রোধ আমার রাজ্যের সমস্ত সৈনিককে অকস্মাৎ ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত করে দিয়েছে। তোমার দর্প চূর্ণ করবার জন্যহ্ রিকেশ বল কোশলাধিপতির সমস্ত ক্ষাত্র বলদর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন। আমার রাজ্য লুপ্ত ও গৌরব কিরীট ভূমিস্যাৎ হতে চলেছে। তুমি এই ভয়ানক অভিশাপ নিয়ে এসেছ কন্যা।

আমি যদি ক্ষমা প্রার্থনা করি তবে কি তিনি আমায় ক্ষমা করে তুষ্ট হবেন না পিতা ?

না তনয়া, না। যক্ষের প্রত্যাদেশ হয়েছে তোমাকে শাস্তি না দিয়ে তিনি তুষ্ট হবেন না।

কি সে শাস্তি ?

তোমাকে তাঁর পত্নী হতে হবে।

আমাকে তাঁর পত্নী হতে হবে ?

হ্যাঁ কন্যা।

ওই জরাজীর্ণ দেহ ত্বগস্থিসার শ্রমণের ?

প্রত্যুত্তর দেন না কৌশলিক। প্রত্যুত্তর দেবারও কিছু ছিল না তাঁর।

কিছুক্ষণ চুপ করে শান্ত নেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে ভদ্রা। বলে, আপনার কি ইচ্ছা পিতা ?

আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো প্রশ্ন আর নেই কন্যা। আমার রাজ্যের আনন্দ বিনষ্ট হয়েছে।

সেই আনন্দ ফিরিয়ে আনার জন্য আপনি কি আনন্দহীন করতে চান আমার জীবন ?

কিন্তু তার জন্যত তুমিই দায়ী কন্যা। তোমার অবিমৃষ্যকারিতা—

বুঝেছি পিতা। আপনারও তাই ইচ্ছা।

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকেন কৌশলিক।

তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি প্রস্তুত।

জরাগ্রস্ত হরিকেশ বলের জীবন সঙ্গিনী হতে চলেছে বিপুল যৌবনা ভদ্রা। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাকে সাজিয়ে দিয়েছে সহচরীরা। নবীন কিশলয়ের বৃন্ত কুঙ্কুম রসে অনুলিপ্ত করে বক্ষঃপটে এঁকে দিয়েছে পত্রলিখা। নিপুণা কলাবতীর মত ধীর সঞ্চালিত করাঙ্গুলি দিয়ে রাজকন্যার কপাললগ্ন চিকুর নিকরম্বে দুলিয়ে দিয়েছে বিলোল ভ্রমরক, ঝুলিয়ে দিয়েছে স্তবকিত মেঘভারের মত কবরীসম্বদ্ধ কেশদামের ওপর একখণ্ড সুপ্রভ চন্দ্রোৎপল। তারপর এক হাতে ভদ্রার মুখ ঈষৎ তুলে ধরে দেখতে চায় তারা তার বাসরিকা রূপ কিন্তু অশ্রুবাষ্প কিছুই দেখতে দেয় না।

সেই বৃদ্ধ বটবৃক্ষতলে কন্যা সম্প্রদান করতে এসেছেন একক কৌশলিক। আর এসেছে কর্তব্যের অনুরোধে পুরোহিত পুত্র সোম। তাছাড়া আর কেউই আসে নি। পুরোহিত স্বয়ংও না। কারণ এই দুঃসহ দৃশ্য দেখার মত মনের সাহস আর কেউই সঞ্চয় করতে পারেনি।

সেই নিরুদক সরোবরের মত শুষ্ক বলিকীর্ণ শরীরের ওপর দৃষ্টি পড়তেই করতলে দু'চোখ আবৃত করে নেয় ভদ্রা। কিছু দেখার বা শোনার মত মনের অবস্থা তার নয়। তবু সে শুনতে পায় পিতা কৌশলিক সেই শ্রমণকে সম্বোধন করে যেন বিনীত কণ্ঠে বলছেন, মহাভাগ! সালঙ্কারা আমার একমাত্র কন্যা ভদ্রাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করতে এনেছি। ওকে গ্রহণ করে আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন।

সেই ধূলিক্লিন্ন ত্বগস্থিময় দেহ যেন একটুখানি নড়ে ওঠে। ভদ্রা যেন শুনতে পায় বহুদূরশ্রুত নির্ঝরের কলধ্বনির মত, হরিকেশ বল যেন বলছেন, রাজন্, এরূপ অশোভন উক্তি আপনার শোভা পায় না। কোথায় ঐশ্বর্যপালিতা কুসুম কোমলা রাজকন্যা, কোথায় জীর্ণ দেহ কঙ্কালাবশেষ আমি।

কিন্তু আমি অবগত হয়েছি, ভার্যারূপে আপনি আমার কন্যাকে প্রার্থনা করেছেন। এ না হলে আপনার ক্রোধ উপশান্ত হবে না।

আমি ভার্যারূপে আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করেছি, এ না হলে আমার ক্রোধ উপশান্ত হবে না—এর আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রাজন্, শ্রমণ কখনো ক্রোধ করে না। মানে অপমানে, লাভে ক্ষতিতে, জয়ে পরাজয়ে সর্বত্র তাকে সম থাকতে হয়। আমি ত কখনো কারু প্রতি ক্রোধ করেছি মনে পড়ে না।

কিন্তু আপনার ক্রোধেই ত আমার সমস্ত সৈনিক ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমার রাজ্য যেতে বসেছে। আমার কন্যা আপনাকে অপমান করেছিল। তাই আমার কন্যাকে শাস্তি দেবার জন্যই আপনি তার পাণিপ্রার্থনা করেছেন।

বুঝতে পেরেছি রাজন্, এ সমস্তই আমার প্রতি অনুরক্ত ওই যক্ষের কাজ। কিন্তু আপনার কন্যাকৃত অপমান আমায় একটুও বিক্ষুব্ধ করেনি। আমি ক্রুদ্ধও হইনি। আপনি কন্যাসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। ধর্মপ্রভাবে আপনার সমস্ত সৈনিক ব্যাধি ও জরা মুক্ত হবে।

চক্ষু হতে হস্ত অপসারিত করে ভদ্রা। তেমনি বসে রয়েছেন ভূমিতলে ত্বগস্থিসার শ্রমণ হরিকেশ বল। কিন্তু কি দেখছে ভদ্রা? দেখছে সেই কুৎসিৎ জরাজীর্ণ দেহের অন্তরাল হতে ফুটে উঠেছে আত্মার অপরিমিত সৌন্দর্য। অসুন্দর তাঁর বাইরের আবরণ। হৃদয় সুন্দর সুশান্ত সুসমাহিত।

সুস্মিত নয়নে তাকিয়ে থাকে ভদ্রা। মুগ্ধ হয় তার চোখ, তার হৃদয়। আশ্চর্য হয়ে ভাবে এঁর অপমান সে কি করে করতে পেরেছিল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ভদ্রা। হরিকেশ বলের চরণপ্রান্তে প্রণত হয়ে বলে ওঠে, আমায় ক্ষমা করুন মহর্ষি।

আনন্দ ক্ষরিত হয় শ্রমণের কোটরগত অক্ষি হতে।

আর একবার প্রার্থনা জানান কৌশলিক। বলেন, এই কন্যাকে আপনি গ্রহণ করুন মহাশ্রমণ।

সে সম্ভব নয় রাজন্, পঞ্চ মহাব্রতধারী শ্রমণের উচিতও নয়।

কিন্তু আপনার জন্য উৎসৃষ্ট এই কন্যাকে কোনো ক্ষত্রিয় কুমারই আর গ্রহণ করবে না।

কেমন উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষ শোনায় কৌশলিকের কণ্ঠস্বর। নিশ্চুপ বসে থাকেন হরিকেশ বল। সামনে অশ্রুপ্লুত চোখে বসে থাকে ভদ্রা। এ আর এক অভিশাপ না জানি কোথা হতে ঘনিয়ে এল তার জীবনে? দুর্ভর যৌবনভার কি তাকে বহন করতে হবে চিরকাল একাকিনী?

ওঠ, আমার দিকে তাকাও। যদি চাও আমি তোমার জীবন সঙ্গী হতে প্রস্তুত।

কানের কাছে গুঞ্জরিত হয় কার মায়াস্বর। চোখ তুলে তাকাবার সাহস হয় না। পাছে সেই মায়াস্বর ছিন্ন হয়ে যায়।

পরমুহূর্তেই তার মনে হয়, না না—এ তো মায়াস্বর নয়। এই মায়াস্বর পুরহিত পুত্র সোমের কণ্ঠস্বর, যে সম্প্রদান কালে মন্ত্রপাঠ করবে বলে এসেছিল তাদের সঙ্গে।

সেই কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, কোনো ক্ষত্রিয় কুমার তোমায় গ্রহণ না করুক, তুমি যদি আমায় গ্রহণ কর, তবে তোমায় গ্রহণ করে আমি ধন্য হব।

পীক সঙ্গীতের চেয়েও মধুরতর সেই সুস্বরের স্পর্শে শিহরিত হয় ভদ্রার অন্তর।

কৌশলিক বলেন, যদি চাও কন্যা তবে এই ব্রাহ্মণ পুত্রের হাতে তোমায় সম্প্রদান করতে পারি।

চোখ তুলে তাকায় ভদ্রা। দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল হৃদয় কান্তিমান নবীন শাল্মলীর মত যৌবনান্বিত সোম।

ফুল্লরুচি ফুলদলের মত সুস্মিত হয় ভদ্রার অধর। আশ্চর্য হয়ে ভাবে এর আগে এই চোখে কখনো সে তাকে দেখেনি। তরুণ সোমের চোখে পরম নির্ভরতা, এক সুন্দর আশ্বাস। দেখে আশ্বস্ত হয় ভদ্রা।

কি ভাবছ ভদ্রা? প্রশ্ন করে সোম।

কি ভাবছি? ভাববার মত অবস্থা নয় সোম। দেখছি তোমার হৃদয়। সেই হৃদয় ওমনি সুন্দর যেমন ওই শ্রমণের।

উদ্ভাসিত হয় সোমের মুখ এক অনাস্বাদিত আনন্দের হিল্লোলে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ভদ্রা। যে বরমাল্য সে হরিকেশ বলের কণ্ঠে প্রদান করবে বলে এসেছিল, সেই বরমাল্য প্রদান করে সোমের কণ্ঠে। তারপর মুগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে।

আনন্দ ক্ষরিত হয় আর একবার স্বর্গস্থিসার শ্রমণ হরিকেশ বলের অক্ষি হতে।

প্রশ্নোত্তরে জৈন তত্ত্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

১১২ প্রঃ সংবর কাহার নাম ?

১১২ উঃ "আস্রব-নিরোধ সংবরঃ"—আস্রবের নিরোধ করাকে সংবর বলে। অর্থাৎ কর্মাস্রবের কারণরূপ মনোবাক্‌কায় যোগ মিথ্যাত্ব কষায়াদি নিরোধ হইলে অনেক সুখ দুঃখ নিমিত্তীভূত কর্মের আগমন হইতে পারে না। উহাকেই সংবর বলে।

১১৩ প্রঃ সংবর কয় প্রকার ?

১১৩ উঃ দ্রব্য সংবর ও ভাব সংবর এই দুই প্রকার।

দ্রব্য সংবর—কার্মণ পুদ্‌গলের আস্রব নিরোধকে দ্রব্য সংবর বলে।

ভাব সংবর—যে যে গুণ ধারণে ভাবাস্রব হইতে পারে না এই দ্রব্যাস্রব নিরোধের কারণ স্বরূপ আত্মার ভাব বিশেষকে ভাব সংবর বলে।

১১৪ প্রঃ কি উপায় অবলম্বনে আস্রবের নিরোধ করা যায় ?

১১৪ উঃ গুপ্তি, সমিতি, ধর্ম, অনুপ্রেক্ষা (ভাবনা), পরীষহ জয়, চারিত্র এই ষড়্‌বিধ কারণ দ্বারা সংবর (আস্রব নিরোধ) লাভ হয়।

১১৫ প্রঃ গুপ্তি কিরূপ ও কতিবিধ ?

১১৫ উঃ সংসার ভ্রমণের কারণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করার নাম গুপ্তি। গুপ্তি তিন প্রকার—মনোগুপ্তি, বাক্‌গুপ্তি, কায়গুপ্তি অর্থাৎ বিষয় সুখাভিলাষ হইতে মন, বচন, কায়ের যথেষ্ট প্রবৃত্তি নিরোধকে গুপ্তি বলে।

১১৬ প্রঃ সমিতির আকার কি ?

১১৬ উঃ নিজ শরীর দ্বারা অন্য জীবের পীড়া না দেওয়ার ইচ্ছায় সম্যক প্রকার যত্ন ও আচার পালন করাকে সমিতি বলে। সমিতি পাঁচ প্রকার—ঈর্ধা, ভাষা, এষণা, আদান-নিক্ষেপ ও উৎসর্গ। এই পাঁচটির প্রত্যেকেরই সম্যক একটি বিশেষণ আছে—সম্যক ঈর্ধা, সম্যক ভাষা, সম্যক এষণা, ইত্যাদি।

১১৭ প্রঃ সম্যক ঈর্ষা সমিতি কি রূপ ?

১১৭ উঃ যেনিজাদি জীব স্থানের সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত মুনি ধর্মের নিমিত্ত সম্যকরূপে—যত্ন গ্রহণ করিতে, সাবহিতচিত্ত হইয়া সূর্যোদয়ের পর (যখন সমস্ত বস্তু উত্তমরূপে দেখা যায় তখন,) যেপথ লোক যাতায়াত দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত সেই পথে ইতস্ততঃ অন্ততঃ চতুর্হস্ত পরিমিত ভূভাগ সম্যক্ পর্যবেক্ষণ পূর্বক মৃদু পদক্ষেপে গমনাগমকরিবে যাহাতেন

কোন জীবেরই হিংসা না হয়। এতাদৃশ সদাচার সজ্ঞান মুনির পৃথ্বিকায়িক, জলকায়িকাদি জীবের হিংসাও বিদূরিত হওয়াতে সম্যক্ ঈর্যা সমিতি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১১৮ প্রঃ সম্যক্ ভাষা সমিতি কি প্রকার ?

১১৮ উঃ পরোপকারক সংশয়শূন্য পরিমিত প্রিয় বাক্য প্রয়োগকে সম্যক্ ভাষা সমিতি বলে।

১১৯ প্রঃ সম্যক্ এষণা সমিতির স্বরূপ কি ?

১১৯ উঃ দিনের বেলা মাত্র একবার গৃহস্থের গৃহে নির্দোষ আহার গ্রহণ করাকে সম্যক্ এষণা বলে।

১২০ প্রঃ সম্যক্ আদান-নিক্ষেপণ সমিতি কাহাকে বলে ?

১২০ উঃ যে প্রকারে কোন হিংসা বা ধর্মহানি না হয় এরূপ ভাবে বিচার পূর্বক নিজের উপবেশনাদির ও গ্রন্থ, কমণ্ডলু প্রভৃতি বস্তুর স্থাপন বা গ্রহণ করার প্রবৃত্তি রাখাকে সম্যক্ আদান-নিক্ষেপণ সমিতি বলে।

১২১ প্রঃ সম্যক্ উৎসর্গ সমিতি কিরূপ ?

১২১ উঃ ত্রস ও স্থাবর জন্তুর পীড়া না হয়, এরূপ ভাবে শুদ্ধ, প্রাণীরহিত ভূমিতে মলমূত্রাদি ক্ষেপণ করিয়া প্রাষক জলে শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করার নাম সম্যক্ উৎসর্গ সমিতি।

১২২ প্রঃ ধর্ম কাহাকে বলে ও ধর্ম কতিবিধ ?

১২২ উঃ যদ্দ্বারা স্বর্গ মোক্ষাদি ইষ্ট বিষয় লাভ করা যায় তাহাকে ধর্ম বলে। ধর্ম দশবিধ। যথা—উত্তম ক্ষমা, উত্তম মার্দব, উত্তম আর্জব, উত্তম শৌচ, উত্তম সত্য, উত্তম সংযম, উত্তম তপ, উত্তম ত্যাগ, উত্তম আকিঞ্চন ও উত্তম ব্রহ্মচর্য।[১১] এই দশপ্রকার ধর্ম নিম্নে বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে।

(১) উত্তম ক্ষমা—যদ্দ্বারা কোন কারণে দুষ্ট লোকের দুর্বাক্যাদি দ্বারা তিরস্কার, উপহাস, তাড়নাদি ক্রোধমূলক কারণ উপস্থিত হইলেও মলিন পরিণমন হয় না।

(২) উত্তম মার্দব—বল, জাতি, কুল, ধন, জ্ঞান আদি দ্বারা উন্নত হইলেও গর্ব না করা।

(৩) উত্তম আর্জব—মনো বাক্ কায় সম্বন্ধী সর্ব প্রকার কুটিলতা ত্যাগ।

(৪) উত্তম শৌচ—পরকীয় ধন ও স্ত্রী আদির লোভ ত্যাগ।

(৫) উত্তম সত্য—সৎপুরুষের সহিত সত্যভাষণ।

---

১১ নিজের খ্যাতি লাভাদির জন্য যে ধর্ম কর্ম করা যায় তাহাকে উত্তম ধর্ম বলে না। খ্যাতি লাভাদির বাসনা ত্যাগ পূর্বক ধর্মাচরণকে উত্তম ধর্ম বলে।

(৬) উত্তম সংযম—ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবর্তন রূপ ইন্দ্রিয় সংযম ও সম্যক্ জ্ঞানী মুনির একেন্দ্রিয়াদি জীব পর্যন্তের অহিংসারূপ প্রাণী সংযম এই দ্বিবিধ।

(৭) উত্তম তপ—কর্মক্ষয়ার্থ অনশনাদি।

(৮) উত্তম ত্যাগ—দ্বাদশ প্রকারের পরিগ্রহ ত্যাগ ।

(৯) উত্তম আকিঞ্চন—নিজ শরীরে ও ভিন্ন শরীরে মমতারূপ পরিণাম না হওয়া।

(১০) উত্তম ব্রহ্মচর্য—স্বকীয় বা পরকীয় স্ত্রী মাত্রের স্মরণাদি ও অনুরাগ বর্জন পুরঃসর ব্রহ্মেতে (আত্মাতে) বিচরণ করা।

১২৩ প্রঃ অনুপ্রেক্ষা (ভাবনা) কিরূপ ?

১২৩ উঃ নিম্নলিখিত অনিত্যাদি দ্বাদশ প্রকার চিন্তনকে অনুপ্রেক্ষা বা ভাবনা বলে।

(১) অনিত্য ভাবনা—ইন্দ্রিয় গোচর ধন যৌবনাদি বিষয় রাশির ক্ষণস্থায়িত্ব চিন্তা।

(২) অশরণ ভাবনা—যেরূপ নির্জন বন মধ্যে সিংহ কর্তৃক ব্যাপাদ্যমান মৃগের শরণ অর্থাৎ রক্ষাকারী থাকে না, সেইরূপ সাংসারিক দুঃখাক্রান্ত ও করাল কাল কর্তৃক কবলিত জীবসমূহের সম্যক্ ধর্ম ব্যতীত শরণ বা রক্ষাকারী কোন বস্তুই নাই ইত্যাকার চিন্তন।

(৩) সংসার ভাবনা—পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণশীল পরিভ্রমণরূপ অবস্থা বিশেষই সংসার। জীব সংসারে এক দেহ হইতে অপর দেহ—এইরূপ দেব, মনুষ্য, তির্যক, নারকী এই চতুর্গতিতে নিয়ত বিঘূর্ণিত, সুতরাং সংসার ঘোরতর দুঃখের আধার এই প্রকার অনুচিন্তন।

(৪) একত্ব ভাবনা—জন্ম, মরণ, জরা, বার্দ্ধক্যাদি, দুঃখময় অবস্থায় আমার সহায় কেহই নাই, আমি একাকী এইরূপ চিন্তা করা।

(৫) অন্যত্ব ভাবনা—দারা পুত্র কলত্র• ও শরীর প্রভৃতি কিছুই আমার নয়, কেননা আমা হইতে ঐ সকল বিষয় ভিন্ন এতাদৃশী চিন্তা।

(৬) অশুচিত্ব ভাবনা—মলমূত্রময় শরীর অতি অপবিত্র এই চিন্তা।

(৭) আস্রব ভাবনা—মিথ্যাত্ব, অবিরত (অসংযম), কষায়াদি দ্বারা কর্মের আস্রব হয়। আস্রবই সংসার পরিভ্রমণের কারণ ও আত্মার স্বাভাবিক গুণের ঘাতক ইত্যাদি আস্রব স্বরূপ চিন্তা।

(৮) সংসার ভাবনা—যে যে গুণ ধারণে যে যে আস্রবের নিরোধ হয় তাহার পরিচিন্তন।

(৯) নির্জরা ভাবনা—কর্মের নির্জরা কি প্রকারে হয় তদুপায় চিন্তা।

(১০) লোক ভাবনা—কোন লোক (স্বর্গাদি) কত বড়, কোন লোকে কি কি অনাদি সৃষ্ট বস্তু আছে ও কোন স্থানে কোন জাতীয় জীব বাস করে ইত্যাদি লোক তত্ত্বানুচিন্তন।

(১১) বোধি দুর্লভ ভাবনা—সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারিত্র এই রত্ন-ত্রয়কে বোধি বলে। এইরূপ বোধির প্রাপ্তি অতি দুর্লভ অর্থাৎ বহু ব্রত তপস্যাদি সাধ্য এইরূপ বারংবার চিন্তা করা।

(১২) ধর্মভাবনা—ধর্ম তাহাকে বলে—যাহা বস্তুর স্বভাব। আত্মার শুদ্ধ নির্মল স্বভাবই আত্মার ধর্ম। আত্মার দর্শন, জ্ঞান, চারিত্র, বা দশবিধ ধর্ম (ক্ষমাদি) বা অহিংসারূপ ধর্ম ইত্যাদি ধর্মগণের স্বরূপ চিন্তা। উক্ত দ্বাদশবিধ ভাবনা বা অনুপ্রেক্ষার (চিন্তা, অনুচিন্তন) দ্বারাও সংবর প্রাপ্তি হয়।

১২৪ প্রঃ পরীষহ জয় কিরূপ ?

১২৪ উঃ রত্নত্রয় (সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চারিত্র) স্বরূপ মোক্ষমার্গ হইতে যাহাতে বিচ্যুত হইতে না হয়, এবং যেরূপে কর্মের নির্জরা হইবে, তন্নিমিত্ত দ্বাবিংশতি প্রকার পরীষহ অর্থাৎ সহনীয় বিষয় আছে। উক্ত পরীষহ সহ্য করাকে পরীষহ জয় বলে।

১২৫ প্রঃ দ্বাবিংশতি প্রকার পরীষহ কি কি ?

১২৫ উঃ (১) ক্ষুধা, (২) তৃষ্ণা, (৩) শীত, (৪) (উষ্ণ), (৫) দংশমশক, (৬) নগ্নতা, (৭) অরতি, (৮) স্ত্রী, (৯) চর্যা. (১০) নিষদ্যা, (১১) শয্যা, (১২) আক্রোশ, (১৩) বধ, (১৪) যাচনা, (১৫) অলাভ, (১৬) রোগ, (১৭) তৃণস্পর্শ, (১৮) মল, (১৯) সৎকার পুরস্কার, (২০) প্রজ্ঞা, (২১) অজ্ঞান, (২২) অদর্শন। এই সকল পরীষহ শারীরিক ও মানসিক সাতিশয় পীড়ার নিদান স্বরূপ, ইহাদিগকে সমভাবে সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করিলে সম্বর হয়।

১২৬ প্রঃ কি প্রণালীতে পরীষহ জয় করিতে হয় ?

১২৬ উঃ ক্ষুধানল প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহাকে ধৈর্যরূপ সলিল সেচনে শান্ত করার নাম ক্ষুধা পরিষহ জয়। এইরূপ তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম সহ্য করা তৃষ্ণাদির জয়। মশক প্রভৃতির দংশন সহ্য করা দংশ মশক জয়, নগ্নতা অর্থাৎ উলঙ্গাবস্থায় অবস্থান করিতে লজ্জা হয়, অন্যত্বাদি ভাবনা দ্বারা ঐ লজ্জা বারণ করা নগ্নতা জয়। ক্ষুধাদি পীড়িতের সংযমে অরতি অর্থাৎ শৈথিল্য ভাব আগমন করিলে (আস্রব ভাবনাদি দ্বারা) তাহার নৈরাশ সাধন অরতি পরীষহ জয়। কমনীয় কামিনীর কটাক্ষাদিতে (অনিত্য ভাবনাদি দ্বারা) আত্মার অচঞ্চলতা স্থাপন স্ত্রী জয়। মোক্ষপথে চলিতে ক্ষুণ্ণতা, খিন্নতা না রাখা চর্যা জয়। ধ্যানার্থ গৃহীত আসন হইতে চলায়মান না হওয়া নিষদ্যা

জয়। কেহ অন্যায় বা অনিষ্ট জনক বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা সহ্য করা আক্রোশ জয় প্রহারোদ্যত বা কৃত প্রহার ব্যক্তির প্রতিরোধ না করা ও প্রহার সহ্য করা বধ জয়। প্রাণাত্যয় সম্ভবেও কাতরতা প্রযুক্ত আহারাদির নিমিত্ত দীনতা (ভৈক্ষচর্যাদি) প্রবৃত্তির বিদূরণ যাচ্ঞা জয়। আহারাদির প্রাপ্তি না হইলেও প্রাপ্তবৎ সন্তুষ্ট থাকা অলাভ পরিষহ জয়। রাস্তায় চলিতে তৃণ কঙ্কর কণ্টকাদির স্পর্শ বেদনা সহ্য করা তৃণস্পর্শ জয়। নিজ শরীরকে মলযুক্ত দেখিয়া গ্লানিবোধ বা স্নানাদি প্রবৃত্তি না করা মল জয়। অজ্ঞান মনুষ্য কর্তৃক অপমানিত বা অসম্মানিত হইলেও সম্মানেচ্ছা না করিয়া মানাপমানে তুল্য ভাবাবলম্বন সৎকার পুরস্কার জয়।

১২৭ প্রঃ চারিত্র ভেদের স্বরূপ কি ?

১২৭ উঃ চারিত্র পাঁচ প্রকার। যথা, (১) সামায়িক, (২) ছেদোপস্থাপনা, (৩) পরিহার বিশুদ্ধি, (৪) সূক্ষ্ম সাম্পরায় ও (৫) যথাখ্যাত।

(১) সামায়িক চারিত্র কিরূপ ?

ব্রতানুষ্ঠান, সমিতি পালন, কষায় নিগ্রহ, মন বচন কায়ের অশুভ প্রবৃত্তি রূপ অনর্থদণ্ডের ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় জয় এই সকল গুণশালীকে সংযমী বলে। সংযমীর সর্ব প্রকার নিন্দনীয় বিষয়ের সম্পর্ক রাহিত্য ও তদনুকূল ত্যাগকে ও আত্ম বিচারে থাকাকে সামায়িক চারিত্র বলে।

(২) ছেদোপস্থাপন কিরূপ ?

প্রমাদাধীন অনিষ্ট জনক নিন্দনীয় কর্মের উদয়ে, উত্তম (শুভ) কর্মের স্থিতি ও উদয় বিনষ্ট হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অশুভ কর্মের ক্ষয় সাধন করিয়া পুনরায় ব্রত সংযম ধারণাদি রূপ প্রতিক্রিয়াকে ছেদোপস্থাপনা চারিত্র বলে অথবা সামায়িক হইতে চালিত হইয়া পুনরায় সামায়িকে লীন হওয়া।

(৩) পরিহার বিশুদ্ধি কি ?

জীবমাত্রের পীড়ন পরিত্যাগ দ্বারা আত্মার বিশেষ বিশুদ্ধি ভাব হওয়াকে পরিহার বিশুদ্ধি বলে।

(৪) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কষায়ের উদয়ে (যাহা জীবাত্মা অনুভব করিতে পারে না) সূক্ষ্ম সাম্পরায় নামক গুণস্থানে যাদৃশ চারিত্র প্রকাশ পায় তাহাকে সূক্ষ্ম সাম্পরায় চারিত্র বলে।

(৫) যথাখ্যাত চারিত্র কি প্রকার ?

চারিত্র মোহনীয় কর্মের সম্পূর্ণ রূপে উপশম বা ক্ষয় হওয়ার পর আত্মার নিজস্ব ভাবে অধিরূঢ় হওয়াকে যথাখ্যাত চারিত্র বলে।

১২৮ প্রঃ নির্জরার স্বরূপ কি ?

১২৮ উঃ বন্ধন গ্রস্ত কর্মের আংশিক অপচয় বা অপসৃতির নাম নির্জরা।

১২৯ প্রঃ নির্জরা কতিবিধ ?

১২৯ উঃ সবিপাক ও অবিপাক এই দ্বিবিধ।

১৩০ প্রঃ সবিপাক ও অবিপাক কিরূপ ?

১৩০ উঃ ফল ভোগান্তে কর্ম ক্ষয়কে সবিপাক ও তপঃকর্মাদি দ্বারা কর্মাপসারণকে অবিপাক নির্জরা বলে।

[ক্রমশঃ

নাগিলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় দৃশ্য

[নাগিলা দরজার কাছে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে]

নাগিলা : [পায়ের শব্দে চমকে] কে ?...ও তুমি শ্রীমন্ত ।

শ্রীমন্ত : হাঁ বৌঠান । আমি ত আপনাদের এখানেই আসছিলাম হঠাৎ ছোট বাবুর সঙ্গে পথে দেখা । আগে আগে এক শ্রমণ চলেছিলেন, পেছনে পেছনে উনি । আমি ওঁকে দুর্লভ জাতীয় ফুলের মঞ্জরী দেখালাম । [বার করে নাগিলাকেও দেখাচ্ছে] দেখে বললেন, তুমি এই মঞ্জরী নিয়ে ঘরে যাও । আমি এখুনি আসছি ।

নাগিলা : [ফুলের মঞ্জরী হাতে নিয়ে] কি সুন্দর এই মঞ্জরী । মনে হচ্ছে আকাশের সমস্ত নীলিমা কে যেন এতে ঢেলে দিয়েছে ।

শ্রীমন্ত : আপনি ঠিক বলছেন বৌঠান । এই মঞ্জরীকে দেখা মাত্রই মন আকাশের নিঃসীমতায় হারিয়ে যায় । লুপ্ত হয়ে যায় আকাশ ও মাটির ব্যবধান । নিঃসীম নীল মুখর হয়ে ওঠে । এই মঞ্জরী ছোট বাবু আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন ।

নাগিলা : আমার জন্য ! [মঞ্জরী নিজের গালের ওপর রাখছে] কিন্তু কত বেলা হয়ে গেল । দিনের সূর্য মাথার ওপর উঠে এল । তবু তাঁর আসার নাম নেই । শ্রীমন্ত, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছিলে ?

শ্রীমন্ত : সেই শুকনো গাছের কাছে যেখান হতে সোমপুরা যাবার পায়ে চলা পথ গেছে ।

নাগিলা : না জানি তিনি কতদূর তাঁকে পৌঁছে দিতে গেছেন । কিন্তু আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে । আজ সকালে আমার মুখ হতে নির্বাসনের কথা বেরিয়ে গিয়েছিল । তা যেন আমার জীবনে সত্য না হয়ে যায় ।

[চুড়ী ওয়ালী আসছে]

চুড়ীওয়ালী : চুড়ী চাই বৌরাণী । [চুড়ীর ডালা নামিয়ে নাগিলার সামনে রাখছে] তোমার জন্য আজ সুন্দর সুন্দর চুড়ী এনেছি ।

নাগিলা : আজ চুড়ী নেবার মন নেই । আর একদিন এসো ।

চুড়ীওয়ালী : ছোট বাবু পাঠিয়ে দিলেন কিনা । রাস্তায়ই দেখা হয়ে গিয়েছিল । বললেন, তুই যা, পছন্দ করা, আমি এখুনি আসছি ।

নাগিলা ঃ আর কিছু কি বলেছিলেন ?

চুড়ীওয়ালী ঃ [হেসে] হাঁ বলেছিলেন। বলেছিলেন ওর কমল কলির মতো কোমল হাতে সবুজ রঙের চুড়ী পরিয়ে দিবি যে সবুজ রঙ বনের শ্যামলিমাকেও হার মানিয়ে যায়।

নাগিলা : [লজ্জিত ভাবে] ছিঃ !

চুড়ীওয়ালী ঃ ওতে লজ্জার কি আছে। এখনত নূতন নূতন তাই। ···তুমি এবার চুড়ী দেখে নাও বৌরাণী। আমার আবার যাবার তাড়া আছে। আমাকে বিয়ে বাড়ীতে যেতে হবে। ওখানে অনেক চুড়ী বিক্রী হবে।

নাগিলা ঃ কিছু পছন্দ করে নেবার মতো মন আজ আর নেই আমার বরং তুইই তোর পছন্দ মতো এক গোছা সবুজ রঙের চুড়ী আমায় দিয়ে যা—

চুড়ীওয়ালী ঃ তবে আমার পছন্দ মতো এক গোছা চুড়ী আমি তোমায় পরিয়ে দেই।
[নাগিলার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুড়ীওয়ালী চুড়ী পরিয়ে দিচ্ছে]

চুড়ীওয়ালী ঃ তাহলে চলি। [ডালা তুলছে]

নাগিলা ঃ পয়সা নিবিনা ?

চুড়ীওয়ালী ঃ ছিঃ ! তোমার কাছে কী নিতে পারি ! তুমি এখন নূতন। ছোটবাবুর কাছে নেব। পাঁচগুণ ! [চলে যায়]

শ্রীমন্ত ঃ তবে আমিও চলি বৌঠান। অনেক দেরী হয়ে গেল। [চলে যায়]

নাগিলা ঃ এখুনি আসছি ! এখুনি আসছি ! আর এত দেরী ! কোথায় রয়ে গেলেন ! শ্রমণদের উপাশ্রয় পর্যন্ত ত চলে যাননি ! আর্য ভবদত্ত সংসার পরিত্যাগের কথা বলছিলেন। তবে কি···না না সেরকম কিছু হতে পারে না। কিন্তু সেই কথাই কেন বারবার আমার মনে আসছে। তবে কি আমি উপাশ্রয়ে গিয়ে দেখে আসব। যদি শ্রমণেরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে না দেন ! যদি উনি না ফেরেন ! আরে পাগলের মতো আমি এসব কি ভাবছি। উনি ত আমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। আমাকে ছেড়ে যাবার তাই প্রশ্নই কোথায় ?···কিন্তু এদিকে যে সন্ধ্যে হয়ে এল। গাংগু মাঠ হতে গরু নিয়ে ঘরে ফিরছে।

[গাংগু আসছে]

গাংগু ঃ শুনেছ বৌরাণী।

নাগিলা ঃ [চমকে] কি ?

গাংগু ঃ ছোটবাবু আজ দীক্ষিত হয়ে গেলেন।

নাগিলা ঃ কে বলল গাংগু ? না না, এমন হতে পারে না।

গাংগু : হতে পারেই নয়, হয়েছে। আমি যখন গরু চরিয়ে ফিরছি তখন উপাশ্রয়ে লোকজনের ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম ছোটবাবুর দীক্ষা হয়েছে। আমার বিশ্বাস হল না তাই ভিতরে ঢুকলাম। সেখনে ছোট-বাবুকে দেখলাম। আরে তুমি কাঁদছ ?

নাগিলা : [চোখের জল মুছে] না না গাংগু, ও কিছু নয়। কিন্তু তিনি কি তোকে চিনতে পারলেন ? তোকে কি কিছু বললেন ?

গাংগু : না বৌরাণী। আমি ত ওঁর কাছ পর্যন্ত যেতেই পারিনি। আর উনিত কোনো দিকেই তাকাচ্ছিলেন না। তাঁকে কেমন যেন উদাস দেখাচ্ছিল। কিন্তু বৌরাণী ঘর হতে কেউ যখন দাক্ষিত হয় তখন যখন উৎসব হয় তখন তুমি কেন চোখের জল ফেলছ ?

নাগিলা : চোখের জল! না গাংগু না। উনি যদি আত্ম কল্যাণের পথে চলতে চান আমি তবে কেন চোখের জল ফেলব ?

গাংগু : তবে তুমি কাঁদছ কেন ?

নাগিলা : আমার ভাগ্যকে।

চতুর্থ দৃশ্য

[উপাশ্রয়। সময় রাত্রি। পুণ্ডরীক ও ভবদেব]

পুণ্ডরীক : ভবদেব, আজ আচার্য যখন রইবক্কা পড়াচ্ছিলেন তখন তোমাকে ভারী অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। এ সম্বন্ধে কি তোমার কিছু বলবার নেই ?

ভবদেব : না।

পুণ্ডরীক : ভবদেব, আমি তোমার সতীর্থ। তোমার সামান্য আগেই দীক্ষিত হয়েছি। তুমি আমায় তোমার মনের কথা অকপটে খুলে বলতে পার।

ভবদেব : কি বলবার আছে যে বলব ?

পুণ্ডরীক : ভবদেব, আমার কি মনে হয় জান। আচার্য যে দশবেয়ালিয়ার প্রথম চুলিয়া আজ পড়ালেন সে শুধু তোমারই জন্য। ইহ খলু ভোঃ প্রব্রজিতেন উৎপন্ন-দুঃখেন—প্রব্রজিত হবার পর যার মনে দুঃখ উৎপন্ন হয়েছে, যে সংসারে ফিরে যেতে চায়, সে সংযম পরিত্যাগের পূর্বে যেন এই আঠারোটি বিষয় চিন্তা করে।

ভবদেব : জানি পুণ্ডরীক। কিন্তু ও শাস্ত্রবাক্য আমার জন্য নয়।

পুণ্ডরীক ; তবে তুমি কেন প্রব্রজিত হতে এলে।

ভবদেব : আমি আসিনি। ঘটনাচক্রই আমায় প্রব্রজিত করেছে।

পুণ্ডরীক : ভবদেব, সংসারে তোমার কে আছে ?

ভবদেব : সংসারে আমার কেউ নেই, এক…

পুণ্ডরীক : বল ভবদেব বল —

ভবদেব : শুধু এক নাগিলা ছাড়া।

পুণ্ডরীক : নাগিলা তোমার কে ?

ভবদেব : সে আমার সব।

পুণ্ডরীক : বুঝেছি ভবদেব। তুমি তাকে খুব ভালবাসতে···কিন্তু এখন তুমি কি ভাবছ বলত ?

ভবদেব : কী ভাবছি ! যার কথা না ভেবে পারা যায় না তার কথা। চাঁদের আলোর একটুকরো যা আমার পায়ের কাছে এসে পড়েছে তা যেন হংসদূত হয়ে তার কথাই আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

পুণ্ডরীক : [খানিক নিস্তব্ধতার পর] অনেক রাত হয়েছে ভবদেব এবারে শুতে যাও।

ভবদেব : আমার ঘুম আসে না।

পুণ্ডরীক : অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং ন যাতি নৈতি নিদ্রা।
কি ঠিক বলিনি ? তুমি কবি। তুমি ভুল স্বর্গে এসে গেছ। তুমি আবার ঘরে ফিরে যাও ভবদেব।

ভবদেব : না।

পুণ্ডরীক : না কেন ?

ভবদেব : ঠিক জানি না। কি যেন আমায় এখানে ধরে রেখেছে। তাছাড়া আমি চলে গেলে আমার অগ্রজের অপমান করা হবে। সে আমি পারব না।

পুণ্ডরীক : তুমি অদ্ভূত !

[দশ বছর পর যে রাত্রে আর্য ভবদত্তের মৃত্যু হল]

পঞ্চম দৃশ্য

[গ্রামপথ। সময় ঊষাকাল]

ভবদেব : রাতও ভোর হয়েছে। আমিও এসে পড়েছি। এই তো সেই গ্রাম। এই ত্র এই সেই পথ, যে পথ গেছে আমবাগানের মধ্যে দিয়ে জলের কুয়োর ধার দিয়ে। এই পথ দিয়েই আমি একদিন বিয়ে করে নিয়ে এসেছিলাম নাগিলাকে। সে কত দিনের কথা ? মনে হয় তা যেন এই কিছু দিন আগের—পালকীতে যখন আসছিলাম তখন ওর হাত ছিল আমার হাতের মধ্যে। মধুর লজ্জায় তা ঘেমে ঘেমে উঠছিল। আর আমি ? আমি চেয়েছিলাম যখন সে চেয়েছিল বাইরে, তার মুখের নিটোল রেখা, কর্ণমূল ছোঁয়া দোলন চাঁপার পাঁপড়ি। কি সুন্দর সেদিন দেখাচ্ছিল মধুর-

বাসরিকা নাগিলাকে। চোখে ছিল তার সুস্মিত তৃষ্ণা, পৌর্ণমাসীর সুন্দর আশ্বাস। আজো কি নাগিলা ওমনি সুন্দর আছে?...সেদিন হতে আজ দশ বছরের ব্যবধান। আর্য ভবদত্তেরও মৃত্যু হল আর আমিও বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু সহসাই কি ঘরে যাওয়া ঠিক হবে? নাগিলা যদি সেখানে না থাকে, যদি সে...না না তা কখনো হতে পারে না। পারে নাই বা কেন? এখন আমি কি করি? এইত গ্রামে যাবার পথ। নিশ্চয়ই কারু না কারু সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাকে শুধিয়ে নেব। কিন্তু? সে কি আমায় চিনতে পারবে? না, তার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া এই দীর্ঘ দিন পর কেই বা আমায় মনে করে রাখবে।...ওই যে কারা যেন এই দিকেই আসছে।

[জল নিতে যাবার জন্য নাগিলা ও মন্দিরা সামনে হতে আসছে। সাধুকে দেখে]

উভয়ে : [আনত হয়ে] প্রণাম।

ভবদেব : [আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে] তোমরা কি এই গ্রামে থাক?

মন্দিরা : হ্যাঁ ভগবন্।

ভবদেব : আচ্ছা তোমরা কি নাগিলাকে জান?

মন্দিরা : কে নাগিলা —ভবদেবের স্ত্রী? ও ত...[নাগিলা পেছন হতে কাপড় টেনে তাকে থামিয়ে দিচ্ছে]

ভবদেব : ও ত?

মন্দিরা : ও ত আমার বাড়ীর কাছে থাকে।

ভবদেব : তোমার বাড়ীর কাছে। এখনো ওখানেই আছে ত?

মন্দিরা : আছে। কিন্তু আপনি বলুন, আপনি কে?

ভবদেব : আমি শ্রমণ।

মন্দিরা : সেত দেখতেই পাচ্ছি। সেই জন্যই ত জিগ্যেস করছি নাগিলার এতো খবরে আপনার কি প্রয়োজন?

ভবদেব : আমার? সে তুমি বুঝবে না। ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

মন্দিরা : দরকার? আপনি কি কখনো এখানে এসেছিলেন? আপনাকে ত কখনো আমি দেখিনি।

ভবদেব : আমিও তোমায় সেই কথাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম। তুমি ওর বাড়ীর কাছে থাক অথচ তোমাকে আমি দেখিনি।

নাগিলা : কি করে দেখবেন? ও ত এ গ্রামের মেয়ে নয়, বউ।

ভবদেব : [নাগিলার দিকে এক ঝলক দেখে মন্দিরার দিকে দেখছে] তুমি কি সুদেবের বউ ?

মন্দিরা : আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু ওঁকে আপনি জানলেন কি করে ?

ভবদেব : তুমি যেমন নাগিলাকে জান ঠিক সেইভাবে। আমি ওর বাড়ীর কাছে থাকতাম।

মন্দিরা [ওপর হতে নীচ অবধি দেখে] তবে কি আপনিই ভবদেব ?

ভবদেব : যদি বলি আমিই ভবদেব।

নাগিলা : যদি কেন ? আপনার সেকথা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল।

ভবদেব : [নাগিলার দিকে চেয়ে] তুমি কে ?

নাগিলা : আমি কে ? কেন আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ?

ভবদেব : পেরেছি। তুমি নাগিলা। সত্যিই তুমি নাগিলা। কিন্তু কি পরিবর্তন ?

মন্দিরা : হবে না ? যে ভাবে আপনি ওকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন তাতে পরিবর্তন না হওয়াই ত আশ্চর্য ?

ভবদেব : তা ঠিক। তবে বিশ্বেস করো আমি ওকে ছেড়ে যাইনি। আমার ভবিতব্যই আমায় টেনে নিয়ে গেছিল। তুমি না জান ও জানে।

[নাগিলার দিকে চেয়ে]

নাগিলা, সেও ছিল এক বসন্ত। এও আর এক বসন্ত। সে দিন আমি যেমন তোমার ছিলাম, আজিও আমি ঠিক তেমনি তোমার আছি।

নাগিলা কিন্তু শ্রমণ, আমি কি সেই নাগিলা ?

ভবদেব : তার মানে ?

নাগিলা : তার মানে সেদিন ও আজকের মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান। আমি সে নই। এবং সম্ভবতঃ আপনিও।

ভবদেব : কিন্তু আমি সেই আছি নাগিলা। এই দশ বছর তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবি নি।

নাগিলা : না শ্রমণ না। এত চাওয়ার মূল্য আমার মধ্যে নেই।

ভবদেব ; আছে নাগিলা, আছে। চল ঘরে যাই।

নাগিলা : ঘর ? তুমি আমি একসঙ্গে থাকি এত জায়গা কি আর এক ঘরে আছে ?

ভবদেব : [চমকে] সত্যিই কি নেই নাগিলা ?

নাগিলা : না শ্রমণ না। তোমায় আমি ব্রতচ্যুত দেখব সেই কি তুমি আশা কর। আমার হৃদয়ে তুমি যে স্থান অধিকার করে আছ তাকে অবিস্মরণীয় থাকতে দাও। আমি তোমায় ভালবাসি।

ভবদেব ঃ ভালবাসি। [একটু থেমে] তবে তাই হবে নাগিলা। তোমার রূপ আমায় পৌঁছে দিয়েছে সেই অরূপের কিনারে যা শাশ্বত, যা অনন্ত, যার ক্ষয় নেই। তুমি মানবী নও নাগিলা, বিশ্বের আনন্দ পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যেন কোনো প্রতিমা।

[ভবদেব যেদিক হতে এসেছিল সেদিকে চলে যাবে। ওরা দু'জন চোখের জল মুছতে মুছতে তার যাবার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে]

জৈন

বুদ্ধের ধর্ম প্রচারিত হইবার কিছু পূর্বেই [অনেক পূর্বে—সম্পাদক] উত্তর ভারতে জৈন ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে জৈনগণ তীর্থংকরদিগকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিলেন—ধর্মের প্রাচীন বিশুদ্ধতা নষ্ট হইল। এক সময়ে ইহাদের শক্তি সমগ্র ভারতকে যে অভিভূত করিয়াছিল তাহার নিদর্শন নানাস্থানের অসংখ্য মন্দির ও ধর্মশালা। আবু পর্বতের জৈন মন্দির ভারতীয় স্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। অতি প্রাচীনকালে জৈনদের মধ্যে দুইটি ভাগ হইয়া যায়—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বর মন্দিরে হিন্দু পুরোহিত কাজ করেন এবং প্রায় সমস্ত জৈন পরিবারে কোনো ক্রিয়াই ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। হিন্দু সমাজের মধ্যে জৈনগণ যে ক্রমেই বিলীন হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ গত ত্রিশ বৎসরের আদমসুমারী; ১৮৯১ সালে জৈনদের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, ১৯০১ সালে ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার, ১৯১১ সালে ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার, ১৯২১ সালে ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার। [এই সংখ্যা সব সময়ে নির্ভর যোগ্য নয়। যাঁহারা জনগণনা করিতে যান তাঁহারা অনেক সময়ে জৈনদের হিন্দু বলিয়া লিখিয়া লন।—সম্পাদক]

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদে জৈনদের ভিতরে সংস্কারের এক আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই নূতন দল প্রতিমা পূজার ঘোর বিরোধী; ইহাদিগকে স্থানকবাসী বলে।

জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনেক দিন হইতে প্রবেশ করা সত্বেও শিক্ষা তেমন ভাবে ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই; ইহার কারণ জৈনগণ ব্যবসায়েই তাহাদের মন প্রাণ দিয়াছে, অন্য কোনো উচ্চ আদর্শের সহিত যোগ স্থাপন করে নাই। আধুনিক সময়ে জৈনদের মধ্যে রামচন্দ্র রবজী ভাই নামক একজন কাথিবাড়বাসী জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। মূর্তি ও মূর্মাতি (মুখের কাপড়) ব্যতীত মোক্ষলাভ হয়—স্থানকবাসী হইয়াও শ্বেতাম্বর মন্দিরে পূজা করা যায় ইত্যাদি উদার মত তিনি প্রচার করেন। ১৯০৯ সালে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

যে সাম্প্রদায়িক জাগরণ হিন্দু সমাজের মধ্যে দেখা গিয়াছে, জৈনদের মধ্যে তাহার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৮৯৩ সালে। ঐ বৎসরে দিগম্বর গণের প্রথম বাৎসরিক কনফারেন্স হয়। বৎসর দেড়-এক পরে খৃষ্টীয় যুবক সমিতির অনুকরণে জৈন যুবক সমিতি নামে এক সমিতি গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে শ্বেতাম্বর গণের প্রথম কনফা-

রেন্স ও ১৯৩৬ সালে স্থানকবাসীদের প্রথম মিলন সভা হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা এই তিন সম্প্রদায়কে এক করিয়া এক বিপুল শক্তি সৃষ্টি করেন।

ইহাদের সকলের উদ্দেশ্য জৈন সাধু ও পুরোহিতদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা, জৈন ছাত্রদের জন্যে পৃথক হোস্টেলাদি খোলা ও সেখানে জৈন ধর্ম পুস্তক নিয়মিত ভাবে অধ্যাপনা, ইংরাজী ও দেশী ভাষায় জৈন পত্রিকা প্রকাশ, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের উদ্ধার ও প্রকাশ, নূতন করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা ও প্রচার এবং সমাজ ও ধর্মের সংস্কার সাধন।

দিগম্বর, শ্বেতাম্বর, স্থানকবাসী সকলেই এই সংস্কারের জন্য বদ্ধ পরিকর। দিগম্বরগণ কাশীতে স্যাদবাদ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অর্হতগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দিল্লীতে একটি অনাথাশ্রম, দেশের নানাস্থানে হোস্টেল ও বোম্বাইতে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এছাড়া অনেকগুলি সংবাদপত্র বহু ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে—নারীদের জন্য বিশেষভাবে একখানি কাগজ ইহাদের আছে। শ্বেতাম্বরগণও দিগম্বর-দের পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাছাড়া ইহাদের আর একটি কার্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহারা জৈন সাহিত্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। জৈন গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম বাধা প্রাচীন পন্থী জৈন সাধুগণ, তাঁহারা এই সকল জ্ঞানগর্ভ পুঁথি সমূহ কিছুতেই বাহিরে প্রকাশ করিতে চান না।

অনেকগুলি ফাণ্ড হইতে বহু জৈন গ্রন্থ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দীতে যে কত বই আছে তাহা আমরা জানিতাম না। জৈন যুবক সমিতি বর্তমানে ভারত জৈন মহামণ্ডল নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সভার কেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে। ইহার প্রধান কর্মচারী একজন সম্পাদক, তিন সম্প্রদায়ের তিনজন সহকারী সম্পাদক তাঁহাকে সাহায্য করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য তিন শাখার মধ্যে সখ্যতা ও ঐক্য স্থাপন। ইংরাজীতে 'জৈন গেজেট' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ইহাদের মুখপত্র। আরাতে একটি বড় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া জৈন পুস্তক ও ও পুঁথি রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলাতেও জৈন ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। যুরোপীয় জৈনশাস্ত্রবিদ ও ভারতীয় জৈনদের লইয়া একটি সভা গঠিত হইয়াছে।

বরদা এজেন্সি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা কর্তৃক ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বিরচিত ভারত পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১০৮-১১০) হইতে সংকলিত।

স্মৃতি চারণ

মুনি জিন বিজয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রথম বছরেই সিংঘী জৈন ছাত্রালয়ে ১৬।১৭ জন বিদ্যার্থী ভর্তি হল। যারা সম্পন্ন ঘর হতে এসেছিল তারা নিজের খরচ দিত, অন্য বিদ্যার্থীদের ব্যয়ভার ছাত্রালয়ই বহন করত। স্কুলের এই বিদ্যার্থী ছাড়াও গবেষণামূলক অধ্যয়নের জন্য যে সব বিদ্যার্থী আমার কাছে এসেছিল তারাও যথানিয়ম বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে প্রবিষ্ট হল ও সেই ধরণের অধ্যয়ন করতে লাগল।

প্রথম বছরের আবহাওয়া বেশ উৎসাহ জনক ছিল। যে বাড়ী আমরা পেয়েছিলাম স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে তা অনুকূল ছিল না। অন্য বাড়ী পেতে পারি তারো সম্ভাবনা ছিল না। তাই ভালো বাড়ী না থাকার কষ্ট আমরা অনুভব করতে লাগলাম। সিংঘীজীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হত। তিনি তখন একদিন বললেন, তাহলে এক ভালো বাড়ী তৈরী করে নেওয়া যাক যেখানে সিংঘী জৈন জ্ঞানপীঠ ও সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার একত্র সমাবেশ হবে। এতে ১০।১২ হাজার টাকা মত খরচ হবে। এর জন্য যদি আশ্রম কর্তৃপক্ষ ভালো জমি দেন তবে বাড়ী আমি তৈরী করিয়ে দেব। এ বিষয়ে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমি কথা বললাম ও গুরুদেবের সঙ্গেও দেখা করলাম। গুরুদেব অনেক উৎসাহ দিয়ে বললেন, আশ্রমের যে খালি জমি রয়েছে সেই জমির পছন্দমত যতটুকু দরকার আপনারা নিয়ে নিন ও বাড়ী তৈরী করুন। আশ্রম সমস্ত রকমে আপনাদের সাহায্য করবে। আমি তখন এক লম্বা চৌড়া জায়গা দেখে পছন্দ করলাম ও বাড়ী তৈরীর প্রস্তুতি আরম্ভ হল। প্রথমে একটা ছোট বাড়ী করা হবে যেখানে আমি থাকব, দ্বিতীয় বছর সেখানে ছাত্রালয়ের বড় বাড়ী তৈরী হবে। এরজন্য পূজার ছুটির আগেই এক ছোটখাট অনুষ্ঠান করা স্থির হল ও স্বয়ং গুরুদেব তার শিলান্যাস করবেন তাও স্থির হয়ে গেল। সিংঘীজীরও এই কার্যক্রম পছন্দ হল এবং এর জন্য তিনি সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দিলেন। নিশ্চিত দিনে তিনি সেখানে এলেন। গুরুদেবের হাতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল। সিংঘীজীর পক্ষ হতে আশ্রমের সকলকে চা পানে আপ্যায়িত করা হল।

এভাবে সিংঘী জৈন ছাত্রালয়ের কাজ খুব উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ হল। পূজার ছুটির পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আদির ব্যবস্থাও হয়ে গেল। বিদ্যার্থীদের মধ্যে অনেকে সিংঘীজীর নিকট আত্মীয়দের মধ্য হতে আসায় তাদের অভিভাবকেরা যাতে কোনো

প্রকার ত্রুটি ধরতে না পারে বা ছাত্রালয়ের কোনো দোষ দেখাতে না পারে তার জন্য খাওয়াদাওয়া আদি সমস্ত রকম বিষয়ে দৃষ্টি রাখার জন্য ও তার জন্য যা খরচ হয় করবার জন্য তিনি আদেশ দিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও এতে আমার বিরোধ ছিল। কারণ শান্তিনিকেতনের মত জায়গায় যখন অন্য হাজারো বিদ্যার্থী আশ্রমের সর্বসাধারণ ভোজনালয়ে সস্তা ও সাধারণ খাবার খাবে তখন জৈন বিদ্যার্থীরা কেন প্রতি দিন ভালো খাবার খাবে ? এ ব্যবস্থা অসমঞ্জস বলে আমার মনে হত। কিন্তু সিংঘীজীর নিজের সমাজের ক্ষুদ্র ও দোষদর্শী মনোভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল।...সিংঘীজী যথার্থই দূরদর্শী ছিলেন। এবং কাজ কিছু অগ্রসর হতেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে এর সামান্য পরিচয় আমিও পেয়েছিলাম।

সেই শীতকাল বেশ ভালভাবেই কাটল। এবং পরীক্ষাদি দিয়ে গ্রীষ্মাবকাশে বিদ্যার্থীরা আপন আপন ঘরে ফিরে গেল। আমিও গ্রন্থমালার কাজের জন্য গুজরাত গেলাম।

এই এক বছরের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হল ছাত্রালয়ের যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে না অথচ এর জন্য ব্যয় করা হচ্ছে অনেক বেশী। যে সমস্ত বিদ্যার্থী এখানে ভর্তি হয়েছে তারা অত্যন্ত সাধারণ, উচ্চ শিক্ষার তাদের কোনো যোগ্যতা নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করা ও নিজের মতামত সিংঘীজীকে জানাব ভাবছিলাম এর মধ্যে দ্বিতীয় বছরের গোড়াতেই ছাত্র ভর্তিতে একটা মন্দার আবহাওয়া দেখতে পেলাম। কারু শান্তিনিকেতনের জলহাওয়া অনুকূল মনে হল না, কারু এখানকার পাঠ্যক্রম ও থাকা পরা। তাই অর্দ্ধেকের বেশী বিদ্যার্থীই উপস্থিত হল না।

ছাত্রালয় স্থাপন করানোর আমার উদ্দেশ্য ছিল কিছু বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্যার্থীকে শান্তিনিকেতনের মুক্ত আবহাওয়ায় শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ব্যক্তিত্ব নিয়ে অগ্রণী হয়।

কিন্তু সেখানে যে ধরণের বিদ্যার্থী এসেছিল তারা সংস্কার ও ব্যবহারে প্রায় আমার চিন্তার বিপরীত ছিল। শিক্ষা বিষয়ে তাদের মাতা পিতার না কোন উচ্চ ভাবনা ছিল না তাদের ছেলেরা বিশিষ্ট সংস্কারসম্পন্ন হোক এই ইচ্ছা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিনিকেতনে থেকে যত শীঘ্র সম্ভব স্কুলের পরীক্ষা পাশ করা। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পাঠ্যক্রম এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল ছিল না। কেবলমাত্র পুস্তক পড়ানোর চাইতে বিদ্যার্থীর সংস্কার ও আদর্শ উন্নয়নের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যেই সেখানকার সমস্ত পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছিল। সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও চিত্রকলার বিশিষ্ট শিক্ষাও শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র দ্রব্যোপাসক ও অর্থপূজক বণিক প্রবৃত্তির জৈনদের এই ধরণের সাংস্কৃতিক শিক্ষায় কিছুমাত্র অনুরাগ হবে তার সম্ভাবনা আমি দেখতে পেলাম না। এজন্য আমি ভাবলাম যে জৈন

ছাত্রালয়ের জন্য অধিক শ্রম ও অর্থব্যয় করা লাভদায়ক হবে না এবং সেজন্য এই উদ্দেশ্যে নূতন কোনো কার্য না করাই স্থির হল।

ছাত্রালয়ে স্কুলের বিদ্যার্থী ছাড়াও সিংঘী জৈন জ্ঞানপীঠের কিছু গবেষক বিদ্যার্থীও ছিল যারা আমার কাছে শাস্ত্রীয় বিষয় অধ্যয়ন করত। এ দিকে গ্রন্থমালার কাজও সুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ৪।৫ খানা গ্রন্থ এক সঙ্গে প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রবন্ধ চিন্তামণি মূল সংস্কৃতে ১৯৩৩ সালের মে-জুন মাসে ছেপে তৈরী হয়ে এল।···সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ছাপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। এই গ্রন্থের একখানা যখন আমি গুরুদেবকে উপহার দিলাম, তিনি তখন খুব খুসী হলেন ও এ বিষয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এরপর যখনি আমি তাঁর কাছে গেছি তখনি তিনি এই গ্রন্থমালা সম্পর্কিত প্রশ্ন করতেন। জৈন সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের এক গুপ্ত ভাণ্ডার; প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও রাজস্থানী ভাষাসাহিত্য এক অদ্বিতীয় নিধি এসব কথা যখন আমি তাঁকে বলতাম তখন তিনি উৎসুকতার সঙ্গে আমাকে বলতেন, আপনি বাহাদুর সিংজী সিংঘীর মতো দু'চার জন ধনী জৈন ব্যবসায়ীকে অনুপ্রাণিত করুন ও চান ত আমিও তাঁদের লিখতে পারি যাতে ২।৪ লক্ষ টাকা একত্রিত হয় ও এই ধরণের জৈন সাহিত্য উদ্ধারের কাজ তীব্রগতিতে অগ্রসর হয়।

যদিও এভাবে সিংঘী জৈন জ্ঞানপীঠ ও সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার কাজ শান্তিনিকেতনে সচারুরূপে চলছিল কিন্তু ধীরে ধীরে আমার স্বাস্থ্য সেখানে ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। বাঙলাদেশের ম্যালেরিয়াপূর্ণ জলবায়ু আমাকে শিথিল স্বাস্থ্য করে দিয়েছিল এবং সর্বদাই নিজেকে অসুস্থ অনুভব করতে লাগলাম। এজন্য শান্তিনিকেতনে স্থায়ী নিবাসের যে ইচ্ছা ছিল তা ক্রমশঃ মন্দ হতে লাগল। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে শান্তিনিকেতনের জন্য সিংঘীজীর উৎসাহও কম হয়ে গেল। তা হলেও ৩ বছর সেখানে ব্যতীত হল।

শান্তিনিকেতনে থাকলেও আমার মুখ্য লক্ষ্য ছিল সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার প্রগতির দিকে এবং তারই সম্পাদন ও প্রকাশন ব্যাপারে আমি সর্বদা ব্যস্ত থাকতাম। সেই কাজের জন্য, গুজরাতই ছিল আমার পক্ষে বেশী অনুকূল। তাই নিজের কর্মকেন্দ্র শান্তিনিকেতন হতে সরিয়ে আহমদাবাদ বা বম্বাইতে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে লাগলাম ও সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় তাও চিন্তা করলাম।

এই সময় উদয়পুরস্থিত কেশরিয়া তীর্থের সত্বাধিকার নিয়ে একদিকে শ্বেতাম্বর-দিগম্বর অন্যদিকে উদয়পুর রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ বাধল। এই উপলক্ষে সিংঘীজীকে উদয়পুর যেতে হল। তিনি সেখান হতে উদয়পুরে যাবার জন্য আমাকে পত্র দিলেন··· তদনুসারে আমি উদয়পুর গেলাম।···সেখান হতে জুন মাসে যথাসময় শান্তিনিকেতনে

ফিরে এলাম। জৈন ছাত্রালয় বন্ধ করে দেওয়া স্থির হয়ে গিয়েছিল। তাই তার কাজ গুটিয়ে নিতে লাগলাম। গ্রন্থমালার কাজ চলতে লাগল। এবছর বিবিধ তীর্থকল্প ছাপা হয়ে তৈরী হয়ে গিয়েছিল, প্রবন্ধ কোষ ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আরো কয়েকটী নূতন গ্রন্থের প্রেস কপি তৈরী করা হচ্ছিল।

দীপাবলীর সময় আমি আহমদাবাদ গেলাম ও সেখান হতে বম্বে গিয়ে ২।৩ মাস রইলাম। গ্রন্থ বম্বের নির্ণয় সাগর প্রেসে ছাপা হচ্ছিল। প্রুফ পেতে ও ফেরত যেতে অনেক সময় লাগত তাই দেখতে চাইলাম বম্বেতে রইলে একাজ আরো ত্বরান্বিত করা যায় কিনা।

কেশরিয়াজী সংক্রান্ত মামলায় সিংঘীজীর আমন্ত্রণে আবার আমায় উদয়পুর যেতে হল।···সেখানে থাকাকালীনই এই নির্ণয় নেওয়া হল যে গ্রন্থমালার কাজকে সুচারুরূপে করবার জন্য ও আমার স্বাস্থ্যের জন্য শান্তিনিকেতন উপযুক্ত স্থান নয়। তাই সে স্থান পরিত্যাগ করে অহমদাবাদে তার কার্যালয় স্থাপিত করা হোক।

তদনুসারে ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে আমি শান্তিনিকেতনের আবাসস্থান উঠিয়ে দেওয়া ও জিনিষপত্রের বিলি ব্যবস্থার জন্য শেষবারের মত সেখানে গেলাম। বিগত ৪ বছর ওখানে নিবাস ও ছাত্রাবাসের জন্য সেখানে অনেক জিনিষই জমা হয়ে গিয়েছিল···সিংঘীজীর নির্দেশানুসারে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে যা দেবার মত ছিল তা আশ্রমকে, অন্য জিনিষ সেখানকার অন্যান্য ব্যক্তি যাঁদের মধ্যে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন আদিও ছিলেন তাঁদের দিয়ে দেওয়া হল। এভাবে সেখানকার কাজ শেষ করে আমি কলকাতা গেলাম···

শান্তিনিকেতনের গ্রন্থমালার কার্যালয় এখন অহমদাবাদে রাখাই স্থির হল। এপর্যন্ত প্রবন্ধ চিন্তামণি (মূল), পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রবন্ধ কোষ, বিবিধ তীর্থকল্প ও Life of Hemacandracarya এই পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। আরো ৫।৬ টী গ্রন্থ ছাপা হচ্ছিল। বারাণসীতে পণ্ডিতজীর তত্বাবধানেও কিছু গ্রন্থ তৈরী করাবার ব্যবস্থা করা হল।···

আমি অহমদাবাদ থেকে গ্রন্থমালার কাজ করতে লাগলাম, এর মধ্যে দেবানন্দাভ্যুদয়, প্রভাবক চরিত্র, ভানুচন্দ্র চরিত, জৈন তর্ক ভাষা আদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল ও অন্য নূতন গ্রন্থের প্রেস কপি তৈরী হচ্ছিল। দুই তিন বছর তাই সিংঘীজীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা গেল না। পত্র ব্যবহারও ৪।৬ মাসে এক আধবার হত।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫·০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন

পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র

৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. IV No. 8 : Sraman : December 1976

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

পৌষ । ১৩৮৩ চতুর্থ বর্ষ । নবম সংখ্যা

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮৩ ॥ নবম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

তীর্থংকর, খণ্ডগিরি, উড়িষ্যা

উড়িষ্যায় জৈনধর্ম

শ্রীদীপক রঞ্জন দাস

কথিত আছে ভগবান মহাবীর তাঁর বাণী প্রচারার্থে কলিঙ্গ দেশে গমন করেছিলেন। এই কিম্বদন্তীটি সত্য হলে উড়িষ্যায় জৈনধর্ম খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই প্রবর্তিত হয়েছিল। যদি মহাবীরের এ অঞ্চলে আগমন ঐতিহাসিক সত্য না হয় তা' হলেও উড়িষ্যায় জৈন ধর্ম যে শেষ তীর্থঙ্করের তিরোভাবের অল্প কিছু কালের মধ্যেই প্রবর্তিত হয়েছিল তা' খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপি থেকে অনুমান করা যায়। উক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় খৃষ্ট জন্মের তিনশতাধিক বর্ষ পূর্বে মগধের নন্দরাজ কলিঙ্গ-জিনের একটি মূর্তি উড়িষ্যা থেকে লুণ্ঠন করে নিজ রাজ্যে নিয়ে যান। সুতরাং হাতীগুম্ফা শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে উড়িষ্যায় অতি প্রাচীন কাল থেকেই জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি পূজিত হোত। 'ব্যবহার ভাষ্য' নামক গ্রন্থে উক্ত আছে তোসলী (উড়িষ্যার অপর একটি নাম) রাজ্যে একটি জৈন মূর্তি রাজা তোসলীকের প্রহরায় সুরক্ষিত ছিল।

কলিঙ্গের চেদীরাজ খারবেল (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি মগধ অভিযান করে কলিঙ্গ থেকে অপহৃত জিন মূর্তি স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। তাঁর রাজত্বকালে ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে অনেকগুলি গুহা খনন করে জৈন সাধুদের আবাসস্থল নির্মাণ করা হয়। উদয়গিরির শীর্ষদেশে যে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সম্ভবতঃ সেখানে মগধ থেকে আনীত কলিঙ্গ-জিনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। খারবেলের মৃত্যুর পরও জৈনধর্মের কেন্দ্ররূপে খণ্ডগিরির গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। উড়িষ্যার ভৌমকর এবং সোমবংশী রাজগণ জৈন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন না। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে সোমবংশী রাজা উদ্যোত কেসরীর রাজত্বকালে খণ্ডগিরির কয়েকটি গুহায় তীর্থঙ্কর ও তাঁদের শাসন দেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ই খণ্ডগিরির উপর কয়েকটি মন্দির করে বিভিন্ন তীর্থঙ্করের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। উড়িষ্যায় গঙ্গ ও গজপতি বংশের রাজত্বকালেও খণ্ডগিরিকে জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থরূপে দেখা যায়। এই সময়ই খণ্ডগিরির ত্রিশূল গুম্ফায় জৈন তীর্থঙ্করগণের মূর্তি উৎকীর্ণ হয়।

উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরি ব্যতীত উড়িষ্যায় আরও অনেক জৈন কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙ উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের অবনতি এবং জৈনধর্মের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। পুরী জেলার বানপুর থেকে প্রাপ্ত একটি তাম্র

শাসনে শৈলোদ্ভব রাজা ধর্মরাজ মানভদ্র (৬৯৫-৭৩০ খৃঃ) অর্হদাচার্য নসিচন্দ্রের শিষ্য জৈন সাধক প্রবুদ্ধচন্দ্রকে থোরণ বিষয়ের অন্তর্গত মধুবাটক ও সুবর্ণলদ্ধি গ্রামে কিছু ভূমি দান করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

উড়িষ্যায় যে জৈন ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবিষ্কৃত জৈন মূর্তির প্রাচুর্যে। কটকের দিগম্বর জৈন মন্দিরে দশম শতাব্দীর বহু জৈন মূর্তি রক্ষিত আছে। এছাড়া কটক জেলার জাজপুর ও ঝারেশ্বরে কিছু জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরী জেলার বাণপুর ও কাকটপুরেও অনুরূপ মূর্তি দেখা যায়। এদুটি স্থানে ব্রোঞ্জে নির্মিত অতি সুন্দর জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ময়ুরভঞ্জ জেলার কোশলী, রাণীবান্ধা এবং বাদাবাই থেকে প্রাচীন জৈন মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই জেলার খিচিঙ্গ জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। বালেশ্বর জেলার জলেশ্বর, অযোধ্যা, পুণ্ডাল, ভীমপুর ও ডোমগন্দর থেকে কিছু সংখ্যক জৈন মূর্তি আবিষ্কার করা হয়েছে। এই জেলার চরম্পায় প্রাপ্ত নেমিনাথের শাসনদেবী (১০ম-১১শ শতাব্দী)র মূর্তিটি একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তি। কেওঞ্জর জেলার পোদাসিঙ্গিডিতে ৮ম শতাব্দীর কয়েকটি জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ, মহাবীর ও অম্বিকার মূর্তি কয়টি উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার কোরাপুট জেলাতেও জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এই জেলার ভৈরবসিংপুর, নন্দপুর, চোরমালা, নারীগাঁ, কেবল এবং সুবাইতে এখনও জৈনধর্মের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় উড়িষ্যায় জৈনধর্মের ধারাটি অতি প্রাচীন কাল থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত। এই ধারায় উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষরূপে পুষ্ট। উড়িষ্যার প্রাচীনতম শিল্পকীর্তি উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহাভাস্কর্য-সমূহ জৈন ধর্ম দ্বারাই অনুপ্রাণিত। মন্দির স্থাপত্যে জৈন ধর্মের অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে উদয় গিরির শীর্ষদেশে প্রাপ্ত দেবালয়টির ধ্বংসাবশেষ। ভারতবর্ষে অনুরূপ মন্দিরের নিদর্শন খুব কমই আছে। পরবর্তীকালে নির্মিত জৈন মূর্তিসমূহ উড়িষ্যার শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। উড়িষ্যার আঞ্চলিক সভ্যতার অগ্রগতিতে জৈন ধর্মের অবদান কম নয়। দুর্গম অরণ্য ও পর্বতাঞ্চলে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জৈন সাধকগণ অনগ্রসর অঞ্চলকে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। কিন্তু উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে জৈন ধর্মের প্রভাবের চিত্রটি এখনও সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট নয়। কোন গবেষক এই চিত্রটি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তিনি আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন।

মৈনাবতী

[কথানক]

উজ্জয়িনীর রাজান্তঃপুরে বাস করে মালব রাজকন্যা মৈনাবতী।

তপস্বিনী নয় কিন্তু দেখে মনে হয় যেন এক ক্লান্তিহীন তপস্যার জীবন যাপন করছে মৈনাবতী। এক পরম কাম্যের পদধ্বনির জন্য তপস্যা।

স্ফটিকময় রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন বনবীথির প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত কলনাদিনী সিপ্রা। তারি শিকরকণা বহন করে নিয়ে আসে মলয়ানিল। পল্লবিত দ্রুমবাহু হতে পুরট কর্ণিকার মত ঝরে পড়ে পীতমঞ্জরীর পুঞ্জ। নবতৃণের গন্ধামোদে চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে মৃগদম্পতী।

সেই কলনাদিনী সিপ্রাকূলে এক কুসুমিত অর্জুন তরুর ছায়াতলে প্রতি সন্ধ্যায় এসে দাঁড়ায় মৈনাবতী। সে নিজেও জানে না সে কিসের তপস্যা। কিন্তু সেই কলনাদিনী সিপ্রা, বনস্থলীর তরুলতা ও মৃগদম্পতিদের দিকে তাকিয়ে তার কেমন যেন মনে হয় এক সুন্দর দয়িতকে জীবনে অভ্যর্থনা করবার জন্য তপস্যা করছে তার জীবনের প্রতি মুহূর্ত। তৃষ্ণার্ত ধূলিকণার অন্তরের ব্যাকুল কামনাই ত আহ্বান করে আনে আকাশচর জলদকে বিগলিত হয়ে স্নেহধারায় মর্ত্যের ধূলায় লুটিয়ে পড়তে। ওমনি এক মর্ত্যনারীর কামনা যদি অহরহ তার জীবন প্রিয় দয়িতকে আহ্বান করে তবে সে কি না এসে থাকতে পারে? নিমীলিত নেত্রে নিবিড় স্বপ্নের আবেশ ভরে দিয়ে সে তার হৃদয় দয়িতের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় তার অন্তরের মধ্যে।

মৈনাবতীর সেই নীরব তপস্যার কথা কানে গিয়েছে মালবপতিরও। সংসার নিলয়ের সকল ভোগসুখ ও অনুরাগের বন্ধন হতে অনেক দূরে সরে গিয়েছে তাঁর কন্যা মৈনাবতী। দুঃখিত হন তিনি। তার অন্তর বেদনার কথা জানবার জন্য তাই তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন তিনি একদিন।

পিতার আহ্বানে তাঁর নিকটে এসে তাঁকে প্রণাম করে বসল মৈনাবতী তাঁর পায়ের কাছে রাখা বেতসলতা দিয়ে নির্মিত ভদ্রাসনে।

কিছুক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মালবপতি। তাঁর কন্যা পূর্ণ যৌবনা হয়ে সুন্দরী ও শোভনা হয়েছে, আঁবিকার কাছে শিক্ষালাভ করে বিদূষী ও কলাভিজ্ঞা। কিন্তু না, তিনি যে আশঙ্কা করেছিলেন তা নয়, তার মুখচ্ছবি সাধ্বীর তপঃক্লিষ্ট মুখের প্রতিবিম্ব নয়, এক প্রতীক্ষারতা নারীর বিহ্বল মুখচ্ছবি।

আশ্বস্ত হন মালবপতি। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, কন্যা, আঁযিকার মুখেই শুনেছি তোমার প্রশংসার কথা। তুমি শুধু রূপবতীই নও, বিদূষীও।

নীরবে নতমস্তকে বসে থাকে মৈনাবতী।

কন্যা, সময় এবার হয়েছে আর্যাবর্তের যশস্বী কোনো রাজকুমারকে তোমার বরণ করে নেবার। বল, তোমার স্বয়ম্বরের আয়োজন করি।

না, পিতা।

আশ্চর্য হন মালবপতি। বলেন, কেন?

নিরুত্তর থাকে মৈনাবতী।

সহসা স্মিত হাস্যে বিকসিত হয় মালবপতির ওষ্ঠসন্ধি। বলেন, তুমি যদি মনে মনে কাউকে বরণ করে থাক তবে খুলে বল। আমি তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস করব।

না, পিতা।

না, পিতা! তবে কি তুমি আজীবন ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকতে চাও কন্যা? প্রশ্ন করেন মালবপতি।

না, পিতা।

বিক্ষুব্ধ শোনায় মালবপতির কণ্ঠস্বর। বলেন, তবে তুমি কি চাও কন্যা?

ক্ষণিকক্ষণ নত নেত্রে চুপ করে বসে থাকে মৈনাবতী। তারপর ধীরে ধীরে বলে, আমি কি চাই তা আমি নিজেও জানি না। শুধু এই জানি, যিনি আমায় গ্রহণ করবেন তিনি নিজেই আসবেন আমার ভবন দ্বারে। আমি শুনেছি তাঁর পদধ্বনি। তিনি আসছেন। আমার প্রতীক্ষা তাঁরি প্রতীক্ষা।

কিন্তু আমি ত চিরকাল সেই পদধ্বনির প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে পারি না। তোমার বয়স হয়েছে।

জানি, পিতা। কিন্তু আমার প্রতীক্ষা শীঘ্রই ফলবতী হবে তারো সঙ্কেত পেয়েছি। সেদিন যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম অর্জুন গাছের তলায় তখন ঝরে পড়েছিল আমার বেণীভারে অর্জুনের স্নিগ্ধ সিক্ত মঞ্জরী। সেই মঞ্জরী বাহু প্রসারিত করে তুলে নিলাম। তখন কেমন যেন মনে হল সেই আগন্তুক এমনি এক অর্জুনের মঞ্জরী নিয়ে আসবে আমার ভবন দ্বারে। নিজের হাতে সে পরিয়ে দেবে সেই মঞ্জরী আমার কবরীতে।

অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিত্রাসিত হয় মালবপতির হৃদয়। বলেন, সে যদি কুলে শীলে রূপে গুণে তোমার উপযুক্ত না হয়।

না, পিতা। আমি দেখেছি তাকে আমার অন্তরলোকে। তিনি দেবোপম তনু।

সপ্তাহ যেতে না যেতেই মৈনাবতীর প্রতীক্ষা সফল হয়। সত্য হয় মালবপতির আশঙ্কাও। গলিত কুষ্ঠাক্রান্ত অজ্ঞাত কুলশীল এক যুবককে নিয়ে সাতংশ সুভট

উপস্থিত হয় উজ্জয়িনীর ভবন দ্বারে। সেই যুবকের জন্য পাণি-প্রার্থনা করে মালব-রাজকন্যার। যুবকের হাতে অর্জুন ফুলের মঞ্জরী।

অনেক বোঝালেন কন্যা মৈনাবতীকে মালবপতি। বললেন, এই দুরাগ্রহ পরিত্যাগ কর কন্যা। এই অসম বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা করে না। কিন্তু মৈনাবতী পরিত্যাগ করে না সেই দুরাগ্রহ। সে নিজের সঙ্কল্পে স্থির, অচঞ্চল।

বাধ্য হয়ে সেই অজ্ঞাত কুলশীল গলিতদেহ যুবকের হাতেই সমর্পণ করতে হয় কন্যাকে মালবপতির, কিন্তু বিস্মিত হন তিনি সম্প্রদত্তা কন্যার আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে। বিস্মিত হন মালবরাজমহিষী ও তার সহচরীরা। বিদায় ক্ষণে তাই এক হাতে চোখের জল মুহূতে মুহূতে তাঁরা বিদায় দেন মৈনাবতীকে, রত্নময় প্রাসাদের সমস্ত স্নেহ ও সুরক্ষা হতে বঞ্চিত হয়ে যে আজ চলে যাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্নিবারতায়। সে বেদনা অসহ্য।

লতাগৃহের নিকট প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল যুবক শ্রীপাল। রাজপ্রাসাদের অশ্রুসিক্ত বেদনার কাছ হতে বিদায় নিয়ে মৈনাবতী ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় শ্রীপালের সম্মুখে। তারপর ধীরে ধীরে প্রণাম করে। সুস্বরে শিঞ্জিত হয় রত্নাভরণ যেন এক সঙ্গীত ঝংকার মূর্তিমতী হয়ে শ্রীপালের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে। একটু দূরে সরে যায় শ্রীপাল। বলে, আমায় স্পর্শ করো না রাজকুমারী!

সুস্মিত অধরপুটে সুষমা বিকশিত করে শ্রীপালের মুখের দিকে তাকায় মৈনাবতী। তারপর একে একে খুলে ফেলে তার রত্নাভরণ। বলে, বুঝতে পেরেছি স্বামি, তোমার অভিপ্রায়। ধ্বনিমুখর মণিময় আভরণে আমার কি কাজ। শোভা দেয় না আমার দেহে পুণ্যক্ষয়কারী এই বিলাস সজ্জা।

বেদনাদ্র কণ্ঠে বলে শ্রীপাল, তা নয় শোভনে।

তবে কি স্বামি?

আমি চাই না তুমি আমার এই বিকৃত দেহ স্পর্শ কর।

কিন্তু—

কিন্তু নয় শোভনে। তারপর একটু থেমে বলে, জানি না, কি দেখে তোমার পিতা তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করলেন।

স্বামি, তিনি যা দেখেই করে থাকুন, কিন্তু এখন কিছুই আমাকে তোমা হতে দূরে রাখতে পারবে না।

আমার এই গলিত দেহ দেখেও কি তোমার ঘৃণা হয় না রাজকুমারী!

না।

বিস্ময়ে শিহরিত হয় শ্রীপাল। বলে এই দেহ যখন আর সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক করে তখন তোমার কেন করে না রাজকুমারী।

আমার যৌবন স্বপ্নে আমি তোমার প্রতীক্ষা করেছিলাম তাই।

শোভনে, আমি বুঝতে পারছি না, এ কি ধরণের প্রণয় রীতি।

খুব সহজ প্রণয় রীতি। মৈনাবতী ভালবেসেছে তোমাকে; তোমার কুল শীল রূপ গুণকে নয়। তোমার দেহের চাইতে তোমার হৃদয় আমার অনেক বেশী লোভনীয় স্পৃহনীয়। আমি অপেক্ষা করেছিলাম। তাই তোমার বক্ষের ক্ষণিক স্পর্শও আমার পরম কাম্য।

কিন্তু আমি তোমার যোগ্য নই, মৈনাবতী।

ছি ছি—ওমন করে বলো না স্বামি।

সত্যি আমি তোমার যোগ্য নই কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি। তাইত তোমায় দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। পাছে—

সে তুমি পারবে না। আমায় দূরে সরিয়ে রাখলে তুমি শান্তি পাবে না কোনো দিনই?

তুমি কি আমায় শান্তি দিতে পার?

আমিই তোমার শান্তি।

তুমি কি আমায় ব্যাধি হতে মুক্ত করতে পার?

আমিই তোমার বৈশল্যকরণী।

বিস্ফারিত হয় শ্রীপালের চোখ। বলে মৈনাবতী, তুমি কি বিশ্বাসে একথা বলছ?

প্রেমের সহজ বিশ্বাসে।

আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

পারবে বলে এগিয়ে এসে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে তাকে। সর্বাঙ্গ ভরে দেয় চুম্বনে চুম্বনে।

বিস্মিত শ্রীপালের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। এ তুমি কি করছ?

তোমার ক্ষতস্থানে অমৃত সিঞ্চন।

দীর্ঘ বারো বছর পর পিতৃসকাশে আসে মৈনাবতী। মৈনাবতীর সঙ্গে দেবোপম তনু এক তরুণ।

দেখে ভ্রুকুঞ্চিত হয় মালবপতির। রূঢ় কণ্ঠে কন্যাকে সম্বোধন করে বলেন, স্বৈরিনী, তোর কলঙ্কিত মুখ আমাকে দেখাতে লজ্জা করল না?

কেন পিতা?

কে এই সুদর্শন যুবক?

আমার স্বামী।

একথা বলতে তোর জিহ্বা একটুও কুণ্ঠিত হল না ?

কেন পিতা ? তুমিত এঁরি হাতে আমায় সমর্পণ করেছিলে।

না সে ছিল—

মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠে শ্রীপাল। মালবপতি, ভালো করে চেয়ে দেখুন—আমিই কি সে নই ?

চেয়ে দেখেন ভালো করে মালবপতি। হাঁ সেই ত!

ঈষৎ আনত হয়ে মালবপতির চরণ স্পর্শ করে শ্রীপাল। তারপর বলে আমি অঙ্গনরেশ সিংহরথের পুত্র শ্রীপাল। ভাগ্য বিড়ম্বনায় রাজ্যচ্যুত ও রোগাক্রান্ত হয়ে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই দুর্দিনে আপনি আমায় দিলেন প্রাণের সঞ্জিবনী মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত।

আমি ? কি সেই অমৃত ? কোথায় সেই অমৃত ?

শ্রীপাল মৈনাবতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে, এই সেই অমৃত।

প্রশ্নোত্তরে জৈন তত্ত্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৩১ প্রঃ তপ কর্ম কি কি ?

১৩১ উঃ তপ দ্বিবিধ বাহ্য তপ ও আভ্যন্তর তপ।

১৩২ প্রঃ বাহ্য তপ কত প্রকার ?

১৩২ উঃ অনশন, অবমোদর্য, বৃত্তিপরিসংখ্যান, রস পরিত্যাগ, বিবিক্ত শয্যাসন ও কায়ক্লেশ এই ষড়বিধ বাহ্য তপ।

১৩৩ প্রঃ অনশন কিরূপ তপ ?

১৩৩ উঃ লৌকিক যশোলাভাদির বাসনা নিরসন পুরঃসর সংযম সাধনের নিমিত্ত, রাগভাবের সমুচ্ছেদ মানসে কর্মের বিনাশ উদ্দেশ্যে ধ্যান স্বাধ্যায়াদি সিদ্ধার্থ নিদ্রা প্রমাদাদি বিজয় সংকল্পে—ভোজনের পরিত্যাগকে অনশন নামক তপ বলে।

১৩৪ প্রঃ অবমোদর্য তপের স্বরূপ কি ?

১৩৪ উঃ পূর্বোক্ত (অনশন ব্যাখ্যানে) প্রয়োজন ও ধ্যানের নিশ্চলতাদি সম্পাদনার্থ অল্পভোজন করাকে অবমোদর্য বা উনোদর তপ বলে।

১৩৫ প্রঃ বৃত্তি পরিসংখ্যান কিরূপ ?

১৩৫ উঃ ভিক্ষার নিমিত্ত এক বাড়ী বা দুই বাড়ী বা তিন চার বাড়ী অথবা এক মহাল্লা বা দুই মহাল্লামাত্র ভিক্ষা করা; তাহাতে ভিক্ষা না পাইলে বনে প্রত্যাবর্তন পূর্বক উপবাস করা—ইত্যাদিরূপ ভোজন গ্রহণের স্থান বিশেষের ও বস্তু বিশেষের নিয়ম করাকে বৃত্তি পরিসংখ্যান তপ বলে।

১৩৬ প্রঃ রসপরিত্যাগ তপ কিরূপ ?

১৩৬-উঃ ইন্দ্রিয়দমন, সংযম পালন ও লোভ ত্যাগের নিমিত্ত ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, গুড়, লবণাদি রসের বর্জনকে রস পরিত্যাগ কহে।

১৩৭ প্রঃ বিবিক্ত শয্যাসন তপ কি ?

১৩৭ উঃ জীবের রক্ষার নিমিত্ত শোধিত ক্ষেত্রে পর্বত, গুহা, মঠাদি নিভৃতস্থানে অর্থাৎ যে স্থানে ব্রহ্মচর্য, স্বাধ্যায় ধ্যানাদির বিঘ্ন না ঘটে সেইরূপ নিরুপদ্রব স্থানে শয়ন বা আসন করাকে বিবিক্ত শয্যাসন তপ বলে।

১৩৮ প্রঃ কায়ক্লেশ তপ কিদৃশ ?

১৩৮ উঃ শরীরে মমতা ত্যাগ করিয়া যথার্থ (সৎ) দেবোক্ত শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ রূপ শারীরিক ক্লেশ জনক কর্মবিশেষকে কায়ক্লেশ তপ বলে।

১৩৯ প্রঃ আভ্যন্তর তপ কত প্রকার ?

১৩৯ উঃ (১) প্রায়শ্চিত্ত, (২) বিনয়, (৩) বৈয়াবৃত্ত, (৪) স্বাধ্যায়, (৫) ব্যুৎসর্গ, (৬) ধ্যান এই ছয় প্রকার।

১৪০ প্রঃ প্রায়শ্চিত্ত কত বিধ ?

১৪০ উঃ প্রায়ঃ শব্দে অপরাধ ও চিত্ত শব্দে শুদ্ধ করা বুঝায় ; যে কর্ম অপরাধের শুদ্ধি করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলে। প্রায়শ্চিত্ত নয় প্রকার। যথা ঃ

(১) আলোচনা—দোষরহিত গুরুর নিকট স্বকীয় অপরাধ প্রকাশ করা।

(২) প্রতিক্রমণ —আমি 'অমুক দোষ করিয়াছিলাম' এ প্রকার মনে পশ্চাত্তাপ করা।

(৩) তদুভয় (প্রায়শ্চিত্ত) – কোন এক পাপ আলোচনা দ্বারা যায় আর কোন পাপ প্রতিক্রমণ দ্বারা যায় ; আবার কোন পাপ আলোচনা প্রতিক্রমণ দুইটী দ্বারা যায় – ইহাকেই তদুভয় বলে।

(৪) বিবেক—কোন নিয়ত কাল পর্যন্ত আহারাদি ত্যাগ।

(৫) ব্যুৎসর্গ—নিয়ত কালাবধি কায়োৎসর্গাদি করা

(৬) তপ – অনশনাদি করা

(৭) ছেদ—দীক্ষার কাল কম করা।

(৮) পরিহার—কিছুকালের জন্য মণ্ডলী হইতে বাহির করা।

(৯) উপস্থাপনা—সাবেক দীক্ষা খণ্ডনান্তর পুনরায় দীক্ষা দান।

১৪১ প্রঃ বিনয় তপ কিরূপ ?

১৪১ উঃ (১) দর্শন বিনয়, (২) জ্ঞান বিনয়, (৩) চারিত্র বিনয় ও (৪) উপচার বিনয়—চার প্রকার বিনয়।

(১) দর্শন বিনয়—শিক্ষাদি দোষ রহিত সম্যগ দর্শন অবলম্বন করা।

(২) জ্ঞান বিনয় – আলস্য ত্যাগ পূর্বক দেশ কাল অনুরূপ বিধিতে শুদ্ধমনা হইয়া সবিশেষ সম্মান সহকারে জিন-সিদ্ধান্ত গ্রহণ অভ্যাসাদি করা।

(৩) চারিত্র বিনয়—সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান যুক্ত পঞ্চবিধ চরিত্রবান মুনির নাম মাত্র আকর্ণনে আন্তরিক হৃষ্টতা লাভ ও ভক্তিপূর্ণভাবে শিরে অঞ্জলি বন্ধন (প্রণাম) এবং চিত্তে চারিত্র ধারণের প্রবৃত্তি রাখা।

(৪) উপচার বিনয়—আচার্যাদি পুরুষ প্রবরের প্রত্যক্ষতা লাভমাত্র উত্থিত হইয়া করজোড়পূর্বক অভ্যর্থনা করা ও অভিবাদন অনুগমনাদি করা—এবং নানারূপ তদীয় গুণের মহিমা কীর্তন করা, তদাজ্ঞানুযায়িনী প্রবৃত্তি করা ইত্যাদি তথা শাস্ত্র ও দেবের প্রত্যক্ষ বিনয় রক্ষা।

১৪২ প্রঃ বৈয়াবৃত্য তপ কাহাকে বলে ?

১৪২ উঃ (১) আচার্য, (২) উপাধ্যায়, (৩) তপস্বী, (৪) শৈক্ষ, (৫) গ্লান, (৬) গণ, (৭) কুল, (৮) সংঘ, (৯) সাধু, (১০) মনোজ্ঞ এই দশ প্রকার সাধুর সেবা শুশ্রুষা করা।

১৪৩ প্রঃ স্বাধ্যায় তপ কি প্রকার ?

১৪৩ উঃ স্বাধ্যায় পাঁচ প্রকার—(১) বাচনা, (২) পৃচ্ছনা, (৩) অনুপ্রেক্ষা, (৪) আম্নায়, (৫) ধর্মোপদেশ।

(১) বাচনা—বিনীত সংশিষ্যে অর্থ-সহিত সচ্ছাস্ত্রোপদেশ।

(২) পৃচ্ছনা—শাস্ত্রীয় সংশয়াপনোদনার্থ জ্ঞানিগণ সমীপে সবিনয় জিজ্ঞাসা।

(৩) অনুপ্রেক্ষা—গৃহীত শাস্ত্রার্থের বারম্বার ভাবনা।

(৪) আম্নায়—লৌকিক ফলেচ্ছা রহিত দ্রুত বিলম্বিতাদি দোষ শূন্য আবৃত্তি।

(৫) ধর্মোপদেশ—অর্থাৎ উদ্দেশ্য শূন্য উন্মার্গতা দূরীকরণার্থ পদার্থ স্বরূপ প্রকটন অভিপ্রায়ে ধর্মার্থোপদেশাত্মক উপদেশ বা কথা।

১৪৪ প্রঃ ব্যুৎসর্গ তপের ভেদ কি ?

১৪৪ উঃ বাহ্যোপাধি ত্যাগ ও আভ্যন্তরোপাধি ত্যাগ এই দ্বিবিধ। বাহ্য পরিগ্রহ ত্যাগকে বাহ্যোপাধি ত্যাগ ও আভ্যন্তর পরিগ্রহ বর্জনকে আভ্যন্তরোপাধি ত্যাগ কহে।

১৪৫ প্রঃ ধ্যান কি ? তাহার ভেদ কি ?

১৪৫ উঃ ষড়্‌বিধ সংহনন নাম কর্মের মধ্যে বজ্র বৃষভ নারাচ সংহনন, বজ্রনারাচ সংহনন ও নারাচ সংহনন এই ত্রিবিধ সংহননকে উত্তম সংহনন বলে; এই তিনটিই ধ্যানের হেতুভূত অর্থাৎ উত্তম সংহনন যুক্তেরই ধ্যান অন্ত ও মূল পর্যন্ত থাকে। চিত্ত বৃত্তিকে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া এক বিষয়ে আরোপণ করাকে একাগ্র চিন্তা, নিরোধ বা ধ্যান বলে। ধ্যান চতুর্বিধ—আর্ত, রৌদ্র, ধর্ম ও শুক্ল। আর্ত ও রৌদ্র ধ্যান সাংসারিক বিষয়াকৃষ্ট ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, উহা সংসার প্রযোজক। ধর্ম ধ্যান ও শুক্ল ধ্যান মোক্ষমার্গের উপযোগী অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করিতে সমর্থ।

১৪৬ প্রঃ ধর্মধ্যানের স্বরূপ কি ?

১৪৬ উঃ (১) আজ্ঞা বিচয়, (২) অপায় বিচয়. (৩) বিপাক বিচয় ও (৪) সংস্থান বিচয়—ধর্মধ্যান এই চারিপ্রকার।

(১) আগম-প্রমাণানুসারে অর্থ বিচারকে আজ্ঞা বিচয় ধর্মধ্যান বলে।

(২) মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উপদৃষ্ট জীবের উন্মার্গতা কিরূপে বিদূরিত হইবে ? কিরূপে জীব সন্মার্গে ধাবিত হইবে ? সন্মার্গে প্রসরণের সাতিশয় স্বল্পতা হইয়াছে ইত্যাদি ধর্মাভাব উন্মোচক উপায় চিন্তাকে অপায় বিচয় ধর্মধ্যান বলে।

(৩) গুণস্থান ও মার্গণা স্থানে কর্মের ফলানুভবকে চিন্তা করা ও উদারণার চিন্তাকে বিপাক বিচয় ধর্মধ্যান বলে।

(৪) লোক সংস্থান, দ্রব্যস্বভাব এবং দ্বাদশ ভাবনার পরিচিন্তনকে সংস্থান বিচয় ধর্মধ্যান বলে।

১৪৭ প্রঃ শুক্লধ্যান কিরূপ ?

১৪৭ উঃ পৃথকত্ব বিতর্ক সবিচার, একত্ব বিতর্ক নির্বিচার, সূক্ষ্ম ক্রিয়া অপ্রতিপাতী ও ব্যুপরত ক্রিয়া অনিবৃত্তি এই চার প্রকার শুক্ল ধ্যান, তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার ধ্যান শ্রুত কেবলীর ও অন্তিমধ্যান দ্বয় (ক্রমে) যোগ কেবলী ও অযোগ কেবলীর হইয়া থাকে।[১২]

১৪৮ প্রঃ বিতর্ক ও বিচার শব্দের অর্থ কি ?

১৪৮ উঃ 'বিতর্কঃ শ্রুতং' বিশেষরূপ তর্ক-বিতর্ক, ইহা শ্রুত জ্ঞানেরই নামান্তর। 'বিচারোঽর্থ ব্যঞ্জন-যোগ সংক্রান্তিঃ' অর্থাৎ অর্থ, ব্যঞ্জন ও যোগের সংক্রামক (অন্যো-ন্যাবলম্বন) বিশেষকে বিচার বলে। ধ্যেয় পদার্থকে (দ্রব্যকে) ত্যাগ করিয়া অর্থদ্রব্যকে ধ্যান করাকে অর্থ সংক্রান্তি বলে। শ্রৌত কোন এক বচনকে অবলম্বন করিয়া অন্য বচন, তাহা ছাড়িয়া আর এক বচনকে অবলম্বন করার নাম—ব্যঞ্জন সংক্রান্তি। কায়যোগকে ছাড়িয়া মনোযোগ বা বাগযোগ, আবার বাগযোগ বা মনোযোগ ছাড়িয়া কায়যোগকে অবলম্বন (গ্রহণ) করার নাম যোগ সংক্রান্তি। (পূর্বোক্ত) বিচার ও বিতর্ক যুক্ত ধ্যান। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় বিচার রহিত বিতর্ক যুক্ত ধ্যান এই দ্বিবিধ ধ্যানই সম্পূর্ণ শ্রুত-জ্ঞান যুক্ত অর্থাৎ শ্রুত কেবলীর হয়। সযোগকেবলী—কেবল কায়-বচন-যোগ যুক্ত। অযোগ কেবলী—যাহার কোন যোগই নাই।

১৪৯ প্রঃ মোক্ষ পদার্থের স্বরূপ কি ?

১৪৯ উঃ 'বন্ধহেত্বভাব নির্জরাভ্যাং কৃৎস্ন-কর্ম-বিপ্রমোক্ষো মোক্ষঃ, বন্ধের কারণরূপ আশ্রবাভাব ও নির্জরা দ্বারা ঘাতি অঘাতি যাবতীয় সঞ্চিত কর্মের ক্ষয়করাকে মোক্ষ বলে।

১৫০ প্রঃ সম্যক জ্ঞান কিরূপ ?

১৫০ উঃ সংশয় বিপর্যয় ও অনধ্যবসায় এতত্রিতয় রহিত জীবাদি পদার্থ পরিজ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বলে।

১৫১ প্রঃ সংশয় কিরূপ ?

১৫১ উঃ এইটী স্থানু কিংবা পুরুষ ইত্যাকার জ্ঞানকে সংশয় বলে।[১৩]

১৫২ প্রঃ বিপর্যয় কি প্রকার ?

১২ এই দ্বাদশ তপ বর্ণিত হইল। ইহার দ্বারা সম্বর ও নির্জরা উভয়েরই লাভ হয়।

১৩ 'বিরুদ্ধ ধর্মপ্রকারক-জ্ঞান সংশয়:'—অর্থাৎ এক জ্ঞান যখন এক বস্তুতে (পুরুষেতে) 'ইহা স্থানু কি পুরুষ'—এই ভাব ধারণ করে, তখন তাহাকে সংশয় জ্ঞান বলে, ইহাকে উভয় কোটি স্পর্শী বিজ্ঞান বলে।

১৫২ উঃ এক বস্তুর ধর্ম অন্য বস্তুতে আরোপ করা অর্থাৎ এক পদার্থকে অন্য পদার্থ মনে করা (ইহাই ভ্রম জ্ঞান) যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান।

১৫৩ প্রঃ অনধ্যবসায় কিরূপ ?

১৫৩ উঃ অন্ধকারে বা অন্যমনস্কভাবে চলিতে হয়ত কঙ্কর তৃণাদি পায়ে লাগিয়াছে, কিন্তু কোনটাতেই লক্ষ্য নাই, কেবল পায়ে কিছু লাগিয়াছে ইত্যাকার জ্ঞান হইল। এইরূপ জ্ঞানকে অনধ্যবসায় জ্ঞান বলে।

১৫৪ প্রঃ সম্যক জ্ঞান কত প্রকার ?

১৫৪ উঃ মতি শ্রুত অবধি মনঃপর্যায় ও কেবল ভেদে পাঁচ প্রকার। যথাঃ

(১) ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে মতিজ্ঞান বলে।

(২) মতিজ্ঞান দ্বারা গৃহীত পদার্থের ভেদানুভেদ জ্ঞান বা বিতর্ক জ্ঞানকে শ্রুতজ্ঞান বলে।

(৩) ক্ষেত্রকাল ভাব ও মর্যাদা বিশিষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে অবধি জ্ঞান বলে।

(৪) অপরের মনঃস্থিত পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মনঃপর্যায় জ্ঞান বলে।

(৫) ত্রৈকালিক পর্যায়ের সহিত সমস্ত পদার্থের এককালে প্রত্যক্ষ রূপে জানাকে কেবল জ্ঞান বলে।

১৫৫ প্রঃ পরোক্ষ জ্ঞান কি কি ?

১৫৫ উঃ মতিজ্ঞান ও শ্রুত জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বা পরোক্ষ প্রমাণ বলে।

১৫৬ প্রঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি কি ?[১৪]

১৫৬ উঃ অবধি জ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান ও কেবল জ্ঞান এই তিনটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। (পূর্বে প্রমাণের স্বরূপ বলা হইয়াছে, প্রমাণ ও জ্ঞান উভয়ের পার্থক্য নাই। যদিও প্রমাণ শব্দের জ্ঞান ও জ্ঞানজনক শাস্ত্রাদিতে ব্যবহার কিন্তু বস্তুতঃ প্রমাণ শব্দে জ্ঞানকে বুঝায়)।

১৫৭ প্রঃ মতিজ্ঞানের ভেদ কি ?

১৫৭ উঃ (১) অবগ্রহ, (২) ঈহা, (৩) আবয়, (৪) ধারণা এই চার ভেদ।

(১) অবগ্রহ—কোন বস্তুর সত্তামাত্রের জ্ঞানকে দর্শন বলে, অনন্তর উহার শ্বেত কৃষ্ণাদি গুণ বিষয়ক জ্ঞানকে অবগ্রহ জ্ঞান বলে।

(২) ঈহা—অবগ্রহ জ্ঞানানন্তর বস্তুর স্বরূপাবগ্রাহী এই শ্বেত কৃষ্ণাদি গুণ-যুক্ত বস্তুটী অমুক কি তদ্‌ভিন্ন ইত্যাদি অনিশ্চয় অনুভবকে ঈহা জ্ঞান বলে।

---

১৪ 'প্রত্যক্ষমন্যৎ' (১।১১) পরোক্ষ হইতে ভিন্ন অবধি মনঃ পর্যায় এবং কেবল জ্ঞান এই তিনকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে।

মতি—মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে বর্তমান কালবর্তী পদার্থের অবগ্রহ প্রভৃতি রূপে জ্ঞান হওয়া।

(৩) আবয়—ঈহা জ্ঞানের পর বিশেষ চিহ্ন দ্বারা বস্তুর স্বরূপের নিশ্চয় করাকে আবয় মতিজ্ঞান বলে।

(৪) ধারণা—যেরূপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের কালান্তরে স্মৃতি হয়, তাহাকে ধারণা মতিজ্ঞান বলে।

উক্ত অবগ্রহাদি প্রত্যেক জ্ঞানের (১) বহু, (২) বহুবিধ, (৩) ক্ষিপ্র, (৪) অনিঃসৃত, (৫) অনুক্ত, (৬) ধ্রুব, (৭) অল্প, (৮) অল্পবিধ, (৯) চির (বিলম্বিত), (১০) নিঃসৃত, (১১) উক্ত ও (১২) অধ্রুব এইরূপ দ্বাদশ প্রকার বিষয় ভেদে দ্বাদশ ভেদ হইয়া থাকে।

(১) বহু—যুগপৎ এক পদার্থের অবগ্রহাদি বহু জ্ঞান।

(২) বহুবিধ—এককালীন বহু পদার্থ বিষয়ক অবগ্রহাদি জ্ঞান।

(৩) ক্ষিপ্র—দ্রুত (অল্পকালেই) অবগ্রহাদি জ্ঞান হওয়া।

(৪) আনিঃসৃত—যৎ কিঞ্চিৎ অবয়ব দেখিয়া অবয়বীর অবগ্রহাদি জ্ঞান, যেরূপ জলমগ্ন হস্তীর শুণ্ড দেখিয়া হস্তীর অবগ্রহাদি জ্ঞান হয়।

(৫) অনুক্ত—বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত না হইলেও অভিপ্রায়াদি দ্বারা যে জ্ঞান হয়।

(৬) ধ্রুব—বহুকাল পর্যন্ত পদার্থের নিশ্চল ভাবে জ্ঞান হইতে থাকাকে ধ্রুব গ্রহণ বলে।

(৭) অল্পজ্ঞান—এককালে এক বিষয়ের অবগ্রহাদির এক একটি জ্ঞান।

(৮) অল্পবিধ জ্ঞান এককালীন এক বিষয়ের এক ধর্ম পুরস্কারে জ্ঞান।

(৯) চিরগ্রহণ—একপদার্থের বহুকালে অবগাহনশীলকারী জ্ঞান।

(১০) নিঃসৃত গ্রহণ—সম্পূর্ণ অবয়ব দেখিয়া অবয়বীর জ্ঞান অর্থাৎ জলাদিতে মগ্ন হস্তী প্রভৃতির শুণ্ডাদি দর্শনেও জ্ঞান না হইয়া জলোত্থিত হইলে সম্যকরূপে দেখিয়া হস্তী প্রভৃতি নির্ণয়াত্মক জ্ঞান।

(১১) উক্ত গ্রহণ—ঘট, এইরূপ শব্দ শুনিয়া ঘট জ্ঞান ইত্যাদি।

(১২) অধ্রুব গ্রহণ—যে জ্ঞান হইয়া কখনও আত্মায় থাকে, আর কখনও থাকে না অথবা ক্ষণকালেই নষ্ট হইয়া যায় তাহাকে অধ্রুব গ্রহণ বলে।

১৫৮ প্রঃ অব্যক্ত শব্দাদির অবগ্রহাদি সমস্ত জ্ঞান হয় কিনা ?

১৫৮ উঃ 'ব্যঞ্জন স্যাবগ্রহঃ' ব্যঞ্জন অর্থাৎ অপ্রকাশমান (অর্থ গ্রহণানুপযোগী) শব্দাদির কেবল অবগ্রহ জ্ঞানই হয়। এইরূপ অপ্রকটীভূত শব্দাদির অবগ্রহ জ্ঞানের প্রতি নেত্র ও মনের কারণতা নাই। (মনের কারণতা না থাকায় ঈহাদি জ্ঞানও হইতে পারে না, কারণ ঈহাদির জ্ঞানের প্রতি মনের কারণতা আছে।) এই স্থানে জ্ঞাতব্য এই যে—পূর্বোক্ত মতি জ্ঞানের দ্বাদশ ভেদ দ্রব্যেরই হইয়া থাকে। যেমন চাক্ষুষ জ্ঞান স্থলে, কেহ বলেন চক্ষুদ্বারা প্রথমতঃ রূপের

জ্ঞান ও রূপাশ্রয়ভূত পুরস্কারে দ্রব্যের জ্ঞান হয়। কিন্তু এই মতে চক্ষু দ্বারা রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের একবারেই জ্ঞান হয়। (কারণ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ গুণযুক্ত দ্রব্যের সহিতই হয়, কেবল গুণের সহিত হয় না।)

১৫৯ প্রঃ শ্রুত জ্ঞান কত প্রকার ?

১৫৯ উঃ শ্রুতজ্ঞান দ্বিবিধ ১ম ও ২য়। ১ম শ্রুত জ্ঞান অনেক প্রকার, ২য় শ্রুত জ্ঞান দ্রব্য শ্রুত ও ভাবশ্রুত অথবা অঙ্গ প্রবিষ্ট ও অঙ্গ বাহ্য এই দুই প্রকার। অঙ্গ প্রবিষ্ট আচারাঙ্গ, সূত্র কৃতাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, ইত্যাদি দ্বাদশ প্রকার, অঙ্গ বাহ্য শ্রুত জ্ঞানের দশ বিকালিকাদি অনেক ভেদ আছে।

১৬০ প্রঃ—অবধি জ্ঞানের ভেদ কি ?

১৬০ উঃ—ভব প্রত্যয় অবধিজ্ঞান ও ক্ষয়োপশম নিমিত্তক অবধিজ্ঞান—এই দুই প্রকার।

১৬১ প্রঃ ভবপ্রত্যয় অবধিজ্ঞান কিরূপ ?

১৬১ উঃ দেব ও নারকীর জ্ঞানকে ভব প্রত্যয় অবধি জ্ঞান বলে, এই জ্ঞান, দেব বা নারকীর গতি হইলে অবশ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে জ্ঞান হইলে দেব বা নারকী গতি লাভ হয়।

[ক্রমশঃ

জিনেশে বিশ্বনাথায়

শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত

রাঢ় দেশের শুকনো বৃক্ষ
বালি আর কাঁকর-মেশানো উঁচু নীচু পথে
আমি প্রথমে একদিন ঢিল ছুঁড়ে ছিলুম
আর তোমার কপাল কেটে
রক্ত ঝরেছিল নিঃশব্দে,
আরণ্য গজের মত অকম্পন ছিল শরীর
কিছু বলোনি।
তাই—
আরো ক্রুদ্ধ আরো হিংস্র হয়ে
পেছন থেকে কখনও লাঠি মেরেছি,
মুঠো করে কেটে নিয়েছি তোমার চুল,
দেখা হলেই গায়ে ছিটিয়ে দিতুম নোঙরা কাদা,
কতবার যে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছি তোমার পথে।

শ্রমণেরা যখন পাকদণ্ডী বেয়ে চলতেন
পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলেই
পাথর গড়িয়ে দিতুম—ফসকাত না,
তারপর করতালি আর অট্টহাসি।

নিন্দার প্লাবনে বয়ে যেতে রসনার—কী যে সুখ,
কত আরাম লোভের নিকুঞ্জ গহনে
বিলাসে ব্যসনে—মৃগয়াক্ষ দিবাস্বপ্নে,
কী বিপুল উত্তাপ ঈর্ষ্যায়,

* ভট্টারক সকলকীর্তির বীর বর্ধমান চরিতের মঙ্গলাচরণের জিনেশে বিশ্বনাথায় কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে:

জিনেশে বিশ্বনাথায় হ্যনন্তগুণসিন্ধবে।
ধর্মচক্রভৃতে মূর্ধ্না শ্রীবীরস্বামিনে নমঃ॥

কত রহস্য চৌর্যে,
বীর্য হত্যায়,
শৌর্য লুণ্ঠনে,
প্রজ্ঞা ক্রূরতায়,
অতলান্ত তৃপ্তি অগম্যায়—
যুগে যুগে তা ছিল আমারই নখদর্পণে,
গর্ব ছিল ক্রোধ ভট্টারক বলে।

এক জন্মের কথা মনে পড়ছে—
সেবার নারী শরীর,
কুলীন সার্থবাহের ঘরে আমি ছিলুম সুন্দরী বধূ।

শ্বশুর ধনকুবের,
শ্বশ্রূমাতা মূর্তিমতী মমতা,
শ্রেষ্ঠিপুত্র সুদর্শন স্বল্পবাক্ সুপণ্ডিত।

তাই তাম্রলিপ্তের সমুদ্রতীরে
যখন সেই চিন্তাশীল ব্যক্তিটি
বিবাগী হয়ে শুধুই দেখতেন ফেনিল তরঙ্গভঙ্গ,
তখন ক্রমশ ঃ
আমার রোমাঞ্চিত দিন রাত্রি কেটে যেত
তাঁরই মুগ্ধ বন্ধুর সাহচর্যে।

সচ্চরিত্র সত্যসন্ধানী স্বামী—
দিনে দিনে কেমন রুগ্ন হয়ে গেলেন
আমাকে দেখে দেখে,
শেষে একদিন
মধ্যরাতে সামান্য কৌশলেই
জলে ঠেলে ফেলে দিলুম ওই বিরস দেহ-পিণ্ডকে।
পরদিন থেকে নিশ্চিন্ত নিদ্রা
আর রসরঙ্গের পরিণাম রমনীয় উজ্জীবন।

তাম্রলিপ্ত থেকে কৌশাম্বী,
বৎসরাজ উদয়নের কৌশাম্বী,

কুঙ্কুমিত সিন্দুরিত পিঞ্জরিত কৌশাম্বী,
কেয়ূরে কঙ্কণে মণিমালিনী কৌশাম্বী।
সেখানে একদিন নির্মল ভোরে
এক শীর্ণ শ্রমণ এলো
শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদে ভিক্ষা নিতে,
অমন সৌম্যকান্তি দেখা যায় না।
সেই প্রশান্তি দেখে কেমন যেন শিউরে উঠল
আমার সুবর্ণময় তনুশ্রী।
তাই অর্ধরাতে অভিসারিকার মতই সেজে
পূজার ছলনায় আমাকে যেতে হোল পথে।

মহাশ্মশানে গিয়ে দেখি
অমাবস্যার ভয়ঙ্কর রাতে
স্থির দাঁড়িয়ে আছে কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে
সেই পরম আশ্চর্য মানুষটা
যেন কত দিগ্বিজয়ী বীর,
একবারও চোখ মেললে না।
গা জ্বলে গেল—বুক জ্বলে গেল আমার,
কী করি!
অবলার শরীরে তেমন তো শক্তি নেই
তাই বহু দুরন্ত ক্লেশে
আধপোড়া শুকনো কাঠগুলো নানা দিক থেকে
একটি একটি করে টেনে এনে
ঘর্মাক্ত হয়ে তার চার পাশে সাজিয়ে দিলুম,
বরণডালা থেকে নামিয়ে দিলুম
সোনার প্রদীপখানি,
রত্নঘট থেকে ঢাললুম প্রচুর সদ্যোঘৃত
কর্পূর সর্জরস অগুরু চন্দন,
ঘষে ঘষে বারে বারে জ্বালালুম বাতিটি।
ভাঙতে পারলুম না তার সুকঠিন ধ্যান
তাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেই শরীরটা।
কেননা উদাসীন স্বামীর মত শত্রু

সুন্দরী নারীর অল্পই আছে সংসারে
ও সেই।
তারপর চক্রবৎ পুনরাবৃত্তি।

এখন আমি স্থবির
পাপে রুচি নেই—ফুরিয়ে যাচ্ছি।
সেদিন দেখলুম আবার অমাবস্যা এসেছে
আবার দীপান্বিতা—এবার নির্বাণ জয়ন্তী।
দিকে দিকে ওরা দিচ্ছে মালা,
জ্বালছে প্রদীপ ঢালছে নৈবেদ্য,
দেখতে দেখতে হঠাৎ কী যেন ঝল্‌সে উঠল,
দর্পণের আলোকে দেখা দিল
আমার যশোধবল কীর্তিসৌধমালা—
ত্রাসের বিকট সমুদ্র এলো তেড়ে।

*   *

প্রভু তুমি বীর, তুমি অরিহন্ত, তুমি জিন,
তুমি তো কখনও ধ্বংস করো না পরাজিতকে,
তুমি কেবলী,
তোমার কাছে তো গোপনীয় কিছু নেই।
শেষের দিনে এনেছি
আমার কামনার সম্ভার,
ছলনার উপায়ন,
আর্তনাদের ঐকতান।
এই নাও আমার জটাজটিল প্রারব্ধ,
সব তুমি জানো, তুমি চেনো, তুমি শোনো,
এখন থেকে
তোমার লোকবিজয়ী করুণাধারা দিয়ে মুছিয়ে দাও-
সব আস্রব,
সমস্ত কষায়,
নীল কৃষ্ণ কপোত শ্বত লেশ্যা,
দূর কর শতশতাব্দীর আবর্জনা ,

নিভিয়ে দাও—
নরকের ঐ প্রজ্জলন্ত আগুন,
আমি রুদ্ধশ্বাস, ক্লান্ত, ভীত,
হাত ধরো, ছায়া দাও, জল দাও,
আমার মাতা হয়ে পিতা হয়ে—
গুরু হয়ে সখা হয়ে
আমাকে কাছে ডেকে নাও,
আর সরিয়ে নিয়ো না
তোমার পরশরতন চরণ।

স্মৃতিচারণ

মুনি জিনবিজয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৯৩৮ সালে পণ্ডিতজী শ্রীসুখলালজী এপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হয়ে বোম্বাই এলেন ও সার হরকিসনদাস হস্পিটালে তাঁর অপারেশন হল।...তাঁর পরিচর্যার জন্য আমিও এই হস্পিটালে এসে রইলাম। তখনই এক দিন মুন্সীজী (কে, এম, মুন্সী) যিনি সেই সময় বম্বে সরকারের গৃহমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন হস্পিটাল পরিদর্শনে এলেন ও পণ্ডিতজীর কক্ষে গিয়ে আমি সেখানে আছি জানতে পারলেন ও আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয় দিন সকালে তিনি গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন ও আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেঠ মুংগালালজী কোনো বিশিষ্ট ও উচ্চ বিদ্যাধ্যয়নের জন্য ২ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন যার জন্য পুরাতত্ব মন্দিরের মত কোনো সংস্থা স্থাপিত করবার কথা তিনি চিন্তা করছিলেন এবং তাতে আমার পূর্ণ সহযোগ প্রার্থনা করলেন।... মুন্সীজীর কথা শুনে আমার আনন্দ হল।...কিন্তু আমি ত আমার লক্ষ্য সিংঘী জৈন গ্রন্থমালায় স্থির করে নিয়েছিলাম। তাই এই সংস্থা নির্মাণে আমি মুন্সীজীকে কতখানি সাহায্য করতে পারব তা ঠিক করতে পারলাম না। তাই সংক্ষেপে আমার পরিস্থিতি বিবৃত করে যতখানি সম্ভব সহযোগ দেবার ইচ্ছা প্রকট করলাম। পণ্ডিতজী সুস্থ হয়ে গেলে আমি তাঁকে আহমদাবাদে নিয়ে গেলাম। সেখানে কিছু দিন থেকে তিনি হিন্দু ইউনিভার্সিটি তাঁর কার্যস্থানে ফিরে গেলেন। এর মধ্যে মুন্সীজীর কয়েকটি পত্র আমি পেলাম যাতে আমি বম্বাই যেয়ে থাকি তার আগ্রহ ছিল। বম্বাই থাকলে গ্রন্থমালার কাজ দ্রুত হবে ও মুন্সীজীর কাজেও আমি সাহায্য করতে পারব ভেবে বম্বাই আমার মুখ্য নিবাস স্থান করা স্থির করলাম।

৩ আগষ্ট আমি বম্বাই পৌঁছলাম এবং মাতুঙ্গায় কিংস সার্কলে এক বাড়ী ভাড়া নিলাম। মুন্সীজীর সঙ্গে বসে ভারতীয় বিদ্যাভবনের খসড়া তৈরী করা গেল। মাতুঙ্গাস্থিত খালসা কলেজে তার প্রারম্ভিক কার্য করা স্থির হল। আমি যখন এসব কথা সিংঘীজীকে জানালাম তিনি তাতে হর্ষ ব্যক্ত করলেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই বছর (১৯৩৮) ডিসেম্বর মাসে আমি কলকাতায় গেলাম ও কিছুকাল সেখানে রইলাম। সেই সময় তাঁর সংগৃহীত মুঘল, রাজপুত ও কাঙড়া স্কুলের কয়েক শ' ছবি ব্যবস্থিত করে এলবাম আকারে সাজাবার চেষ্টা করলাম।...সেই সময় এ স্থির করা

হল যে এতে যা ভালো ও বৈশিষ্ট্যমূলক ছবি আছে তার কিছু সংগ্রহ সিংঘী জৈন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত করা হবে। মুদ্রা সংগ্রহের ক্যাটলগ বিষয়েও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকের স্টক এ পর্যন্ত সিংঘীজীর ওখানেই থাকত। এখন তা আহমদাবাদে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।...

বম্বেতে নূতন স্থাপিত ভারতীয় বিদ্যাভবন সম্পর্কেও অনেক কথা হল এবং তাতে আমার সহযোগ কি ধরণের এবং তা সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার বাধক না হয়ে সাধক হবে সে সম্বন্ধেও আমার যা মনে হচ্ছিল তা তাঁকে জানালাম। কারণ তাঁর ভয় ছিল যে পাছে আমি ভারতীয় বিদ্যাভবনের কাজে ব্যস্ত হয়ে সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার কাজে মন্দগতি হয়ে না পড়ি। কিন্তু আমি যখন তাঁকে সমস্ত কথা যথাযথভাবে জানালাম তখন তিনি তা পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন এবং আমিও তখন খুসী হয়ে তাঁর কাছ হতে বিদায় নিলাম।

বম্বে থাকায় গ্রন্থমালার কাজে প্রগতি এল। প্রেস সেখানে থাকায় প্রূফ আসা যাওয়া ও ছাপার কাজ দ্রুত হল। ওদিকে ভারতীয় বিদ্যাভবনের কাজও প্রগতি করছিল। যদিও তার বাইরের কাজের ভার আমি নেই নি তবু গ্রন্থের সম্পাদন আদি কাজে আমায় যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করতে হত। ভারতীয় বিদ্যা নামক গবেষণাত্মক হিন্দী-গুজরাতী ত্রৈমাসিক সম্পাদনও প্রথম প্রথম আমায় করতে হত। তাছাড়া ভারতীয় বিদ্যা-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত কিছু কিছু গ্রন্থের সম্পাদনাও আমি সুরু করেছিলাম। অধিকারীরূপে না হলেও সহকারীরূপে ভবনের সমস্ত বিষয়ের ওপরই আমায় প্রতিদিন নজর রাখতে হত।

এর মধ্যে রাজস্থান সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের অধ্যক্ষরূপে ও পরে তার সমিতিতে ভাগ নেবার জন্য বারবার রাজস্থানে যাতায়াতে ও সাহিত্যিক অন্বেষণের জন্য প্রবাস বাসে আমার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে লাগল।...এদিকে গ্রন্থমালার কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। গ্রন্থ যেমন যেমন ছেপে জমা হতে লাগল তেমনি তেমনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, বিক্রয়াদির ব্যবস্থা ও আয়ব্যয়ের হিসাবাদি রাখার কাজ বেড়ে গিয়েছিল। সিংঘীজী এসব দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। তিনি গ্রন্থ-মালার জন্য যে ব্যয় হত তা পাঠিয়ে দেওয়া ও গ্রন্থের অধিকাধিক প্রসিদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। এদিকে ওঁরও স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছিল ও মাঝে মাঝে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতেন। এজন্য গ্রন্থমালার ভাবী ব্যবস্থা আমাকে চিন্তিত করে তুলেছিল। শরীর যখন বেশী খারাপ হত তখন পণ্ডিতজী আমায় বলতেন কোনমতে গ্রন্থমালার কাজ গুটিয়ে নাও, যে গ্রন্থ ছাপা হচ্ছে তা পুরো করে আগের কাজ বন্ধ করে দাও।

এই সব নানা কারণে দীর্ঘ দিন সিংঘীজীকে আমি কোনো পত্র দিতে পারিনি বা নিজের মনোভাবও তাঁকে জানাতে পারি নি।

...ভারতীয় বিদ্যাভবন মুন্সীজীর সতত প্রয়াস ও প্রভাবে দিন দিন উন্নতি করতে লাগল ও তিন চার বছরে আর্থিক ও সংগঠনের দিক হতে সুদৃঢ় হয়ে গেল। মুন্সীজী আমায় প্রায়ই বলতেন যে সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা যদি ভবনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তবে ভবনের যেমন প্রসিদ্ধি হবে তেমনি আমিও তার দায়িত্ব হতে খানিকটা মুক্ত হতে পারব। আমার-ও তাই ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু এ সম্পর্কে বিচার বিমর্শ করতে করতে বছর দুই কেটে গেল। যখন মনস্থির হল তখন সিংঘীজীকে পত্র দিলাম ও তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

...সিংঘীজীর...পত্র পেয়ে ১৯৪২ এর জুলাই মাসে আমি আজিমগঞ্জ গেলাম... আজিমগঞ্জই সিংঘীজীদের মূল নিবাস স্থান ছিল।...যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতির জন্য তিনি তখন সপরিবারে কলকাতা পরিত্যাগ করে সেখানে অবস্থান করেছিলেন। পুরো ১৫ দিন আমি আজিমগঞ্জে রইলাম। সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার বিচার বিনিময় হল। আমার সমস্ত কথা শুনে তিনি বললেন, এ বিষয়ে আপনিই আমার প্রমাণ। আপনার স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য আপনি যা বলবেন তাই আমার মান্য। তারপর ভবনের সঙ্গে এই গ্রন্থমালা কিভাবে যুক্ত করা যায় সে নিয়ে আলোচনা হল। প্রকাশনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বার্ষিক ২০ হাজার টাকা তিনি খরচ করবেন বলে আশ্বাসন দিলেন।

ভারতীয় বিদ্যা ভবনের অন্ধেরীস্থিত বিশাল বাড়ীর ওপরের তলায় সংগ্রহালয় স্থাপনের আমার ইচ্ছা ছিল। সিংঘীজীকে সেকথা বলায় তিনি তখুনি তার জন্য ১০ হাজার টাকা অনুমোদন করলেন।

বারাণসীতে পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। তাই আমি ভাবছিলাম তিনি যদি আহমদাবাদে গিয়ে থাকেন। সিংঘীজীকে সেকথা জানাতে তিনি তখুনি আমার আশাতিরিক্ত তাঁর মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এভাবে আমার কাজ সেখানে শেষ হলে আমি বারাণসী যাবার জন্য রওনা হলাম।...পণ্ডিতজীর সঙ্গে আবশ্যক পরামর্শ করে ১ই আগষ্ট রাত্রের গাড়িতে আমি বম্বে গেলাম। বম্বে গিয়ে সিংঘীজীর সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল তা মুন্সীজীকে জানালাম। মুন্সীজী সমস্ত শুনে আনন্দিত হলেন। তারপর সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা কিভাবে ভবনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সে নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। মুন্সীজীর তরফ হতে এক অফিসিয়াল পত্র সিংঘীজীকে দেওয়া হল এবং তার উত্তর কি ভাবে দিতে হবে তার মুসাবিদাও সেই সঙ্গে পাঠান হল। সিংঘীজীও সেই অনুসারে তাঁর প্রত্যুত্তর তৈরী করলেন এবং সেই প্রত্যুত্তরের সঙ্গে ২৯-৯-৪২ তারিখে আমায় এক পত্র দিলেন।...সিংঘীজীর সেই পত্র যখন এল আমি তখন আহমদাবাদে ছিলাম ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জাত রাজনৈতিক পরি-

স্থিতিতে উন্মনস্ক ও অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়েছিলাম।...

এই সময়ে জৈশলমের হতে আচার্য শ্রীজিনহরি সাগরজী মহারাজের এক পত্র পেলাম যাতে তিনি আমাকে সেখানকার জৈন জ্ঞান ভাণ্ডার পরিদর্শন করবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন।...জৈশলমেরের জ্ঞান ভাণ্ডার পরিদর্শন করবার ইচ্ছাই নয় উৎকণ্ঠা আমার অনেকদিন হতেই ছিল। যখন আমি গুজরাত পুরাতত্ব মন্দিরের কাজ হাতে নেই তখনই (১৯২০ সাল) সেখানে যাবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল। যদিও পাটন প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থ সংগ্রহ আমি দেখেছি কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জৈশলমের যাবার সুযোগ আমার হয়নি। ১৯২৮ সালে যখন আমি হ্যাম্বর্গ যাই ও সুপ্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত জেকোবীর সঙ্গে দেখা করি তখন প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমায় প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি জৈশলমেরের জ্ঞানভাণ্ডার ভালো করে পরিদর্শন করেছি কিনা? আমাকে তখন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই এর প্রত্যুত্তর দিতে হয়েছিল যে, সে সুযোগ আমার হয় নি। তখন তিনি বূহলর-এর সঙ্গে ১৮৭৪ সালে সেখানে যে গিয়েছিলেন ও বহুকষ্টে সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের সামান্য অংশ দেখতে পেরেছিলেন সেকথা বললেন। গ্রন্থাদি রাখবার দুর্ব্যবস্থার কথাও তিনি বললেন এবং আরো বললেন যে সেই জ্ঞান ভাণ্ডার আমার ভালো করে দেখা উচিত ও সেখানে যে দুর্লভ ও অপূর্ব সাহিত্য রয়েছে তা প্রকাশে আনা উচিত।...তাই সেই আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্র আমি জৈশলমের যাবার জন্য মনস্থির করে ফেললাম ও ৪।৫ জন্য সুযোগ্য সহকারী নিয়ে ৩০ শে নভেম্বর ভোরের গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে গেলাম।...

জৈশলমেরের জ্ঞান ভাণ্ডারে যে তালপত্রীয় গ্রন্থাদি রাখা ছিল তা সুব্যবস্থিত ভাবে ছিল না। সামান্যভাবে কাপড়ে জড়িয়ে তাদের রাখা হয়েছিল। না ছিল সবক্ষেত্রে কাঠের পট্টি, বা পৃথক পৃথক ভাবে তাদের ভালো করে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা। যেখানেও বা কাঠের পট্টি ছিল সেও ছিল ছোট বড় সাইজের। ফলে গ্রন্থের পাতা ভেঙে যেত আর যখনই কোনো বাণ্ডিল খোলা হত তখনি এক গ্রন্থের পাতা অন্য গ্রন্থের সঙ্গে মিশে যেত। আমি সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের সংরক্ষকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করলাম ও বললাম যে পাটন বা খাম্বাতে যেভাবে প্রাচীন গ্রন্থকে সমান কাঠের পট্টি দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বেঁধে কাঠের বাক্সে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে সেইরূপ ব্যবস্থা এখানেও নেওয়া উচিত। তাঁরা তখন এ বিষয়ে নিজেদের অসামর্থ্য জানিয়ে আমাকেই কাজ হাতে নিতে বললেন। আমি তখন সিংঘীজীকে পত্র দিলাম ও লিখলাম এই জ্ঞান ভাণ্ডারের গ্রন্থের সুরক্ষার জন্য তিনি যদি কাঠের বাক্স আদি তৈরীর ব্যয়ভার বহন করেন তবে তা মহৎ পুণ্যের কাজ হবে। গ্রন্থের প্রকাশনের মত গ্রন্থের সুরক্ষাও অতীব প্রয়োজনীয়।

প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে কাঠের বাক্স আদি তৈরী করাতে বললেন ও তার ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন জানালেন।...আমি তখন ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে নমুনার জন্য দু একটি

বাক্স করতে বললাম। তখন সে হেসে বলল যে দু'একটি বাক্সের ধরণের কাঠের এক টুকরোও এখানে পাওয়া যাবে না। তার কথাই ঠিক। এদিকে ওদিকে সন্ধান করে আমিও কাঠের বাক্স তৈরীর কোনো সামগ্রীই খুঁজে পেলাম না। সমস্ত জিনিষই বাইরে হতে আনাতে হবে কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তখন তা সম্ভব ছিল না।...[বর্তমানে এল্যুমিনিয়ামের বাক্সে পৃথক পৃথক ভাবে রাখবার সুব্যবস্থা হয়েছে।—সম্পাদক]

দেখতে দেখতে ৫ মাস সেখানে কেটে গেল। সেই সময়ে আমি যে কেবল দুর্গের জ্ঞান ভাণ্ডারই পরিদর্শন করেছিলাম তাই নয়, আশপাশে আরো যে সব জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল তাও পরিদর্শন করলাম। এদের মধ্যে আমার কাছে যে সব গ্রন্থ নূতন ও অধিক উপযোগী বলে মনে হল সেই সব গ্রন্থের প্রতিলিপি করালাম ও টিপ্পনী লিখলাম। ছোট বড় প্রায় ২০০ গ্রন্থের প্রতিলিপি করা হল। এদের মধ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন দেশীয় ভাষায় গ্রথিত ন্যায়, ব্যাকরণ, আগম, কথা, চরিত্র, জ্যোতিষ, বৈদ্যক, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্য, কোষ আদি সমস্ত রকম গ্রন্থই ছিল।...এই কাজে প্রায় ৩৫০০ টাকা ব্যয় হয়। বলা বাহুল্য এ কাজ সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার জন্য করা হয়েছিল এবং এই ব্যয়ভারের সমস্তই সিংঘীজী বহন করেছিলেন।...

জৈশলমের হতে আমি যেই আহমদাবাদে পৌঁছলাম ওমনি মুন্সীজীর পত্র পেলাম। সেই পত্রে তিনি আমায় শীঘ্র বম্বে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। আমি তাই তাড়াতাড়ি বম্বে পৌঁছলাম। সেখান হতে দু'এক দিনের মধ্যে সিংঘীজীকে পত্র দেব ভাবছিলাম এর মধ্যে ৬ই মে রাত্রে মুন্সীজীর টেলিফোন পেলাম যে সিংঘীজী কোনো কার্যোপলক্ষে আজ সকালে সেখানে এসে পৌঁচেছেন।...এভাবে অকস্মাৎ দুজনের সাক্ষাৎ হওয়ায় আমরা উভয়ে আনন্দিত হলাম। এরপর আমাদের তিনজনের মধ্যে সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছিল তা নিয়ে বিচারবিমর্শ হল। পণ্ডিতজীকেও বারাণসী হতে ডাকান হল। ১১ই মে এই বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সিংঘীজী এগ্রিমেণ্টের কাগজে সই করে দিলেন। এভাবে নিজের গ্রন্থমালা ভবনের হাতে অর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এবং আমাকে উৎসাহিত দেখে আনন্দিতও।...

[এই স্মৃতি চারণ এইখানেই শেষ করছি। কারণ এই স্মৃতি চারণে মুনিশ্রী জিন বিজয়জীর জ্ঞান সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার বিবরণ উপস্থিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই গ্রন্থমালা ভারতীয় বিদ্যা ভবনের হাতে অর্পণ করার পর সিংঘীজী অল্পদিনই জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই গ্রন্থমালায় যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তা তাঁর সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় রাজেন্দ্র সিংহজী সিংঘী ও নরেন্দ্র সিংজী সিংঘীর বদান্যতায় ভারতীয় বিদ্যা ভবন হতে।

বিদ্বৎজনের জ্ঞাতার্থে সিংঘী জৈন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা এইখানে আমরা সংযোজিত করছি। এতদতিরিক্ত কিছু গ্রন্থ মুনিজী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অবস্থায় এখনো পড়ে রয়েছে। সেদিকে আমরা বিদ্যা ভবনের কর্তৃপক্ষ ও সিংঘী পরিবারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। বাহাদুর সিংজী সিংঘী ও মুনিশ্রীর আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য সেগুলির প্রকাশন আমাদের উত্তর দায়িত্ব।—সম্পাদক]

সংঘী জৈন গ্রন্থমালা

১। প্রবন্ধচিন্তামণি (মূল)—মেরুতুঙ্গাচার্য
২। পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহ
৩। প্রবন্ধ চিন্তামণি (হিন্দী ভাষান্তর)
৪। ধর্মাভ্যুদয় মহাকাব্য—উদয়প্রভ সূরি
৫। সুকৃত কীর্তি কল্লোলিন্যাদি বস্তুপাল প্রশস্তি সংগ্রহ
৬। প্রবন্ধকোশ—রাজশেখর সূরি
৭। দেবানন্দ মহাকাব্য—মেঘ বিজয় উপাধ্যায়
৮। জৈন তর্ক ভাষা —যশোবিজয় উপাধ্যায়
৯। প্রমাণ মীমাংসা—হেমচন্দ্রাচার্য
১০। বিবিধ তীর্থকল্প—জিনপ্রভ সূরি
১১। কথাকোষ প্রকরণ—জিনেশ্বর সূরি (প্রাকৃত)
11. The Life of Hemacandracarya—G. Buhler
১২। অকলঙ্ক গ্রন্থত্রয়ম—অকলঙ্ক
১৩। প্রভাবক চরিত—প্রভাচন্দ্র সূরি
১৪। দিগ্বিজয় মহাকাব্য—মেঘ বিজয় উপাধ্যায়
১৫। ভানুচন্দ্রগণি চরিত—সিদ্ধিচন্দ্র উপাধ্যায়
১৬। জ্ঞান বিন্দু প্রকরণ—যশোবিজয় উপাধ্যায়
১৭। বৃহৎ কথাকোষ—হরিষেণাচার্য
১৮। জৈন পুস্তক প্রশস্তি সংগ্রহ—১
১৯। ধূর্তাখ্যান—হরিভদ্র সূরি (প্রাকৃত)
২০। ন্যায়াবতার বার্তিক বৃত্তি—শান্ত্যাচার্য
২১। রিষ্টসমুচ্চয়—দুর্গদেব
২২। 'সন্দেশরাসক—আব্দুল রহমান
২৩। শতকত্রয়াদি সুভাষিত সংগ্রহ—ভর্তৃহরি
২৪। পউমসিরীচরিউ (অপভ্রংশ)—ধাহিল
২৫। নাণপংচমী কহা (প্রাকৃত)—মহেশ্বর সূরি
২৬। ভদ্রবাহু সংহিতা — আচার্য ভদ্রবাহু
২৭। জিনদত্তাখ্যানদ্বয় (প্রাকৃত)

২৮। ধর্মোপদেশমালা (প্রাকৃত)—জয়সিংহ সূরি
২৯। ভর্তৃহরি শতক ত্রয়ম্
৩০। শৃঙ্গার মঞ্জরী কথা
৩১। লীলাবঈ কহা (প্রাকৃত) কোউহল
৩২। কীর্তি কৌমুদী
৩৩। Literary Circle of Mahamatya Vastupala and Contribution to Sanskrit Literature —B. J. Sandesara
৩৪। পউমচরিউ ১ (অপভ্রংশ)—স্বয়ংভূ
৩৫। পউমচরিউ ২ ,, ,,
৩৬। পউমচরিউ ৩ ,, ,,
৩৯। উক্তি.ব্যক্তি প্রকরণ—দামোদর
৪০। কাব্যপ্রকাশ খণ্ডন—সিদ্ধিচন্দ্র
৪১। কুমারপাল চরিত্র সংগ্রহ
৪৩। জয়পায়ড় নিমিত্ত শাস্ত্র (প্রাকৃত)
৪৪। জংবু চরিয়ং (প্রাকৃত)—গুণপাল মুনি
৪৫। কুবলয় মালা-১ (প্রাকৃত)—উদ্যোতন সূরি
৪৫-অ কুবলয় মালা কথা সংক্ষেপ
৪৬। কুবলয় মালা-২ (প্রাকৃত)—উদ্যোতন সূরি
৪৭। অর্থশাস্ত্র (রাজ সিদ্ধান্ত)—কৌটিল্য
৪৮। নম্ময়াসুন্দরী কহা (প্রাকৃত)—মহেন্দ্র সূরি
৪৯। ছন্দোঽনুশাসন—হেমচন্দ্রাচার্য
৫১। বিজ্ঞপ্তি লেখ সংগ্রহ।

ধূর্তাখ্যান

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

সেকালে উজ্জয়িনী নগরীর নিকটে একটি সুরম্য উপবন ও উদ্যানগৃহ ছিল। সেই উদ্যানগৃহে এক সময়ে নানা স্থান হতে সমাগত হয়ে কয়েক শ' ধূর্ত সমবেত হয়। তাদের পাঁচজন দলপতি ছিল যাদের চারজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। পুরুষ দলপতিদের নাম মূলদেব, কণ্ডরীক, এলাষাঢ় ও শশ। স্ত্রী দলপতির নাম খণ্ডপানা। পুরুষ দলপতিদের প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ পাঁচশ' অনুচর ও খণ্ডপানার অধীনে পাঁচশ' সহচরী ছিল। এদের সকলের ওপর সর্বময় কর্তা ছিল আবার মূলদেব।

ধূর্তরা যখন উদ্যান গৃহে সমবেত হয় তখন বর্ষাকাল। সেই সময় মানুষ সাধারণতঃ প্রবাসে যায় না। তার উপর সাতদিন অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় পথঘাট সব বন্ধ। কেউই সাত দিন ঘরের বার হতে প্যারেনি। তাই কাউকে ঠকাতে না পেরে ধূর্তরা ক্ষুধায় কাতর ও শীতে আর্ত হয়ে এখন কী করা যায় তা নিরূপণ করার জন্য এক মহতী সভায় মিলিত হল। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পরও যখন কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেল না তখন মূলদেব সকলকে সম্বোধন করে বলল—আমরা ধূর্ত নায়কেরা

ধূর্ত সভায় আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলব। যে তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দেবে সে সবাইকে একদিন পেট ভরে খাওয়াবে। আর যদি সে ভারত পুরাণাদির দৃষ্টান্তে তার সত্যতা প্রমাণ করে দেয় তবে তাকে আর কিছু করতে হবে না এবং তাকেই আমরা সকলে দলপতি বলে স্বীকার করে নেব। মূলদেবের এই প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হওয়ার তারা সকলে তাকেই প্রথম তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলল।

মূলদেব তখন বলতে আরম্ভ করল। সে বলল, প্রথম জীবনে গঙ্গা মাথায় ধারণ করে অক্ষয় কীর্তি লাভ করব বলে আমি একবার দেবাদিদেব মহাদেবের আলয়ে যাবার

জন্য ছাতা ও কমণ্ডলু নিয়ে বাড়ী হতে বার হলাম। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখি পর্বতাকার এক বৃহৎ হাতী আমার দিকে ছুটে আসছে। আত্ম-রক্ষার অন্য উপায় ছিল না। তাই আমি তাড়াতাড়ি আমার কমণ্ডলুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এতে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে সেই হাতীটিও পেছন পেছন সেই কমণ্ডলুতে ঢুকে পড়ল। সেই কমণ্ডলুর মধ্যে কখনো নিকটে এসে কখনো দূরে সরে গিয়ে তাকে আমি ছ'মাস ঘুরিয়ে মারলাম। শেষে জল বার হবার ছিদ্রপথে সেই কমণ্ডলু হতে বার হয়ে এলাম। হাতীটিও আমার পেছনে পেছনে সেই ছিদ্র পথ দিয়ে বার হয়ে এল কিন্তু তার লেজের চুল
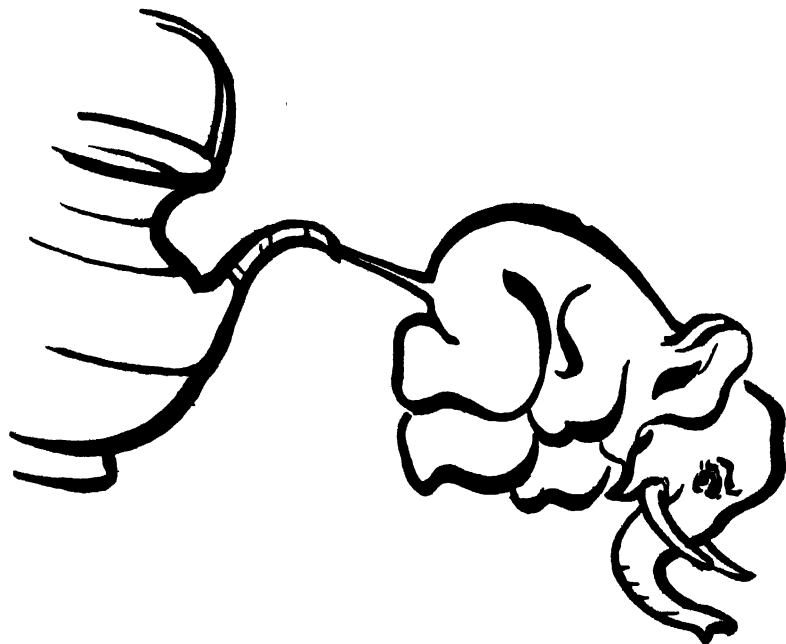
ছিদ্রপথ দিয়ে বার হতে না পারায় সে আমায় তাড়া করতে পারলনা। আমি তখন দৌড়ে গঙ্গার তীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম ও সমুদ্রের মত বিস্তৃত সেই গঙ্গানদী সাঁতার দিয়ে পার হলাম। পার হয়ে শিবের আলয়ে গিয়ে শিবের মাথা হতে গঙ্গা নিজের মাথায় নিয়ে ছ'মাস অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে দিলাম। তারপর শিবের গঙ্গা শিবকে ফিরিয়ে দিয়ে সেখান হতে সোজা এখানে চলে এলাম। কণ্ডরীক, এসব যদি তোমার মিথ্যা বলে মনে হয় তবে তুমি একদিন আমাদের সকলকে পেট ভরে খাইয়ে দাও নয়ত ভারত-পুরাণের দৃষ্টান্তে এদের সত্যতা প্রমাণ কর।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন

পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র

৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. IV No. 9 : Sraman : January 1977
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

ফাল্গুন । ১৩৮৩

চতুর্থ বর্ষ । একাদশ সংখ্যা

শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৮৩ ॥ একাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

আদিনাথ, ধরাপাট

জৈনমূর্তি, গ্রামদেবতা ও লোক কথা

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

বিশ্বের সর্বপ্রাচীন ধর্মের অন্যতম হল জৈনধর্ম। মহাবীরের সময়ে এবং আগে নির্গ্রন্থ নামে জৈনদের পরিচিতি ছিল। মহাবীর আত্মজয়ী হয়ে 'জিনত্ব' অর্জন করলেন, শিষ্যরা হলেন জৈন। জৈনধর্ম চব্বিশজন মুক্তি পথ প্রদর্শক বা তীর্থংকর প্রচার করেন। আদিতম তীর্থংকর হলেন আদিনাথ বা ঋষভনাথ। শেষ দিকে এলেন পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। মহাবীরের সময়ে এবং পরে জৈন ধর্ম মগধ পার হয়ে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়।

মৌর্য আমল থেকে সুরু হয়ে গুপ্ত আমল পর্যন্ত জৈন ধর্মের পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল। অনুমিত হয় পার্শ্বনাথের প্রচেষ্টাতেই বাঙলাদেশে এই ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। জৈন ধর্মের বিস্তারের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর্যীকরণ সম্ভব হয়েছিল এমন মন্তব্য ভাণ্ডারকার প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ করেছেন। জৈন সূত্র (খৃঃ পূঃ ৪র্থ-৩য় শতক) থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে বাঙলাদেশে গোদাস মুনির শিষ্যরা এক সময়ে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের তৎকালীন অভিধা ছিল গোদাসগণ। প্রাচীন ভূমিখণ্ডের বিভাজন অনুসারে এঁরা তাম্রলিপ্তক (তমলুক আঞ্চলিক) কোটিবর্ষীয় (দিনাজপুর আঞ্চলিক) পৌণ্ড্রবর্ধনীয় (বগুড়া-রাজশাহী), দাসী খর্বটিক (সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গ) এই চারিটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। কারো কারো অভিমত, মহাস্থান গড়ের (বগুড়া) শিলালেখেত যে 'সংবঙ্গীয়' সম্প্রদায়ের কথা আছে তা জৈন সম্প্রদায় সম্পর্কিত। উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুরের বিহার যে প্রথমে জৈনবিহার ছিল প্রাচীন তাম্রপট্ট তার প্রমাণ। জৈন প্রাধান্যকালে এই বিহারের নাম ছিল বটগোহালী।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, সাধারণতঃ বাংলায় যে সকল দেবমূর্তি পাওয়া যায় তা অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী। সম্ভবতঃ ঐ সময় থেকেই বাংলায় জৈন ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই কমে যায়। এবং এই কারণেই জৈন মূর্তি বাংলায় খুবই কম পাওয়া গেছে। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকদের সর্বশেষ মন্তব্য বোধ করি শূন্যগর্ভ। কারণ, সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গের দুইটি জেলা থেকে, বিশেষ করে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া থেকে, যে পরিমাণ তীর্থংকর, চৌমুখ, রেখমন্দির ও শাসনদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে তাতে 'জৈনমূর্তি বাঙলায় কমই পাওয়া গেছে' উক্তির সারবত্তা উপলব্ধ হয় না। পরন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি গ্রন্থটি থেকেও দেখানো যেতে পারে আগ্রাসী পৌরাণিক ধর্ম বিজেতার ধর্মোন্মাদনার পরিচয় সাক্ষ্য রাখছেন এখানে মূর্তিকে পরিবর্তিত

রূপদান করে, মন্দিরকে অদল বদল করে। ধরাপাটের মন্দিরের দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক। মন্দিরের আমলক চূড়ার চারদিকে যে পাথরের চারটি লম্ফমান সিংহ আছে অথবা গর্ভগৃহের ছাদ যে ধাপযুক্ত চারচালার উপর স্থাপিত এ সব বৈশিষ্ট্য ততটা লক্ষণীয় নয়, যতটা শিখরের গায়ে নিবদ্ধ তিনটি পাথরের মূর্তি। পূব দিকের বাসুদেব মূর্তিটি প্রায় ৩ ফুট (০.৯ মি), উত্তর দিকের আদিনাথের মূর্তিটি প্রায় ৫ ফুট (১.৫ মি) ও পশ্চিমদিকের পার্শ্বনাথের মূর্তিটি প্রায় ৩ ফুট (০.৯ মি) উঁচু। এগুলি ধরাপাটের পূর্ব ইতিহাসের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। জৈন মূর্তি দুটি থেকে সহজেই প্রমাণ হয় যে দূর অতীতে এখানে বা কাছে পিঠে এক জৈন ধর্মকেন্দ্র ছিল।...বর্তমান মন্দিরের প্রায় ২০০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিমে বেশ বড় এক ঢিপির ওপরে মাকড়া পাথরের এক প্রাচীন আমলক প্রভৃতির ভগ্নাংশ ছড়ানো দেখা যায়। জৈন আমলের মন্দিরটি সম্ভবতঃ এখানেই ছিল। তারপর সে ধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত সেই দেবালয়কে কেন্দ্র করে এক বাসুদেব উপাসনার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তার প্রমাণ, শুধু উপরিলিখিত বাসুদেব বিগ্রহটিই নয়, অদূরের দালান মন্দিরে মনসাজ্ঞানে উপাসিত পার্শ্বনাথের প্রায় ৪ ফুট (১.১ মি) উঁচু মূর্তিটিও। বস্তুতঃ, শেষেরটির মত কৌতু-হলোদ্দীপক ভাস্কর্য পশ্চিমবঙ্গে বড় বেশী নেই। নাগছত্রধারী(সেইজন্যেই অধুনা মনসায় রূপান্তরিত পার্শ্বনাথ মূর্তিটির পিছনের প্রস্তরপট খোদাই করে গদাচক্রধারী অতিরিক্ত দুটি হাত ও লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রথাগত দুটি মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

রাজা শশাঙ্ক প্রসঙ্গে হুয়েন সাঙ্‌ও বলেছেন,. শশাঙ্ক গয়ায় বোধিবৃক্ষ উপড়ে ফেলেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদচিহ্ন সংবলিত একখানি পাথর গঙ্গার জলে ফেলে দেন, কুশীনগরের বিহার থেকে বৌদ্ধদের মেরে তাড়িয়ে দেন, গয়ার একটি মন্দির থেকে বৌদ্ধমূর্তি সরিয়ে শিবমূর্তি স্থাপনের আদেশ দেন। আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে বলা হয়েছে যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েরই উৎপীড়ক ছিলেন।

ঐতিহাসিকদের আরেকটি সিদ্ধান্ত, অষ্টম শতাব্দীর পরে জৈন ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই কমে যায়—বলা বাহুল্য এই উক্তি রাঢ় অঞ্চল সম্পর্কে আদৌ যথাযথ নয়। কারণ, শুধুমাত্র বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কয়েকশো জৈনমূর্তি দশম ও একাদশ শতাব্দীর বলে বিবেচনা করার সম্যক কারণ বর্তমান। তবে একথা ঠিক উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য কোন কোন অঞ্চলে জৈনপ্রভাব পৌরাণিক ধর্মের আক্রমণের কারণ হয় এবং প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়।

বাঙ্‌লাদেশে জৈন মূর্তি প্রায় সর্বত্রই পাওয়া গেছে এবং জৈন বিহারের অস্তিত্ব কথা জানা গেছে। রাঢ়বঙ্গের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে নদীতীরবর্তী সমস্ত এলাকায় জৈনপ্রভাবের চিহ্ন বিশেষ আজও রয়ে গেছে। কোটিবর্ষীয় মূর্তির নমুনা পাওয়া গেছে সুরহর গ্রামে। আদিতম তীর্থংকর ঋষভনাথের অতি উল্লেখযোগ্য মূর্তি এটি।

তাম্রলিপ্তিক মূর্তি পাওয়া গেছে বীরভূমে এবং দক্ষিণ বঙ্গের কাঁটাবেনেতে। তীর্থংকরদের মধ্যে ঋষভদেবের মূর্তি পাওয়া গেছে সুরহর ছাড়া বাঁকুড়ার অনেকগুলি স্থানে, অজিতনাথ মূর্তি বরকোশাতে, পদ্মপ্রভ পুরুলিয়াতে, সুবিধিনাথ দেউলভিড়াতে, বসুপূজ্য সাগর দীঘিতে, ধর্মনাথ মেদিনীপুরে (বর্তমানে বাগনান আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায় রক্ষিত), শান্তিনাথ পুরুলিয়ায়, কুন্থুনাথ অম্বিকানগরে, নেমিনাথ ধরাপাটে, পার্শ্বনাথ পুরুলিয়ার প্রায় সর্বত্র। এই তীর্থংকরদের মূর্তি ছাড়াও আরো হয়ত অন্যান্য তীর্থংকরদের অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে, এখানে বর্তমান প্রবন্ধকারের নিজের দেখা মূর্তিগুলির মাত্র উল্লেখ করা হল। জৈনমূর্তি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব গ্যালারীর প্রযত্ন বিশেষভাবে দেখা যায়। বাঙ্‌লাদেশের অন্যান্য কীর্তিশালার এই ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ নজরে আসে না।

পশ্চিম বাঙ্‌লার সীমান্ত জেলা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে যে পরিমাণ তীর্থংকর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় তাতে শুধু সংখ্যার দিক বিবেচনা করলে এই ধর্মের প্রভাব একদা কি ছিল অনুমান কঠিন হয় না। বাঁকুড়ার বহুলড়া, হাড়মাসড়া, অম্বিকা, চিৎগিরি, চেয়াদা, বরকোনা, কেন্দুয়া, দেউলভিড়া, গোকুল, পরেশনাথ ও ধরাপাট এবং পুরুলিয়ার পাকবিড়া, বুধপুর, সুইশা, পল্‌মা, দেউলি, বলরামপুর, ছররা, সঙ্‌কা, পাড়া, লনেড়া ও ঝালদা যে একদা জৈন পীঠ ছিল তার প্রমাণ বিহারের ভগ্নাবশেষ অসংখ্য জৈন মূর্তি এবং অগণিত চৌমুখ রেখ মন্দির।

অজস্র মূর্তি অপসারিত হওয়ার পরও যে সব ভারী ভারী তীর্থংকর মূর্তি স্থানে স্থানে রয়ে গেছে তারা পববর্তীকালে গ্রামবাসীদের কাছে বিচিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। সীমান্ত বাঙ্‌লায় কয়েকটি অঞ্চলে এগুলি গ্রামদেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রামের মানুষ অভিজাত ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে মাথা না ঘামিয়ে তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে এইসব মূর্তিতে বিশেষ বিশেষ মহিমা আরোপ করেছেন।

বাবা ভৈরব ॥ পল্‌মা, পুরুলিয়ার পুইঞ্চা থানার একটি গ্রাম। গ্রামে একটি পাকা শিবের থান রয়েছে। এই থানে দুটি ব্রহ্মশিলার বসুপূজ্য মূর্তি রয়েছে, মূল লিঙ্গদেবের সঙ্গে এ'রাও নিত্যপূজা পান। সাদৃশ্যমূলক মূর্তিতত্ত্বের দিক থেকে এগুলিকে একাদশ শতকের বলে চিহ্নিত করা যায়। শিবের থানের বাইরে টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ৮ ফুটি বাবা ভৈরব। ভৈরবের মাথাটি নেই। স্থানীয় লোকশ্রুতি বাবা মাথার কাজ আর নয় বলে কালাপাহাড়কে কেটে নিয়ে যেতে বলেন। তলাকার লাঞ্ছন চিহ্ন না পাওয়ায় কোন তীর্থংকর চেনা মুস্কিল। এ'র বার্ষিক পূজা হয় বৈশাখ সংক্রান্তির দিনে।

কাল ভৈরব ॥ পলমার বাবা ভৈরবেরা তিন ভাই। তাঁর অপর দুই ভাইয়ের একজন থাকেন পুরুলিয়ারই আরেকটি স্থান পাকবিড়াতে এবং সর্বকনিষ্ঠ থাকেন

বাঁকুড়ার মদনপুরে। কাল ভৈরব নামধারী দুই ভাই-ই এখন চাষের দেবতায় পরিণত হয়েছেন। পাকবিড়ার সর্বত্র জৈন বিহারের অবশেষ এবং জৈন মূর্তি দেখা যায়। কাল ভৈরবের উচ্চতাও অগ্রজ বাবা ভৈরবের সমান। কাল ভৈরব আসপাশের সমস্ত কৃষিক্ষেত্র ঘুরে ঘুরে দেখেন—স্থানীয় লোকের মুখে মুখে এই কথা চালু আছে। তাছাড়া উনি নাকি আগে অতটা লম্বা ছিলেন না। মাঝে শরীর খারাপ হওয়ায় দূরের মাঠের চাষ দেখার জন্য যেমনি মাথা উঁচু করলেন অমনি লম্বা হলেন। কাল ভৈরবের বার্ষিক পূজা উপলক্ষে পাকবিড়াতে জৈষ্ঠ্যমাসের মাঝামাঝি একটা মেলাও বসে।

বাচ্চা কান্না ॥ পলমার রাজারডাঙ্গায় একটি প্রোথিত প্রস্তর স্তম্ভ রয়েছে। লোকে বলে শিবের থব। গ্রামের দুর্গা-দালানের বয়োবৃদ্ধ পুরোহিত প্রসঙ্গতঃ ঐ ডাঙ্গা থেকে অজস্র পুরাসামগ্রী প্রাপ্তির কথা জানালেন এবং ভবিষ্যতে বড়ো রকমের খোঁড়াখুঁড়ি পুরস্কৃত হবেই বলে তাঁর ধারণা। এই ডাঙ্গার ঠিক সামনে অর্ধপ্রোথিত একটি ব্যাসল্টের তীর্থংকর মূর্তি আছে। লাঞ্ছনাংশ মাটির তলায় থাকায় মূর্তিটি কোন বিশেষ তীর্থংকর বলে চিহ্নিত করা অসুবিধা। বর্তমানে এই তীর্থংকর এক বিশেষ মহিমায় দেখা দিয়েছেন। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কোন কারণে ভীষণরকম কান্নাকাটি সুরু করলে অভিভাবকরা এই বাচ্চা কান্না দেবতার আশ্রয় নেন। শোনা যায় বাচ্চারাও এই দেবতার সামনে এলে কান্না থামিয়ে দেয়। অন্যান্য গ্রাম দেবতার সঙ্গে ইনিও বৈশাখ সংক্রান্তির দিনে বার্ষিক পূজা পান। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ উপকার পেলে বার্ষিক পূজা ছাড়াও ইনি পূজিত হন। গ্রামের শিব মন্দিরের 'অধিকারী' উপাধিধারী পুরোহিত যাবতীয় তীর্থংকর মূর্তিগুলিকে শিবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলে বর্ণনা করে থাকেন। আরও একটা শিব দেখেন, হেই একটা কালো শিব দেখেন··· ঋষভনাথের লাঞ্ছন চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, 'হেই বাবার নন্দী দেখেন', পার্শ্বনাথের সাপ দেখিয়ে বলবেন, 'এই ফ্যাচট দেখেন বটে', মহাবীর দেখিয়ে বলবেন; 'বাবা আমার বাঘাহুট বোঙ্গা'।

সমকালীন, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ হতে পুনর্মুদ্রিত।

প্রভাবতী

[জৈন কথানক]

কিন্নর কন্যাদের মুখে কাশীরাজপুত্র পার্শ্বের গুণগাথা শুনে পার্শ্বকে আত্মদান করে বসেছে কুশস্থলের রাজকন্যা প্রভাবতী। যদি বরমাল্য কারু কণ্ঠে অর্পণ করতে হয় তবে সে কুমার পার্শ্ব। নইলে রম্যক বনে গিয়ে তাপসিনীর জীবন যাপন করবে সে একব্রতা হয়ে।

উভয় সঙ্কটে পড়েছেন কুশস্থল নৃপতি প্রসেনজিৎ। পার্শ্বের মনোভাব তাঁর জানা নেই। কিন্তু কলিঙ্গাধিপতির মনোভাব তাঁর অজ্ঞাত নয়। তাঁর দূত অপেক্ষা করছে সন্ধি-বিগ্রাহিকের ঘরে। তিনি কুশস্থলের রাজকন্যার পাণি-প্রার্থনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে পাঠিয়েছেন যদি তিনি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ না করেন তবে বাহুবলে হরণ করে নিয়ে যাবেন প্রভাবতীকে। তিনি এই ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি; সসৈন্যে উপস্থিত হয়েছেন কুশস্থলে। দুর্গাবরোধ করে অবস্থান করছেন। প্রত্যুত্তরের জন্য মাসাবধিকালের সময় দিয়েছেন।

কিন্তু প্রভাবতীর সেই এক কথা। যদি বরণ করতে হয়ত কুমার পার্শ্বকে। নয়ত—

এই নয়ত-র কথা ভাবতে গিয়ে সিউরে ওঠেন প্রসেনজিৎ। এখন রম্যক বনে গিয়ে তাপসিনীর জীবন নয়। প্রভাবতীর সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা রয়েছে—এক অসম্মানের, দুই মৃত্যুর। কারণ কলিঙ্গাধিপতিকে বাধা দানের শক্তি কুশস্থলের নেই।

কন্যার মনকে যখন পরিবর্তিত করা গেল না, তখন বাধ্য হয়ে দূত প্রেরণ করতে হল প্রসেনজিৎকে পার্শ্বের পিতা কাশীরাজ অশ্বসেনের কাছে। সমস্ত কথা নিবেদন করে তিনি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

কাশীরাজ নিজেই অশ্বারহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করছিলেন কিন্তু তাঁকে নিবৃত্ত করে অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপত্য গ্রহণ করলেন কুমার পার্শ্ব, তারপর দুর্বার বেগে ছুটে গেলেন কুশস্থলের দিকে।

•

কক্ষের বাতায়ন হতে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রভাবতী। যতদূর চোখ যায় ততদূর কলিঙ্গাধিপতি যবনরাজের স্কন্ধাবার। সেই স্কন্ধাবার যেন এক উদগ্রীব অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করছে কুশস্থল নৃপতির প্রত্যুত্তরের। যদি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন যবন রাজের প্রার্থনা তবে মুহূর্তেই চঞ্চল হয়ে উঠবে এই স্কন্ধাবার। হস্তীর বৃংহতিতে, অশ্বের হ্রেষারবে, অস্ত্রের ঝনৃঝনায় মুখরিত হয়ে উঠবে দিগমণ্ডল। তারপর?

—না সে ভয় করে না প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় প্রবেশ করে নিজের জীবনদীপ নির্বাপিত করতে।

ওমনি এক অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করছে প্রভাবতীর হৃদয়ও। কুমার পার্শ্ব কি তাকে উদ্ধার করতে আসবেন না? পিতা প্রসেনজিৎ অশ্বসেনের কাছে দূত প্রেরণ করেছেন সে কথা সে শুনেছে। তবে কেন হচ্ছে তাঁর এত দেরী? এদিকে যে মাসান্ত হতে চলেছে যার মধ্যে প্রত্যুত্তর দিতে তার পিতা যবনরাজের কাছে প্রতিশ্রুত।

ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখতে পায় দূর দিগন্ত রেখায় ধূলি পুঞ্জের ধূসর বর্ণ একখণ্ড মেঘ—সেই মেঘ ক্রমে পরিস্ফুট হয়, বিস্তৃত হয়, আরো নিকটবর্তী হয়। তখন তার মনে হয় এক ধূলিলিপ্ত ঝঞ্ঝা যেন ছুটে আসছে বৈশাখী অপরাহ্নকে আক্রমণ করতে।

কিন্তু এতো দুর্বার বাতাসের ফুলে ফুলে ওঠা আক্রোশ নয়, ঝঞ্ঝার নিঃস্বন, এ যে সম্মিলিত অশ্বক্ষুরধ্বনির সুস্পষ্ট খট খট। তবে কি সত্যিই আসছেন কুমার পার্শ্ব তাকে উদ্ধার করতে? তবে কি সে জীর্ণ পত্রের আবর্জনার মত দূরে নিক্ষেপ করে দিতে পারে তার মিথ্যা দুশ্চিন্তার ভার?

তারপর এক সুখ তন্দ্রায় সে লীন হয়ে যায়।

রাজকুমারী—

ফিরে তাকায় প্রভাবতী। দেখে তার নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিঙ্করী সুবিনীতা।

সুবার্তা নিয়ে এসেছি রাজকুমারী। যবন রাজের স্কন্ধাবার ছিন্ন ভিন্ন করে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন কুমার পার্শ্ব।

আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে প্রভাবতীর চোখ হতে। আবেগে বক্ষলগ্ন করে সুবিনীতাকে। তারপর নিজের কণ্ঠের একাবলী হার তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বলে, সুবার্তার এই নে পুরস্কার।

কুশস্থলের রাজান্তঃপুর। দ্বিপ্রহরের আহারের পর বিশ্রাম সুখ অনুভব করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কুমার পার্শ্ব। সহসা এক কুন্তল সুরভির স্পর্শে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ে নবকাশ সন্নিভ সুশ্বেত ক্ষৌমপট্ট বাসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেঘ চিকুরা এক নারী যার মুখচ্ছবি শশাঙ্কচ্ছবির মতোই সুন্দর। সতৃষ্ণ নয়নে সে তাঁরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন করেন কুমার পার্শ্ব, তুমি কে?

আমি কুশস্থলের রাজকন্যা প্রভাবতী।

প্রভাবতী! বল তুমি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

কি উদ্দেশ্যে? কেমন যেন আহত হয় প্রভাবতীর চোখের দৃষ্টি। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে নিজেকে সংযত করে নেয়। বলে, না, আর কোনো উদ্দেশ্যেই নয়, যাঁর

গুণগাথা কিন্নর কন্যাদের কণ্ঠে, যিনি ভুজ বলে যবন রাজকে পরাজিত করেছেন তাঁকে একবার নিকট হতে দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। তাই তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। নিশ্চুপেই ফিরে যেতাম, যদি না আপনার নিদ্রাভঙ্গ হত। তারপর একটু থেমে বলে, আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি কুমার কিন্তু যাবার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করি।

কি প্রশ্ন বল ?

কুমার, জানতে ইচ্ছে করে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আপনি কি সুস্বপ্ন দেখছিলেন ?

এক মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে কুমার পার্শ্বে'র ওষ্ঠাধরে। বলেন, যে কর্ত'ব্য পালন করতে এসেছিলাম সেই কর্ত'ব্য পালন করতে পেরেছি সেই সুস্বপ্ন।

এইমাত্র, বলে ফিরে যাবার উপক্রম করে প্রভাবতী। আর্ত'নাদের মত বেদনা শিহরিত সেই কণ্ঠস্বর।

কিন্তু শোভনে, তুমি কি স্বপ্ন আশা করেছিলে ?—মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন কুমার পার্শ্ব'।

এক লজ্জাবনত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রভাবতী। বলে, সেকথা থাক কুমার।

কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে।

তবে শুনুন কুমার, যদি প্রগল্ভতা হয় তবে ক্ষমা করবেন।...আমি ভেবেছিলাম যে আপনাকে আত্মদান করেছে, যার উদ্ধারের জন্য আপনি এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন সে যেন আপনাকে বরমাল্য দান করছে। শঙ্খধ্বনি ও মন্ত্ররবের মধ্যে আপনি যেন তাকে চিরকালের প্রিয়া করে নিচ্ছেন।

অদ্ভুত তোমার কল্পনা। কিন্তু তুমি ত জান শোভনে, কোন কুমারীর পাণিগ্রহণ করতে আমি এখানে আসিনি।

জানি, কিন্তু এখন আপনার প্রেমাকাঙ্খিনী এক নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলুন কুমার, পিপাসা জাগে না কি আপনার অধরে ? চঞ্চল হয় না কি বক্ষের নিঃশ্বাস ? এই কুশস্থল বাসিনীর ললাটতিলকে অধর দান করে মদামোদ মধুর বিহ্বলতা বরণ করে নিতে উৎসুক হয় না কি হৃদয় ?

না প্রভাবতী !

নীরবে অবনত শিরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রভাবতী। পূর্ব আকাশের ললাটে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া দেখা দেয়। ক্রমে অন্ধকার নিবিড় হয়।

আপনি ফিরে যান, কুমার। প্রভাবতী চিরকাল আপনারই প্রতীক্ষা করে থাকবে। বলে দ্রুত পদে কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যায় প্রভাবতী।

অতন্দ্রিত সবিতা কালচক্রে ধাবিত হয়, দিবারাত্রি কাল ও কাষ্ঠা রচনা করে। আর

রম্যক বনের উপান্তে এক পর্ণ কুটীরে অমাহতা কৃশ চন্দ্রলেখার মত প্রতিদিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে একব্রতা প্রেমিকা প্রভাবতী। আর ওদিকে গঙ্গাবারির সিত জল কণিকাও শান্ত করতে পারে না পার্শ্বের হৃদয়। উপাসিকা যেমন দূরের দেবতাকে কাছে ডাকে তেমনি এক প্রেমিকা তাঁকে কাছে পাবার জন্য অহরহ ডেকে চলেছে। সেই নিরন্তর আহ্বান তাঁকে কেমন যেন অস্থির করে তোলে। তিনি যেন দেখতে পান রম্যক বনের নিভৃতে নীলাশোকের ছায়ায় দুটি আলিঙ্গনোন্মুখ মৃণাল বাহু তাঁর জীবনের সুখস্বর্গ রচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অনির্বাণ তারকার মত দুই অক্ষি তারকা তাঁর প্রতীক্ষায় যেন নিশি যাপন করছে।

থাকতে পারেন না কুমার পার্শ্ব। অন্তঃপুর পরিত্যাগ করে রথশালার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হন। কুমারের আহ্বান শোনা মাত্র সারথী রথ প্রস্তুত করে নিয়ে আসে। প্রাসাদের সিংহদ্বার অতিক্রম করে নগরদ্বার পার হয়ে সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে রম্যক বনের অভিমুখে পার্শ্বের রথ ছুটে চলে।

প্রভাবতীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হন কুমার পার্শ্ব। দেখেন তপস্বিনীর মত মুদ্রিত নয়না এক নারীর মূর্তি ধ্যানলীনা। দেখে বিস্মিত হন, মুগ্ধ হন।

প্রিয়া প্রভাবতী—আহ্বান করেন পার্শ্ব।

কিন্তু প্রভাবতীর অধর স্ফুরিত হয় না, ভ্রূলতিকা স্পন্দিত হয় না। সুকোমল কপোলে রক্তিমচ্ছটা জাগ্রত হয় না।

পার্শ্ব ব্যাকুল হয়ে আবার আহ্বান করেন, প্রিয়া প্রভাবতী!

কোনো প্রত্যুত্তর আসে না।

প্রভাবতীর আরো নিকটে গিয়ে উপস্থিত হন কুমার পার্শ্ব। তার মঞ্জরী বলয়িত একটি বাহু সাগ্রহে বক্ষে গ্রহণ করেন। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেন, প্রভা, আমার প্রভা, তোমায় আমি চিরকালের প্রিয়া করে নিতে এসেছি।

ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত হয় প্রভাবতীর। শান্ত, নির্বিকার, বেদনাহীন দুটি চোখের দৃষ্টি।

ধীরে ধীরে বলে ওঠে প্রভাবতী, তুমি এসেছ?

আমি এসেছি প্রভাবতী, আমি তোমায় চিরকালের প্রিয়া করে নিলাম।

প্রিয় পার্শ্ব! প্রভাবতীর সকল বাসনার আনন্দ দূরান্তের বেণুধ্বণিত গীতধ্বনির মতই সুস্বরিত হয়।

তারপরই আবার দুই চক্ষু মুদ্রিত করে ধীরে ধীরে বলে ওঠে, ফিরে যাও কুমার, সম্মেত শিখরের গিরিশৃঙ্গ তোমায় আহ্বান করছে। তোমায় আমি মুক্ত করে দিলাম। তারপর একটু থেমে বলে, তোমায় আমি পেয়েছি অন্তরের মধ্যে যেখানে বিচ্ছেদ নেই, বেদনা নেই, হারানো নেই, কেবল পাওয়া আর পাওয়া। আমি তোমায় চিনেছি।

তুমি নিরঞ্জন, তুমি করুণাঘন, তুমি নিখিলেশ, তুমি একনাথ, তুমি আমার, আমি তোমার—

স্তব্ধ হয় প্রভাবতীর কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর মাধুরী স্পর্শে জেগে ওঠে প্রভাত বায়ু, জেগে ওঠে পার্শ্বের হৃদয়। যেন অন্তর হতে উৎসারিত সুমন্ত্রিত এক মন্ত্রস্বর তাঁর হৃদয়কে অভিসিঞ্চিত করে দিয়ে গেল। যে পথের তিনি এতদিন সন্ধান করে ফিরছিলেন সেই পথ সহসা যেন তাঁর চোখের সামনে আলোকিত হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে সেই কুটীর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন পার্শ্ব। তারপর রথের নিকটে গিয়ে একে একে খুলে ফেললেন অঙ্গের আভরণ, অঙ্গদ, কেয়ূর, মুকুট।

সারথী ভীত কণ্ঠে ডাক দেয়, কুমার—

শান্ত স্বরে বলেন পার্শ্ব, কথা বলে না সারথি, এই সব নিয়ে তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও।

প্রশ্নোত্তরে জৈন তত্ত্ব
[পূর্বানুবৃত্তি]

১৯৯ প্রঃ দিগ্‌ব্রত সংজ্ঞক গুণব্রত কিরূপ ?

১৯৯ উঃ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই দশ দিকের যে দিকে যে পর্যন্ত যাতায়াতের প্রয়োজন তদনুসারে সীমা নির্দেশ করিয়া একটী ক্ষেত্র কল্পনা করিবে। অনন্তর যাবজ্জীবন ঐ কল্পিত ক্ষেত্র মধ্যে বাস করা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের অতিরিক্ত স্থানে সাংসারিক কার্যে না যাওয়াকে দিগব্রত সংজ্ঞক গুণব্রত বলে।

২০০ প্রঃ অনর্থ দণ্ড বিরতি গুণব্রত কিরূপ ?

২০০ উঃ যে কর্মদ্বারা ইষ্ট সিদ্ধি হয় না পরন্তু পাপ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কর্মের বিরিতিকে অনর্থ দণ্ড বিরতি সংজ্ঞক গুণব্রত বলে। যথা মিথ্যা উপন্যাস ও বৃথা গল্প না শোনা।

২০১ প্রঃ দেশাবকাশিক বা দেশ বিরতি সংজ্ঞক গুণব্রত কিরূপ ?

২০১ উঃ দিগ্‌বিরতিব্রতাবলম্বী কর্তৃক যাবজ্জীবন পণে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হইতে একটি অধিকতর সঙ্কুচিত স্থান নির্দেশ করিয়া সেই সঙ্কুচিত স্থান মাত্রে দিন, মাস, পক্ষাদি নিজের নিয়মিত কাল পর্যন্ত অবস্থান করাকে দেশবিরতি সংজ্ঞক গুণব্রত বলে।

২০২ প্রঃ অনর্থদণ্ড গুণব্রত কয়প্রকার ?

২০২ উঃ ১) পাপোপদেশ, ২) হিংসাদান, ৩) অপধ্যান, ৪) দুঃশ্রুতি, ৫) প্রমাদচর্যা—এই পাঁচপ্রকার।

১) পাপোপদেশ—তির্য্যগাদি জন্তুর পীড়াজনক উপদেশ ও এইরূপ চৌর্যাদি পাপ কর্মের উপদেশ।

২) হিংসাদান—হিংস ফলক দ্রব্যের (তলোয়ার প্রভৃতি) দান বা বিক্রয়।

৩) অপধ্যান—অন্যের দোষ গ্রহণের ভাব, পরধন গ্রহণেচ্ছা, পরস্ত্রী প্রেক্ষণেচ্ছা, কলহদর্শন প্রীতি, পরের অমঙ্গল বাসনা, ও পরকীয় অপমান, অহিত, অকীর্তি প্রার্থনা ইত্যাদি রূপ।

৪) দুঃশ্রুতি—কাম ক্রোধাদি সঞ্চারক গ্রন্থাদি শ্রবণ, শ্রাবণাদি।

৫) প্রমাদচর্যা—বিনা প্রয়োজনে জলঘাঁটা, মাটি খোঁড়া, ডাল ভাঙ্গা, আগুন জ্বালান, বৃক্ষ কর্তন ইত্যাদি।

২০৩ প্রঃ ভোগোপভোগ পরিমাণ শিক্ষাব্রত কিরূপ ?

২০৩ উঃ যে বস্তু একবার ব্যবহার করিলে নষ্ট হয়, যথা অন্নাদি ভোজ্য, পানীয়, সুগন্ধি দ্রব্যাদির সেবনকে ভোগ বলে ও যাহা অনেকবার ব্যবহার করা যায় এইরূপ বস্ত্র, গৃহ, স্ত্রী, শয্যাসনাদির সেবনকে উপভোগ বলে। এইরূপ ভোগ্য ও উপভোগ্য বস্তু হইতে নিজের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর অতিরিক্ত ভোগ্য ও উপভোগ্য বস্তুর যাবজ্জীবন বা কোন নিয়মিত কাল পর্যন্ত পরিত্যাগ করার নাম ভোগোপভোগ সংজ্ঞক শিক্ষাব্রত।

২০৪ প্রঃ সামায়িক শিক্ষাব্রত কিরূপ ?

২০৪ উঃ সন্ধ্যার দ্বারা সমস্ত পাপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া সম্যগ ভাব অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ আত্মধ্যান নিমগ্ন থাকাকে সামায়িক শিক্ষাব্রত কহে।

২০৫ প্রঃ পোষধোপবাস শিক্ষাব্রত কি প্রকার ?

২০৫ উঃ অষ্টমী চতুর্দশীর দিন সমস্ত (হিংসাভাব) পরিত্যাগ পূর্বক কষায় শূন্য হইয়া চার প্রকার আহার ত্যাগ অর্থাৎ পূর্বদিন ও পরদিনে একবার আহার, অষ্টমী ও চতুর্দশী দিনের দুইবেলার আহার ত্যাগ করিবে ও পূর্বদিনের দুই প্রহর হইতে পরদিন বেলা দুইপ্রহর পর্যন্ত ষোলপ্রহরকাল ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মকথা শ্রবণ, শ্রাবণাদিতে অতিবাহিত করিবে। এইরূপ ক্রিয়াকে পোষধোপবাস সংজ্ঞক 'শিক্ষাব্রত' বলে। (দিনে দুইবার আহার ত্যাগ শব্দে উপবাস অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পান আহার ত্যাগ বুঝিতে হইবে)।[১৯]

২০৬ প্রঃ অতিথি সংবিভাগ শিক্ষাব্রত কি প্রকার ?

২০৬ উঃ মুমুক্ষু সম্যগ্ দর্শন চারিত্রাদিযুক্ত সাধুর নিমিত্ত বিশুদ্ধ চিত্তে আহার ও ঔষধদান আর উপকরণ বাসস্থান শাস্ত্র প্রভৃতি দানের নাম অতিথি সংবিভাগ শিক্ষাব্রত।[২০]

২০৭ প্রঃ সামায়িক প্রতিমার স্বরূপ কি ?

২০৭ উঃ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন কাল এই কালত্রয়ে প্রথমতঃ পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া—'ওঁ নমঃ সিদ্ধেভ্যঃ' এবং ন'বার নমস্কার মন্ত্র পাঠপূর্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ করিবে। পুনরায় দাঁড়াইয়া তিনবার নমস্কার মন্ত্রপাঠ করিবে। ত্রিআবর্তন পূর্বক একবার প্রণাম করিবে। এইরূপ প্রণাম দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এই তিন মুখেও ক্রমশঃ উক্তমন্ত্রে—ত্রিআবর্তন পূর্বক নমস্কার করিবে, পরে দাঁড়াইয়া বা উপবেশন করিয়া সামায়িক পাঠ, ধ্যান, জপ, স্তোত্র, ভাবনাদি দ্বারা সামায়িক কর্মের জন্য নিয়মিত কমপক্ষে এক মুহূর্ত অথবা অন্তর্মুহূর্ত কাল অতিবাহিত করিবে। সমাপ্তি সময়েও দাঁড়াইয়া নয়বার নমস্কার মন্ত্রপাঠ করিয়া দণ্ডবৎ করিবে। এইরূপ ক্রিয়া বিশেষকে সামায়িক প্রতিমা বলে।

১৯ উপরোক্ত ব্রতকে উৎকৃষ্ট বলে। বার প্রহরকে মধ্যম বলে, আট প্রহরকে অধম বলে। ব্রতপ্রতিমা অশক্ত হইলে অষ্টমী ও চতুর্দশীতে একবার মাত্র ভোজন বিধেয়।

২০ উক্ত তিন গুণব্রত ও চার শিক্ষাব্রতকে শীলব্রত কহে।

২০৮ প্রঃ পোষধোপবাস প্রতিমা কি প্রকার ?

২০৮ উঃ প্রত্যেক অষ্টমী ও চতুর্দশীতে নিয়মপূর্বক উত্তম, মধ্যম ও অধম যে কোনরূপ উপবাস করাকে পোষধোপবাস নামক চতুর্থ প্রতিমা বলে।

২০৯ প্রঃ সচিত্ত বিরত প্রতিমার আকার কি ?

২০৯ উঃ সমস্ত অপক্ক, অপ্রাসুক সাক-সব্জী, ফল, মূল, জল প্রভৃতির পরিত্যাগকে সচিত্ত বিরত ত্যাগ নামক পঞ্চম প্রতিমা বলে।[২১]

২১০ প্রঃ রাত্রিভুক্তি ত্যাগ প্রতিমা কিরূপ ?

২১০ উঃ দিবা-মৈথুন ত্যাগ পূর্বক রাত্রিতে ভোজনের নিয়ম বর্জনকে রাত্রিভুক্তি ত্যাগ সংজ্ঞক ষষ্ঠ প্রতিমা বলে।[২২]

২১১ প্রঃ ব্রহ্মচর্য প্রতিমা কিরূপ ?[২৩]

২১১ উঃ যাবজ্জীবন স্ত্রীমাত্রের সংসর্গ ত্যগকে ব্রহ্মচর্য নামক সপ্তম প্রতিমা বলে।

২১২ প্রঃ আরম্ভ ত্যাগ প্রতিমা কাহাকে বলে ?

২১২ উঃ কোনরূপ হিংসা বা হিংসা প্রসঙ্গ হয়—এরূপ কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম পরিবর্জনকে আরম্ভ ত্যাগরূপ অষ্টম প্রতিমা বলে।

২১৩ প্রঃ পরিগ্রহত্যাগ প্রতিমা কিরূপ ?

২১৩ উঃ উচিত ও আবশ্যক বস্ত্র ভিন্ন যাবতীয় পরিগ্রহ ত্যাগ পূর্বক ধর্মোপার্জনকে পরিগ্রহ ত্যাগ সংজ্ঞক নবম প্রতিমা বলে।

২১৪ প্রঃ অনুমতি ত্যাগ প্রতিমা কিরূপ ?

২১৪ উঃ ভোজনাদির নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদির দ্বারা শস্য ও অর্থাগমের আবশ্যকতা এবং রন্ধনাদি ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা—কিন্তু সর্বত্রই হিংসার সম্ভাবনা সুতরাং নিজের নিমিত্ত আহার্য বস্তু প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলে রন্ধনাদির অন্তঃপাতী হিংসারও অনুমোদন করা হয়। এই জন্য গৃহস্থের প্রস্তুত আহারীয় সামগ্রী হইতে তৎকালীন নিমন্ত্রণ দ্বারা ভোজন সমাপন করিয়া গৃহত্যাগ পূর্বক ধর্মশালাদি নির্জন পবিত্র স্থানে অবস্থান করিয়া ধর্মোপার্জনের নাম—অনুমতি ত্যাগ সংজ্ঞক দশম প্রতিমা বলে।[২৪]

২১ যে দ্রব্য শুষ্ক হয়, অথবা পক্ক হয়, গরম ও অম্ল-লবণাদি কষায় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় এবং যন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয়, তাহাকে প্রাসুক বলে এবং উক্ত দ্রব্য জলাদি গ্রহণযোগ্য।

২২ অথবা স্বয়ং না খায় ও অপরকে না খাওয়ায় এবং অনুমোদন না করে।

২৩ "ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভ :" (পাতঞ্জল দর্শন)। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য বা ওজঃ শক্তি লাভ হয় এবং সকল ইন্দ্রিয়ে নির্মলতা বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মচর্য শব্দের মতান্তরে অর্থ আট প্রকার স্ত্রী সম্বন্ধ ত্যাগ করা। "ব্রহ্মচর্যমহিংসায়াং শরীরতপ উচ্যতে" (গীতা)। ব্রহ্মচর্য ও অহিংসাকে শারীরিক তপ বলে।

২৪ পুত্র পৌত্রাদিকে গৃহস্থালীতে রত থাকিতে অনুমতি প্রদান না করা।

২১৫ প্রঃ উদ্দিষ্টাহার ত্যাগ প্রতিমা কাহাকে কহে ?

২১৫ উঃ গৃহত্যাগ পূর্বক কাহারও নিমন্ত্রণ না লইয়া গৃহস্থের পরিপক্ক অন্ন আদি মাত্র গ্রহণ করা কিন্তু যদি ঐ অন্ন আহারই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা কল্পিত হয়, অথবা বিশুদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাদৃশ অন্নাদি গ্রহণ না করা এইরূপ উদ্দিষ্টাহার ত্যাগ পূর্বক দীক্ষিত হইয়া ধর্মার্জনকে উদ্দিষ্টাহার ত্যাগ নামক একাদশ প্রতিমা বলে।

২১৬ প্রঃ শ্রাবক কত প্রকার ?

২১৬ উঃ ব্রত চরিত্রযুক্ত সম্যক দৃষ্টিকে শ্রাবক বলে। শ্রাবক তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম, অধম। প্রথমাবধি ষষ্ঠ প্রতিমাধারী শ্রাবক অধম। সপ্তম হইতে নবম প্রতিমাধারী শ্রাবক মধ্যম। দশম হইতে একাদশ প্রতিমাধারী শ্রাবক উত্তম।[১৫] উত্তম শ্রাবক দুই প্রকার—ক্ষুল্লক, অহিলক।

২১৭ প্রঃ একাদশ প্রতিমা পর্যন্ত ধারীর কি কি গুণ উপার্জিত হয় ?

২১৭ উঃ একাদশ প্রতিমা পর্যন্ত ধারী পঞ্চম গুণস্থানবর্তীর অপ্রত্যাখ্যান কর্ম (তীব্র পরিণামী)—ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ উপশমিত থাকে ও প্রত্যাখ্যান কর্মের (মদপরিণামী কষায়ের) উদয়ও অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায় ইহাকে দেশব্রত গুণস্থানী কহে।

২১৮ প্রঃ প্রমত্ত সংজ্ঞাবিধেয় ষষ্ঠ গুণস্থান কিরূপ ?

২১৮ উঃ প্রত্যাখ্যান কর্মের উপশম হইলেও মন্দতর পরিণামী কষায়রূপ সংজ্বলন কর্মের এবং নববিধ অকষায়ের তীব্র রূপ উদয় থাকিলে প্রমত্ত সংযতরূপ ষষ্ঠ গুণস্থান হইয়া থাকে, ইহাকে প্রমত্ত বিরত কহে।

২১৯ প্রঃ অপ্রমত্ত সংযত সংজ্ঞক সপ্তম গুণস্থানবর্তী কিরূপ ?

২১৯ উঃ যে সময় মুনি গুপ্তি সমিতি দশবিধ ধর্ম প্রভৃতি পালন পূর্বক সংযত ভাবে জ্ঞানার্জন তপস্যাদিতে মগ্ন থাকেন ও শারীরিক মমতা শূন্য হওয়ায় ধ্যান অবস্থা লাভ করেন তখন তাঁহাকে অপ্রমত্ত সংযত সংজ্ঞক সপ্তম গুণস্থানবর্তী বলে। পঞ্চম হইতে সপ্তম গুণস্থান হইলেই মুনি সংজ্ঞা লাভ হয়।[২৬] এই অবস্থায় মুনি কণ্টকোদ্ধার ব্যাধির উপশম, রত্ন সোণ্ড্রভেদজ্ঞানাদি করেন না। সপ্তম গুণস্থানবর্তীর সংজ্বলন কর্ম ও নববিধ অকষায়ের উদয় মান্দ্যভাব অবলম্বন করে, সুতরাং এই অবস্থায় প্রমাদ উৎপন্ন হইতে পারে না, মুনিগণ পঞ্চ মহাব্রতের অনুষ্ঠাতা হয়েন। উপশমাদি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কষায় পর্যন্ত বিরোহিত হইলে মহাব্রতানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

২২০ প্রঃ অপূর্বকরণ গুণস্থানবর্তী কাহাকে কহে ?

২২০ উঃ অষ্টম গুণস্থানবর্তীর কষায় আরও সূক্ষ্ম হইয়া যায়। এই অবস্থায় দর্শন

২৫ পরন্ত প্রত্যেক শ্রাবক আপনার হইতে নিম্ন প্রতিমার চারিত্রকে ত্যাগ করে না।

মোহনীয়ের সম্যক্ত্বাদি তিন প্রকৃতির সম্পূর্ণরূপে উপশম অথবা ক্ষয় হইয়া থাকে ও চরিত্র মোহনীয় কর্মের পঁচিশ প্রকৃতির মধ্যে প্রায় একুশ প্রকৃতির উপশম আরম্ভ হয়।

২২১ প্রঃ অনিবৃত্তকরণ গুণস্থানবর্তী কিরূপ ?

২২১ উঃ নবম গুণস্থানবর্তীর কষায়াদি এরূপ উপশম বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যে জীব নিজে কষায়ের উদয় উপলব্ধি করিতে পারে না। এই অবস্থায় মুনির অষ্টম গুণস্থানের ক্রিয়াই বিশুদ্ধতা লাভ করে, এবং পরিণাম পূর্বাপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ হয়। সূক্ষ্ম লোভ ছাড়া সর্বকষায়কে উপশম ক্ষয় করে।

২২২ প্রঃ সূক্ষ্ম সাম্পরায় নামক দশম গুণস্থানবর্তী কিরূপ ?

২২২ উঃ দশম গুণস্থানবর্তীর চরমাবস্থায় মোহনীয় কর্মের অবশেষ সূক্ষ্ম লোভের উপশম বা ক্ষয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় চরিত্র মোহনীয় কর্মের ক্ষয় হইলে যথাখ্যাত চারিত্র লাভ হয়। তখন জীব এই দশম গুণস্থান হইতে দ্বাদশ গুণস্থানে যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ, দংশ, মশক, চর্যা, বধ, অলাভ, রোগ, তৃণস্পর্শ, মল, প্রজ্ঞা, অজ্ঞান, এই চতুর্দশ পরিষহের বিষয়—দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গুণস্থানবর্তীর হইয়া থাকে ; পরন্তু ধ্যানাবস্থায় নিমগ্ন হইলে প্রকট হয় না। অপর—নগ্নতা, অরতি, স্ত্রী, নিষদ্যা, আক্রোশ, যাতনা, অদর্শন ও সৎকার-পুরস্কার এই আটটী পরিষহের জয়লাভ হইয়া থাকে। এই গুণস্থানে কষায় সূক্ষ্মবস্থা লাভ করিয়া অবশেষে ক্ষয় বা উপশম প্রাপ্ত হয়।

[ক্রমশঃ

২৩ পুনরায় সপ্তম হইতে ষষ্ঠে গমন করে, এই প্রকারে কাল অবস্থায় সপ্তম ও প্রবৃত্তি অবস্থায় ষষ্ঠ হইতে থাকে। এই মুনি বস্ত্রাদি পরিগ্রহ রহিত দিগম্বর হয়েন।

ধূর্তাখ্যান

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ শেষ কথা ॥

ধূর্তাখ্যান রচয়িতা হরিভদ্রসূরী প্রথম জীবনে চিত্রকূট বা চিতোরের রাজার পুরোহিত ছিলেন। শুধু পুরোহিতই নয়, ছিলেন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ও অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন। এজন্য 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' বলে তাঁকে অভিহিত করা হত। এই পাণ্ডিত্যের গর্বও যে তাঁর না ছিল তা নয়। কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারে এ ছিল তাঁর ধারণার অতীত। তিনি তাই উদ্ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁকে পরাস্ত করবে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। কিন্তু এত দুঃসাহস কারু ছিল না যে বাদে তাঁকে কেউ পরাস্ত করতে আসে। তারপর একদিন দৈবাৎই তিনি যখন শিবিকায় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পথ পার্শ্বস্থ এক উপাশ্রয় হতে সাধ্বীদের কণ্ঠোচ্চারিত এক শ্লোক শুনতে পান। সেই শ্লোকের অর্থ বোধগম্য না হওয়ায় তিনি শিবিকা হতে অবতরণ করে সাধ্বীদের নিকট যান ও তার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। সাধ্বীরা হরিভদ্রসূরীকে বলেন যে সে অধিকার তাঁদের নেই। এর অর্থ তাঁকে তাঁদের গুরু শ্রীজিনভট্র সূরীর কাছে বুঝতে হবে। হরিভদ্রসূরী তখন জিনভট্র সূরীর কাছে যান ও জিনভট্রসূরী তাঁকে সেই শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দেন। হরিভদ্রসূরীর জ্ঞানের অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ায় তিনি জিনভট্রসূরীর কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। হরিভদ্রসূরীর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সেই হতে শ্রমণ সাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রসারে নিয়োজিত হল। তিনি যে কেবল আগমাদি গ্রন্থের টীকা রচনা করে ছিলেন তাই নয় সমরাদিত্য কথার মত রোচক উপন্যাসধর্মী সাহিত্যও সৃষ্টি করেছিলেন।

হরিভদ্র সূরীর ধূর্তাখ্যান একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। এর হাস্য ও অদ্ভুত রস ছাড়াও এর মধ্যে নিহত রয়েছে এক পরিচ্ছন্ন বিদ্রূপ বা বক্রোক্তি যা মানুষের মোহান্ধতাকে তীব্র কশাঘাত করে সত্যের প্রতি উন্মুখ করে তোলে। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আদি যে কোনো গ্রন্থের দিকে আমরা তাকাই না কেন তা এই ধরণের অসম্ভব কাহিনী ও অসামঞ্জস্যে ভরা। কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের অবিশ্বাস এই জন্যই জাগ্রত হয় না কারণ সেগুলি ধর্মগ্রন্থ। এও মোহ। নইলে সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে একটি অণ্ডের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমাহিত ছিল কি করে আমরা বিশ্বাস করি। সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে জৈনমত অনেক বেশী যুক্তিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত। জৈনমতে সৃষ্টি অনাদি, কেউ করেন নি। চিরকাল ছিল, চিরকাল রইবে। এবং সৃষ্টি তত্বের মতো সৃষ্টির উপাদান জীব ও

অজীব—চেতন ও জড়, সেও অনাদি। হয়ত এই কাহিনী রচনার মূলে হরিভদ্র সূরীর মনে এমনো একটা ভাব বিদ্যমান ছিল যে এ হতেই প্রমাণিত হবে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ। অসম্ভব গল্প ভরা ধর্ম, না যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম? সে যাই হোক ধূর্তাখ্যানের tall talks জাতীয় গল্প হয়ত অনেক লেখা হয়েছে, এখানে *Folk-tales of Hindusthan* বা *Adventures of Baron Von Manchausan* কি *Alice in Wonderland*-এর উল্লেখ করা যেতে পারে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত শ্লেষ যে কোনো যুগের যে কোন স্থানের মানুষকে ভাবিত করবে। Jonathan Swift-এর *Guliver's Travels* বা দণ্ডীর দশকুমার চরিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্রূপ আছে কিন্তু এই ধরণের হাস্য ও অদ্ভুত রসের মাধ্যমে তার প্রস্তুতি করণ সেকালে কেন একালেও দুর্লভ।

ধূর্তাখ্যান প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। হরিভদ্রসূরীর সময় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী।

মৃগাবতী

প্রথম দৃশ্য

[মালবপতি প্রদ্যোতের প্রমোদোদ্যান। প্রদ্যোতের জন্মদিন উপলক্ষে সকলে উৎসবরত। নর্তকীরা নৃত্য করে চলে যাচ্ছে। জনতা তাই উৎসুক হয়ে দেখছে। জনতা হতে এক ব্যক্তি এক নর্তকীর উত্তরীয় ধরে আকর্ষণ করে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করছে। অন্য নর্তকীরা চলে যাচ্ছে। জনতাও]

জয়ন্ত : মালতী ?

মালতী : কে ?

জয়ন্ত : কি চিনতে পারছ না আমাকে ? অনেক দিনের কথা—না চিনতে পারাই স্বাভাবিক।

মালতী : না না চিনতে পারব না কেন ? কিন্তু তুমি এখানে ? আমি ভাবতেই পারিনি। তুমি না কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদ চিত্রিত করছিলে ?

জয়ন্ত : হাঁ করছিলাম। আর এই তার পুরস্কার [ডান হাতের কাটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে]

মালতী : [চীৎকার করে] হায় ! হায় ! তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুল কে কেটে নিল ? এ না থাকার অর্থ—

জয়ন্ত : অর্থত অনেক কিছু। কিন্তু না, আমি পঙ্গু হয়ে যাই নি। কিন্তু···কিন্তু আমি প্রতিশোধ নেবার জ্বালায় জ্বলছি। [চোখ জ্বলে ওঠে] মালতী, তুমি আমায় সাহায্য করতে পার ?

মালতী : জয়ন্ত, আমি কি ভাবে তোমায় সাহায্য করতে পারি তার কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি চাও ?

জয়ন্ত : আমি কি চাই···চল ওই গাছের নীচে বসি। তোমায় সব কথা খুলে বলি তা হলেই বুঝতে পারবে আমি কি চাই। কিন্তু দেখ, আমি কি স্বার্থপর ; তোমার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি।

মালতী : আমার আবার কথা। আমরা স্রোতে ভাসা ফুল। কখনো এ ঘাটে কখনো ও ঘাটে। চোখের সামনে স্বামীকে হত্যা করে ডাকাতেরা আমায় ধরে নিয়ে গেল। তারপর বিক্রী করে দিল পাটলীপুত্রের এক রূপজীবার কাছে। তোমার উপকারের কথা কখনো ভুলব না শিল্পী, তুমি আমায় সাহায্য করেছিলে সেখান হতে পালিয়ে যেতে।

জয়ন্ত : সেকথা কেন বলছ মালতী, পরস্পরকে সাহায্য করা কি আমাদের কর্তব্য নয় ? ...মাঝে মাঝে তোমার জন্য মন কেমন হয়ে যায় ।

মালতী : সত্যি বলছ শিল্পী !

জয়ন্ত : সত্যি । কিন্তু একি তোমার চোখে জল ।

মালতী : ও কিছু নয় শিল্পী ! হৃদয় বলেত আর আমাদের কিছু নেই ।

জয়ন্ত : [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে] এবার তোমার কথা বল । পাটলীপুত্র হতে পালিয়ে তুমি কোথায় গেলে ?

মালতী : সে কথা জিজ্ঞাসা করো না শিল্পী । জীবিকার জন্য এক নটের দলে যোগ দিলাম । ওদের সঙ্গেই তারপর হতে ঘুরে বেড়াচ্ছি । কখনো কোশল ত কখনো পাঞ্চাল, কখনো মগধ ত কখনো বৎস । কৌশাম্বীতে শুনেছিলাম তুমি রাজপ্রাসাদ চিত্রিত করছ ।

জয়ন্ত : মালতী, এখানে এসেছ কত দিন ?

মালতী : এক মাসের কিছু বেশীই । আমরা চলে যেতাম কিন্তু মালবপতির জন্মদিন সন্নিকট বলে আমাদের আটকে রাখা হল ।

জয়ন্ত : তুমি থাক কোথায় ?

মালতী : প্রাসাদেই ।

জয়ন্ত : প্রাসাদে । তবে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে তোমার নিশ্চয় পরিচয় আছে ।

মালতী : তা আছে ।

জয়ন্ত : তা হলে তুমি পারবে । [কাপড় হতে ছবি বার করে] তুমি কি এই ছবি মালবপতিকে পৌঁছে দিতে পার ?

মালতী : [ছবি হাতে নিয়ে] কেন পারব না ? কিন্তু এ ছবি কার ?

জয়ন্ত : সে আজ বলব না । কিন্তু তুমি কি আমার মালবপতির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পার ?

মালতী : চেষ্টা করব । কিন্তু তুমি প্রতিশোধের কি কথা বলছিলে ?

জয়ন্ত : সে আজ থাক ।

মালতী : তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের বিষয়ে—

জয়ন্ত : সেও আর একদিন বলব ।

মালতী : বুঝেছি । তুমি ভাগ্যের অন্বেষণে এসেছ না ?

জয়ন্ত : হাঁ । তা হলে আমি তোমার জন্য এখানে প্রতীক্ষা করি ।

মালতী : সে ত করতেই হবে । তাহলে আমি চলি ।

[মালতী চলে যাচ্ছে । জয়ন্ত তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকছে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রদ্যোতের প্রমোদ কক্ষ। অর্দ্ধশায়িত প্রদ্যোত মদিরা পান করছে। নুপূরের ঝুণঝুণ শোনা যাচ্ছে। দেহ রক্ষিণীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে বয়স্য কপিঞ্জল বসে আছে]

কপিঞ্জল : মহারাজ !

প্রদ্যোত : [মাথা তুলে] কি বল ?

কপিঞ্জল : আর পান করবেন না। অনেক পান করেছেন।

প্রদ্যোত : তুমি কি পাগল হয়ে গেলে কপিঞ্জল। আমি প্রদ্যোত···আর পান করব না। তুমি কি জানো না মদিরা পানে প্রদ্যোতের চেতনা কখনো লুপ্ত হয় না। যত সহজে এই পান পাত্র ধরে আছি তত সহজেই আমি এখনো খড়্গ ধরতে পারি। [খড়্গ তুলে শূন্যে সঞ্চালন করছেন]

কপিঞ্জল : থাক থাক মহারাজ ! আপনার এই খড়্গ দেখলে আমার হৃৎকম্প হয়।

প্রদ্যোত : তুমি প্রদ্যোতের বয়স্য হবার উপযুক্ত নও। গিয়ে ক্ষপণক হয়ে যাও। [পিঠে হালকা চাপড়]

কপিঞ্জল : আপনার খড়্গ ত দূর, এই মুষ্টি প্রহারও বা কি কম ? ব্রাহ্মণীর বৈধব্য যোগ ছিল না তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।

প্রদ্যোত : [হেসে] তুমি বেশ বলেছ ! ব্রাহ্মণীর ভাগ্যে বেঁচে গেলে।

কপিঞ্জল : ওর ভাগ্যেইত বেঁচে আছি। নইলে···

প্রদ্যোত : নইলে কি ?

কপিঞ্জল : কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম।

প্রদ্যোত : কেন ?

কপিঞ্জল : কেন আর কি ? আপনি কি কখনো রাজধানীতে থাকেন ? হয় যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নয়ত বনে শিকারের পেছনে।

প্রদ্যোত : বাঃ কপিঞ্জল বাঃ ! কি কথাই না শোনালে তুমি। আমি খুব খুসী হয়েছি তোমার ওপর। নাও, তুমিও খাও। [পানপাত্র এগিয়ে দিচ্ছেন]

কপিঞ্জল : না না আমি খাই না।

প্রদ্যোত : খাওনা, কেন খাওনা ? না খেলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক আনন্দ হতে তুমি বঞ্চিত থাকবে। তবে আমিই খাই। [পান]

কপিঞ্জল : এ নিয়ে কত পাত্র হল মহারাজ ?

প্রদ্যোত : প্রদ্যোত কখনো গুনে পান করে না।

কপিঞ্জল : পুরো পঞ্চাশ।

প্রদ্যোত : তাহলে তুমি গুনতেও জান দেখছি।

কপিঞ্জল : আমার গৃহদাস এক পণ্ডিতের ওখানে চাকরী করত কিনা তাই—

প্রদ্যোত : এও তুমি বেশ বলেছ। এর জন্য এক পাত্র আর পান করি।
[প্রতিহারিণী চিত্র নিয়ে আসছে]

প্রতিহারিণী : মহারাজ! দূরাগত এক শিল্পী আপনার জন্মদিনে এই চিত্র আপনাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করছে।

প্রদ্যোত : [চিত্র হাতে নিয়ে] বাঃ! অপূর্ব! অবিশ্বসনীয়! বয়স্য, দেখত এই সুন্দরী বিধাতার সৃষ্টি না শিল্পীর কল্পনা?

কপিঞ্জল : [চিত্র হাতে নিয়ে] মহারাজ! কপিঞ্জলও আজ বিভ্রান্ত।

প্রদ্যোত : বেশ বলেছ—কপিঞ্জলও আজ বিভ্রান্ত! [প্রতিহারিণীর প্রতি] যাও, শিল্পীকে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। [প্রতিহারিণী প্রণাম করে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রদ্যোত কপিঞ্জলের প্রতি তাকিয়ে] কি বল কপিঞ্জল, এই সৌন্দর্য, এই রূপ অধিগত করতে কি সমস্ত শক্তি সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়োগ করা যায় না?

কপিঞ্জল : যায় মহারাজ।

প্রদ্যোত : তুমি কি এমন রমণীরত্ন এর পূর্বে কখনো দেখেছ?

কপিঞ্জল : না মহারাজ।

প্রদ্যোত : এ সত্যি কি মানবী?

কপিঞ্জল : না মহারাজ

প্রদ্যোত : কি বললে—
[এর মধ্যে প্রতিহারিণী প্রবেশ করছে]

প্রতিহারিণী : মহারাজ! শিল্পী বাইরে অপেক্ষা করছে।

প্রদ্যোত : ওকে ভেতরে নিয়ে এস।
[প্রতিহারিণী বাইরে গিয়ে—শিল্পীকে নিয়ে ফিরে আসছে। শিল্পী প্রণাম করে রাজার সম্মুখে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিহারিণী প্রণাম করে বাইরে চলে যাচ্ছে]

প্রদ্যোত : এই চিত্র কে এঁকেছে?

জয়ন্ত : এই দাস, মহারাজ।

প্রদ্যোত : তুমি? তুমি দক্ষ শিল্পী আর তোমার কল্পনাও অদ্ভুত।

জয়ন্ত : মহারাজ, এ কল্পনা নয়।

প্রদ্যোত : কল্পনা নয়? তবে কি এই ছবি কোনো মানবীর?

জয়ন্ত : হাঁ মহারাজ।

প্রদ্যোত : মানবীতে এত রূপ! এত সাক্ষাৎ রতি! বল চিত্রকার, কে এই অলোক-সামান্যা রূপসী?

জয়ন্ত : [দেহরক্ষিকাদের দিকে চেয়ে] মহারাজ !

প্রদ্যোত : বল। এই সব সুন্দরীদের কাছে আমার কিছু গোপন নেই। আমি এদের চোখে দেখি এদের কানে শুনি।

জয়ন্ত : এই দাসের দুঃসাহস ক্ষমা করবেন মহারাজ। এই চিত্র কৌশাম্বীপতি মহারাজ শতানীকের অগ্রমহিষী রাণী মৃগাবতীর।

প্রদ্যোত : রাণী মৃগাবতীর ? অসম্ভব ! শিল্পী, যে দক্ষতার সঙ্গে এই নারীর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তুমি ফুটিয়ে তুলেছ তাতে মনে হয় তুমি একে খুব নিকট হতে দেখেছ। কিন্তু কৌশাম্বীপতির প্রাসাদে প্রবেশ ও তাঁর বল্লভাকে এত নিকট হতে দেখা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। সত্য বল এই চিত্র কার ? আর তুমি কে ?…গুপ্তচর ? জানো গুপ্তচরের কি সাজা ?

জয়ন্ত : জানি মহারাজ। কিন্তু আমি আপনাকে সত্যি বলছি, আমি কোনো গুপ্তচর নই।

প্রদ্যোত : গুপ্তচর নও তবে রাণী মৃগাবতীর এই চিত্র নিয়ে তোমার এখানে আসার কি উদ্দেশ্য ?

জয়ন্ত : মহারাজ, যদি অভয় দেন ত সমস্ত কথা খুলে বলি।

প্রদ্যোত : বল।

জয়ন্ত : মহারাজ ! আজ হতে ঠিক এক বছর আগে মহারাজ শতানীক তাঁর প্রাসাদের রঙ্গমণ্ডপ চিত্রিত করবার জন্য আমাকে নিয়োজিত করেন। সেখানে কাজ করবার সময় একদিন নিকটবর্তী এক কক্ষের সামান্য ছিদ্রপথে এক সুন্দরীর তিনটি আঙুল আমি দেখতে পাই। সেই আঙুল হতে সেই সুন্দরীর পূর্ণাবয়ব চিত্র আমি সেই রঙ্গ মণ্ডপে চিত্রিত করি। সেদিন কি জানি সেই সুন্দরী রাণী মৃগাবতী ! সেদিন জানলাম যেদিন শতানীক রঙ্গ মণ্ডপ দেখতে এলেন।

প্রদ্যোত : তুমি অসম্ভব কথা বলছ শিল্পী ! কোনো এক অবয়ব দেখে কি তার পূর্ণাবয়ব ছবি আঁকা সম্ভব ?

জয়ন্ত : সামান্যভাবে সম্ভব নয় মহারাজ। কিন্তু অযোধ্যায় থাকা কালে অযোধ্যাস্থিত এক যক্ষের উপাসনা করে এই বিশেষ ক্ষমতা আমি লাভ করি। সেই কথাই সেদিন বললাম ক্রুদ্ধ শতানীককে এবং তিনি আমার কথার সত্যতার পরীক্ষাও নিলেন। কিন্তু কোথায় তার জন্য আমায় পুরস্কৃত করবেন তা না করে তিনি আমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়ে বিদায় দিলেন যাতে এই চিত্র আমি আর না আঁকতে পারি।

প্রদ্যোত : তবে এই চিত্র তুমি কি করে আঁকলে ?

জয়ন্ত : মহারাজ ! সেই কথাই আমি এখন আপনাকে বলছি। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হারিয়ে আমি যে শুধু ব্যথিত হলাম তাই নয়, এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার এক তীব্র বাসনা আমার হৃদয়ে প্রজ্জলিত হয়ে উঠল। কিন্তু আমি সামান্য চিত্রকার, তিনি কৌশাম্বীর অধিপতি। আমি কিভবে তাঁর ক্ষতি করতে পারি ! কিন্তু সহসা আমার মাথায় এক চিন্তা খেলে গেল। আমি সেখান হতে আবার অযোধ্যা গেলাম ও যক্ষকে প্রসন্ন করে বাঁ হাতে চিত্র অ'াকবার ক্ষমতা লাভ করলাম। তারই পরিণাম এই চিত্র যা আপনাকে দিতে নিয়ে এসেছি।

প্রদ্যোত : কিন্তু আমাকে কেন ?

জয়ন্ত : এইজন্য যে আপনি সাহসী ও নারী সৌন্দর্যের উপাসক। আপনার প্রাসাদ বিভিন্ন দেশের সুন্দরীতে পূর্ণ। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের যে পরাকাষ্ঠা তার অভাব হয়ত আপনাকে পীড়া দিতে পারে।

প্রদ্যোত : শিল্পী !

জয়ন্ত : আমার দুঃসাহস ক্ষমা করুন মহারাজ !

প্রদ্যোত : [চিত্রের দিকে তাকিয়ে] আচ্ছা তুমি যেতে পার। প্রতিহারিণী ! [প্রতিহারিণীর প্রবেশ] একে কোষাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাও ও দশ লক্ষ কার্ষাপণ পারিশ্রমিক দিতে বল।

জয়ন্ত : ক্ষমা করবেন মহারাজ ! আমি এই পারিশ্রমিক নিতে পারি না। প্রতিশোধই আমার পারিশ্রমিক। [চিত্রকার বাইরে আসছে]

[কক্ষের বহির্ভাগ]

মালতী : চিত্রকার, এ তুমি কি করলে ?

জয়ন্ত : ও···তাহলে তুমি সব কিছু শুনেছ।

মালতী : শুনেছি। শতানীক তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছেন তা ঠিক কিন্তু তুমি তার প্রতিশোধ নেবে মৃগাবতীর জীবন লাঞ্ছিত করে ? যদি এসব আমি আগে জানতাম তবে তোমায় সাহায্য করতাম না।

জয়ন্ত : [ভেবে] তুমি ঠিকই বলছ মালতী, কিন্তু প্রতিশোধের জ্বালা আমাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তাই অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখন পাশা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

মালতী : ছিঃ !

[ক্রমশঃ

মন্দিরের পথ

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

স্বাগত জানায় মোরে বার বার
মন্দিরের পথ—
যেখানে স্বপ্নটুকু অবাধ মেঘের মত
ভেসে চলে।
এ পথ চলেছে দূর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে
কাঁটা গাছের সারি পেরিয়ে,
আর আমার শপথ
ভাবনার উত্তরীয় প্রাচীন দুকূল।
উপনীত হই যদি যাত্রা-শেষে
মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে সেথা
পাব কি অঙ্গনে মোর আকাঙ্খিত ধন?
তৃষ্ণামুক্ত কুঞ্জশাখে ফুটিবে কি ফুল?
বর্ণগুলি যেথা শুধু আনন্দের গান—
স্বাগত জানায় মোরে অন্তরঙ্গ প্রহরগুলিতে
কারুধন্য মন্দির-প্রাচীর
খোদিত আলেখ্যাবলী যেথা স্থির
যুগান্তর হ'তে;
কিন্তু আমার হৃদয় সে যে
সন্ন্যাসীর রথে
হ'তে চায় রাজপুত্র অশ্রুসিক্ত কাহিনীর মত।
সত্য সব না আছে সংশয়
তবু এই দেবালয় আমারি অন্তরে—
অরণ্য ও প্রান্তরে যে সঙ্গীত ওঠে অনুচ্চারে
কেবলীর সুরধুনী, অর্হৎ-এর জয়।

জৈন শাস্ত্রে প্রেততত্ত্ব

পূরণ চাঁদ সামসুখা

প্রেত তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই বর্তমান। অধুনা পাশ্চাত্য দেশেও প্রেততত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হইতেছে ও আমাদের দেশেও এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা কিয়ৎ পরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে। সাময়িক পত্রাদিতেও এবিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল প্রবন্ধাদি ইংরাজী শিক্ষিত মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ভারতে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে পুরাকালে যে সকল গবেষণা ও সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে জৈন শাস্ত্রে লিখিত প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিবরণের কিছু অংশ বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার প্রয়াস করা যাইতেছে। আশা করা যায় যে এই পুরাতন বিবরণের দ্বারা আধুনিক প্রেততত্ত্বের কতক অংশে আলোকপাত করা যাইতে পারিবে।

প্রেত তত্ত্বের আলোচনার পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব ও পুনর্জন্ম স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া বর্তমানে যাহাকে খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলে, তাহার আশ্রয় লইতে গেলে আত্মার অস্তিত্ব অনস্তিত্বেই পরিণত হইয়া পড়িবে। পুরাকালেও আত্মায় অবিশ্বাসী একদল দার্শনিক ছিলেন। তাঁহারা প্রমাণ করিতেন যে পঞ্চভূতের সমবায়ে একটি শক্তি উৎপন্ন হয় যাহা জীবিত কাল পর্যন্ত শরীরকে পরিচালিত করে কিন্তু দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিরও বিনাশ হয়। যাহা হউক বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আত্মার অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিয়াই অগ্রসর হইব।

জৈন শাস্ত্রে প্রত্যেক জীবের আত্মাকে পৃথক, অবিনাশী, জন্মজন্মান্তরে পরিভ্রমণশীল ও সংসার ভ্রমণের অন্তে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবার স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা হয়। পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে জীব এক জন্ম হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া পরবর্তী জন্মে কোথায় উৎপন্ন হয় তাহা বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব মৃত্যুর পর যে যে গতিতে জীব জন্মগ্রহণ করিতে পারে তাহা আলোচিত হইতেছে।

জৈন শাস্ত্রমতে এইরূপ গতি চারি প্রকার: দেবগতি, মনুষ্যগতি, তির্যকগতি ও নরকগতি। মৃত্যুর পর এই চারিপ্রকার গতির মধ্যে কোন একপ্রকার গতিতে জীবকে উৎপন্ন হইতেই হইবে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে আত্মা তাহার কার্মণ শরীর (যাহাকে অন্য শাস্ত্রে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়) সহ এক দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ—অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই—উপরে লিখিত চারিপ্রকার যোনির মধ্যে কোন

এক প্রকার যোনিতে উৎপন্ন হইয়া সেই যোনির উপযুক্ত শরীর ক্রমশ: নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। জন্ম মরণশীল আত্মা পূর্বোক্ত চারিপ্রকার যোনির উপযুক্ত শরীরের মধ্যে যে কোন এক প্রকার শরীর ধারণ না করিয়া মাত্র কার্মণ বা লিঙ্গ শরীরযুক্ত অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। কোনও প্রকার শরীর ধারণ না করিয়া অশরীরী অবস্থায় যখন মৃত আত্মা থাকিতে পারে না তখন প্রেতদিগকে (spirits) যে অশরীরী বলা হয় তাহা ঠিক নয়। তাহারা অশরীরী নয়, কিন্তু শরীরধারী, তবে তাহাদের শরীর আমাদের শরীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার উপাদানে প্রস্তুত। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

যে চারিপ্রকার গতির কথা লিখিত হইল তাহাতে বাহ্য শরীর দুই প্রকারের হয়। এই দুই প্রকারের মধ্যে জীবকে এক প্রকার শরীর ধারণ করিতেই হয়। এই দুই শরীরকে ঔদারিক ও বৈক্রিয় শরীর বলে। মনুষ্য ও তির্যক গতিতে উৎপন্ন জীবের শরীরকে জৈনশাস্ত্রে ঔদারিক শরীর বলে। এই শরীর অস্থি, রস, রক্ত, মাংসের দ্বারা নির্মিত ও ইহাকে ছেদন, বেধন, দাহন করা যাইতে পারে। যেমন, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতাদির শরীর। দেব ও নারক গতিতে উৎপন্ন জীবের শরীরকে বৈক্রিয় শরীর বলে। এই শরীরকে সংকোচ, বিস্তার, রূপান্তর, বহুরূপে পরিবর্তন ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকার সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ইহা আমাদের শরীরের ন্যায় অস্থি, রক্ত, মাংসাদির দ্বারা নির্মিত নয় ও ইহাকে ছেদন, বেধন, দাহনাদি করিতে পারা যায় না। যে প্রকার জড় পদার্থের দ্বারা আমাদের শরীর নির্মিত তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার জড় পদার্থের সংযোগে বৈক্রিয় শরীর নির্মিত। আমাদের এখানকার কোন পদার্থ দেবগণের গমনাগমনে বাধা প্রদান করিতে পারে না। যাহাদিগকে প্রেত বা অশরীরী আত্মা বলা হয় বাস্তবিক পক্ষে তাহারা দেব পর্যায়ের বৈক্রিয় শরীরধারী জীবন মাত্র। মানুষ, তীর্যক, দেব বা নারক যে কোন প্রাণীর তাহার বর্তমান জীবনের যে কোন সময়ে বা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পরজন্মে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে তাহার স্বকৃত কর্মের ফলানুযায়ী স্থিরীকৃত হইয়া তাহার আয়ুর বন্ধ হয় এবং মৃত্যুর পর সেই যোনিতে গিয়া তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতেই হয়। মনুষ্য মরিয়া নিজের কর্মের ফলানুযায়ী চারি প্রকার যোনির মধ্যে যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

যে সমস্ত জীব দেবযোনিতে উৎপন্ন হয় তাহাদের বিভাগাদির কিছু বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে, কেননা এই প্রবন্ধের বিষয়ের সহিত তাহাদেরই সম্বন্ধ আছে। দেবগণ চারিপ্রকার: ব্যন্তর, ভবনপতি, জ্যোতিষ্ক ও বৈমানিক। ইহারা সকলেই দেব পর্যায়ের অন্তর্গত এবং বর্তমান প্রবন্ধে প্রেত শব্দও দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। এই চারি প্রকার দেবগণের মধ্যে ব্যন্তরগণ সর্ব নিকৃষ্ট, তদপেক্ষা ভবনপতি, তদপেক্ষা

জ্যোতিষ্ক, তদপেক্ষা বৈমানিকগণ ক্রমশঃ উন্নততর। বহু বহু যোজন অন্তরে অবস্থিত একটির উপর অন্যটি এইভাবে দ্বাদশটি স্বর্গে, তাহারও উর্দ্ধে উভয় পার্শ্বে অবস্থিত নয়টি গ্রৈবেয়ক নামক স্বর্গে এবং তাহারও উর্দ্ধে পাঁচটি অনুত্তর বিমান নামক স্বর্গে বৈমানিক দেবগণ অবস্থান করেন। জ্যোতিষ্কগণ মধ্যলোকের কিছু উর্দ্ধে অবস্থান করেন। ভবনপতিগণ পৃথিবীর উপর ও নিম্নভাগের কিছু অংশ বাদ দিয়া মধ্যে ভাগে ভবনে বাস করেন এবং এই কারণে ইহাদিগকে ভবনপতি বলা হয়। সর্ব নিকৃষ্ট ব্যন্তরগণ পৃথিবীর সমতল ও মধ্যভাগে বা বন, জঙ্গল, পর্বতের অন্তরে, বৃক্ষে এমন কি অলিতে গলিতেও থাকিতে পারে।

দেবগণের শরীরকে বৈক্রিয় শরীর বলে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বৈক্রিয় শরীর ভিন্ন প্রকার পরমাণু দ্বারা রচিত বলিয়া তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে দেব আখ্যানধারী জীবগণ যে সমস্ত স্থানে বাস করে তথাকার জড়জগৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ভাবেই রচিত। দেব অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন, কামচারী ও প্রভূত শক্তিশালী। ইহাদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ কিন্তু কোন প্রকার দেবই অমর নহে একদিন না একদিন তাহাদিগকে মরিতেই হইবে। ব্যন্তরগণের মধ্যে ভূত, পিশাচ আদি বিভাগ আছে। অন্যদেবগণের মধ্যেও বিভাগ আছে। যে সমস্ত ব্যন্তরগণ আমাদের বাসস্থানের নিকটে থাকিয়া যায় তাহারা পূর্ব জন্মের তীব্র আসক্তির দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এই স্থান সহজে ত্যাগ করিতে চাহে না। ইহা বলা আবশ্যক যে দেবগণের এক প্রকার বিশেষ জ্ঞান শক্তি আছে যাহার দ্বারা তাহারা ইচ্ছা করিলে পরিমিত স্থানের মধ্যস্থিত বস্তুগুলি দেখিতে ও জানিতে পারে। এই জ্ঞানকে জৈন শাস্ত্রে অবধি জ্ঞান বলে। নিকৃষ্ট পর্যায়ের দেবগণের এই জ্ঞান অল্প স্থান-গ্রাহী ও অবিশুদ্ধ, এবং উন্নত হইতে উন্নততর দেবগণের এই জ্ঞানের পরিসর ও বিশুদ্ধি অধিক হইতে অধিকতর। এই জ্ঞান তাহাদের জন্মসিদ্ধ অর্থাৎ জন্ম হইতেই স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হয়, কোন প্রকার আয়াস করিয়া অধিগত করিতে হয় না।

আধুনিক পাশ্চত্য প্রেত বিদ্যার কোন কোন তথ্যের সহিত উপরে লিখিত দেব আখ্যাধারী জীবের কার্যের নিম্নরূপ তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যখন কোন স্থানে কোন্ ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তি কোন প্রেতের ধ্যান করিতে থাকে তখন সেই ধ্যাতা ব্যক্তিগণের মানসিক শক্তির দ্বারা সেই প্রেতের দেব পর্যায়ের জীবের মধ্যে এক প্রকার স্পন্দন হয়। স্পন্দন হইলে সে তাহার অবধিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া কোন স্থান হইতে কে তাহাকে আহ্বান করিতেছে তাহা জানিতে পারে এবং স্ব-ইচ্ছা বশতঃ হউক বা ধ্যাতার ধ্যানের প্রভাবেই হউক সে তথায় গমন করিতে উদ্যত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দেবগণের শরীর সূক্ষ্ম এবং এখানকার বায়ুমণ্ডল খুব সম্ভব তাহাদের উপযুক্ত নয়, সেই জন্য সে তথাকার আকাশ হইতে বিভিন্ন প্রকারের অণুসমূহকে

আকর্ষণ করিয়া নিজের শরীরকে কতকটা এই স্থানের উপযোগী করে ও যে স্থান হইতে তাহাকে আহ্বান করা হইতেছে তথায় ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে মাধ্যমের শরীরে সে অবতরণ করে তাহার শরীর হইতেও সে পরমাণু সমূহ গ্রহণ করিয়া নিজেকে সেই শরীরে অবস্থান ও কার্য করিবার শক্তি সম্পন্ন করিতে পারে। আধুনিক প্রেততত্ত্ববিদেরও এইরূপই মত যে শরীরে প্রবৃষ্ট হইয়া সেই প্রেত সেই শরীরের পরমাণু লইয়া নিজেকেও কার্য করার উপযুক্তরূপে পরিবর্তন করিয়া লয় ইহা অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ আগত প্রেতকে প্রশ্ন করিলে সে তাহার জ্ঞানানুযায়ী উত্তর প্রদান করে। পূর্ব জন্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে অবধি-জ্ঞানের দ্বারা তাহা জানিয়া লইয়া সে উত্তর দিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের জ্ঞানের বিস্তারের সহিতই উত্তরটির সঠিকতা নির্ভর করে। আবার তাহারা মিথ্যা কথা বলেনা বা অভিমান হেতু বা অন্য কারণে কোন বস্তুকে অযথা বড় বা ছোট বলিয়া বর্ণনা করে না সব সময় এরূপও বলা যায় না। কেননা যে সমস্ত প্রেত আহূত হইয়া আগমন করে তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃই নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যন্তর বা ভবনপতি বিভাগের দেবই অধিক। বৈমানিক দেব যে আগমন করে না এরূপ নয় কিন্তু তাহারা এতদূরে থাকে ও এত উন্নত যে তাহাদিগকে আকর্ষণ করা যে সে মনুষ্যের কর্ম নয়। অবশ্য সেরূপ শক্তিমান মনুষ্য থাকিলে তাহা দিগকেও আকর্ষণ করা যাইতে পারে কিন্তু উপরিতন স্বর্গলোকের দেবগণ— বিশেষ করিয়া গ্রৈবেয়ক ও অনুত্তর বিমানবাসী দেবগণ এখানে আসে না। তাহারা অত্যন্ত উন্নত।

মানুষ মরিয়া কি সকলেই দেবযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে? জৈনশাস্ত্র মতে বলিতে হইলে বলা যায় যে প্রত্যেক মনুষ্য স্বকৃত কর্মানুযায়ী দেব, মানব, তীর্যক ও নারক এই চারি গতির মধ্যে যে কোন একটিতে উৎপন্ন হইবে। অবশ্য যাহারা মুক্ত হয় তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। অতএব যে মনুষ্য মৃত্যুর পর মনুষ্য, পশু, পক্ষী বা বৃক্ষাদি হইয়া উৎপন্ন হয় তাহারা আকৃষ্ট হইয়া প্রেতরূপে আসিতে পারে না। কিন্তু ইহা কতকটা সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে সাধারণ অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে জীব ক্রমশঃ উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে, যদি না সে ঘোর পাপকর্মে রত হয়। এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বিশেষ পুণ্যকর্মের প্রয়োজন হয় না। অতএব মনুষ্য শরীর হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া অনেকেই হয়ত ব্যন্তর বা ভবনপতি বিভাগের নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেব হইয়া জন্মগ্রহণ করে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। অবশ্য যাহারা ঘোর পাপকর্ম করে তাহারা নরক বা তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সেখানকার নিয়ম ও পরিবেশানুযায়ীই হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োগ না করে ততক্ষণ

এখানকার পূর্বাবস্থা ভুলিয়া থাকাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে কেহ কেহ গাঢ় আসক্তির জন্য এখানে আগমন করিয়া অবস্থান করিতে থাকে ও পূর্বজন্মের শত্রু, মিত্র বা ভালবাসার পাত্রের প্রতি বা কুতূহলাদির বশে অপরিচিত ব্যক্তির প্রতিও ইষ্টানিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়।

দেবগণের শরীরের আকৃতি মনুষ্যাকার ও তাহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন মনুষ্যের প্রতিকৃতি ধারণ করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তাহারা অশরীরী আত্মা মাত্র নয়, তাহাদেরও শরীর আছে তবে সেই শরীর সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলিয়াই আমাদের নিকট অশরীরী বলিয়া ভ্রান্ত প্রতীতি হয়। ভবনপতি ও বৈমানিকগণের আবাসস্থান আমাদের আবাসস্থান হইতেও সুন্দর। বৈমানিকগণের আবাসস্থান যে কত মনোহর ও সেখানে যে কত সুখ তাহার বর্ণনার সামান্য একটু উদ্ধৃত করা হইতেছে।

চন্দ্রকান্তশিলানদ্ধাঃ প্রবালদলদন্তুরাঃ।
বজ্রেন্দ্রনীল-নির্মাণা বিচিত্রাস্তত্র ভূময়ঃ ।। ৩৬।৯৪
যৎসুখং নাকিনাং স্বর্গে তদ্বক্তুং কেন পার্যতে।
স্বভাবজমনাতঙ্কং সর্বাক্ষপ্রীণনক্ষমং ।। ৩৬।১৭৬

অর্থাৎ স্বর্গের ভূমি চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা আচ্ছাদিত, প্রবাল পত্রের ন্যায় আভা বিশিষ্ট, হীরক ও ইন্দ্রনীলমণির দ্বারা নির্মিত ও বিচিত্র।

স্বর্গের দেবগণ আতঙ্ক বা রোগ রহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জনক যে স্বাভাবিক সুখ স্বর্গে উপভোগ করে তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে ?

স্বর্গের সুখ বর্ণনায় কবি পঞ্চমুখ হইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে আরও উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। মনুষ্য পুণ্য করিলে স্বর্গে যায় অতএব স্বর্গের সুখ ও ঐশ্বর্য পৃথিবী হইতে যে অধিক হইবে তাহা স্বাভাবিক।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জড়জগৎ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং প্রকৃতির গুহ্যতম নিয়ম সমূহও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সমস্ত গবেষণার দ্বারা মনুষ্যের জীবনে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে ও দিনের পর দিন নূতন নূতন ভাবধারা ও পরিবেশের সৃষ্টি হইয়া মানবিক সভ্যতা এক বিশেষ দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, আবার অন্যদিকে এই জড় বিজ্ঞানের প্রভাবেই প্রাণীজগৎকে ধ্বংস করিবার মারণাস্ত্র সমূহও প্রস্তুত হইয়া তাহাদের ধ্বংসলীলা বিস্তারের জন্য সঞ্চিত হইতেছে। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে যে প্রকার অসাধারণ একাগ্রতা, মনঃ সংযোগ ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের দ্বারা মনীষিগণ জড় প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতেছেন সেইরূপ প্রচেষ্টা ও মনীষা যে শক্তির প্রভাবে তাঁহারা কার্য করিতেছেন, যে শক্তির বিকাশের দ্বারাই

তাঁহাদের অসামান্য বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রকাশ হইতেছে, এবং যাহার অভাবে মনুষ্য নিমেষে পচনশীল জড় পদার্থে পরিণত হইয়া যায় সেই চেতনাশক্তি বা আত্মার রহস্যোদ্‌ঘাটনের প্রতি প্রয়োগ করেন না। আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতেই বহু পুরাতন কাল হইতে আত্মা সম্বন্ধে গবেষণা ও সাধনা করিয়া বহু মনীষিগণ তাহার অতুল ঐশ্বর্য ও শক্তির কথা জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। আজও এই সাধনার অস্ত হয় নাই। জগতের জড়াভিমুখী চিন্তাশীলতার পরিবর্তন করিয়া আত্মাভিমুখী প্রবর্তন স্বাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিকগণেরই কর্তব্য। প্রেতবিদ্যা আত্মবিদ্যা নয়। এই পৃথিবীর প্রাণিগণের বিষয় জ্ঞানলাভ করা যেমন, অন্য পৃথিবীর প্রাণিগণের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা প্রায় তদ্রূপই। কিন্তু অন্যালোকে অন্যরূপ প্রাণী আছে এবং আমরা মৃত্যুর পর অন্যালোকে অন্যরূপ প্রাণী হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে পারি জানিতে পারিলে যে বস্তুটি মৃত্যুর সময় আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া ভিন্ন স্থানে ভিন্ন রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সেই বস্তুটি বা সেই আমিটির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার স্বতঃই ঔৎসুক্য হয় এবং এই দৃষ্টিতে প্রেত-তত্বকে আত্মতত্বের একটা অঙ্গরূপে অনুশীলন করা যাইতে পারে।

উত্তরা, চৈত্র, ১৩৫৮

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

  জৈন ভবন

  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

  ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র

  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি ঃ

প্রকাশন স্থান ঃ কলিকাতা

প্রকাশের কাল ঃ মাসিক

মুদ্রকের নাম ঃ গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা ঃ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

প্রকাশকের নাম ঃ গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা ঃ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

সম্পাদকের নাম ঃ গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা ঃ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

স্বত্বাধিকারীর নাম ঃ জৈন ভবন

ঠিকানা ঃ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আমি, গণেশ লালওয়ানী, ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

গণেশ লালওয়ানী

১৫. ৩. ৭৭

প্রকাশকের স্বাক্ষর

WB/NC-120

Vol. IV No. 11 : Sraman : March 1977

Registered with the Register of Newspapers for India under No. R.N. 24582/73

THUS SAYETH OUR LORD

Jainism is older than Buddhism and has a vast history. But unfortunately our knowledge of Jainism is meagre and poor This booklet is a invaluable companion because it compiles the novel teachings of Mahavira.

—The Hindusthan Standard, Calcutta

Pp. 60 Price 1.50 P.

ESSENCE OF JAINISM

The book has indeed given in outline the main tenets of Jain religion. It will surely prove useful to the new adherants of Jain religion as well as to those general readers who may be interested in acquainting themselves with the elementary teachings of this great religion.

—The Pioneer, Lucknow

Pp. 48 Price 1.50 P.

Published by Jain Bhawan

Available at

JAIN INFORMATION BUREAU

36 Budreedas Temple Street

Calcutta-4

চৈত্র । ১৩৮৩

চতুর্থ বর্ষ । দ্বাদশ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৮৩ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

'শ্রমণ' সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

পত্রিকাটি সার্বিকভাবে অত্যন্ত সুন্দর। তার প্রবন্ধগুলিও তথ্যবহুল। এ পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ
অধ্যাপক, মালদহ কলেজ, মালদহ

'শ্রমণ' সত্যই শ্রমণ সংস্কৃতির পরিচায়ক। প্রতিমাসের 'শ্রমণ' তা সুচারুভাবে প্রমাণ করে।

—প্রদীপ চোপড়া
মুরারাই, বীরভূম

আপনার পত্রিকা আমাদের বাড়ীর সবাই পড়তে ভালো বাসেন।

—সিপ্রা চট্টোপাধ্যায়
বারলা, মুর্শিদাবাদ

আমি আপনাদের প্রকাশিত 'শ্রমণ' পত্রিকাখানি পড়িলাম। সাহিত্য, সংস্কৃতি, গল্প ও কবিতাগুলি আমার বেশ ভালো লাগিয়াছে।

—মুজিবর রহমান
কোর্টচাঁদপুর, যশোহর, বাংলাদেশ

'শ্রমণ' নিয়মিত পেয়ে যাচ্ছি। বলাবাহুল্য শুধু ভাল লাগছে নয়, আনন্দিত এবং উপকৃত হচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে। শ্রমণের লেখাগুলো নিয়ে যদি মধ্যে মধ্যে আলোচনাচক্র বা বৈঠক করানো যেত—তাহলেই এর মর্যাদা দেওয়া যেত যথার্থ ভাবে।

—কল্যাণী দত্ত
অধ্যাপিকা, বাসন্তীদেবী গার্ল'স কলেজ, কলিকাতা

'শ্রমণ' পাচ্ছি। খুব আগ্রহ সহকারে পড়ি। এই ছোট কাগজটার মধ্যে অনেক কিছু জানবার আছে। মূল্যবান। আমি পত্রিকাটি সংগ্রহ শালায় যত্ন করে রেখে দেই

—জীবন সরকার
সহকারী সম্পাদক 'অন্য দিন', কলিকাতা

বড় উন্নতমানের নিবন্ধসহ, সুন্দর চিত্র শোভিত, এমন ভালো সাময়িকী আজকাল বিরল।

অমিতাভ চক্রবর্তী
অধ্যাপক, দমদম মতিঝিল কলেজ, কলিকাতা

বালিহাটির জৈন (?) মন্দির

শ্রীদীপকরঞ্জন দাস

অল্প কিছু দিন আগে সমাচার সংবাদ-সংস্থা পরিবেশিত সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক মেদিনীপুর জেলার জিন শহরে একটি প্রাচীন মন্দির আবিষ্কারের ঘোষণা করা হয়। (দ্রঃ স্টেটস্‌ম্যান, ২।২।৭৬, পৃ. ৩) প্রকৃতপক্ষে মন্দিরটির অবস্থিতি জিন শহরের পাশে বালিহাটি গ্রামে। এই মন্দিরটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের কৃতিত্বও পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নয়। পরলোকগত ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত 'দি লেট মিডিয়েভাল টেম্পলস্ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বালিহাটির মন্দিরটির উল্লেখ হয়েছে। (পৃঃ ১৬) ঐ গ্রন্থে মন্দিরটির আবিষ্কারক রূপে শ্রীতারাপদ সাঁতরা ও বর্তমান লেখকের নাম করা হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় ওই মন্দিরটির প্রকৃত আবিষ্কারক নন। ১৯৭২ সালে শ্রীসাঁতরা এবং লেখক মেদিনীপুর কলেজের তদানীন্তন ছাত্র শ্রীবরেন্দ্রনাথ মাকড়ের কাছে মেদিনীপুর খড়্গপুর রোড ব্রিজের নিকটে কাঁসাইয়ের দক্ষিণ তীরে বালিহাটি গ্রামে একটি জীর্ণ মন্দিরের সংবাদ পান। শ্রীমান বরেন মেদিনীপুর জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা কালে এই মন্দিরটি আবিষ্কার করে। সুতরাং বালিহাটির মন্দিরটির আবিষ্কারকরূপে সমস্ত গৌরবই এই উৎসাহী ও সংস্কৃতি-অনুরাগী ছাত্রটির প্রাপ্য। ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন লেখকের নিকট মন্দিরটির সংবাদ পান এবং অনুমান করেন যে শ্রীসাঁতরা ও লেখক এই মন্দিরটির আবিষ্কারক। এর অল্প কিছুকাল পরেই ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের অকাল মৃত্যু একটি ভ্রান্ত ধারণাকে সংশোধনের সুযোগদানে লেখককে বঞ্চিত করে।

বিভিন্ন কারণে বালিহাটির মন্দিরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। মন্দিরময় বাঁকুড়া জেলার প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও মেদিনীপুর জেলায় কোন প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বালিহাটির মন্দিরটি খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনুমান করে। এই কালনির্ণয় হয়তো সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও বালিহাটির মন্দির মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনতম মন্দির। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন মন্দিরে উড়িষ্যার প্রভাব স্পষ্ট। বালিহাটির মন্দিরটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এই মন্দিরটির গঠন পরিকল্পনায় যে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য মন্দিরে অনুপস্থিত। বালিহাটির মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তিটি বহুকাল পূর্বেই অপসৃত। তবে এটি কোন জৈন তীর্থংকরের বলে অনুমান

করা যায়। এই স্থানের আশে পাশে পাওয়া কিছু জৈন নিদর্শনই এই অনুমানের কারণ। বালিহাটির সংলগ্ন প্রতিবেশী গ্রাম জিন শহরের নামটিও এই অঞ্চলকে জৈন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চল বলে নির্দেশ করে।

বালিহাটির মন্দিরটি পূর্বদ্বারী। মন্দিরের গর্ভগৃহের বহির্ভাগ পঞ্চরথ এবং অভ্যন্তর বর্গাকার। গর্ভগৃহের আসন এবং অভ্যন্তরের দৈর্ঘ্যের আনুপাতিক হার ২ : ১। এখানে উল্লেখযোগ্য পূর্বাঞ্চলের বহু প্রাচীন মন্দিরে আসন ও গর্ভের অনুরূপ আনুপাতিক হার দেখা যায়। আসনের পাঁচটি রথের মধ্যেও একটি শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় রয়েছে। গর্ভগৃহটিকে একটি বর্গক্ষেত্র ধরে নিয়ে এটিকে ১১ অথবা তার গুণিতক 'মডিউলে' ভাগ করা হয়েছে। এই ১১টি ভাগের ১ ভাগ প্রতিটি কৌণিক, ২ ভাগ প্রতিটি অনুরথ, ৪ ভাগ রাহা এবং ১/২ ভাগ আসনের প্রতিপার্শ্বে অনুরথ ও রাহার 'যুগ্ম' উদ্গত অংশের জন্য নির্দিষ্ট করে স্থপতি তাঁর আসন পরিকল্পনা করেন। একথা বলা হয়ত অযৌক্তিক হবে না যে এখানে আসনের বিভিন্ন অংশের ভাগ একটি প্রচলিত সূত্র অনুযায়ী নির্ণীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে একটী আঞ্চলিক বাস্তুশাস্ত্রের অস্তিত্বও স্বীকৃত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী রাজ্যের মন্দিরসমূহ পরীক্ষা করে এই বাস্তু-শাস্ত্রের ভৌগলিক পরিধি এবং কাল নির্ণয় করা সম্ভব।

একটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ প্রবেশ-নির্গমন পথ গর্ভগৃহকে তার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত প্রদক্ষিণ পথের সঙ্গে যুক্ত করেছে। প্রদক্ষিণ পথটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের অধিকাংশই কালের গহবরে বিলীন। কিন্তু উত্তর দিকের দেওয়ালে একটি গবাক্ষ এখনও বর্তমান। অনুরূপ গবাক্ষ দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের দেওয়ালেও ছিল বলে অনুমান করা যায়। পূর্বদিকের দেওয়ালের মধ্য ভাগে মন্দিরে প্রবেশের মূল পথটি প্রায় ৮ ফুট দীর্ঘ। ফলে এটিকে প্রায় সুড়ঙ্গের মতো বলে মনে হয়। প্রবেশ পথের বাম দিকে দেওয়ালের ভিতর দিয়ে মন্দিরের উপরে যাওয়ার সিঁড়ি রয়েছে। মন্দিরটির শীর্ষদেশ ভগ্ন ও লতাগুল্মে ঢাকা। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় মন্দিরটি একাধিক তল বিশিষ্ট ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ছাদের ধারে দু' একটী খুরা (ইংরাজী 'এস' এর মতো) জাতীয় মোল্ডিং দেখা যায়। কিন্তু এগুলো একটি সমতল পৃষ্ঠ ছাতের বর্ডার হতে পারে। বিকল্পে মোল্ডিং গুলোর ক্রমহ্রাসমান উন্নয়ন শিখরদেশকে বক্রাকৃতি অথবা পিরামিডাকৃতি করে থাকতে পারে।

মন্দিরের বহির্ভাগে দেওয়ালের উত্তরপূর্ব কোন সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। অনুরূপ প্রকোষ্ঠ দক্ষিণপূর্ব কোণেও ছিল। এখন কেবলমাত্র ভিতরে কিছু অংশ দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রকোষ্ঠদ্বয় মন্দিরের ভাণ্ডার এবং ভোগ প্রস্তুত প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হতো।

মন্দিরটি মাকড়া বা ঝামা পাথরে নির্মিত। পাথরগুলো জোড়া লাগাতে কোন

মশলা বা লৌহ ফলক ব্যবহার করা হয়নি। সম্পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষার ভিত্তিতে একটির উপর আর একটি পাথর সাজিয়ে এই মন্দির নির্মিত। ঊর্দ্ধাংশে লহরার দ্বারা গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ পথ এবং মন্দির ও গর্ভগৃহের প্রবেশ পথদ্বয় আচ্ছাদিত। নিরাভরণ বালিহাটি মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এর গর্ভগৃহ বেষ্টিত প্রদক্ষিণ পথ। পূর্বভারতীয় মন্দিরে এরূপ প্রদক্ষিণ পথ দেখা যায় না। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কিছু মন্দিরে বিশেষতঃ খাজুরাহোর একশ্রেণীর মন্দিরে ঘেরা প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরেও প্রদক্ষিণ পথ একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বালিহাটির শিল্পী হয়তো এই উভয় অঞ্চলের কোন একটির স্থাপত্য রীতি দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে এই প্রভাব কেবলমাত্র প্রদক্ষিণ পথেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকার উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ভৌগলিক অবস্থান, ধর্মীয় সম্পর্ক এবং সর্বোপরি অভিনব পরিকল্পনায় বালিহাটির মন্দির পশ্চিম বঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য কীর্তি। কিন্তু আশু সংরক্ষণ করা না হলে এই মন্দির অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

কৌশিকী, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৩ হতে পুনর্মুদ্রিত

বিজয়া

[জৈন কথানক]

পুষ্পচয়নের জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে উপবনস্থলীর প্রান্তে এসে দাঁড়ায় বিজয়া। অদূরের তৃণাস্তিত পথরেখার দিকে তৃষ্ণাতুরার মত চেয়ে থাকে। এই ত সেই পথ, যে পথের প্রান্তে প্রতি প্রভাতে তার হৃদয় বরেণ্য প্রেমিকের মূর্তিকে অভ্যুদিত হতে সে দেখে থাকে।

প্রিয়া—

আহবান শুনে চমকিত হয়ে পিছনে ফিরে তাকায় বিজয়া। দেখতে পায় নক্তমাল তরুর ছায়া তলে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই প্রেমাস্পদ অর্হদ্দাস পুত্র বিজয়।

বাগদত্তা বিজয়া!

সম্ভাষণ শুনে ব্রীড়াভঙ্গে কুণ্ঠিত হয়ে যেন দুই অধরের সুস্মিত আনন্দ গোপন করবার চেষ্টা করে বিজয়া।

বিজয় বলে, আজ আমি এক স্বপ্ন দেখেছি বিজয়া। তারকা উত্তরাফাল্গুনী আকাশে হাসছে এবং প্রেম ব্যাকুলা এক নারী বিবাহের মাঙ্গল্য উৎসবের পর এই উপবনের নিভৃতে এসে তার পরিণেতার সঙ্গ লাভ করছে।

বিজয়ার অধর সুস্মিত হয়। বলে, তারপর?

তারপর সেই শুভ রজনীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মিলনোৎসবের আনন্দ বক্ষলগ্ন করে উভয় উভয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর?

তারপর প্রভাত হতেই শূন্য হয়ে যায় উপবন।

তারপর কোথায় যায় তারা দুজন?

দুই দিকে ভিন্ন দিকে। আবার মিলিত হবার জন্য।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তুলে অশ্রুধারার মধ্যে হেসে ওঠে বিজয়া। বলে, একি সত্যি তোমার স্বপ্ন, আশঙ্কা না কৌতুক!

যা মনে কর।

কৌতুকই। কারণ গতকাল্য অপরাহ্ণে লতাপ্রতানের অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুনেছে বিজয়া শ্রেষ্ঠী অর্হদ্দাস স্বয়ং এসে পুত্রবধূরূপে তাকে গ্রহণ করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। সেই প্রস্তাবে সম্মতও হয়েছেন পিতা। সেদিন আসন্ন যেদিন সন্ধ্যার আকাশে হীরক-

বিন্দুর মত ফুটে উঠবে উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্র। সেই সন্ধ্যায় বিজয়ার প্রেমের পুরুষ শুভ বিবাহের মাঙ্গল্য উৎসবের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তার পাণিগ্রহণ করবে।

আমার স্বপ্নের কথা বলব, বলে বিজয়া। শুনবে?

বল।

আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার জীবন মধুর করে দিয়ে আমি থাকব।

তুমি সুন্দর বিজয়া।

সে যদি তুমি সুন্দর বল তবেই।

তারপর আসে সেই তিথি যে তিথিতে হীরকবিন্দুর মত সন্ধ্যার আকাশে ঝলমল করে ওঠে উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্র। নববধূর বেশে বিজয়াকে সাজিয়ে দেয় সখীরা। পদতল লাক্ষাপঙ্কে রঞ্জিত করে। পত্রাগলিপ্ত করে বর তনু, নয়নদ্বয় কজ্জল মসিরেখায় প্রসাধিত করে দেয়।

বিবাহ তখন শেষ হয়েছে। সময় মধ্যরাত্রি। লতাপ্রতানের নিভৃতে মধুর বাসরিকা যাপনের সুযোগ রচনা করে ফিরে গিয়েছে পুরললনারা। আকাশে পৌর্ণমাসীর অতন্দ্র চন্দ্র।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে বিজয়া। তার প্রেমাস্পদের বক্ষ সন্নিধানে এসে প্রভা পুলকিত নয়নে অদ্ভুত এক তৃষ্ণা উদ্ভাসিত করে দাঁড়ায়।

পৌর্ণমাসী রজনীর আকাশে হিমকর ভাসে। একে একে ক্ষয় হয় সময়ের পল অনুপল, বিপল। বিজয়ার মুখের দিকে নিমেষহীন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে বিজয়। তার মনে হয় আকাশের ওই শশাঙ্ক ছবির মতই সুন্দর এই মুখচ্ছবি। পূর্ণচন্দ্রের মাঝে মৃগ রেখার মত এই বরনারীর ললাটেও কৃষ্ণ চিকুরের ভ্রমরক সুনিবিড় ছায়ালেখা অঙ্কিত করে রয়েছে।

সযত্নে বিজয়ার ললাটলগ্ন ভ্রমরক নিজের হাতে বিন্যস্ত করতে থাকে বিজয়। মনে স্পৃহা জাগে। বিপুল পিপাসা ভারে, সিহরিত হয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে অধর। সে বিজয়ার হাত ধরতে যায়, মৃদু স্বন শঙ্খের অস্ফুট নিঃশ্বাস ধ্বনির মত কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কি যেন বলতে চায়—কিন্তু কিছু বলা হয় না। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে সে পেছনে সরে আসে।

সরে আসে কিন্তু তখনি এক বেদনার্দ্র দৃষ্টি তুলে সে বিজয়ার মুখের দিকে তাকায়। তার মনে হয় বিজয়ার চোখের দৃষ্টি তার কবরীগ্রথিত চন্দ্রোৎপলের রশ্মির চেয়ে অনেক বেশী সান্দ্র ও স্নিগ্ধ যা সেই রাকা রজনীর কৌমুদীধারার মত সুতরল জ্যোতি সুধা উৎসারিত করে তার দিকে চেয়ে হাসছে।

বক্ষে কেমন যেন আবার তৃষ্ণা জাগে। উপবন তরুর অন্তরাল হতে কোকিলনাদ

উত্থিত হয়। তার দুই বাহু অসহ ঔৎসুক্যে অস্থির হয়ে বিজয়াকে আলিঙ্গন করার জন্য উদ্যত হয়।

কিন্তু আবার নিজেকে সংযত করে নেয় বিজয়।

বিজয়—

সেই সুস্বরে সিহরিত হয় বিজয়ের সমস্ত দেহ, সমস্ত সত্বা। যেমন শিহরিত হয় নব মেঘের সঞ্চারে বনভূমি, বন বিহগের কলকূজনে প্রভাত বায়ু। তারপর ঈষৎ আনত করে তার চোখের দৃষ্টি বলে, বল?

তুমি অমন চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? প্রিয়, তোমার ওই বক্ষ নিলয়ের আশ্রয়ে আজকের এই মধু যামিনী আমায় যাপন করতে দাও।

কথা ফোটে না বিজয়ের মুখে। তেমনি নীরবে নতনেত্রে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্বামি—

শিঞ্জিত হয় রত্নাভরণ। বিজয়ের আরো নিকটে এসে দাঁড়ায় বিজয়া।

আমায় ক্ষমা করো বিজয়া। আর কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর চন্দ্র অস্তমিত হলে আমি তোমায় বক্ষপটে গ্রহণ করব।

চন্দ্র অস্তমিত হলে?—অস্ফুট উচ্চারণ করে বিজয়া। চীৎকার করে ওঠে তার সমস্ত সত্বা। না না না, সে সম্ভব নয়। তারপর দুই হাতে আবৃত করে তার অশ্রু সিক্ত চোখ।

সান্ত্বনার স্বরে বলে বিজয়, দুঃখিত হয়োনা বিজয়া। আর দুই মুহূর্ত। তারপর তোমাকে আমার কাছ হতে কেউ আর দূরে রাখতে পারবে না।

কিন্তু কেন?—আবেগে প্রশ্ন করে বিজয়া।

আমায় ভুল বোঝোনা—ধীরে ধীরে বলে বিজয়। আচার্য বিজয়প্রভের কাছে আমি ব্রতগ্রহণ করেছিলাম শুক্লপক্ষে নারী সম্ভোগ না করবার।

অশ্রুজলে ভেসে যায় চন্দনের অনুলেপন, কুঙ্কুমের চিত্রক। আর্তনাদের মত শোনায় বিজয়ার কণ্ঠস্বর। স্বামি, আচার্য বিজয়প্রভের কাছে আমিও যে ব্রত গ্রহণ করেছিলাম কৃষ্ণপক্ষে পুরুষ সংসর্গ না করবার।

অস্তমিত হয় চন্দ্র। মিথ্যে হয়ে যায় উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্রের হীরক দ্যুতি। বিমূঢ়ের মতো উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে থাকে। তাদের ব্রত জীবনে তাদের একি দুর্নিবার সমস্যার সম্মুখীন করে দিয়েছে। এ কেবল শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের বিচ্ছেদ নয়—এ বিচ্ছেদ চির জীবনের। এত নিকটে তবু কতদূরে।

বিজয়ের চোখের দিকে দৃষ্টি তুলে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে বিজয়া, তোমার স্বপ্নই সত্য হল বিজয়। প্রভাত হতেই শূন্য হয়ে গেল উপবন।

বিজয়ার মুখের দিকে তাকাতে বিজয়ের সাহস হয় না। চন্দ্রাস্তবিধূর দিগ্বলয়ের দিকে চেয়ে সে নিশ্চুপে বসে থাকে।

স্বামী, তুমি দুঃখিত হয়ো না—আমার জীবনের বোধ হয় এই-ই ভবিতব্য ছিল। কিন্তু তুমি ?—তুমি আবার বিবাহ কর। সুখী হও।

দৃষ্টি উত্তোলিত না করেই বলে বিজয়, সে হয় না বিজয়া।

কেন হয় না ?—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে বিজয়া। তোমার ত আবার বিবাহে কোন বাধা নেই। আমি তোমায় সহজ অনুমতি দিচ্ছি।

তুমি অনুমতি দিলেও অনুমতি দেবে না আমার হৃদয়, আমার মন।

তরল হয় বিজয়ার চোখের দৃষ্টি। শান্ত হয়ে যায় ত্রস্ত হৃদয়ের আর্তভা, দূরের বনবীথিকার দিকে তাকিয়ে সে কি যেন চিন্তা করে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত ও কঠিন এক সংকল্পের আনন্দ তার অধর রেখায় সুস্মিত হয়ে ওঠে।

সেই আনন্দের স্পর্শে বিজয়ের অধরও সুস্মিত হয়। যেন দ্রুমজয়ের এক প্রশান্ত আনন্দ বান্ধব ও বান্ধবীর মত দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে জৈনতত্ত্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

২২৩ প্রঃ উপশান্ত কষায় বা দুঃধস্থ বীতরাগ সংজ্ঞক একাদশগুণস্থানবর্তী কিরূপ।

২২৩ উঃ সপ্তম গুণস্থানের পর হইতে মুনির দুইটা বিভাগ হয়, কাহারও কাষায়াদির উপশম পূর্বক ক্রমশঃ উত্তরোত্তর গুণ লাভ হয়। কাহারও কষায়াদির ক্ষয় সহকারে পরপর গুণস্থান লাভ হয়। তন্মধ্যে উপশমক শ্রেণী চারিত্র মোহনীয়ের উপশম দ্বারা যথাখ্যাত চারিত্র লাভ করিলে উপশান্ত কষায় নামক একাদশ স্থান হয়। এই একাদশ গুণস্থানবর্তীর কালক্রমে উপশম অবস্থা পূর্ণ হইলে মোহনীয় কর্মের প্রাদুর্ভাব দ্বারা পতন সম্ভাবনা আছে।

২২৪ প্রঃ ক্ষীণ কষায় বা ক্ষীণ মোহ সংজ্ঞক দ্বাদশ গুণস্থানবর্তী কিরূপ ?

২২৪ উঃ যিনি মোহনীয় কর্মের কষায়াদি প্রকৃতি পুঞ্জের ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে ক্ষায়িক বা ক্ষপক শ্রেণীর মুনি বলে। এই ক্ষপক শ্রেণীর মুনির দশমগুণস্থানের চরম সময়ে মোহনীয় কর্মের সমস্তক ষায়াদি প্রকৃতির ক্ষয় হইলে যথাখ্যাত সংযম লাভ হয়। এবং এই গুণস্থানের শেষ ভাগে সমস্ত ঘাতি কর্ম নষ্ট হইয়া যায় ও অলাভ, প্রজ্ঞা, অজ্ঞান এই ত্রিবিধ পরীষহ জয় হইয়া থাকে। অষ্টম গুণ-স্থানাবধি দ্বাদশ স্থান পর্যন্ত মুনিগণ ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এই গুণ-স্থান-বর্তীকে ক্ষীণ মোহ, ক্ষীণ কষায় নামক দ্বাদশ গুণস্থানবর্তী বলে।

২২৫ প্রঃ সংযোগ কেবলী গুণস্থানবর্তী কিরূপ ?

২২৫ উঃ ক্ষীণ মোহ নামক দ্বাদশ গুণস্থানে অন্তর্মুহূর্ত কাল পর্যন্ত অবস্থানের পর, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় ও অন্তরায় কর্মের যুগপৎ ক্ষয় হইয়া থাকে, অনন্তর কেবল জ্ঞানের উদয় হয়। কেবল জ্ঞান হইলে অনন্ত বীর্য, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত সুখ, ক্ষায়িক সম্যক্ত্ব ও ক্ষায়িক চারিত্র লাভ হয়। এই ত্রয়োদশ গুণস্থানবর্তীকেই কোন বিষয় অবিদিত না থাকায় সর্বজ্ঞ, রাগ-দ্বেষাদি দোষের সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্তি হওয়ায় বীতরাগ, অষ্টৈশ্বর্য যুক্ত বলিয়া পরমেশ্বর, প্রাণী-মণ্ডলীর হিত সাধনে তৎপর বলিয়া হিতোপদেশক বা হিতকারী বলে। ভব্যত্বভাব তিরোহিত হওয়ায় মুক্ত, আয়ু কর্মের বর্তমানতা থাকায় জীবিত, সুতরাং ইহাকে জীবন্মুক্ত বা সকল পরমাত্মা বলে। এই অবস্থায় বেদনীয় কর্মের বর্তমানতা থাকায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ, দংশ, মশক, চর্যা, শয্যা, বধ, রোগ তৃণস্পর্শ, মল এই একাদশ প্রকার পরীষহ থাকে, কিন্তু

মোহনীয়াদি কর্ম না থাকায় ক্ষুধাদি ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। এই সযোগ কেবলী নামক ত্রয়োদশ গুণস্থানবর্তী অন্তভাগে সূক্ষ্ম ক্রিয়াতিপাত নামক শুক্ল ধ্যানে নিরূঢ় থাকেন। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণবান ও সকলের অর্হনীয় (পূজনীয়) বলিয়া ইঁহাকে অর্হন বলে। এই গুণস্থানে আকাশ গমনাদি নাম কর্মের উদয় হয়।

২২৬ প্রঃ অযোগ কেবলী গুণস্থানবর্তী কিরূপ ?

২২৬ উঃ যখন মন বচনের যোগ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইয়া যায় তখন অযোগ কেবলী নামক চতুর্দশ গুণস্থান নাম হয়। এখানেই চতুর্থ শুক্লধ্যান ব্যুপরিত ক্রিয়া-নিবৃত্তি ধ্যান হয়। ইহার কাল যতক্ষণ পঞ্চম অক্ষর (অ-ই-উ-ঋ-৯) উচ্চারিত হয়। এখানে চার প্রকার অঘাতী কর্মের ক্ষয় হয়। ইহার অন্তকালে শরীর পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন। তখন লোকাকাশের শেষ সীমা অর্থাৎ সিদ্ধস্থানে ঊর্দ্ধগমন হয়।

২২৭ প্রঃ মুক্ত আত্মার ঊর্দ্ধগমনের প্রতি কারণ কি ? [গতিরূপ নাম কর্মের উদয় হইলে ধর্মের সহায়তায় জীবের গমনাগমন হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত কর্ম ক্ষয় করিয়া মোক্ষ লাভের পর আত্মার ঊর্দ্ধগমনরূপ ক্রিয়া আসিল কোথা হইতে ? এই আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা হইতেছে যে মুক্ত আত্মার ঊর্দ্ধগমনের প্রতি কারণ কি ?]

২২৭ উঃ (১) কুম্ভকার কর্তৃক যেরূপ দণ্ডাদি দ্বারা বিঘূর্ণিত চক্র দণ্ডাদি সংযোগাভাব সাধিত হইলেও কিয়ৎকাল ঘুরিতেই থাকে, এইরূপ জীবও "আবিদ্ধ-কুলালচক্রের ন্যায়" পূর্বকৃতানুষ্ঠান জন্য সংস্কার বসে ঊর্দ্ধ গমন করিতে পারে, (২) কিম্বা যে প্রকার মৃত্তিকা লেপযুক্ত 'তুম্বা' জলমগ্ন হইয়া থাকে, পরন্তু যখন ঐ লেপ গলিত হইয়া যায়, তখন 'তুম্বা' আবার জলের উপর ভাসমান হইয়া উঠে সেইরূপ ব্যপগত লেপ অলাবুর ন্যায় জীব অনাদিকাল হইতে কর্মভারাক্রান্ত হইয়া নিমগ্নাবস্থায় থাকে, কর্মবন্ধনমুক্ত হইলেই লোকাকাশের উপরিভাগে গমন করিয়া থাকে, (৩) অথবা এরণ্ড বৃক্ষের বীজ যেমন বৃক্ষে থাকিয়াই শুষ্ক হইতে থাকে, যখন আবরণ (খোষা) ফাটিয়া যায় তখন এরণ্ড বীজের শস্য তুলার ঊর্দ্ধে উচ্ছলিত হইতে থাকে এই এরণ্ড বীজের মত মনুষ্যাদি সংসারবর্তী প্রাণিবর্গও গতি, জাতি প্রভৃতি নাম কর্ম ও আয়ু গোত্রাদি কর্মের বন্ধন ছিন্ন হইলেই ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক যেরূপ অগ্নিশিখা, বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত না হইলে স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগামিনীই হয়, সেইরূপ অগ্নি শিখার ন্যায় মনুষ্যাদি গতি চতুষ্টয়ের হেতুভূত কর্মসংহতির অভাব হওয়ায় জীব স্বকীয় ঊর্দ্ধগমন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া লোকাকাশ ও ও অলোকাকাশের সন্ধিস্থলে উপনীত হয়। কিন্তু ধর্মাস্তিকরণ অর্থাৎ ধর্মাদি দ্রব্যের সত্তা অলোকাকাশে না থাকায়—অলোকাকাশে গমন করিতে পারেন না।

২২৮ প্রঃ আত্মার স্বকীয় ভাব কত প্রকার ?

২২৮ উঃ ঔপশমিক, ক্ষায়িক, মিশ্র, ঔদয়িক, পারিণামিক—এই পাঁচ প্রকারের অনুভেদে তিপ্পান্ন প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

২২৯ প্রঃ ঔপশমিক ভাব কিরূপ ?

২২৯ উঃ ঘোলাজল কিছুক্ষণ রাখিয়া দিয়া অথবা নির্মল্যাদি প্রক্ষেপ করিলে তাহার ময়লা নীচে পড়িয়া যায়। উপরের জল স্বচ্ছ ভাব ধারণ করে এইরূপ বন্ধ হেতু কর্মের উপশম অর্থাৎ উদয়াভাব হইলে (সত্তাস্থিত কর্মের মান্দ্য ভাব বশতঃ) আত্মার যে বিশুদ্ধ পরিণাম হওয়া তাহাকে ঔপশমিক ভাব বলে।

২৩০ প্রঃ ক্ষায়িক ভাব কি প্রকার ?

২৩০ উঃ কর্মের সর্বপ্রকারে ক্ষয় হইয়া আত্মার সাতিশয় বিশুদ্ধ হওয়াকে ক্ষায়িক ভাব বলে।

২৩১ প্রঃ মিশ্রভাব কাহাকে বলে ?

২৩১ উঃ সকল ঘাতি কর্মের উদয়াভাবের ক্ষয় (যেরূপ ক্ষয় হইলে কর্মের উদয় হইতে পারে না) এবং উপশম হইলেও একদেশ ঘাতী কর্মের উদয় থাকিলে আত্মার কিঞ্চিৎ শুদ্ধ কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ এইরূপ মিশ্র পরিণাম হওয়াকে মিশ্রভাব ক্ষায়োপশমিক ভাব বলে।

২৩২ প্রঃ ঔদয়িক ভাব কীদৃশ ?

২৩২ উঃ দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব এই চারি প্রকার নিমিত্ত সমবায়ে কর্ম যাদৃশ ফল প্রদান করে তাহাকে উদয় এবং কর্মের ফলভোগ সময়ে আত্মার যে ভাব হয় তাহাকে ঔদয়িক ভাব বলে।

২৩৩ প্রঃ পারিণামিক ভাব কি প্রকার ?

২৩৩ উঃ আত্মার যে ভাব হওয়ায় কর্মের কোন অপেক্ষা থাকে না তাহাকে পারিণামিক ভাব বলে।

২৩৪ প্রঃ ঔপশমিক ভাব কয়প্রকার ?

২৩৪ উঃ ঔপশমিক সম্যক্ত্ব ও ঔপশমিক চারিত্র এই দুই প্রকার।

২৩৫ প্র: ঔপশমিক সম্যক্ত্ব কয় প্রকার ?

২৩৫ উঃ ঔপশমিক সাম্যক্ত্ব দুই প্রকার। অনন্তানুবন্ধী কষায় চার প্রকার ও মিথ্যাত্ব প্রকৃতি পাঁচ অথবা অনন্তানুবন্ধী কষায় চার, মিথ্যাত্ব, সম্যক্ত্ব, সম্যক্ত্ব মিথ্যাত্ব এই সপ্তবিধ প্রকৃতির উপশম হইলে প্রথম উপশম সম্যক্ত্ব হয়, এবং যখন অনন্তানুবন্ধী কষায়ের বিসংযোজন করে অর্থাৎ অন্যকে ভাবরূপ পরিণমন করায় এবং মিথ্যাত্ব সম্যক্ত্ব, সম্যক্ত্ব মিথ্যাত্বের উপশম হয়, তাহাকে দ্বিতীয় উপশম সম্যক্ত বলে।

২৩৬ প্রঃ ক্ষায়িক ভাবের ভেদ কি ?

২৩৬ উঃ ক্ষায়িক জ্ঞান (কেবল জ্ঞান), ক্ষায়িক দর্শন (কেবল দর্শন), ক্ষায়িক দান, ক্ষায়িক লাভ, ক্ষায়িক ভোগ, ক্ষায়িক উপভোগ, ক্ষায়িক বীর্য, ক্ষায়িক সম্যক্ত্ব ও ক্ষায়িক চারিত্র এই নয় প্রকার ক্ষায়িক ভাব।

২৩৭ প্রঃ ক্ষায়োপশমিকভাব কি কি ?

২৩৭ উঃ চতুর্বিধ সম্যক্‌জ্ঞান, ত্রিবিধ মিথ্যা জ্ঞান, ত্রিবিধ দর্শন ও ক্ষায়োপশমিক দান, লাভ, ভোগ, উপভোগ, বীর্য এই পঞ্চবিধ লব্ধি (লাভ) এবং বেদক সম্যক্ত্ব, সরাগ চারিত্র, আর সংযমাসংযম (দেশব্রত) এই অষ্টাদশ প্রকারকে ক্ষায়োপশমিক ভাব বলিয়া অবগত হইবে।

২৩৮ প্রঃ ঔদয়িক ভাব কত প্রকার ?

২৩৮ উঃ চতুর্বিধ গতি ও কষায়, ত্রিবিধ বেদ (লিঙ্গ), মিথ্যা দর্শন, অজ্ঞান, অসংযম, অসিদ্ধত্ব (যতদিন মুক্ত না হয় ততদিন থাকে) ও পীত, পদ্ম, শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল, কপোত এই ষড়্‌বিধ লেস্যা [২৭] এই একবিংশতি রকম ঔদয়িক ভাবের ভেদ আছে।

২৩৯ প্রঃ আত্মার পরিণামিক ভাব কি কি ?

২৩৯ উঃ জীবত্ব, ভব্যত্ব, অভব্যত্ব, এই তিন রকম পারিণামিক ভাবের ভেদ আছে।

২৪০ প্রঃ জন্ম কয় প্রকার ?

২৪০ উঃ তিন প্রকার—সম্মূর্চ্ছন জন্ম, গর্ভ জন্ম ও উপপাদ জন্ম।

২৪১ প্রঃ সম্মূর্চ্ছন জন্ম কিরূপ ?

২৪১ উঃ দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব, বিশেষের নিমিত্ত দ্বারা দিগ্‌বিদিক্‌ বিকীর্ণ পুদ্‌গল পরমাণু হইতে শরীর বিশেষ ও রচনা বিশেষের উপযোগী পরমাণুপুঞ্জের মিলন (বিজাতীয় সম্বন্ধ) দ্বারা (রজোবীর্য সম্পর্ক ভিন্ন) রচিত দেহাশ্রয়ণকে—সম্মূর্চ্ছন জন্ম বলে।

২৪২ প্রঃ গর্ভ জন্ম কীদৃশ ?

২৪২ উঃ মাতা পিতার রজোবীর্য সংযোগ বিশেষ জন্য জন্মকে গর্ভ জন্ম বলে। [২৮]

২৪৩ প্রঃ উপপাদ জন্ম কিরূপ ?

২৪৩ উঃ রজোবীর্য সম্বন্ধ ভিন্ন দেব ও নারকীর স্থান বিশেষে (স্বর্গাদিতে) উৎপন্ন হওয়াকে উপপাদ জন্ম বলে। [দেব ও নারকীর উপপাদ জন্ম। জরায়ুজ

[২৭] 'কাষায়ানু-রঞ্জিত-যোগপ্রবৃত্তির্লেশ্যা' ইতি সর্বার্থ সিদ্ধিঃ। কাষায় অনুরঞ্জিত যোগ প্রবৃত্তিকে লেস্যা বলে। ইহা তত্বার্থ সূত্রের 'সর্বার্থ সিদ্ধি' নামক টীকাতে কথিত হইয়াছে।

[২৮] মাতা হইতে সূক্ষ্মরূপে বা শোণিতরূপে লোম, রক্ত, মাংস এই তিন আসে। পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, ইহা তিন আসে। ইহা মাতৃপিতৃজ কিংবা জরায়ুজ দেহের লক্ষণ জানিবে। মতান্তরে চরক সংহিতা, গর্ভোপনিষদে অনেক বিষয় আছে।

অণ্ডজ ও পোত (জরায়ু ও অণ্ডাশ্রয় ব্যতিরেকে মাতার উদর হইতে বহির্গত) এই তিন প্রকার গর্ভজন্ম। এতদ্ভিন্ন সমস্তজীবেরই সম্মূর্চ্ছন জন্ম।]

২৪৪ প্রঃ জীব শরীর কত প্রকার ?

২৪৪ উঃ শরীর পাঁচ প্রকার—ঔদারিক, বৈক্রয়িক, আহারক, তৈজস ও কার্মণ। ঔদারিক শরীর স্থূল ও পর পর শরীর ক্রমশঃ পূর্ব পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম।

ঔদারিক—স্থূল (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) আহার বর্গণা হইতে উৎপন্ন।

বৈক্রয়িক—স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, গুরুত্ব, লঘুত্বাদি বিকার সংঘটন যোগ্য।

আহারক—সূক্ষ্ম পদার্থ নির্ণয়ার্থ, সংযমাচরণার্থ, প্রমত্তগুণবর্তী মুনির যে শরীর প্রকটিত হয়।[২৯]

তৈজস—যে শরীর দ্বারা জীব শরীরে তেজ উৎপন্ন হয় তাহা তৈজস বর্গণা হইতে উৎপন্ন।

কার্মণ—জ্ঞানাবরণাদি অষ্টবিধ কর্মাত্মক।

২৪৫ প্রঃ কোন্ জীবের কিরূপ শরীর ?

২৪৫ উঃ দেব ও নারকীর বৈক্রয়িক শরীর। গর্ভজ ও সম্মূর্চ্ছন জন্মের ঔদারিক শরীর। প্রথম সংযত গণস্থানবর্তীর (শুভ কর্ম প্রাপক ও বিশুদ্ধ কর্মদ্বারা) আহারক শরীর উৎপন্ন হয়। তপোবিশেষের লাভ হইলে মনুষ্যাদিরও বৈক্রয়িক শরীর হয়। তৈজস দুই প্রকার যথা-ভিন্ন ও অভিন্ন। অভিন্ন তৈজস-শরীর প্রাণী মাত্রেরই আছে[৩০] কিন্তু ভিন্ন তৈজস তপোবিশেষ লভ্য।

২৪৬ প্রঃ বাক্যোৎপত্তি হয় কোথা হইতে ?

২৪৬ উঃ ভাষা বর্গণার পরমাণুর আকর্ষণে জীবের বাকশক্তি জন্মে।

২৪৭ প্রঃ মন হয় কিরূপে ?

২৪৭ উঃ মনোবর্গণার পরমাণুর আকর্ষণে দ্রব্য মনের উৎপত্তি হয়। (হৃদয় স্থানে অষ্ট পত্রের মত কমলাকার হয়।)

এইরূপ বস্তু নিচয়ের তত্বার্থ পর্যালোচনা দ্বারা সম্যগ্ দর্শন যুক্ত (শ্রদ্ধাবান) জীব-মণ্ডলী ব্যবহারিক সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করিয়া তপরূপ ব্রত, ধর্ম, ধ্যান ও ভাবনাদি দ্বারা ক্রমশঃ ব্যবহারিক সম্যক চারিত্র লাভ করতঃ নিশ্চয়াত্মক সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান ও চারিত্র লাভ করিয়া ধ্যান সমাধি দ্বারা মুক্তি রূপ প্রেয়সীর পাণিগ্রহণপূর্বক পূর্ণ পরমানন্দে আপ্লাবিত হইয়া থাকেন।

২৯ এই শরীর অন্তর্মুহূর্ত কেবলী, শ্রুত কেবলীর দর্শন করিয়া আসে এবং মুনির সংশয় ঘুচিয়া যায়।

৩০ অভিন্ন তৈজস দ্বারা জীবের শরীরে কান্তি সংঘটিত হয়।

জৈন দর্শনে অহিংসা

শ্রীমতী মঞ্জু দাশগুপ্ত

ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা সত্বেও নিছক ভারতীয় বলেই সম্ভবতঃ ঐকে'র সাধারণ ভূমিতেও এসব ধারার প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। জাগতিক অস্তিত্বের সর্ববিধ সুখ সমৃদ্ধি সত্বেও একমাত্র চার্বাক ছাড়া অপর সকলেই এক আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি বোধ করেন। কেননা জগতের সুখীতম ব্যক্তিও জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন। তাছাড়া জাগতিক সুখ অর্জনেও কত দুঃখ—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে সুখ অর্জন। অর্জিত সুখ ভোগেও শান্তি নেই। সর্বদাই ত্রাসে, ভয়ে, উদ্বেগে, আশঙ্কায় সুখের অনাবিল তৃপ্তি ব্যাহত হচ্ছে—এই বুঝি সুখ ফুরিয়ে গেল, এই বুঝি সুখ আগুনে পুড়ল, এই বুঝি সুখ চোরে নিল—প্রভৃতি দুশ্চিন্তায় সুখ সম্ভোগ কালেও শান্তি কই? আর সুখ যখন ফুরিয়ে গেল তখন অতীত সুখস্মৃতি বেদনাই বয়ে আনে। ফলতঃ ভঙ্গুর, অস্থির সাংসারিক সুখ যে স্বরূপতঃ 'অশ্বডিম্ব' মাত্র—সাংসারিক সুখ যে ছদ্মবেশে দুঃখমাত্র—এই অতৃপ্তি বোধই তাদের মধ্যে এই গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলে—কী করে এবং কোথায় মানুষ সেই অবিনশ্বর অবিচ্ছিন্ন মহান পরিতৃপ্তি তথা শান্তি পেতে পারে।

কর্ম বিধিতে বিশ্বাসী সকল ভারতীয় শিক্ষাই প্রচার করেছে যে, আত্মসংযমের পথেই আমরা এ জগতের সব দুঃখের অতীতে যেতে পারি। আত্মসংযম মানে আমাদের জৈব তথা জান্তব প্রবণতাকে আমাদেরই স্বরূপের উচ্চতর দিক বিচার বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ। তাই আত্মদমন তথা আত্মজয়ই হ'ল আত্ম সংযম। এতে করে অবশ্যই আমাদের ঐ জান্তব প্রবণতা তথা ইন্দ্রিয় সকলকে ধ্বংস করার কথাও বলা হচ্ছে না। বরং তাদেরকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা প্রশমিত করার কথাই বলা হচ্ছে। তাই আমরা দেখি যে আমাদের প্রকৃতির নিম্ন দিকের ধ্বংস সাধন করা নয়, বরং উচ্চদিকের দ্বারা নিম্নদিকের সংস্কার ও বশীভূত করণের মাধ্যমেই আত্মসংযম সম্ভব। নিম্নদিকের নিয়ন্ত্রণের অর্থ নঞর্থক এবং সদর্থক দুই-ই। এই দুই-ই যুগপৎ অনুসরণ করতে হবে। রাগ-দ্বেষ রূপ পাশব প্রবৃত্তি তাড়িত নিছক মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা হল নঞর্থক নিয়ন্ত্রণ। উপরন্তু জ্ঞান বিচারের দ্বারা চালিত হয়ে ভাল ভাল সব কাজ—কর্তব্য করা এইটাই সদর্থক দিক। ভারতীয় দর্শনের কঠোর কৃচ্ছতাবাদী মতবাদগুলোতে আমরা এরূপ দেখতে পাই। যেমন, যোগ দর্শনে পাই যোগাবস্থা লাভ করতে গেলে যোগাঙ্গের ওপর নির্ভর করতে

হবে। এই যোগাঙ্গের মধ্যে 'যম' অর্থাৎ কী কী করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে, এ শিক্ষার সাথে সাথেই 'নিয়ম' পালন অর্থাৎ কী কী আমাদের সদর্থক ভাবে করতে হবে সেই শিক্ষা পাই। 'যম' হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। এই যমের অনুশীলনের সাথে সাথেই নিয়মেরও অনুশীলন করতে হবে। নিয়ম হল দেহ ও মনের শুচিতা, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, স্বাধ্যায় ও ভগবানে আত্মসমর্পণ। অপর সমস্ত বেদবিশ্বাসী দর্শনগুলোতেও এবং এমন কি বেদ বিরোধী জৈন দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনেও মূলগত ভাবে অনুরূপ শিক্ষাই আমরা পেয়ে থাকি। জৈনগণ এবং বৌদ্ধগণ প্রেম (মৈত্রী), দয়া (করুণা) এবং অহিংসা শিক্ষা দেন। ইন্দ্রিয় সকলের কাজকে নির্মূল করে নয়, বরং তাদেরকে আমাদের প্রকৃতির উচ্চতর দিকের সেবায় নিযুক্ত করেই আমরা এ জগতের সব রকম দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার শিক্ষাও এইরূপ।

ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত অষ্টাঙ্গিক মার্গে এবং ভগবান মহাবীর প্রচারিত পঞ্চ মহাব্রতের অন্তর্গত অহিংসার শিক্ষা তাই ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মবাণী। এমন কি মহর্ষি বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাঠে জানতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে কর্ম বিধিতে অবিশ্বাসী নিছক আত্মগত স্থূল ইন্দ্রিয় সুখবাদী চার্বাকই ছিলেন না, উপরন্তু বাৎস্যায়ন সুশিক্ষিত চার্বাকেরও উল্লেখ করেন। তাঁরা সামাজিক শৃঙ্খলার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখতে তাঁরা রাজাকেও দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। ফলতঃ রাজার প্রতি অহিংস আচরণের দ্বারা যাঁরা জড়বাদী তাঁরাও প্রকারান্তরে সমাজান্তর্গত মানুষের প্রতি অহিংসাই পোষণ করতেন। এতে করে বোঝা যায় যে আধুনিক ইউরোপের পজিটিভিস্ট অথবা প্রাচীন গ্রীসের ডিমক্রিটাসের অনুবর্তীদের মতো প্রাচীন ভারতের বেদ বিরোধী জড়বাদীদের মধ্যেও সুশিক্ষিত চিন্তাবীর ছিলেন।

অহিংসা মন্ত্রের অন্যতম এবং জৈন ধর্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ভগবান মহাবীর তাঁর অনেকান্তিক স্যাদ্বাদ এবং অহিংসা, ত্যাগ সকল জীবাত্মার প্রতি সাম্য এবং প্রায়োগিক আশাবাদ (Pragmatic Optimism) প্রচার করে প্রচলিত দার্শনিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য এবং বৈষম্যকে বিদূরিত করার পথ অনুসন্ধান করেন। তাই জৈন শ্রমণেরা নিছক বেদের প্রাধান্যে, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে এবং বর্ণাশ্রম প্রথায় বিশ্বাস করেন না। অহিংসা এবং অনাসক্তিকে চাবিকাঠি করে তাঁরা ব্যক্তিগত নৈতিক উন্নতি এবং নৈতিক আচরণ ও আধ্যাত্মিক আচরণের ওপরই গুরুত্ব দিতেন। তাই তাঁদের কাছে অনেকান্তহীন বিচার যেমন মিথ্যা, অহিংসাহীন আচরণও তেমনি মিথ্যা, জৈন আচার বিচারের সাথে তাই অহিংসা এবং অনেকান্ত পরস্পর জড়িত হয়ে পড়েছে।

বস্তুতঃ আচারে অহিংসা, বুদ্ধিতে সমন্বয়ের শিক্ষাই ভগবান মহাবীর সকলের সামনে তুলে ধরেন। অহিংসা অর্থাৎ হিংসা না করা এবং সকল জীবের প্রতিই প্রেম ও করুণা প্রদর্শন করার কথা বলেন। মিথ্যা ভাষণ, অতিভাষণ, অপ্রিয় ভাষণ প্রভৃতি থেকে বিরত থাকতে হবে বরং সত্যভষী এবং প্রিয়ভাষী হতে হবে। অস্তেয় অর্থাৎ অদত্তদান গ্রহণে বিরত থাকতে হবে। জৈনরা মনে করেন কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল বাহ্য প্রাণ—কেননা ঐ সম্পত্তির ওপরেই যেহেতু তাঁর জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। তাই কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপহরণ করা মানেই পরোক্ষ তার প্রাণ হনন করা অর্থাৎ কিনা হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া। তাই তাঁরা অদত্তদান নেন না। ব্রহ্মচারী ব্রত পালন হল জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়গুলোকেই আয়ত্তে এনে ফেলা। নিজে ইন্দ্রিয়ের দাস না হয়ে ইন্দ্রিয়কে বরং আজ্ঞাবহতে পরিণত করা। অপরিগ্রহ হল কোনও বস্তুতে স্বামীত্ব অর্জনে অনাগ্রহ। সব ক'টি মহাব্রতই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান।

পঞ্চ মহাব্রত সাধুদের অবশ্য পালনীয় হলেও গৃহস্থদের জন্য এই ব্রত পালন শিথিল করা হয়েছে। তাই জৈন সাধুদের অর্থাৎ শ্রমণদের বলা হয় মহাব্রতী এবং জৈনগৃহীদের বলা হয় অণুব্রতী। ব্রত পালনের মূল উদ্দেশ্য হল রাগদ্বেষ থেকে নিবৃত্ত থাকা। তার জন্য জৈন সাধুরা কঠোর ভাবে এই মহাব্রতের অনুশীলন করেন। কারণ রাগ দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হলে হিংসাকেও স্বাভাবিক ভাবেই নিবৃত্ত করা যায় না বলেই জৈনরা মনে করেন।

হিংসা ও অহিংসার পার্থক্য জৈন ধর্ম ও দর্শনে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কারো দ্বারা হত, আহত বা দুঃখিত হলেই তা হিংসে হয় না। যেখানে আচরণ-কারীর মনেই মন্দ চিন্তা আছে, যেখানে তিনি অসাবধান বা প্রমাদগ্রস্ত, সেখানে বাইরের কোন হিংসা না হলেও তাকে হিংসা বলা যাবে। আবার যেখানে আচরণকারীর মন শুদ্ধ ও সাবধান, সেখানে বাইরের হিংসা হলেও তা হল স্বল্প বা লঘু হিংসা। জৈন ধর্মে অহিংসার ব্যাখ্যা অধ্যাত্মমূলক। বাহ্য হিংসাই সেখানে সব কিছু নয়। সামাজিক শৃঙ্খলা তথা সমাজের সুখ-শান্তি বাস্তবায়িত করতে গেলে সামাজিক মানুষের অহিংসায় প্রবৃত্তি থাকতেই হবে। সেই কারণেই জৈন দর্শনে অহিংসাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা জৈনদের বিশ্বাস যে অহিংসার সাহায্যেই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব।

২৫০০ বছর আগেকার প্রাচীন ভারতের রাজা, রাজপুরুষ, সেনাপতি, অভিজন, মন্ত্রী, বণিক, শিল্পী এবং কৃষক সর্বশ্রেণীর সকল স্তরের মানুষই ভগবান মহাবীরের অমৃতময়ী অহিংসার বাণীতে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন। সমগ্র ভারত ছাড়াও সুদূর প্রাচ্য এবং উত্তর পশ্চিমের ভারতীয় উপনিবেশ ও ভারতীয় কৃত রাজ্যগুলিতেও তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে জৈনরা সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় হলেও সারা ভারতেই তাঁরা

ছড়িয়ে আছেন। আর তাঁদের একটা বৃহৎ অংশই মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। কিন্তু তাই বলে কী ভগবান মহাবীরের অহিংসার বাণীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে বা কমে গেছে? বর্তমান সভ্যতার সংকটে তা কি আমাদের সঞ্জীবন মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত করবে না? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে অহিংসাব্রত দুর্বলের সাধ্য নয়। আমাদের অতীত মন্দ কাজের পরিণামকে আমাদের সৎ চিন্তা, সৎবাক্য এবং সৎ আচরণের দ্বারা আত্মাতে সঞ্জাত প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারাই একমাত্র বিদূরিত করা যেতে পারে। নিজ নিজ মুক্তির পথ তাই প্রত্যেককে নিজেকেই করে নিতে হবে। তীর্থংকরেরা আলোক সংকেতের কাজই করেছেন মাত্র। সুতরাং ভগবান মহাবীরের ধর্ম হল সাহসী এবং বলবানের ধর্ম। এ হল আত্ম-সহায়তার ধর্ম। সেই কারণেই মুক্ত পুরুষকে বলা হয় জিন এবং বীর। এই দিক থেকে ভারতীয় বৌদ্ধ, সাংখ্য এবং অদ্বৈত বেদান্ত-বাদীরাও এর সমান্তরাল শিক্ষাই দিয়ে থাকেন। আধুনিক মানবের সকল প্রকার চারুকলা ও শিল্পকৃতি এবং আধুনিকতম বিজ্ঞানের সকল আশীর্বাদও তাকে তার দুঃখ থেকে মাত্র সাময়িক এবং নিছক ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রদান করছে। এসব আমাদের দেহ-মনোগত যাবতীয় দুঃখের থেকে সার্মাগ্রিক মুক্তি ও চূড়ান্ত মুক্তির নিশ্চয়তা বহন করে আনে না। কিন্তু অন্তরে বাহিরে ভগবান মহাবীরের অহিংসা মন্ত্রে অভিষিক্ত কেবলী পুরুষেরাই একমাত্র সাংসারিক সকল প্রকার দুঃখের কবল থেকে সার্মাগ্রিক ও চূড়ান্ত মুক্তি যুগে যুগেই লাভ করছেন।

ভগবান মহাবীর ২৫০০তম নির্বাণ স্মারক গ্রন্থ, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৫

ত্রিশলা

যে বেদনা আমার লাগি মা'কে
সইতে হয়—গর্ভস্থ সেই শিশুর মনে জাগে,
যদিও তার নিতে না পারি সব,
খানিক আমি করতে পারি লাঘব,
বন্ধ যদি করি নড়া চড়া।

বন্ধ হতে নড়া—
মায়ের বুকে শঙ্কা জাগে কত,
শত শত,
গর্ভ কি মোর নষ্ট হল, করল বা কেউ চুরী-
চোখে নামে শ্রাবণ মেঘের ঝুরি,
দৈব একি আনল অভিশাপ—
কে জানত এমন হবে ?

দেখি মায়ের মনের তাপ
ভাবে শিশু, একি মোহ ডোর ?
যারে আজো দেখেনি চোখে
তার জন্য একি মোহ ঘোর ?
না না না, মোহ এ নয়—
এও ত সেই পরম ভালবাসা।
সকল বন্ধনাশা
যে আনন্দে নিত্য চলে গ্রহ তারা রবি
এরো মাঝে রয়েছে তারি ছবি।
মায়ের চেয়ে নয় ত বড় বিশ্বলোক—

মায়ের দৃষ্টি তখন অপলক
সকল অর্থহারা,
স্তব্ধ আঁখি তারা।

শিশু তখন উঠল আবার নড়ে
মায়ের চোখে মুক্তো গলে পড়ে,
অশ্রু ভেজা গানে
আনন্দ তাঁর এল আবার প্রাণে।

আশ্বিনের শিশির ভেজা
শিউলি ফুলের মত
মায়ের মন কোমল কত!

মূল : শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী
হিন্দী হতে অনূদিত

মৃগাবতী

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় দৃশ্য

[কৌশাম্বীর রাজসভা। শতানীক সিংহাসনে বসে রয়েছেন। পার্ষদেরা যথাস্থানে সমাসীন। প্রদ্যোতের দূত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মন্ত্রী মনে মনে পত্র পড়ছেন। পত্র পড়া শেষ হলে]

শতানীক : যুগন্ধর, প্রদ্যোতের কি অভিপ্রায় ?

যুগন্ধর : মহারাজ, অভিপ্রায় আত্ম বিনাশ।

শতানীক : আত্মবিনাশ ! এমন কী লিখেছেন তিনি বল দেখি ?

যুগন্ধর : [পত্রের দিকে তাকিয়ে] লিখেছেন আমি ভুজবলে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য আহরণ করে অবন্তীর রাজপ্রাসাদ সুশোভিত করেছি। এখন অবগত হলাম যে একটি অপূর্ব সৌন্দর্য কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সেই সৌন্দর্য শতানীকের মত নরপতির প্রাসাদে শোভা পায় না। তাই তিনি সেই সৌন্দর্যকে অবন্তীর রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে চান। তাই···

শতানীক : [দূতের দিকে চেয়ে] এর কি অর্থ ?

দূত : এর অর্থ ত খুব সরল। মহারাজ প্রদ্যোত বীর হলেও অনর্থক রক্তপাত করতে চান না, তাই আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন—

শতানীক : বল কি অনুরোধ ?

দূত : মহারাজ সংসারে সৌন্দর্যের অভাব নেই, না উদ্যানলতার। এক সৌন্দর্য চলে গেলে অন্য সৌন্দর্য নিয়ে আসা যায়। এক উদ্যান লতা বিনষ্ট হলে অন্য উদ্যান লতা রোপন করা যায়। এক নারী চলে গেলে তার রিক্ত স্থান অন্য নারী দিয়ে পূর্ণ করা যায়।···

শতানীক : দূত অনাবশ্যক ভূমিকা না করে তোমার বক্তব্য সুস্পষ্ট শব্দে ব্যক্ত করো।

দূত : তবে তাই করি মহারাজ। সম্রাট প্রদ্যোত কৌশাম্বীর অগ্রমহিষী মহারাণী মৃগাবতীকে অবন্তীর রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে চান।

[সমস্ত সভাসদ একসঙ্গে খাপ হতে তলোয়ার বার করছে]

১ম সভাসদ : মহারাজ ! প্রদ্যোতের নির্লজ্জতার সীমা নেই। বামন হয়ে সে আকাশের চাঁদ ছুঁতে চায়।

২য় সভাসদ ঃ মহারাজ! এই দূতের উপযুক্ত সাজা এর জিহ্বা ও হস্তপদ কর্তিত করে নগর চৌমাথায় ফেলে রাখা।

৩য় সভাসদ ঃ তার চেয়েও ভালো হয় যদি একে টুকরো টুকরো করে কেটে স্বর্ণথাল সাজিয়ে প্রদ্যোতের কাছে প্রেরণ করা হয়। এই ঘৃণিত অসম্মানজনক প্রস্তাবের এই যোগ্য পত্যুত্তর।

শতানীক ঃ সভাসদগণ! আমি আশা করব আবেশে এসে আপনারা রাজসভার মর্যাদা লঙ্ঘন করবেন না। [সকলের তলোয়ার খাপের মধ্যে প্রবেশ করছে] সভাসদগণ! এই মূর্খতাপর্ণ প্রস্তাবের যদি অবিবেকের সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেওয়া যায় তবে প্রদ্যোত ও শতানীকে পার্থক্য কোথায়? দূত কোনো অপরাধ করে না, দূত কেবল সন্দেশ পৌঁছায়। [দূতের দিকে চেয়ে] দূত! তুমি দাসীপুত্র প্রদ্যোতকে গিয়ে বল যে তার পিতার হস্তে মালবপতি কুণিকের রক্ত এখনো শুকিয়ে যায়নি। দাসত্বের চিহ্ন কুণিকের হাত হতেও বোধ হয় এখনো বিলুপ্ত হয়নি। অভিজাত বংশের সংস্কার সে তাই জন্মজাত ভাবে পায় নি। কিন্তু মানুষ দেখেও শেখে। ভারতবর্ষের এই পুণ্য ভূমিতে প্রখ্যাত কুলোৎপন্ন রাজাদের অভাব নেই। তাঁদের আচরণ হতে সে যেন আচরণ শেখে। সুন্দরী পরস্ত্রীদের প্রতি সে যেন লোলুপ দৃষ্টি না দেয়। তা যদি সে না করে তবে এক মু'ঠা অন্নের জন্য প্রদ্যোতের সন্ততিদের পথে পথে মাথা কুটে মরতে হবে। এমন নয় শতানীক অস্ত্রধারণ করতে জানেন না, তাঁর অস্ত্রধারণ দীন দুঃখীর রক্ষার জন্য, দুষ্টের দমনের জন্য। আর প্রদ্যোত দুষ্টই নয়, কামীও।

দূত ঃ মহারাজ! আর একবার ভেবে দেখুন। অনর্থক রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করবেন না। অহিংসার ছায়ায় শান্তি নিহিত। ধর্মের ছায়ায় নিরাকুলতা।

শতানীক ঃ মূর্খ! ধর্মের উল্লঙ্ঘন করে তুমি আমাকে ধর্মের উপদেশ দিতে এসেছ। আর যদি বাকবিস্তার করবে তবে তোমায় অপমানিত করে রাজসভা হতে বার করে দেওয়া হবে।

দূত ঃ তবে এই কথ ই গিয়ে বলব—

শতানীক ঃ হাঁ।

[দূত বেরিয়ে যাবে]

শতানীক ঃ সভাষদগণ! প্রদ্যোত নির্বীর্য নয়। তাই অবন্তীর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য কৌশাম্বীর সৈন্যদল সুসজ্জিত করতে হবে। [মন্ত্রীর দিয়ে চেয়ে] তুমি কি বল?

যুগন্ধর : আপনি যা বললেন তাই মহারাজ !

শতানীক : রূমন্বান সৈন্য সজ্জিত কর !

রূমন্বান : যে আজ্ঞা মহারাজ !

চতুর্থ দৃশ্য

[কৌশাম্বীর অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান]

পিঙ্গলা : ওলো মঞ্জুলা, কোথায় চলেছিস ?

মঞ্জুলা : দেব মন্দিরে পূজো দিতে।

পিঙ্গলা : কেন ? আজ অসময়ে পূজো দিতে ?

মঞ্জুলা : মহারাজ শতানীক অতিসারে পীড়িত হয়ে রোগশয্যায় শায়িত। তাই গ্রহ-শান্তির জন্য দেবী রাজপুরোহিতকে এই সিধে দিয়ে আসতে বলেছেন।

পিঙ্গলা : মহারাজ শতানীক অসুস্থ ? বলিস কি ?

মঞ্জুলা : শুধু তাই নয়। ওদিকে মালবপতি চণ্ডপ্রদ্যোত সৈন্য সুসজ্জিত করে কৌশাম্বী অভিযান সুরু করেছেন।

পিঙ্গলা : ও মা ! তবে আমাদের কি হবে ?

মঞ্জুলা : যা হবার তাই হবে। গ্রহশান্তির জন্য তাইত দেবী এই পূজো দিয়ে আসতে বললেন। যাই—

পিঙ্গলা : কিন্তু প্রদ্যোত হঠাৎ কৌশাম্বী আক্রমণ করছেন কেন ?

মঞ্জুলা : কৌশাম্বীর আর সবাই যখন জানে সে কথা তখন তুই জানিস না ! প্রদ্যোত মহাদেবীর প্রার্থনা করে পাঠিয়েছিলেন।

পিঙ্গলা : প্রদ্যোতের এত আস্পর্দ্ধা।

মঞ্জুলা : মহারাজ তাইত দূতকে অপমানিত করে দূর করে দিয়েছেন।

পিঙ্গলা : ঠিকই করেছেন কিন্তু…[বাইরের দিকে তাকিয়ে] ওমা ! ভগবতী কৌশিকী যে এদিকেই আসছেন।

[পরিব্রাজিকা প্রবেশ করছেন। মঞ্জুলা ও পিঙ্গলা তাঁকে প্রণাম করছে]

কৌশিকী : দীর্ঘজীবিনী হও। ভাল আছ ত ?

উভয়ে : আপনার আশীর্বাদে।

কৌশিকী : [মঞ্জুলার দিকে তাকিয়ে] পূজো নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস ?

মঞ্জুলা : রাজপুরোহিতের ওখানে। মহারাজ অতিসারে পীড়িত কিনা—

[কঞ্চুকীসহ দেবীর প্রবেশ]

মৃগাবতী : কিরে মঞ্জুলা, এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস। তোকে না তাড়াতাড়ি জো দিয়ে আসতে বললাম।

মঞ্জুলা ঃ আমি ত যাচ্ছিলাম। এর মধ্যে ভগবতী এসে গেলেন।

মৃগাবতী ঃ [কৌশিকীর দিকে তাকিয়ে] প্রণাম ভগবতী।

কৌশিকী ঃ চির আয়ুষ্মতি হও—

মৃগাবতী ঃ [মঞ্জুলার দিকে তাকিয়ে] তুই যা আমি ভগবতীকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাই। [মঞ্জুলা ও পিঙ্গলা বাইরে যাচ্ছে] [কৌশিকীকে] এই দিকে, এই দিকে। [দুজনে পরিক্রমণ করে বসছেন। কঞ্চুকী দূরে দাঁড়িয়ে থাকছে] [কৌশিকীকে] ভগবতী, আপনার কুশল ত ?

কৌশিকী ঃ হাঁ আমার সর্বাঙ্গীন কুশল। আপনার ?

মৃগাবতী ঃ আমার সমস্তই এখন অকুশল। আপনার আগমন কৌশাম্বীর এক সংকটকালীন মুহূর্তে হয়েছে।

কৌশিকী ঃ তার কিছু কিছু আমি জানি। কারণ অবন্তী হতেই আমি এখানে আসছি।

মৃগাবতী ঃ একদিকে আমার জন্য অবন্তীপতির যুদ্ধযাত্রা। অন্যদিকে স্বামীর অসুস্থতা। এক গভীর উৎকণ্ঠায় আমার দিন ব্যতীত হচ্ছে।

কৌশিকী ঃ আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই।

মৃগাবতী ঃ জানি না এতে কি মঙ্গল নিহিত রয়েছে। দেখতে পাচ্ছি চার দিক হতে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। ভগবতী ! কেন এমন হল ?

কৌশিকী ঃ সমস্তই দৈবের নির্বন্ধ। নইলে কেনই বা চিত্রকার আপনার প্রতিকৃতি রঙ-মণ্ডপে অঙ্কিত করবে আর মহারাজ ক্রুদ্ধ হয়ে দণ্ড দিয়ে তাকে বিতাড়িত করবেন।

মৃগাবতী ঃ কিন্তু চিত্রকারের সঙ্গে অবন্তীপতির যুদ্ধযাত্রার কি সম্বন্ধ ?

কৌশিকী ঃ অনেক সম্বন্ধ। সে আপনি জানেন না তাই। তার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ কর্তিত হলেও সে বাম হস্তে আপনার চিত্র অঙ্কিত করে মালবপতিকে উপহার দিয়েছে।

মৃগাবতী ঃ এখন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এতে তার লাভ ?

কৌশিকী ঃ প্রতিশোধ ! প্রদ্যোত আপনার চিত্রের জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পুরস্কার সে গ্রহণ করে নি। বলেছিল প্রতিশোধই আমার পুরস্কার। আমাকে অকর্মণ্য করে যে আমার জীবন বিড়ম্বিত করেছে আমিও তার জীবন এমনি বিড়ম্বিত করতে চাই।

মৃগাবতী ঃ বুঝেছি। কিন্তু কি হীনমনা ওই চিত্রকার। আমিত তার কোনো অনিষ্ট করিনি তবে সে কেন আমায় লাঞ্ছিত করতে চায়।

কৌশিকী ঃ দেবী ! প্রতিশোধের অগ্নি যখন হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয় তখন মানুষ বিবেকশূন্য হয়ে যায়। কিছু ভাববার বোঝবার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা : দেবী! মহারাজ এখুনি আপনাকে স্মরণ করেছেন।

মৃগাবতী : এখন তিনি কেমন আছেন?

পরিচারিকা : ওই রকমই।

মৃগাবতী : তুই যা, আমি যাচ্ছি। [পরিচারিকা চলে যাচ্ছে। কৌশিকীর দিকে চেয়ে] ভগবতী! আপনিও চলুন। তাঁকে আশীর্বাদ করবেন যাতে তিনি শীঘ্র নিরাময় হয়ে ওঠেন।

কৌশিকী : চলুন। [সকলে চলে যাবে]

পঞ্চম দৃশ্য

[শতানীকের শয়নকক্ষ। শতানীক শুয়ে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে মন্ত্রীরা বসে রয়েছে]

যুগন্ধর : [পত্র পড়ছেন তারপর চোখ তুলে] এত আপনারা সকলেই জানেন যে প্রদ্যোতের সৈন্যদল কি ভাবে কৌশাম্বী অবরুদ্ধ করেছে। বাইরে যাতায়াতের এখন সমস্ত পথই রুদ্ধ। এ পত্র তাঁর, তিনি জানিয়েছেন—তিন দিনের ভেতর যদি মহাদেবীকে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করা না হয় তবে দুর্গাক্রমণের জন্য তিনি দোষী হবেন না, দোষী হব আমরা।

[সকলে চুপ থাকবে]

শতানীক : মানুষ কত অসহায়। যেদিন প্রদ্যোতের দূত রাজসভায় এসেছিল। সেদিন গর্বের সঙ্গে বলেছিলাম, শতানীক নির্বীর্য নয়। কিন্তু আজ এই হাতে অস্ত্র-ধারণ করা ত দূর, আমি উঠে বসতেই অসমর্থ।...রুমন্বান—

রুমন্বান : মহারাজ!

শতানীক : দুর্গ আক্রান্ত হলে আমাদের সৈন্য কি দুর্গ রক্ষায় সমর্থ?

রুমন্বান : হাঁ মহারাজ।

শতানীক : তোমার স্বরে সেই নিশ্চিতি নেই রুমন্বান।. কেমন করে তাই বিশ্বাস করি যে তার প্রতিরোধ করতে আমরা সমর্থ। সত্যিই কি আমরা প্রদ্যোতের প্রতিরোধ করতে পারব না?

রুমন্বান : মহারাজ! প্রদ্যোতের সৈন্যদল দুর্দ্ধর্ষ আর—

শতানীক : আর কি রুমন্বান?

রুমন্বান : আপনার এই ব্যাধি আমাদের সৈন্যদের হতোৎসাহ ও দুর্বল করে দিয়েছে।

শতানীক : যুগন্ধর, এই অবস্থায় আমাদের কি কর্তব্য?

যুগন্ধর : সেই কথাই আমি চিন্তা করছি। দুর্গ রক্ষার প্রযত্ন করতে করতে আত্ম-বিসর্জন করা করা ছাড়াত আর পথ দেখি না।

শতানীক : মহারাণীর সম্বন্ধেও কি কিছু চিন্তা করেছ ?

যুগন্ধর : করেছি মহারাজ। ওঁকে নিজের সম্মান নিজেকেই রক্ষা করতে হবে।

শতানীক : বুঝতে পেরেছি তোমার অভিপ্রায় কিন্তু—

শীলবাহন : মহারাজ, আপনি অসুস্থ বলে প্রদ্যোতকে যদি এক পত্র দেওয়া যায়। আপনি যতদিন না ব্যাধিমুক্ত হচ্ছেন ততদিন যেন তিনি দুর্গাক্রমণ না করেন।

যুগন্ধর : সে হয় না শীলবাহন। প্রদ্যোত আমাদের এই আবেদন রক্ষা করবে না বরং তাতে আমাদের দুর্বলতাই প্রকাশিত হবে।

শতানীক : তুমিই ঠিকই বলছ যুগন্ধর। প্রদ্যোত যদি এত বিবেকশীল হত তবে এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের জন্য কৌশাম্বী আক্রমণ করত না।

শীলবাহন : তবে উপায় ?

যুগন্ধর : উপায়ের কথাত আমি আগেই বলেছি, মহাদেবী সহ আমাদের সকলেরই আত্ম বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সকলে : [দাঁড়িয়ে একস্বরে] আমরা সকলে প্রস্তুত।

শীলবাহন : [খাপ হতে তরবারি বার করে] আমি শপথ গ্রহণ করছি যে আমি এক পা-ও পিছে হটব না। শত্রুসৈন্য যদি দুর্গ প্রবেশ করে তবে আমার মৃত-দেহের ওপর দিয়েই তা করবে।

সকলে : সাধু ! সাধু ! আমরাও সেই শপথই গ্রহণ করছি।

শতানীক : আমি আশ্বস্ত হলাম। বৃমন্বান, সৈন্যদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থা কর।

বৃমন্বান : [দাঁড়িয়ে] যে আজ্ঞা, মহারাজ !

[দ্বার রক্ষকের প্রবেশ]

দ্বাররক্ষক : মহারাজ ! ভগবতী সহ মহাদেবী বাইরে অপেক্ষা করছেন।

শতানীক : ও'দের ভেতরে নিয়ে এস।

[কৌশিকী সহ মহাদেবী প্রবেশ করছেন। সকলে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তাঁরা মহারাজের নিকটে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন]

শতানীক : ভগবতী কৌশিকী ! এখান হতেই আপনাকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করছি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য উঠতে পারলাম না।

কৌশিকী : আপনি শীঘ্র নিরাময় হয়ে উঠুন এই আশীর্বাদ করি।

শতানীক : এখন তার আশা খুব কম। মৃত্যু দূত শিয়রে দাঁড়িয়ে। সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাজবৈদ্য ও আপনারা আমায় যতই কেন-না আশ্বাস দিন, আমি জানি আমার সময় খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তার জন্য দুঃখ নয়। মৃত্যু ত একদিন সকলেরি হয়। দুঃখ ত এই জন্য যে

কৌশাম্বীর এই সঙ্কট কালে আমি কেবল দর্শক হয়েই রইলাম। প্রদ্যোতের সৈন্য কৌশাম্বী আক্রমণ করছে—আর আমি পরলোক যাত্রা করছি।

মৃগাবতী : আপনি এমন করে বলবেন না আর্যপুত্র। প্রদ্যোতের এত কি শক্তি যে দুর্গ অধিকার করে নেয়। [কৌশিকীর দিকে চেয়ে] ভগবতী! আপনি আশীর্বাদ দিন আর্যপুত্র শীঘ্র নিরাময় হয়ে উঠুন।

কৌশিকী : আমি সেই আশীর্বাদই দিচ্ছি, দেবী।

শতানীক : সময় আর খুব অল্পই রয়েছে। উদয়ন কোথায়? আমি ওকে একবার দেখতে চাই।

[মন্ত্রী উদয়নকে ডাকবার জন্য বাইরে যাচ্ছেন। সেনাপতি সামন্ত আদি সকলেই ও'র পেছনে পেছনে বাইরে যাচ্ছে। কৌশিকীও এক পা একপা করে সরে বাইরে চলে যাচ্ছেন। মৃগাবতী শতানীকের পাশে বসে তাঁর মাথায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করছেন]

শতানীক : দেবী! এই সময়েও তোমার চিন্তা আমাকে ব্যাকুল করে দিচ্ছে। প্রদ্যোত অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির। [মৃগাবতীর দিকে এভাবে দেখছেন যেন তাঁর কাছে কিছু শুনতে চান]

মৃগাবতী : স্বামি, আমার জন্য আপনি একটুও চিন্তিত হবেন না। আমি হৈহয় বংশীয় ক্ষত্রিয়-কন্যা ও আপনার মত বীর ক্ষত্রিয়ের পত্নী। নিজের সম্মান কি ভাবে রক্ষা করতে হয় তা আমি জানি। প্রদ্যোত আমার মৃত দেহকেই পেতে পারে আমাকে নয়।

শতানীক : [মৃগাবতীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে] এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব। আর প্রদ্যোতকেও ক্ষমা করতে পারব।

[উদয়ন আসছে]

উদয়ন : বাবা! বাবা!

শতানীক : এসো বাবা এসো। আরো কাছে এসো। [উদয়নের হাত মৃগাবতীর হাতে দিতে দিতে] দেবী, একে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। এখন শান্তি। পূর্ণ শান্তি।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাৰ্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

  জৈন ভবন

  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

  ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র

  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

চতুর্থ বর্ষ ।। চতুর্থ খণ্ড

বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৩

কবিতা

গল্প

চিঠিপত্র

জীবনী

নাটক

প্রবন্ধ

WB/NC-120

Vol. IV No. 12 : Sraman : April 1977

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. R. N. 24582/73

বৈশাখ । ১৩৮৪ পঞ্চম বর্ষ । প্রথম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
পঞ্চম বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮৪ ॥ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

তীর্থংকরের মাতা-পিতা
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক
দেওপাড়া, রাজসাহী

ব্রাত্যরা কি শ্রমণ ছিলেন ?

মুনি রূপচন্দ্র

মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতিকে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা হত কিন্তু মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার পুরাকীর্তি একথা প্রমাণিত করে দিয়েছে যে আর্যদের আগমনের অনেক পূর্বে এখানে এক সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। তৎকালীন ভারতীয়েরা কেবল সুসভ্য, সুসংস্কৃত ও কলাবিদই ছিলেন না, আত্মবিদ্যারও তাঁদের মধ্যে বিকাশ ঘটেছিল যার সঙ্গে আর্যরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদদের অনেকেই একথা আজ স্বীকার করে নিয়েছেন যে মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার সংস্কৃতি আর্যেতর ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সংস্কৃতি অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও অধ্যাত্মসম্পন্ন ছিল। এই সিদ্ধান্তে আসবার পর এখন তাঁদের দৃষ্টি শ্রমণ সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে যা হাজার হাজার বছর ধরে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও অবিচ্ছিন্ন ভাবে আজো নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এর ওপর ভিত্তি করে তাঁরা বলছেন শ্রমণ পরম্পরার সঙ্গে সেই প্রাচীন সংস্কৃতির সম্বন্ধ থাকাই স্বাভাবিক। এই কথার সত্যতা স্থাপনে মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ যেমন সহায়ক হবে তেমনি আমার বিশ্বাস ঋগ্বেদ আদি বেদ হতেও তার পূর্ণ সমর্থন পাব। বর্তমান নিবন্ধে আমি অথর্ব বেদে প্রযুক্ত ব্রাত্য শব্দের ওপর ভিত্তি করে একথা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করব যে ব্রাত্য শব্দের শ্রমণ পরম্পরার সঙ্গেই সম্বন্ধ হওয়া উচিত।

ব্রাত্য শব্দ অর্বাচীন অর্থে আচার ও সংস্কারহীন মানুষের প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে। আচার্য হেমচন্দ্র তাঁর অভিধান চিন্তামণি কোষে সেই প্রকার অর্থই দিয়েছেন।

ব্রাত্যঃ সংস্কারবর্জিতঃ। ব্রতে সাধুঃ কালো ব্রাত্যঃ। তত্র ভবো ব্রাত্যঃ প্রায়শ্চিত্তার্হঃ, সংস্কারোঽত্র উপনয়নং তেন বর্জিতঃ ॥[১]

কিন্তু এই অর্থ মনুস্মৃতি ও উত্তরকালীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পূর্ববর্তী নয়।

মনুস্মৃতিতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> অতঃ ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
> সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ ॥[২]

অর্থাৎ, যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হবার পরও অসংস্কৃত তারা ব্রাত্য, আর্যদের দ্বারা তারা নিন্দনীয়।

---

১ অভিধান চিন্তামণি, ৩।৫১৮

২ মনুস্মৃতি, ২।৩৮

অন্য এক প্রকরণে মনুস্মৃতিকার লিখছেন ঃ

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তুতান্ ।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যানিতি বিনির্দিশেৎ ॥৩

যে ব্রাহ্মণ সন্ততি উপনয়ন আদি ব্রতরহিত সেই গুরুমন্ত্র পরিভ্রষ্ট মানুষকে ব্রাত্য নামে অভিহিত করা হয়। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে 'ব্রাত্য স্তোত্র'র জন্য বলা হয়েছে এই স্তোত্র পাঠে ব্রাত্যও শুদ্ধ সংস্কৃত হয়ে পুনরায় যজ্ঞের অধিকারী হতে পারে।৪ এই ব্রাহ্মণ ভাগের ওপর সায়নাচার্যের ভাষ্য আছে যাতে তিনি ব্রাত্যের অর্থ আচারহীনই করেছেন।

ব্রাত্যান্ ব্রাত্যতাং আচারহীনতাং প্রাপ্য প্রবসন্তঃ প্রবাসং কুর্বন্তঃ।

কিন্তু এদের পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে ব্রাত্য-র এই অর্থ স্বীকৃত নয়। বস্তুতঃ এর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রচলিত দেখা যায়। এই শব্দের প্রথম উল্লেখ আমরা অথর্ব বেদের পঞ্চদশকাণ্ডে পাই যাকে 'ব্রাত্য কাণ্ড' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর ভূমিকায় ভাষ্যকার সায়ন লিখছেন, এতে ব্রাত্যের স্তুতি করা হয়েছে। উপনয়ন আদি হীন মানুষকে ব্রাত্য বলা হয়। এরূপ ব্যক্তিকে বৈদিক কর্মে অনধিকারী ও সামান্যতঃ পতিত বলে মনে করা হলেও যদি কোন ব্রাত্য বিদ্বান ও তপস্বী হয় তবে ব্রাহ্মণ তাকে বিদ্বেষ করলেও সে সর্বপূজ্য হয় ও দেবাধিদেব পরমাত্মা তুল্য হয়।৫ সেই জায়গায় তিনি ব্রাত্যকে 'বিদ্বত্তম', 'মহাধিকার', 'পুণ্যশীল' ও 'বিশ্বাসম্মান্য'আদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন।

অথর্ববেদীয় চূলিকোপনিষদ ও যজুর্বেদীয় মান্তিকোপনিষদে ব্রাত্য সূক্তকে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা নিরূপক সূক্ত বলা হয়েছে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র অতিথির শুশ্রূষা করবার জন্য ব্রাত্য সূক্তের উল্লেখ করেছেন। পূজ্য, গুরু, আচার্য, স্নাতক, তপস্বী, রাজা আদি সকলকে সামান্যতঃ ব্রাত্য' শব্দে সম্বোধিত করবার আদেশ দিয়েছেন।

অথর্ববেদের পঞ্চদশকাণ্ডের প্রারম্ভ যে প্রকারে হয়েছে তাতে মনে হয় এর সম্পর্ক কোন আর্যেতর পরম্পরার সঙ্গে ছিল। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্লুমফিল্ড এই কাণ্ডকে শৈব দর্শনের প্রতিনিধিমূলক বলেছেন, যার সমর্থনে এই সূক্তে প্রযুক্ত নীললোহিত, ঈশান, মহাদেব আদি শব্দের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কল্পনা যথার্থ বলে মনে হয় না। 'কেবলমাত্র শব্দের ভিত্তিতে অনেক বিরোধী পরম্পরারও সমাবেশ করা যায়। কিন্তু একথা সত্যের নিকট বলে মনে হয় যে এর সম্পর্ক অন্য কোন পরম্পরার সঙ্গে হওয়া উচিত। প্রারম্ভ সূক্তটি এই প্রকার ঃ ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ—ব্রাত্য নিজের পর্যটন কালে প্রজাপতিকে প্রেরণা দিলেন। এতে প্রযুক্ত

৩ মনুস্মৃতি, ১০।২০
৪ হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যং প্রবসন্তিঃ...ষোড়শো বা এতৎ স্তোমঃ সমাপ্তু মহর্তি।
৫ অথর্ববেদ, ১৫।১।১।১

'আসীদীয়মান' ও 'প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ' এই দুই পদ বিশেষ মহত্বপূর্ণ যার মীমাংসা আমি পরে করব। তার ঠিক পরের উল্লেখ তো আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বলা হয়েছে স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপস্যৎ[৬]—সেই প্রজাপতি নিজের সুবর্ণ (আত্মাকে) দেখলেন। এর পর সম্পূর্ণ কাণ্ড ব্রাত্যের গরিমায় ভরা।

এখন প্রশ্ন এই যে এই ব্রাত্য কে যিনি প্রজাপতিকেও অনুপ্রেরিত করতে সমর্থ। ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ এর অর্থ 'পরমাত্মা' করছেন। যদিও এই কাণ্ডের নিজকৃত অনুবাদের ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করছেন অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত এই যে এই প্রসঙ্গ কোনো পরিভ্রমণশীল সম্প্রদায়ের প্রশংসায় রচিত।[৭] কিন্তু পরমাত্মা অর্থই তাঁর স্বীকার্য। বলদেব উপাধ্যায়ও তার সমর্থন করেছেন কিন্তু সমস্ত ব্রাত্যকাণ্ডের অনুশীলন করলে এই অর্থ সংগত বলে মনে হয় না। আমার ত মনে হয় এর যথার্থ অর্থ পাবার জন্য ব্রাত্য শব্দ ও ব্রাত্য কাণ্ডের প্রথম সূক্ত আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

প্রথমে আমরা ব্রাত্য শব্দকে নি। এর ব্যুৎপত্তি গত অর্থতেও নানা কারচুপী করা হয়েছে। ডাঃ গ্রীফিথ অথর্ববেদের (পঞ্চদশ কাণ্ডের) ইংরেজী অনুবাদে এর ব্যুৎপত্তি দিতে গিয়ে লিখেছেন—ব্রাত্যশব্দ ব্রাত হতে হয়েছে। ব্রাত-র অর্থ সমূহ ও ব্রাত্যের অর্থ আর্য হতে বহিষ্কৃত দলপতি। সে ব্রাহ্মণদের শাসন হতে সর্বথা মুক্ত ও স্বতন্ত্র।[৮] কিন্তু পঞ্চদশ কাণ্ডে এই অর্থোৎপন্ন বিসংগতি দূর করবার জন্য ডাঃ গ্রীফিথ পাদটিপ্পনীতে লিখেছেন—এই অপূর্ব রহস্যময় কাণ্ডের উদ্দেশ্য ব্রাত্যকে আদর্শরূপে উপস্থিত করা ও তার সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা মাত্র। আমার ত মনে হয় এই মিথ্যা ধারণার কারণ সম্ভবতঃ এই যে এঁরা এখানে প্রযুক্ত ব্রাত্য শব্দকে মনুস্মৃতি ও উত্তরকালীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষীতে গ্রহণ করেছেন। অন্যথা এর এই অর্থ স্বয়ং কোষ রচয়িতাদেরও মান্য হয়নি। অভিধান চিন্তামণির স্বোপজ্ঞ টীকায় আচার্য হেমচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় লিখছেন ব্রাতে বৃন্দে সাধুরিতি বা পৃথক্ ব্যপদেশ্যো ন ইত্যর্থঃ।[৯]

দ্বিতীয়তঃ বহিষ্কৃত দলের দলপতি হওয়া মাত্র তার উল্লেখ ও বিস্তৃত প্রশস্তি করা ঠিক মনে হয় না। পণ্ডিত প্রবর ওভ্রান্ট এই বৈসাদৃশ্যকে সৌসাদৃশ্যে পরিণত করার অসফল প্রয়াস করতে গিয়ে লিখেছেন—যে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করে উপস্থিত হত ও ব্রাহ্মণ আর্যদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করত তার জন্য এই প্রশংসা লেখা হয়েছে।[১০] কিন্তু একে স্বকপোল কল্পনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

৬ অথর্ববেদ, ১৫।১।১।৩
৭ অথর্ববেদীয় ব্রাত্যকাণ্ডম্, সম্পূর্ণানন্দ, ভূমিকা, পৃঃ ২
৮ অথর্ববেদ সংহিতা (তৃতীয় খণ্ড ভূমিকা, পৃঃ ৩৬, শ্রীজয়দেব শর্মা
৯ অভিধান চিন্তামণি, ৩।৫১৮
১০ অথর্ববেদ সংহিতা, তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ

বস্তুতঃ ব্রাত্য শব্দ ব্রত হতে উদ্ভূত। এর মূল বৃ—বরণে। ব্রিয়তে যদ্ তদ্ ব্রতম্, ব্রতে সাধুঃ কুশলো বা ইতি ব্রাত্যঃ। ব্রতের অর্থ ধার্মিক সংকল্প, যে সংকল্পে সাধু, কুশল সে ব্রাত্য। ডাঃ হেবর এই শব্দের বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে লিখছেন—Vratya as initiated in *vratas*: Hence Vratya means a person who has voluntarily accepted the moral code of vows for his own spiritual discipline.—ব্রতে দীক্ষিত ব্রাত্য। অর্থাৎ আত্মানুশাসনের দৃষ্টিতে স্বেচ্ছায় যে ব্রত গ্রহণ করেছে সে ব্রাত্য। এই প্রসঙ্গে তার প্রবৃত্তি লভ্য অর্থ দিতে গিয়ে তিনি লিখছেনঃ Vratyas as a class of heterodox nomadic holymen [১১] আর্যেতর পরিভ্রমণশীল সাধুসংঘ—ব্রাত্য।

যখন আমরা ব্রাত্যর মূল ব্রত স্বীকার করে নেই তখন ব্রাত্য শ্রমণ পরম্পরার স্বীকার করে নিতে কষ্ট কল্পনা করতে হয় না। ব্রতবিধির পরম্পরা শ্রমণ সংস্কৃতির মৌলিক অবদান। এই পরম্পরায় এই অবসর্পিণীর প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের সাধনা পদ্ধতিতে ব্রতরই প্রমুখ স্থান, বেদপরবর্তী সাহিত্যে ব্রতের বিধান পাওয়া গেলেও তার পূর্বে পাওয়া যায় না। তাই একথা নিশ্চিত যে ব্রাহ্মণদের সাধনা পদ্ধতিতে ব্রত শ্রমণ পরম্পরা হতে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রাত্যকাণ্ডের প্রথম সূক্তে ব্রাত্যর বিশেষণ 'আসীদীয়মান' শ্রমণ সংস্কৃতির প্রতিই ইঙ্গিত করে। আসীদীযমান-এর অর্থ পর্যটন নিরত। এতে মনে হচ্ছে নিয়ত প্রব্রজন করতে থাকা এই ব্রাত্য সম্প্রদায়ের চর্যা ছিল। স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীদিশমনু-ব্যচলৎ, [১২] স উদতিষ্ঠৎ স প্রতীচীং দিশমনুব্যচলৎ,[১৩] স উদতিষ্ঠৎ স উদীচীং দিশমনুব্যচলৎ [১৪] আদি বিভিন্ন সূক্ত আরো সূচিত করে যে তার প্রব্রজনের ক্ষেত্র সীমিত ছিল না। সমস্ত দিকে সে নির্বন্ধ বিচরণ করত। অপ্রতিবন্ধরূপে প্রব্রজন করা শ্রমণদের আজো অনিবার্য নিয়ম। এই পরম্পরায় সাধুর জন্য এই নিয়ম যে এক বর্ষাবাস ছাড়া সে কোথাও দীর্ঘ দিন স্থায়ী হবে না, প্রব্রজন করতে থাকবে। [১৫] ডাঃ গ্রীফিথ ব্রাত্যদের ত ধার্মিক পরিব্রাজক বলেছেন। [১৬] এ হতে এই নিষ্কর্ষই পাওয়া যায় যে আর্যদের আসবার আগে, ভারতবর্ষে এই ধরণের সাধু ছিলেন যাঁরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ

---

১১ *History and Doctrines fo Ajivikas* A. L. Bhasham p 8

১২ অথর্ববেদ, ১৫।১।৬।১

১৩ অথর্ববেদ, ১৫।১।২।১৫

১৪ অথর্ববেদ, ১৫।১।২।৯

১৫ দশবৈকালিক চূলিকা, ২

১৬ *History of Dharmasarstra,* Dr Kanne Vol.II Part I, p. 38

সমস্ত দিকে যাযাবরের মত প্রব্রজন করতেন ও জনতাকে অধ্যাত্ম সাধনার উপদেশ দিতেন।

শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালংকারও ব্রাত্যদের অর্হ'তানুগামী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখছেন—বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্বেও ভারতে বেদ ভিন্ন মার্গ ছিল। অর্হ'তেরা বুদ্ধেরও পূর্বে ছিলেন। সেই অর্হ'ৎ ও চৈত্যের অনুযায়ীদের ব্রাত্য বলা হত যাদের উল্লেখ অথর্ববেদে পাওয়া যায়।[১৭]

ব্রাত্যর যে স্বরূপ অথর্ববেদে দেখান হয়েছে এতে এ স্বতঃ প্রমাণিত হয় যে তারা আত্ম সম্পন্ন ও আধ্যাত্মিক মার্গদর্শক ছিলেন যাঁদের প্রেরণায় প্রজাপতি স্বয়ং নিজের সুবর্ণময় আত্মাকে পরিজ্ঞাত হলেন। বিশেষ সাধনাসম্পন্ন ও আত্মদ্রষ্টা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ প্রজাপতিকে প্রেরণা দেবে তা কল্পনা করা যায় না।

এর অতিরিক্ত ব্রাত্যকাণ্ডে আরো এমন কিছু সূক্ত রয়েছে যা এর পুষ্টিসাধন করে। যেমন—স সংবৎসর মূর্ধ্বোংহতিষ্ঠৎ তং দেবা অব্রুবন ব্রাত্য কিং নু তিষ্ঠসীতি—সে সংবৎসর দাঁড়িয়ে রইল। দেবতারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাত্য তুমি কেন দাঁড়িয়ে রয়েছ?[১৮] আচার্য তুলসী 'শ্রমণ সংস্কৃতিকে প্রাগ্-বৈদিক অস্তিত্ব' প্রবন্ধে প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের জীবনের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। তাঁর মতে এই সূক্ত ঋষভদেব দীক্ষিত হবার পর সংবৎসর তপস্যায় স্থির হয়ে ছিলেন তার চিত্র চিত্রিত করছে। এক বছর পর্যন্ত আহার গ্রহণ না করা সত্বেও তাঁর শরীরে পুষ্টি ও দীপ্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।[১৯]

অন্য এক সূক্ত বলছে—সে অনাবৃত দিকে গেল। সে ভাবল আর প্রত্যাবর্তন করবনা[২০]। যে দিকে গেলে আবর্তন হয়না তাকে অনাবৃতদিক বলা হয়। এইজন্য সে ভাবল আমি প্রত্যাবর্তন করবনা। একমাত্র মুক্ত পুরুষেরই প্রত্যাবর্তন হয়না।[২১] ভগবান ঋষভ সম্পর্কেই ত একথা বলা হয় যে তিনি অন্তকালে অপুনরাবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হলেন যেখানে গিয়ে কেউ ফিরে আসে না।

এ প্রকার আরো অনেক সূক্ত রয়েছে যা ব্রাত্যর মহত্ব ও তৎকালীন ভারতীয় সমাজের ওপর তার প্রভাব ব্যক্ত করছে। সায়ন ব্রাত্যর জন্য বিদ্বত্তমং এর সঙ্গে সঙ্গে কর্মপরে ব্রাহ্মণৈর্বিদ্বিষ্টং বিশেষণ দিয়েছেন। এ হতে ব্রাত্যর তৎকালীন স্বরূপের কেউ কল্পনা করতে পারবেন না। সায়ন এই কাণ্ডের তাৎপর্যকে সমগ্রতায় ধরতে

১৭ ভারতীয় ইতিহাসকী রূপরেখা, পৃঃ ৩০৯
১৮ অথর্ববেদ, ১৫।১।৩।১
১৯ জৈন ভারতী, বর্ষ ১২, অঙ্ক ৮
২০ অথর্ববেদ, ১৫।১।৬।১৮
২১ অথর্ববেদ, ১৫।২।৬।১২

পেরেছেন কিনা সে সম্বন্ধেও আজকের পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে। কারণ সায়ন পর্যন্ত আসতে আসতে ব্রাত্য তার প্রাগবৈদিক ও বৈদিক অর্থ পরম্পরা হারিয়ে অনেক নীচে নেবে এসেছে।

তবে একথা বলা যায় যে ব্রাত্যদের প্রতি আর্যদের মনে মানসিক ঘৃণা অবশ্যই ছিল। কারণ এক দীর্ঘ সংঘর্ষের পরও যখন ওদের পরাস্ত করা গেলনা, বা বিজয়ী হবার পরও সুখে অবস্থান সহজ হলনা বা জীবনের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করা গেলনা তখনই তাঁরা ব্রাত্যদের সম্মান দিলেন এরূপ মনে হচ্ছে। ঋগ্বেদে তাদের উল্লেখ না হয়ে অথর্ববেদে, যার রচনা ঋগ্বেদের দু তিন শতাব্দী পরের বলা হয় তাতে তাদের এত গরিমা এই তথ্যের দিকেই সংকেত করে যে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন মতবাদের লোক হওয়া সত্বেও আর্যদের বিবশ হয়ে নিজেদের সাহিত্যে তাদের স্থান দিতে হল। আর্য হতে ভিন্ন হবার ও সহজ সম্মান্য না হবার সমর্থন আমরা অন্য এক সূক্তে পাই। সেখানে বলা হয়েছে—রাজার ঘরে যদি এমন বিদ্বান ব্রাত্য অতিথি হয়ে আসেন ও সেই রাজা সেই বিদ্বানের আগমন নিজের জন্য কল্যাণকারী বলে মনে করেন তবে তিনি ক্ষাত্র বা রাষ্ট্রের প্রতি অপরাধ করেন না।[২১]

আই সিদ্দে, *The Religion and Philosophy of Atharva Veda* গ্রন্থে ব্রাত্যদের আর্যেতর বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখছেন—বস্তুতঃ ব্রাত্যরা কর্মকাণ্ড প্রধান ব্রাহ্মণ হতে স্বতন্ত্র ছিলেন। কিন্তু অথর্ববেদ আর্যদের সঙ্গে তাঁদের সম্মিলিতই করল না তাঁদের মধ্যে যাঁরা উত্তম সাধনা সম্পন্ন ছিলেন তাঁদের উচ্চতম সম্মানও দিল।[১২]

তাই ব্রাত্যদের স্বরূপ এভাবে আমাদের সামনে আসে যাতে মনে হয় তাঁরা আর্য-ভিন্ন সম্পন্ন পরম্পরার অনুযায়ী। আত্মার তাঁদের জ্ঞান ছিল, অধ্যাত্ম সাধনা তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভিক্ষুর মত একস্থান হতে অন্যস্থানে অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রসার করতে করতে তাঁরা পর্যটন করতেন। তাঁরা যেখানেই যেতেন সমস্ত প্রকারের মানুষ তাঁদের সামনে নত মস্তক হয়ে যেত। ইন্দ্র, আদিত্য, দেবগণ, বৈরূপ, বৈরজ, বরু আদির দ্বারা সম্মান্যই ছিলেন না, তারা তাঁদের অনুসরণও করতেন। তাঁদের নেতা এক ব্রাত্য ছিলেন[২৩] যাঁর নেতৃত্বে সমগ্র সঙ্ঘ পরিচালিত হত। আর্যদের মধ্যে তাঁর প্রতি মানসিক গর্হা থাকা সত্বেও অথর্ববেদে উদ্গীত মাহাত্ম্যে এই তথ্যই উদ্ঘাটিত করে যে প্রভাবশালী, আত্মসম্পন্ন ও সুসংগঠিত হবার জন্য আর্যদেরও তাঁকে উচ্চ স্থান দিতে হল।

•• Vratyas were outside the pale of the orthodox Aryans. The *Atharva Veda* not only admitted them in the Aryan fold but made the most ri htous of them the highest divinity.

অথর্ববেদ, ১৫।১।১।৩

রুক্মিণী

পাটলীপুত্রের নগর উদ্যানে এসে অবস্থান করছেন আচার্য বজ্র।

তপস্যাপূত আচার্যের জীবন। মাতৃক্রোড় হতেই তিনি শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করেছিলেন। আর্যিকাদের দ্বারা হয়েছেন লালিত পালিত। আর্যিকাদের কণ্ঠোচ্চারিত শাস্ত্রপাঠেই হয়েছে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান। আট বছর বয়সে শ্রমণ দীক্ষা, যৌবনারম্ভের পূর্বেই আচার্য পদ লাভ। যেমন ছিল তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য তেমন ছিল তাঁর বাইরের রূপ।

আচার্যের অপরিমিত সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের কথা কানে গিয়েছে শ্রেষ্ঠী-প্রধান ধনবাহ কন্যা রুক্মিণীর কানে। মনে মনে সে তাই তাঁকেই বরণ করে নিয়েছে। বিবাহ যদি করতে হয় তবে আচার্য বজ্রকে।

সখীরা তাকে কত বুঝিয়েছে—এ বিবাহ সম্ভব নয়। ত্যাগব্রতী সাধুর সঙ্গে সাধনারই সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, বিবাহের সম্পর্ক নয়। কিন্তু রুক্মিণীর সঙ্কল্পও কঠোর। ইহজীবনে সে আচার্য বজ্র ছাড়া আর কারুকে বরণ করে নিতে পারবে না।

শেষে সে কথা ওঠে শ্রেষ্ঠী-প্রধান ধনবাহের কানে। তিনি বলেন, একি শুনছি কন্যা।

নীরবে নত নেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে রুক্মিণী।

তুমি কি জানো না আচার্য বজ্র তোমাকে কখনো গ্রহণ করবেন না।

কোনো প্রত্যুত্তর দেয় না রুক্মিণী।

যদি না করেন তবে তুমি কি করবে? তুমি কি আজীবন চির কুমারী হয়ে থাকবে?

ধীরে ধীরে মুখ তোলে রুক্মিণী। বলে, তাই থাকব পিতা।

কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন চিন্তা করেন শ্রেষ্ঠী-প্রধান। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, আমার কুলযশের কথা তুমি কি জান না কন্যা?

জানি পিতা।

কিন্তু সেই কুলের কন্যা হয়ে তুমি যদি চিরকুমারীর জীবন যাপন কর তবে সর্বসমাজে এই কুলের অপযশ প্রচারিত হবে নাকি?

পিতার প্রশ্ন শুনে সম্ভ্রস্তের মত চমকে ওঠে রুক্মিণী। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নেয়। তারপর ধীর দৃষ্টি তুলে শান্ত স্বরে বলে, আপনি কি বলতে চাইছেন পিতা, চিরকুমারী হয়ে বেঁচে থাকার পরিবর্তে আপনার কন্যা যদি এই মুহূর্তে

মৃত্যু বরণ করে নেয় তবে কি আপনার কুলখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকবে ?

ব্যথা বিব্রত স্বরে বলেন শ্রেষ্ঠী-প্রধান, না কন্যা। তোমার পিতাকে এত নিষ্ঠুর মনে করো না।

অশ্রু বাষ্পাচ্ছন্ন হয় রুক্মিণীর দুই চোখ। বলে, আমার রূঢ় ভাষণের অপরাধ ক্ষমা করুন পিতা। আদেশ করুন, বলুন কি করলে আপনার কুলখ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবে না।

তুমি আচার্য বজ্রকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।

সে হয়না পিতা। মেয়েরা একবারই আত্মদান করে থাকে।

কিন্তু তিনি তোমায় গ্রহণ করবেন না—বলে কি এক ভাবনায় অন্তর্লীন হয়ে যান শ্রেষ্ঠী-প্রধান।

পিতা !

স্বপ্নোত্থিতের মতো তিনি সহসা চোখ তুলে তাকান। বলেন, এক উপায় আছে কন্যা, কুল খ্যাতি আরো প্রসারিত হবে যদি তুমি সাধ্বী ব্রত গ্রহণ কর। বিষয় সংসর্গ হতে মুক্ত হয়ে সাধনায় উৎসর্গীত প্রাণ হও।

এক নূতন দিগন্ত যেন উন্মুক্ত হয় রুক্মিণীর চোখের সামনে। বলে তাই হবে পিতা, তিনি যদি আমায় প্রত্যাখ্যান করেন।

পিতার সঙ্গে আচার্য সন্নিধানে এসেছে রুক্মিণী। রত্নাভরণে সজ্জিত হয়ে নয় নবকাশসন্নিভ সুশ্বেত ক্ষৌম পট্টবাস পরিধান করে, শ্বেত স্ফটিকোপল কণিকায় খচিত শ্বেতাংশুকজালে কবরী আচ্ছন্ন করে। তারপর আচার্যের পায়ের কাছে প্রণাম করে দূরে সরে বসে। তার অসিত নয়নে চেয়ে দেখে আচার্যের মুখের দিকে। সে যা শুনেছিল তার চাইতে অনেক বেশী সুন্দর এই মুখ, অনেক বেশী প্রদীপ্ত, অনেক বেশী প্রতিভাশালী।

আচার্যের কাছে নিবেদন করেন শ্রেষ্ঠী-প্রধান—আমার কন্যা আপনার অনুরাগিনী। আপনাকে ও আত্মদান করেছে। আপনাকে ছাড়া ও আর কাউকে পতিত্বে বরণ করবে না। মহাভাগ, আপনি ওকে গ্রহণ করুন।

এক স্মিত রেখা ফুটে ওঠে আচার্য বজ্রের মুখে। শ্রেষ্ঠী-প্রধানকে কোনো প্রত্যুত্তর দেন না। কি যেন চিন্তা করেন তারপর চেয়ে দেখেন ব্রীড়াবনতমুখী রুক্মিণীর মুখের দিকে।

নিশ্চুপে বসে থাকে রুক্মিণী। তার কেমন যেন মনে হয় আচার্যের সেই চোখের দৃষ্টি তার বহিরাবরণ ভেদ করে সমস্ত আত্মপ্রদেশে যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সে যেন তার সম্বীতি হারিয়ে ফেলতে বসেছে। একি মায়াবীর মায়াজাল না সাত্ত্বিক যোগীর যোগবল ? সেই মুহূর্তে সে শুনতে পায়

আচার্যের কণ্ঠস্বর—কল্যাণী, তুমি যদি আমার অনুরাগিনী তবে ছায়ার মত আমার অনুসরণ কর।

উদ্যান হতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন রুক্মিণী সহ শ্রেষ্ঠী-প্রধান। অপরাহ্নের আকাশ বক্ষ হতে তখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল ক্লান্ত দিবসের সৌরকর প্রভা। সন্ধ্যার রক্তরাগ ফুটে উঠেছিল শ্রান্ত চিতানল জ্যোতির মত। তারপরেই পৌর্ণমাসী রজনীর পূর্ণ শশধর। সেই দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে প্রশ্ন করেন শ্রেষ্ঠী-প্রধান—কন্যা, বুঝতে পেরেছ আচার্যের প্রত্যাদেশের অর্থ?

বুঝতে পেরেছি পিতা। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। তাঁর কাছে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন।

সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করেছে রুক্মিণী। তারপর দীর্ঘ বারো বছর ছায়ার মত অনুসরণ করেছে আচার্য বজ্রের, বিষয় সংসর্গ হতে দূরে সরে গিয়ে, আত্মজ্ঞান সাধিকা ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করে। কিন্তু পেয়েছে কি সে সেই পরমা প্রাপ্তি? আজো তবে কেন ভালো লাগে আচার্যের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে, জীবনে কেন সে অনুভব করে ক্লান্তি? তার আত্মজ্ঞানের সাধনা সে কি শুধু ছলনা? তার বারো বছরের পরিব্রজ্যা শুধু কণ্টকক্ষত বিব্রত এক অভিসার?

সহসা পদশব্দে চকিতে চায় রুক্মীণী। সামনে দাঁড়িয়ে আচার্য বজ্র।

আজো তুমি আমার ধর্ম গ্রহণ করতে পারলে না কল্যাণী?

আচার্য বজ্রের এই শান্ত ভর্ৎসনাকে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করে নেবার জন্যই যেন নীরব মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে রুক্মিণী। নিজের হৃদয় সম্বন্ধে তার মনে আর কোন সন্দেহ নেই। উপলব্ধি করেছে সে—তার জীবন সাধ্বীর জীবন নয়, প্রেমার্থিকা এক নারীর জীবন। একথা যে সে উপলব্ধি করেছে তাই নয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন আচার্য বজ্রও একথা জেনে তার আরো ভালো লাগছে।

আচার্য বজ্রের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—কল্যাণী! আমার কাছ হতে এবার তোমায় চিরদিন দূরে সরে যেতে হবে।

গুরুর একি কঠোর প্রত্যাদেশ! সহসা অশ্রুপ্লুত হয়ে ওঠে রুক্মিণীর দুই চোখ। কিন্তু তারপরই এক সুন্দর হাস্য রেখা তার অধরে শিহরিত হয়ে ফুটে ওঠে। বলে, যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি তাঁর আমার সান্নিধ্যকে এত ভয় কেন?

শান্ত স্বরে বলেন আচার্য, ভয় নয় কল্যাণী! একগ্রতায় তুমি পরমা প্রাপ্তির দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। একটুখানি যে বাধা সে বাধা আমার প্রতি তোমার অনুরাগ। যেদিন তা থাকবে না সেদিন তুমি আমি দুই সত্বাও থাকব না। সেইত পরম প্রাপ্তি।

ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রুক্মিণীর দুই চোখ। আচার্যের সুস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে এক দিব্য প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হয় তার আনন শোভা।

জৈনদিগের দৈনিক ষট কর্ম

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

হিন্দু দ্বিজাতির পক্ষে প্রতিদিন পাঁচটী মহাযজ্ঞের[১] অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই যজ্ঞগুলির মধ্যে সকলগুলিতেই দেবতোদ্দেশে অগ্নিতে আজ্যাদি আহুতি দিতে হয় না। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান একটু অন্যরূপ। বেদাদির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্বদেব হোম দেবযজ্ঞ, পশুপক্ষীদিগকে অন্নদান ভূত যজ্ঞ আর অতিথি পূজন নৃযজ্ঞ।[২] প্রাচীন কালে প্রত্যেক দ্বিজ নিত্য নিয়মিতভাবে এই পাঁচ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এগুলি তাঁহাদের নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুগণের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ জৈনগণের পক্ষে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্ম বা ছয়টি কার্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম আছে। সেইগুলির বিষয় সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। জৈন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

দেবপূজা গুরূপাস্তিঃ স্বাধ্যায়ঃ সংযমস্তপঃ।
দানং চেতি গৃহস্থানাং ষট্ কর্মাণি দিনে দিনে ॥

দেবপূজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রাধ্যয়ন), সংযম, তপস্যা এবং দান—এই ছয়টি কর্ম প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই জৈন শাস্ত্রের বিধান। এই ষট কর্মই জৈনদিগের নিত্য কৃত্যের মধ্যে সর্বপ্রধান। জৈন শ্রাবক প্রতিদিন তাঁহার ধর্মের জন্য শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে অন্য কোনও কার্য করুন আর নাই করুন, এই ষটকর্মের অনুষ্ঠান তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। তবে কোন বিধিই সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যিনি সম্যগ জ্ঞানী, যিনি বিদ্বান্, যিনি সমর্থ, তিনি সম্যক রূপে এই ষট কর্মের সমস্ত বিধান পালন করিয়া চলিবেন। আর যিনি অল্পজ্ঞ—যিনি অসমর্থ, তিনি যথাসাধ্য প্রতিদিন ষট্‌কর্মের প্রত্যেক কর্মের অন্ততঃ আংশিক অনুষ্ঠান করিবেন। কার্যতঃও দেখিতে পাওয়া যায়, জৈন দিগের মধ্যে সকলেই যথাশক্তি ষট্‌কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ, হিন্দু ব্রাহ্মণাদির সন্ধ্যাবন্দনাদির মত এই ষটকর্ম জৈনদিগের অবশ্য কর্তব্য নিত্যকর্ম বলিয়া পরিগণিত। এই সকল

---

১ ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

২ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥

—মনুসংহিতা ৩।৭০

কর্মানুষ্ঠানের যে সকল বিধান জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে কথঞ্চিত আলোচনা এইবার করিব।

দেবপূজা

দেব (চতুর্বিংশতি অতীত জিন বা তীর্থংকর, চতুর্বিংশতি বর্তমান তীর্থংকর এবং চতুর্বিংশতি ভবিষ্যৎ তীর্থংকর), গুরু (আচার্য, উপাধ্যায়, সাধু, মুনি প্রভৃতি) ও শাস্ত্র—এই সকলকেই জৈনগণ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। নিত্যপূজায় সাধারণতঃ তাঁহারা তীর্থংকরগণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিসহকারে জল প্রভৃতি অষ্টদ্রব্যের দ্বারা সেই মূর্তির পূজা করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও নিজ গৃহেই এইরূপ জিনমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাঁহাদের বাড়ীতে এইরূপ জিনমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহারা গৃহেই নিত্যপূজা সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের গৃহে এরূপ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, তাঁহারা নিকটবর্তী জিন মন্দিরে যাইয়া পূজাকার্য সমাধা করেন। একটা কথা এস্থানে বলা দরকার—জৈনেরা যে সকল দেবমূর্তি প্রস্তুত করেন, তাহা হয় ধাতুময়ী, না হয় পাষাণময়ী। মৃণ্ময়ী মূর্তি প্রস্তুত করা তাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

নিত্য পূজার সময় যে মন্দিরে যে তীর্থংকর প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পূজা করা বিধেয়। একসঙ্গে চতুর্বিংশতি তীর্থংকরের পূজাও করা যাইতে পারে। এইরূপ একত্র চতুর্বিংশতি তীর্থংকরের পূজা করার নাম 'সমুচ্চয়চতুর্বিংশতিজিনপূজা'।

জৈনদিগের পূজ্য এই যে জিন বা তীর্থংকর, ইঁহারা মানব রূপেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা তপশ্চর্যাদি প্রভাবে কর্ম বন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছেন এবং সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণলাভ করিয়া সাধারণকে মোক্ষ লাভের উপায় সমূহ (বা মোক্ষ মার্গ) নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মুক্ত পরমাত্মার পূজাকে জৈনাচার্যগণ শ্রাবকের দৈনন্দিন কৃত্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া বোধ হয় ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই তীর্থংকরগণই প্রত্যেক শ্রাবকের আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক শ্রাবকেরই তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহাদের আচরণের সর্বথা অনুকরণ করিয়া, তাঁহাদেরই মত মোক্ষলাভের জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। জৈন শাস্ত্রের যে ইহাই একমাত্র অভিপ্রায়, তাহা জিন পূজার মন্ত্রগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। মোক্ষ ভিন্ন জৈন দিগের জীবনের অপর কোন লক্ষ্য নাই—মোক্ষলাভই এই নিত্য জিন পূজার মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। পূজার প্রতি মন্ত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূজাকালে তীর্থংকরের উদ্দেশ্যে জলচন্দনাদি উৎসর্গ করিবার সময় প্রত্যেক স্থলেই এক একটি কামনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের পূজার মধ্যে এ জিনিষটি নাই। তাঁহারা পূজার প্রারম্ভে কামনার উল্লেখ করিয়া সংকল্প করিয়া থাকেন বটে ; তবে পাদ্যাদি উৎসর্গ করিবার সময় কোন কামনা করেননা। কিন্তু জৈনগণ

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বারা পূজা করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মুক্তির কামনা করেন। উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হইবে।

ওঁ হ্রীং বৃষভাদিবীরান্তেভ্যো জন্মমৃত্যুবিনাশনায় জলং নির্বপামি,...ভবতাপ-বিনাশায় চন্দনং নির্বপামি,...অক্ষতপদপ্রাপ্তয়ে অক্ষতান্ নির্বপামি,...কামবাণবিধ্বংসনায় পুষ্পং নির্বপামি,...ক্ষুধারোগবিনাশায় নৈবেদ্যং নির্বপামি,...মোহান্ধকার-বিনাশায় দীপং নির্বপামি,...অষ্টকর্মদহনায় ধূপং নির্বপামি,...মোক্ষফলপ্রাপ্তয়ে ফলং নির্বপামি,...অনর্ঘ্যপদপ্রাপ্তয়ে অর্ঘ্যং নির্বপামি।

জৈনদিগের এই কমনা সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। পূজার্চনাদির সময় হিন্দুদিগের কামনার বিষয় পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য, অক্ষয় স্বর্গলাভ প্রভৃতি। কিন্তু জৈনগণ দৈনন্দিন দেবপূজার সময়ও এই সকল নশ্বর বস্তু কামনা করেন না। প্রত্যেক জৈনেরই জীবনে একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। সুতরাং তাঁহারা সেই মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত অপর বিষয়ের কামনা কদাপি করেন না। অবশ্য হিন্দুরও যে চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে হিন্দু দার্শনিকের মতে প্রারম্ভ হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে অনেক সময় সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। সংসারের প্রতি যতদিন মনের বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, ততদিন মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করা পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজন্য স্বর্গভোগাদি নশ্বর বস্তু প্রাপ্তির জন্য মানুষ প্রথমে পূজার্চনাদির অনুষ্ঠান করুক—এইরূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তখন মোক্ষ লাভের জন্য যত্ন করিলে তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই ফলপ্রসূ হইবে। জৈনগণ তাহার উত্তরে বলিবেন—চিত্তশুদ্ধিই যদি পূজাদির উদ্দেশ্য হয় এবং কামনার দ্বারা লোকের চিত্ত পূজাদির দিকে আকৃষ্ট রাখাও যদি প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে এ উভয় কার্যই পূজার সময় মোক্ষ প্রাপ্তির অনুকূল ইন্দ্রিয় জয়াদিও মোক্ষ লাভের কামনা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যাহা হউক, পূজাদি ব্যাপারে এইরূপ মোক্ষলাভের যে কামনা এবং প্রারম্ভ হইতেই সকলের চিত্ত জীবনের এই চরম লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ করিবার জন্য এই যে চেষ্টা তাহা যে বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। জৈনদিগের প্রত্যেক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যেই এই চরম লক্ষ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া জৈন শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেকের সম্মুখেই যে সকল সময়ের জন্য এক উচ্চ আদর্শ উপস্থিত রাখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনের যেটি লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেটির কথা এইরূপ সকল সময়ে সকলের হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক করিয়া রাখার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা পণ্ডিত মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা কর্তব্য। পূজা আরম্ভ করিবার পূর্বে যে জিন বা তীর্থংকরের পূজা করা হইবে, তাঁহার আবাহন, স্থাপন ও সান্নিধীকরণ৩ করিতে হয়। তাহার পর পূর্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, নৈবেদ্য, দীপ, ধূপ ও ফল, এই অষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে পূজা করিতে হয়। ইহারই নাম অষ্টক বা অষ্টদ্রব্য পূজা। ইহারপর পঞ্চ কল্যাণকের অনুষ্ঠান করা হয় অর্থাৎ অর্চনীয় তীর্থংকরের গর্ভ, জন্ম, তপস্যা, জ্ঞানলাভ ও মোক্ষের কথা স্মরণ করিয়া এক একটি অর্ঘ্য দেওয়া হয়। ইহার পর স্তোত্রাদি বা জয়মালা পঠিত হয়। এইরূপ স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে জিন মূর্তিকে প্রদক্ষিণ করা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের যেমন এক দেবতার পূজা করিবার সময় মূল পূজার পূর্বে ও পরে গণেশাদি নানা দেবতার পূজা করিয়া লইতে হয়, জৈন দিগের সেইরূপ কোনও বিধান দেখা যায়না। তারপর হিন্দুদিগের মধ্যে পূজার দ্রব্যাদির বাহুল্যানুসারে ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার, এই কয়টী ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের মধ্যে কিন্তু মাত্র ঐ অষ্টকের ব্যবস্থা। তবে প্রতিদিনই যে সকলে ঐ আটটি দ্রব্যের দ্বারা পূজা করেন, এমন নহে। সংক্ষেপের জন্য বেশীর ভাগ লোকেই জিন মন্দিরে যাইয়া জিনদেবের দর্শন ও তাঁহার উদ্দেশে অক্ষত অথবা পুষ্প ও যে কোন একটি ফল মাত্র উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তবে এইটুকু অনুষ্ঠান করিতে পারতপক্ষে প্রায় কোন স্ত্রী পুরুষই বাধা করেন না।

[ক্রমশঃ

৩ আবাহন করিবার সময় 'অত্র অবতর অবতর সং বৌষট্', স্থাপন করিবার সময় 'অত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঠঃ ঠঃ, এবং সন্নিধীকরণের সময় 'অত্র মম সন্নিহিতো ভব ভব বষট্' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

মহাবীরের কেবল-জ্ঞানভূমি জোগ্রাম

ড: পঞ্চানন মণ্ডল
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ডঃ জগদীশচন্দ্র জৈন মহাশয়ের ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত জম্ভিয়গ্রাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভূগোলের মূল গবেষণাটি এইরূপ :

Jambhiyagama—a village. It is said that Mahavira travelled here from Campa and proceeded to Mendhiyagama; at another time the teacher arrived here from Majjhima Pava and attained *kevala*-hood under the Sala tree on the northern bank of the river Ujjuvalika. Muni Kalyan Vijaya identifies it with Jambhigaon near the river Damodar in the Hazaribagh district, but it must be located somewhere near modern Pavapuri to the east of Bihar town in Bihar.

Ujjuvaliya সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখছেন :

Ujjuvaliya—a river. This river was situated at the outskirts of the city of Jambhiyagama (See Jambhiyagama) It remains unidentified.—অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত। (L. A. I. as D. J. C., Pp. 289, 346)

১৯৬৩ সালে হাজারীবাগ জেলার জম্ভিয়গাম সম্পর্কে যে গবেষণা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা এই প্রকার :

জৈনসূত্রে 'জম্ভিয়গাম' স্থান নামটির উল্লেখ খুবই দেখা যায়। এই নামটির সংস্কৃতায়িত রূপ হচ্ছে জৃম্ভিকগ্রাম। কথিত হয়, মহাবীর ঋজুপালিকা নদীর তীরে অবস্থিত এই স্থানে কেবলদর্শন লাভ করেছিলেন। মুনি কল্যাণ বিজয়জী জম্ভিয়-গামকে সমৃদ্ধ নগর ভেবেছিলেন। এখানে উঁচু উঁচু সৌধ ছিল, আর নগরটি ছিল প্রাকার ঘেরা। তিনি এটিকে হাজারীবাগ জেলায় দামোদরের নিকটে অবস্থিত জম্ভিগাঁও বলে সনাক্ত করেন। কিন্তু, জগদীশচন্দ্র জৈন বলেন, জম্ভিগাঁও পাটনা জেলায় আধুনিক পাবার কাছে কোনো জায়গায় হবে। পারসনাথ পাহাড়ের চারদিকে অনেক জৈন শ্রমণ ঘোরাফেরা করতেন; ফলে, আশ্চর্য নয় যে, মহাবীর কেবলদর্শন লাভ করবার জন্যে ওখানে গিয়েছিলেন।

কিন্তু, এই সনাক্তীকরণে একমাত্র আপত্তি হলো, যে জম্ভিয়গামে মহাবীর কেবল-জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেখানকার ঋজুপালিকা নদীটিকে বরাকর নদের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিথিলাশরণ পাণ্ডে বলেন, আমরা বলতে পারি না, কিভাবে দামোদরের নিকটবর্তী গ্রামকে প্রাচীন জম্ভিয়গাম বলে সনাক্ত করা হয়। তবে সম্ভব যে, কোনো সময়ে দামোদর হয়তো সেই স্থানে বরাকরের পুরাতন খাতে প্রবাহিত হতো। (*The Historical Geography and Topography of) Bihar*, 1963, Pp. 183-84) মিথিলাশরণ পাণ্ডে মহাশয় তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে বরাকর প্রসঙ্গে লিখছেন ঃ

The Barakar rises in the hills of Chhotanagpur and flows through the district of Hazaribagh. It passes into the state of West Bengal at a place called by the name of this very river on the Grand Chord Railway line. The river is mountainous like other rivers of this area.

A river Rjupalika is mentioned in the *Kalpasutra* in the Prakrit form of its name—Ujjuvaliya. The text says that Mahavira arrived here from Majjhimapava and attained *kaivalya* or full spiritual emancipation on the bank of this river in the township of Jrimbhikagrama.

J. C. Jain thinks that the place must be located somewhere near modern Pavapuri, in the Patna district. Muni Kalyana Vijaya indentifies it with the Jambhigaon on the Damodar. Mrs. S. Stevenson says that "Mahavira stayed in a place not very far from Parasnath hills called Jrimbhikagrama.

This river is sometimes spelt Rjukula or Rjuvalika. The *Kalpasutra* is quite silent about the village and the river flowing thereby.

N. L. Dey says that, in a modern temple on the bank of the Barakar, eight miles away from Giridih there is an inscription which seems to mention the name of the river Rjupalika. The inscription was probably taken there from the original temple which was probably in Jrimbhikagrama.

It is not necessary that the river and the village

should be in the neighbourhood of Pavapuri. At present, there is no river in the locality of Pava which can be identified with the ancient Rjupalika and Pava itself was not very famous before the death of Mahavira. It is therefore, not improbable that when Mahavira attained enlightenment he was wandering in the locality of the Parasnath hill which was sacred place owing to the tradition of the death of Parsvanatha there.

At present Jambhigaon is on the Damodar river but we do not find any similarity between the name Damodar and Rjupalika. So we are not sure of the location of this river nor we can say how this word could be changep into Barakar, on whose bank the inscription has been found. (Pp. 81-12).

জম্ভিয়গাম ও ঋজুপালিকা সম্পর্কে এই ধরণের সিদ্ধান্ত বিহীন গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সন্ধান শুরু করি। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের *Political History of Ancient India* গ্রন্থ থেকে জৃম্ভিকগ্রামের পাঠান্তর পাই Jrbhakagrama (জৃম্ভক গ্রাম) বা Jrmbhila (জৃম্ভিল); *The Heart of Jainism* ও Dr. M. S Pandey-র বই থেকে Rjupalika (ঋজুপালিকা) নদীনামের পাঠান্তর পাই Rjukula (ঋজুকূলা) বা Rjuvalika (ঋজুবালিকা)। সূত্রলেখকগণ দূরবর্তী স্থানের লোক হওয়ায়, তাঁরা এই অঞ্চলের স্থান নাম নির্ধারণে একমত হতে পারেননি।

বর্তমান জম্ভিগাঁও-এর আমি সন্ধান করি হাজারীবাগ জেলার রজরূপ্যা থেকে। সেখানে দামোদরের সঙ্গে এসে মিশেছে ভেরী বা ভৈরবী নদী। প্রাচীন শিলাভূমির সেই সঙ্গম থেকে তিন/চার মাইল দূরে ভৈরবী নদীর তীরে জভিয়াগাঁও ছোট্ট একটি সন্নিবেশ. ওঁরাও মুণ্ডা অধ্যুষিত পল্লী, ঐতিহ্যবিহীন। রাজরূপ্যা এবং দিশেরগড় থেকে দেখলাম, দামোদর নদ কোনোও কালে বরাকরের পুরাতন খাতে প্রবাহিত হয়নি। আর বর্তমান নগর বরাকরের আসল নাম বেগুনিয়া। ষ্টেশন বরাকর এই মূল নামটি আত্মসাৎ করেছে। বেগুনিয়া অতি প্রাচীন মন্দির-সমম্বিত জৈন-প্রভাবিত এলাকা। বাঁকুড়ার অম্বিকানগর-পরেশনাথ মৌজাতেও বিশাল আকারের পার্শ্বনাথ-মহাবীর বর্তমান।

অধ্যাপক জ্যাকোবির অনূদিত ও সম্পাদিত 'কল্পসূত্র' থেকে এবং পূর্ণমচন্দ বৃদ্ধিচন্দ্র ঢড্ঢা হিন্দী জৈন গ্রন্থমালার ১ সংখ্যক বই 'শ্রীকল্পসূত্র মূল ঔর হিন্দী ভাষান্তর'-গ্রন্থ

থেকে জানতে পেরেছি অট্ঠিয়গাম-বর্ধমান 'বংগাল মে' হৈ।" শ্রদ্ধেয় জৈন পণ্ডিত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের বিহারের বাগমতী নদীর তীরে হাথগাঁও বা হাথেওবিঘা, হাতীটোলা ইত্যাদি অস্থিগ্রাম-বর্ধমান নয়, এ-কথা এখন পাটনার পণ্ডিতগণই স্বীকার করছেন।

মহাবীরের অস্থিকগ্রাম-বর্ধমান রাঢ়ভূমির বর্তমান নগর বর্ধমানেই অবস্থিত। কিন্তু সে কোথায়? শ্রীজগবন্ধু দে, শ্রদ্ধেয় শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীরাধাগোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মহাশয়গণের সহায়তায় বহু তথ্য সংগ্রহ করি। আমার প্রথম ধারণা হয়, অস্থিকগ্রাম-বর্ধমান, মেমারী থানার বড়োয়া° গ্রাম আর ঋজুপালিকা নদী হলো বর্তমান বল্লুকা নদী। পূজনীয় বিজয়দা ও সাধনাদির সহায়ে আমি বড়োয়া° গ্রাম দেখতে যাই। ওখানে সবই আছে—বোহার আছে, হরকলা আছে; কিন্তু, আস্থাই নাই। যক্ষও নাই। জোগ্রাম যাই। জোগ্রামের নিকট আস্থাই (অস্থিকূট) পাই। কিরাত-সাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষগোচর হয়। প্রবন্ধ লিখি, আবার সন্ধান শুরু হয়।

আপাততঃ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, বর্তমান নগর অস্থ্যল-বর্ধমানই প্রাচীন অস্থিকগ্রাম-বর্ধমান। প্রাচীন গ্রীক্ বিবরণী মতে, বর্ধমানের উচ্চারণ ছিল ব্রডমন অর্থাৎ বোড়ো-ডোমন। সংস্কৃতায়িত নাম হলো বর্ধমান। স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে হয়, এ নগরের অস্তিত্ব ছিল এখানে মহাবীরের আগমনের পূর্ব থেকেই। তাঁব 'বর্ধমান' উপনামের সঙ্গে এ নামের কোনো সম্পর্ক নাই। তবে, টীকাকারের ইঙ্গিত ভ্রান্ত হলে, বুঝতে হবে সোনায় সোহাগা মিশেছে। মহাবীরের উপনাম বর্ধমান থেকে নগর বর্ধমানের নাম ভাস্বর হয়েছে। অথবা, 'কল্পসূত্রে'র মতে, মহাবীর অট্ঠিয়গাম অর্থাৎ অস্থিক গ্রামে এসেছিলেন। আমাদের মতে, বোড়হাটের মহন্ত-অস্থ্যল এলাকা এই অস্থিক গ্রাম। পাশেই বর্ধমান, মহাবীরের পূর্বনাম অনুসারেই যার নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমীর ভূগোলে 'বর্ধমান'-এর নাম পাওয়া যায় ব্রোডোমন। ব্রোডোমন শব্দটি 'বোড়ো-ডোমন' শব্দ থেকে আসতে পারে। 'বোড়ো-ডোমনই' হয়তো বর্ধমানের আদি নাম। পরবর্তীকালে কতকটা এর ধ্বনিগত সাদৃশ্যে এবং কতকটা বর্ধমান মহাবীর এখানে এসেছিলেন এই স্মৃতির প্রভাবে এ জায়গার নাম 'বর্ধমান' হয়ে থাকতে পারে। কল্পসূত্রের টীকাকার 'অস্থিক গ্রামের পূর্বনাম বর্ধমান' বলতে বোধ হয় এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। বর্তমান বর্ধমান নগরের অবস্থান আলোচ্য অস্থিকগ্রাম-বর্ধমানের পূর্বদিকে আরও অনেক পল্লী নিয়ে। এবং আশ্চর্য, নগর বর্ধমানে 'বর্ধমান' নামে কোনো পল্লী আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মহাবীরের রাঢ় চারিকা প্রসঙ্গে এই জেলায় প্রসঙ্গতঃ আমি মহাবীরের পাদপূত স্থান

পুরিমতাল, কলম্বুক সন্নিবেশ, হলেভুগ, আবস্তগাম, উন্নাগ, পালয়গাম, ভদ্দিয়, পণিয়ভূমি,গোভূমি,চোরাগ সন্নিবেশ পেয়েছি। স্থানগুলির বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এগুলি যথাক্রমে হলো—বর্তমানের পোড়ামাতলা, অম্বিকা-কালনা, হলদী, আস্তগ্রাম, উনে, পালিগ্রাম, ভেদিয়া, পাণ্ডুক, গোপভূমি ও গড়জঙ্গল এলাকা। গড়জঙ্গল এলাকা দুই ছোরা গ্রাম-সীমিত। দণ্ডিস্বামী শুদ্ধবোধ আশ্রম, বলরাম ব্যানার্জী, অজিতকুমার দাস প্রমুখ আমার গবেষক ছাত্রবৃন্দ আমাকে এ-কাজে সহায়তা করছেন। এই ভাবে ডঃ জগদীশ চন্দ্র জৈন মহাশয়ের নির্দেশিত ও অপরিজ্ঞাত রাঢ় ভূমির বহু স্থান আমাদের গোচরে আসে। বর্ধমানের, বীরভূমের, মুর্শিদাবাদের বহু বাঙ্গালা পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করি। উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে অখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনে ১৯৭২ সালে প্রবন্ধ পাঠ ও আমার গবেষণার ফল প্রকাশ করি। কোচিনের ভগবান্ মহাবীরের ২৫০০ নির্বাণ স্মরণ কমিটি ১৯৭৪-৭৫ সালে তাঁদের স্মারকপত্রে আমার নির্ণয় সম্বন্ধে প্রকাশ করেন। ধারওয়াড়ের কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬ সালে আমার এই বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার ফল প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, বোলপুরের জৈন যুবক পরিষদ এবং কলকাতার K. M. Lodha মহাশয় ভগবান্ মহাবীরের ২৫০০ নির্বাণ স্মরণ অনুষ্ঠানের ইস্টার্ণ কমিটির তরফ থেকে এই বিষয়ে আমার গবেষণা প্রকাশ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান ১৯৭৫ সালে।

এবারে জৃম্ভিক গ্রাম ও ঋজুপালিকার কথায় আসছি।

ভগবান্ মহাবীরের প্রথম বর্ষাবাস অস্থিক গ্রাম বর্ধমান নগরের যক্ষ মন্দিরে। ফলে, আমার ধারণা হয়, তাঁর সম্পূর্ণ আর্হৎলাভের স্থান বর্ধমান নগরের ধারে কাছেই কোথাও হবে। কার্যকারণ সূত্রের শৃঙ্খলা সাধারণতঃ দূরবর্তী স্থানে থাকে না। ফলতঃ সন্ধান চলে। পুরাতন রেলপথের বিবরণে (১৯২২) দেখলাম, জৌগ্রামের পুরাতন নাম ছিল 'যোগগ্রাম'। জৃভক শব্দটি থেকে এ-নাম সিদ্ধ হতে পারে। জৃভক/জীভক/জীহক/জীঅক/জীওক/জীওগ/জোগ = যোগ/জৌ। 'গ্রাম' তো আছেই। এই গ্রামে কে যোগ সাধনা করেছিলেন? জৌগ্রামে এসে উত্তর পাওয়া গেল, 'ন্যাংটা গোঁসাই'। —বাপ ঠাকুরদাদার মুখ থেকে গাঁয়ের লোক শুনছেন এই কথা। গরুর গাড়ী বাহন গ্রাম তো। সব খবরই ধীরে চলে পুরুষে পুরুষে। কত শতাব্দী গড়িয়ে যায়।

গ্রামের বাহিরে অদ্ভুত পরিবেশে অতি পুরাতন বালুর উপর জৈন-পদ্ধতিতে গড়া ছোট একটি মন্দির। অনেক পুরাতন। রেল বিবরণী মতে, এক হাজার বছর আগে তৈরি। বিগ্রহ হলেন, জলেশ্বরনাথ। মন্দিরের নীচে 'পাতালঘর'। প্রায় দশ বিঘা ভূমি-পরিমাণ, বহু জলাশয় বিসারিত মনোরম তপোবনের পরিবেশে অবস্থিত এই

'ন্যাংটা গোঁসাই-এর মঠ'। নতুন পুরাতন নানা বৃক্ষরাজি শোভিত এই মঠ এলাকা।

মুঙ্গেরে গোয়েস্কার জলেশ্বরনাথের মন্দির দেখে ঘোর ভাঙলো। জলেশ্বরনাথ তো জৈনদেবতা নিশ্চয়ই। সম্ভবতঃ ইনি মেঘ বৃষ্টির দেবতা জংভয় বা জংভিয় বা জৃভক অসুর। মহাবীরের জন্মলগ্নে যিনি অনেক ধনদৌলত দিয়ে নবজাতককে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা দরকার, তারকেশ্বরের তাড়পিশাচ ও অস্থিগ্রাম – বর্ধমানের শূলপাণি যক্ষের সঙ্গেও মহাবীরের যোগাযোগ ছিল। মহাবীরের উপকারক বলে এই জংভয়, জংভিয় বা জৃভক বা জৃম্ভিলা অসুরকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইনিই জোগ্রামের বর্তমান জলেশ্বরনাথ। এই দেবতা জংভয় বা জৃভক অসুরের নাম থেকেই গ্রামনাম জোগ্রামের পত্তন হলো যোগগ্রাম-রূপে, সে আগেই আমি খতিয়ে দেখিয়েছি।

ন্যাংটা গোঁসাই-এর এই মঠ এলাকা, ষষ্ঠ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ছিল বোধকরি এরই সন্নিহিত 'কামডাঙ্গায়' কামরূপের কিরাত 'কাম' জাতির সন্নিবেশে ঘেরা। আমার ধারণা, বর্তমান জলেশ্বরনাথের মন্দিরের নীচের বা অধোস্তরের বাস্তুতে 'পাতালঘরে' সেই বৈধাবর্ত চৈত্যের অবস্থান মিলবে। সে-কথা পরে বলছি।

ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর রাম সিং তোমর কষে দেখালেন, জম্ভিয় শব্দ থেকে জো শব্দ নিষ্পন্ন হতে পারে। ভাষাতত্ত্বের একাধিক নিয়মে জৃভক শব্দ থেকে (জৃভক জউভক জউহ্ক/জউঅক/জউওঅ/গ/জউ/জোগ = জো) আরও সহজে আমরা জো শব্দ পেয়ে যাই। 'গ্রাম' দিয়ে গ্রাম নাম অতি পুরাতন, শিশুকাল থেকে আমাকে বুঝিয়েছিলেন আমাদের অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়। এখানে জতু—জো বা গালার কারবার কোনোকালে ছিল বলে খবর নাই। ফলতঃ, জৃভকগ্রাম যে জোগ্রাম, সে-বিষয়ে ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে আমি নিঃসন্দেহ হলাম।

[ক্রমশঃ

মহাবীরের উপসর্গস্থল উত্তর-রাঢ়

শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া

একথা সকলে জানেন না যে বঙ্গদেশের এই পশ্চিমাংশে মহাবীর তাঁর সাধনকালে একাধিকবার পদার্পণ করেছিলেন। তবে উৎসাহী গবেষকদের নূতন নূতন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আজ একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে এই রাঢ়দেশে এমন বহু স্থান আছে যা মহাবীরের উপসর্গস্থল হওয়ার গৌরব রাখে।

প্রব্রজিত হবার পরই মহাবীর বর্তমান সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘর শহরের নিকটবর্তী তিউরমোরনাচ পাহাড়ের মুখ্যশৃঙ্গের উপর বিস্তৃত সমতল ভূমিতে অবস্থিত মোরাক আশ্রমে এসে উপস্থিত হন ও সেখানকার কুলপতি দুইজন্তকের অনুরোধে প্রথম চাতুর্মাস্য সেখানে ব্যতীত করতে মনস্থ করেন। মনোরম স্থানে ধ্যানে নিবিষ্ট অবস্থায় ১৫ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু বাধা আসে সেখানকার অন্যান্য তাপসদের কাছ হতে। তাদের অপ্রীতিভাবের জন্য মহাবীর চাতুর্মাস্যের নিয়ম ভঙ্গ করে সেই আশ্রম পরিত্যাগ করেন। মহাবীরের তপস্যা দ্বারা পবিত্র হওয়ায় এই মোরাক আশ্রমের নামে সেখানকার ঝরণা হতে সৃষ্ট সুবর্ণ বালুকা নদীর নাম হয় ময়ুরাক্ষী।

বেগবতী অজয়ের তীর ধরে চলতে চলতে মহাবীর অস্থিক গ্রামে (বর্তমান মঙ্গলকোট) এসে পৌঁছলেন। এখানে সারারাত শূলপাণি যক্ষের ভীষণ উপসর্গ সহ্য করে রাত্রি শেষে তাকে উপশান্ত করলেন। এই শূলপাণি যক্ষই কালে শূলপাণি শিব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মহাবীর সেই অস্থিক গ্রামে চাতুর্মাস্য ব্যতীত করে অজয়নদী পার হয়ে বর্তমান বোলপুর, পুরন্দরপুর ইত্যাদি গ্রাম অতিক্রম করে উপাধ্যায় শ্রীবিনয়-বিজয় মহারাজ বিরচিত কল্পসূত্র সুখবোধিকার ১৯৩ পৃষ্ঠায় ১৭ কলমে উল্লেখিত দক্ষিণবাচাল (ডেউচা) গ্রামের নিকটবর্তী (সতীঘাট) সুবর্ণবালুকার তীরে (ময়ুরাক্ষীর অপর নাম) সরাক (শ্রাবক) জাতি অধ্যুষিত জয়তারা, বিলকাঁদি, বাঁশকুলি গ্রামের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধেশ্বরী নদীর দক্ষিণে শীতল ও উষ্ণ প্রস্রবণের নিকটে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন। পরে সিদ্ধেশ্বরী নদী পার হয়ে মহাবীর বৃন্দাবনী হয়ে সাতগড় তরণী বীর পাহাড়ী (মশানজোড়ের দক্ষিণ পাশে) এসে পৌঁছলেন। এখানে তাঁর স্কন্ধস্থিত দেবদূষ্য বস্ত্র কাঁটায় আটকে পড়ে যায় ও তিনি নির্বস্ত্র হন। এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এখানে প্রাচীন মন্দিরের পুরানো পাতলা ইঁটের স্তূপ আজও রয়েছে। ময়ুরাক্ষীর তীর ধরে মহাবীর ফিরে গেলেন মোরনাচ গ্রাম বা মোরাক সন্নিবেশে।

আবার মহাবীরের প্রব্রজন সুরু হল। এবারে তিনি এলেন দক্ষিণ বাচালের (ডেউচা, সাঁইথিয়া) দিকে। (কল্পসূত্র সুখবোধিকা ২০৩ পৃঃ) দক্ষিণ বাচাল থেকে সরল ও ছোট রাস্তা ধরে উত্তর বাচালের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু রাখাল ছেলেরা তাঁকে ঐ পথে এক ভীষণ সাপের কথা বলে যার চোখের দৃষ্টিতে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং আরো বলে তিনি যেন ওপথ দিয়ে না গিয়ে দীর্ঘ হলেও নিরাপদ পথ দিয়ে যান। কিন্তু তিনি তা না গিয়ে সেই পথে এগিয়ে চললেন। কনকখল আশ্রমের যক্ষমণ্ডপে (যোগী পাহাড়ীর দিকে) দৃষ্টিবিষ সাপ তাঁকে আক্রমণ করল। মহাবীর কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। 'বুজ্ঝ বুজ্ঝ চণ্ডকোসিয়' বলে আশীর্বাদ করলেন। সেকথা শুনে সাপের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হল। সে জন্মে সে ছিল গোভদ্রমুনি। ক্রোধে মৃত্যু বরণ করে পরবর্তী জন্মে সে কনকখল আশ্রমের তাপ কুলপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করে। সে জন্মেও ক্রোধবশতঃ মৃত্যু হয়। ফলে সর্পযোনিতে জন্মলাভ করে। অনুতপ্ত চণ্ড কৌশিক পাদোপগমন অনশন অবলম্বন করে পড়ে রইল। তীব্র পীঁপিলিকার দংশন সহ্য করে পনেরো দিনের দিন দেহত্যাগ করে অষ্টম দেবলোক প্রাপ্ত হল। মহাবীরও এই পনের দিন একাদিক্রমে দণ্ডায়মান হয়ে ধ্যানস্থ রইলেন। চণ্ডকৌশিকের নামে সেই যক্ষের মণ্ডপ (যোগীপাহাড়ীর নিকট) যেস্থানে অবস্থিত ছিল তার নাম হয় কৌশিকা। বর্তমান নাম উসকা।

আজও এস্থানের জনসাধারণের মুখে শোনা যায় যে তাঁরা পুরুষানুক্রমে শুনে আসছেন যে এই সাপের বিষে কুম্ভকারের কাঁচা হাঁড়ির থাক পুড়ে লাল হয়ে যেত (জৈন শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় যে চণ্ড কৌশিক সূর্যের দিকে তাকিয়ে চোখ হতে অগ্নি বর্ষণ করত) ও এক ১৬ মাসের বালক সন্ন্যাসী এখানে এসে সেই ভীষণ সাপকে উপশান্ত করেন। এই ১৬ মাসের বালক সন্ন্যাসী মনে হয় ভগবান মহাবীর কারণ তাঁর দীক্ষার সময় হতে এই ঘটনা সংঘটিত হবার কাল ১৬ মাস। তাছাড়া এই ধরণের সাপের কথাও এই স্থান ছাড়া ভারতের আর কোথাও শোনা যায় নি।

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করি। সাঁইথিয়াবাসী ৮৭ বর্ষীয় বৃদ্ধ ডাঃ কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন যে সেকালে গদাধরপুরের নিকটস্থ দ্বারকানদী হতে বালি আনা হত। বালিতে সোনা ও রূপার কণা দেখতে পেয়ে সরকারী ইঞ্জিনীয়ার পার্কসন সাহেব সেই সোনা-রূপার উদগম স্থানের সন্ধান করলে লোকে তাঁকে যোগীপাহাড়ীতে যেতে বলে। যোগীপাহাড়ীতে সাপের বিলে সোনা রূপার কণা দেখতে পেয়ে পার্কসন পাহাড় কাটার জন্য মজুর নিয়োগ করেন। কিন্তু কাটা আরম্ভ হতেই মজুরদের মুখে রক্ত ওঠে ও কয়েক জনের মৃত্যু হয়। এই বিচিত্র ঘটনায় হতোৎসাহ হয়ে পার্কসন পাহাড়টাকে ধ্বংস করতে মনস্থ করেন। সামনের নদীতে প্রাচীর বেঁধে জলপ্রবাহকে পাহাড়ীর দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নদীর অল্প দূরে অবস্থিত

দ্বারবাসিনীর (জৈন সাহিত্যের বৃক্ষবাসিনী কাঠপুতনা, ব্যন্তর দেবী) মন্দিরের কাছ হতে নদীর উজান বেয়ে ভেসে আসা শালকাঠের এক মস্ত বড় গুঁড়ি ঐ প্রাচীরকে ভূমিস্যাৎ করে দেয়। নদীর বাঁধের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে পার্কসন নিরাশ হয়ে ঐ কাজ বন্ধ করে দেন।[১]

যোগীপাহাড়ী হতে মহাবীর ভিক্ষাচর্যায় বার হন ও রাউতোড়ায় (উত্তর বাচাল) নাগসেনের গৃহে পায়সান্ন গ্রহণ করেন। রাউতোড়া হতে তিনি সোনারগড়িয়ার দিকে অগ্রসর হন। সোনারগড়িয়া স্থানটিই জনশ্রুতি অনুসারে এক মহাবিষধর সাপের দৃষ্টিবিষে দগ্ধ হয়ে আঙ্গারগড়িয়া নাম প্রাপ্ত হয়। এই পথ দিয়ে তিনি স্বর্ণবালুকানদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ নগরী সেয়বিয়ার (শ্বেতাম্বিকার দিকে প্রব্রজন করেন। সেই সেয়বিয়াই বর্তমানের সাঁইথিয়া।

---

[১] পার্কসনের সহকারী ইঞ্জিনীয়র দেবেন্দ্র নাথ সান্যালের ডায়েরী দৃষ্টে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্র নাথ সান্যাল এই ঘটনার বিষয় জানতে পারেন। তিনি কিশোরী বাবুকে সেই ডায়েরী দেখান।

মৃগাবতী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[প্রদ্যোতের স্কন্ধাবার। বিদূষক ও প্রদ্যোত]

কপিঞ্জল : আরে পানপাত্রে মহারাজের অরুচি ?

প্রদ্যোত : তুমি ঠিকই বলছ কপিঞ্জল। এখন যে মদিরা সতত আমি পান করছি তাতে মন-মাতাল হয়ে আছি, মনে হয় এত মাদকতা সংসারের কোনো মদিরাতেই নেই।

কপিঞ্জল : একি বলছেন মহারাজ !

প্রদ্যোত : সত্যিই বলছি। বিশ্বাস করো কপিঞ্জল, মৃগাবতীর ওই রূপ চণ্ড প্রদ্যোতকে প্রেমিক প্রদ্যোতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে।

কপিঞ্জল : তাইত দেখছি মহারাজ ! আপনি কি এরপর আপনার খড়্গ ধারণ করতে পারবেন ?

প্রদ্যোত : তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। খড়্গ ধরতে বোধ হয় আর পারবনা। তুমি শুনলে হাসবে কিন্তু না বলেও আমি পারছি না। এখান হতে দেখা যায় মৃগাবতীর কক্ষ বাতায়ন, আমি বিনিদ্র রজনীতে অপলক ওই দিকে চেয়ে থাকি। এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে ওঠে আমার দেহ ও মন। পুলকিত হয়ে ওঠে রাত্রির নিস্তব্ধ আবহাওয়া। দীপশিখার সেই মৌন আলোক আলোকিত করে দেয় জন্ম জন্মান্তরের না জানি কত বেদনা। আচ্ছা কপিঞ্জল তুমি কি কখনো কারু সঙ্গে প্রেম করেছ।

কপিঞ্জল : না মহারাজ। মোদকের প্রেম ব্যতীত হল বাল্যকাল আর যৌবন ? যৌবনে ব্রাহ্মণী এমন ভাবে আমায় আগলে রাখল যে আর কোথাও প্রেম করার সুযোগই পেলাম না।

প্রদ্যোত : এ তোমার দুর্ভাগ্য। আমি এখনো তাকে দেখিনি তবু এখান হতে কল্পনা করতে পারি যে সে এখন কি করছে।

কপিঞ্জল : আচ্ছা···আপনি হয়ত ভাবছেন সেও আপনার মত আপনার কথা চিন্তা করে বিনিদ্র রজনী ব্যতীত করছে।

প্রদ্যোত : !

[দ্বারপাল আসছে]

দ্বারপাল : [প্রণাম করে] মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য রোহ বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রদ্যোত : ভিতরে পাঠিয়ে দাও তাকে।

[দ্বারপাল প্রণাম ক'র চলে যাচ্ছে। রোহ ভিতরে এসে প্রদ্যোতকে প্রণাম করছে]

রোহ : মহারাজ ! এখুনি খবর পেলাম কৌশাম্বীপতি শতানীকের এইমাত্র মৃত্যু হয়েছে। কৌশাম্বীর সেনায় নৈরাশ্য ছেয়ে গেছে। দুর্গ রক্ষা সন্দিগ্ধ।

প্রদ্যোত : ওঃ ! আচ্ছা, তুমি যেতে পার।

[রোহ চলে যাচ্ছে]

কপিঞ্জল : এখন যুদ্ধ জয় খুব সহজ হয়ে গেছে এবং মৃগাবতীকে পাওয়াও, না মহারাজ ?

প্রদ্যোত : [চিন্তিতভাবে] হাঁ।

কপিঞ্জল : কালইত তৃতীয় দিনের শেষ দিন।

প্রদ্যোত : হাঁ।

কপিঞ্জল : মহারাজ !

প্রদ্যোত : কিছুক্ষণ আমায় একলা থাকতে দাও।

কপিঞ্জল : [যেতে যেতে] আসব পাত্র ?

প্রদ্যোত : না। তার কোনো প্রয়োজন নেই।

সপ্তম দৃশ্য

[রাজান্তঃপুর]

কৌশিকী : দেবী !

মৃগাবতী : ভগবতী !

কৌশিকী : আপনাকে আরো শক্ত হতে হবে। এই সঙ্কট মুহূর্তে আপনার বিচলিত হলে চলবেনা।

আমি একটুও বিচলিত হইনি ভগবতী। মহারাজ যাবার সময় রাজ্য রক্ষা ও বংশ রক্ষার যে গুরু দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে গেছেন সেই গুরু দায়িত্ব আমায় বহন করতে হবে। কাল সারা রাত সেই কথাই চিন্তা করেছি।

কৌশিকী : কিন্তু আমি শুনলাম আপনি কৌশাম্বীর সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরে যেতে বলেছেন।

মৃগাবতী : হাঁ বলেছি। কারণ প্রতিরোধ করে দুর্গ রক্ষা করতে তারা সমর্থ নয়। প্রদ্যোতের সৈন্যবাহিনী অনেক বেশী সুগঠিত ও শক্তিশালী।

কৌশিকী : কিন্তু আপনি কি নিজের কথা কিছু চিন্তা করেছেন?

মৃগাবতী : আমার নিজের কথা আমি চিন্তা করিনা। উদয়নকে আর কোথাও পাঠিয়ে দেবে এখন তাও সম্ভব নয়। কৌশাম্বীর দুর্গ চারদিক হতে অবরুদ্ধ। অথচ তার রক্ষা আমায় করতেই হবে। কৌশাম্বীর সেনা না তার রক্ষা করতে পারবে না আমার। তবে কেন এই রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করি?

কৌশিকী : তবে আপনি কি করতে চান?—আত্মহত্যা।

মৃগাবতী : না না। আমি ক্ষত্রিয় কন্যা। যদি মরতে জানি ত বাঁচতেও জানি। আমাকে কৌশাম্বীর দুর্গ অভেদ্য করতে হবে ও সৈন্যদল সুগঠিত ও শক্তিশালী। উদয়নের রাজ্য নিষ্কণ্টক করেই আমি মরতে পারি; তার আগে নয়।

কৌশিকী : তবে আপনি কি স্থির করেছেন?

মৃগাবতী : সেই কথাই চিন্তা করছি। এবং এখন এক সিদ্ধান্তে এসেও পৌঁচেছি। ভগবতী! এই কাজে আপনিই আমার একমাত্র সহায়ক হতে পারেন আর কেউ নয়।

কৌশিকী : আমি?

মৃগাবতী : হাঁ আপনি। অন্য কারু উপর আমি বিশ্বাসই করতে পারবনা। তাছাড়া আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষণী।

[কানে কানে কিছু বলছেন]

কৌশিকী : না না, এ অসম্ভব।

মৃগাবতী : অসম্ভব কেন? আমাকে এখন ভাবতে হবে কেবল উদয়নের জন্য।

[আবার কানে কানে কিছু বলছেন]

কৌশিকী : বুঝতে পেরেছি। সব কিছু বুঝতে পেরেছি! অপনার মত বুদ্ধি স্ত্রীলোকে কেন পুরুষদের মধ্যেও পাওয়া যাবেনা।

মৃগাবতী : ভগবতী! এই কাজে আমার আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। এসংবাদ যদি আর কারু দ্বারা পাঠাই তবে প্রদ্যোত তা বিশ্বাসই করবেন না। তাছাড়া দূতের মারফৎ পত্র পাঠানোও উচিত নয়। যদি আর কারু হাতে পড়ে যায়।

কৌশিকী : তবে তাই হোক। এই সংবাদ নিয়ে আমিই যাব। আমার ত কোথাও যাতায়াতে বাধা নেই।

মৃগাবতী : সেই জন্যইত আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। এর জন্য সতত কৃতজ্ঞ থাকব।

অষ্টম দৃশ্য

[প্রদ্যোত সৈন্যদের শিবির। এক সৈনিক বসে তলোয়ারে ধার দি'চ্ছ]

২য় সৈনিক : বন্ধুস এ! তুমি কি করছ?

১ম সৈনিক : দেখছনা। তলোয়ারে ধার দিচ্ছি।

২য় সৈনিক : তলোয়ারে ধার?

১ম সৈনিক : হাঁ খাপে পড়ে পড়ে মরচে লেগে গেছে।

২য় সৈনিক : তলোয়া:রে·?

১ম সৈনিক : ব্যবহার না করলে সব কিছুতেই মরচে লেগে যেতে পারে। এমন কি বুদ্ধিতেও। এতো তলোয়ার। কিন্তু বলত আমরা কৌশাম্বী কিজন্য এসেছি। তীর্থ যাত্রা করতে না লড়াই করতে?

২য় সৈনিক : লড়াই করতে।

১ম সৈনিক : লড়াই হচ্ছে?

২য় সৈনিক : না।

১ম সৈনিক : তবে কি হচ্ছে?

২য় সৈনিক : কিছু হচ্ছে না।

১ম সৈনিক : কিছু হচ্ছেনা। তবে ওই যে সারি সারি লোক যাচ্ছে ওরা কারা?

২য় সৈনিক : আমাদের সৈনিক।

১ম সৈনিক : ওরা কি করতে যাচ্ছে ?
২য় সৈনিক : কৌশাম্বীর দুর্গ প্রাকার সুদৃঢ় করতে।
১ম সৈনিক : আর ওদিকে দেখো। ওরা কোথায় যাচ্ছে ?
২য় সৈনিক : কৌশাম্বীতে খাদ্য সম্ভার পৌঁছাতে।
১ম সৈনিক : ওরা কারা ?
২য় সৈনিক : আমাদের সৈনিক।
১ম সৈনিক : খাদ্য সম্ভার যাচ্ছে কোথা হতে ?
২য় সৈনিক : আমাদের সংগ্রহ হতে।
১ম সৈনিক : জানো কিজন্য নিয়ে যাচ্ছে ?
২য় সৈনিক : না।
১ম সৈনিক : মনে হচ্ছে তোমার মাথায় কেবল গোবর ভরা রয়েছে।
২য় সৈনিক : গোবর। কেন ?
১ম সৈনিক : তবে বুঝতে পারছ না কেন ? আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি না কৌশাম্বীর দুর্গ প্রাকার সুদৃঢ় করতে ? আমাদের খাদ্য সম্ভার দিয়ে কেন ও'দের সংগ্রহশালা ভরে তুলছি ? মনে হচ্ছে আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ প্রদ্যোতের বুদ্ধি কাঠ হয়ে গেছে।
২য় সৈনিক : ঠিক বলছ তুমি। এ দানসত্র কিজন্য ?
১ম সৈনিক : সেই কথাইত আমি বলছি—এদানসত্র কি জন্য ? ভেবেছিলাম যুদ্ধ জয় করে সোনা চাঁদি হীরা মুক্তো লুটেপুটে নিয়ে যাব। কিন্তু এখন দেখছি চালকলাও জুটবে না। ওই দেখ এই নাটকের সূত্রধার এদিকেই আসছে।

[চিত্রকারের প্রবেশ]

১ম সৈনিক : এসো এসো। প্রতিশোধ প্রতিশোধ করে মহারাজকেত খুব তাতিয়ে দিয়েছিলে। এখন একি হচ্ছে ?
জয়ন্ত : বাস্তবে আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। শতানীকের মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধ জয় তাই সহজেই হয়ে যেত।
১ম সৈনিক : তাইত আমি বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মহারাজের এমন দুর—না না বুদ্ধি কেন হল ?
জয়ন্ত : সেকথা কেউ জানেনা। না মন্ত্রী, না সেনাপতি। সকলেই আশ্চর্য চকিত। তবে—
১ম সৈনিক : তবে কি ?
জয়ন্ত : শুনলাম পরিব্রাজিকা কৌশিকী যেদিন মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, মহারাজে সেদিন হতে এই পরিবর্তন এসেছে।

১ম সৈনিক ঃ ওঃ বুঝেছি। মনে হচ্ছে মহারাজকে কম্পক না করে উনি ছাড়বেন না। সহস্র মল্ল, এখন আমাদেরো তলোয়ার ফেলে হাতে ভিক্ষা পাত্র নিতে হবে।

২য় সৈনিক ঃ সেও বা মন্দ কী ?

জয়ন্ত ঃ তাতে আমিও কিছু শান্তি পাব।

১ম সৈনিক ঃ যত সব কাপুরুষ।

[আবার তলোয়ারে ধার দিতে থাকবে]

নবম দৃশ্য

[কৌশাম্বীর রাজপথ]

১ম নাগরিক ঃ কিছু বুঝতে পারছ ?

২য় নাগরিক ঃ কিসের ?

১ম নাগরিক ঃ কিসের আবার কি ? দুর্গ প্রাকার সুদৃঢ় হচ্ছে। দ্বার ও অর্গলা সমস্ত মেরামত হচ্ছে। শতঘ্নী স্থাপিত হচ্ছে। সৈন্যদল বর্দ্ধিত করা হচ্ছে। ভারে ভারে অস্ত্র শস্ত্র ও রসদ আসছে। এ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ ?

২য় নাগরিক ঃ মনে হচ্ছে খুব জোর লড়াই হবে।

১ম নাগরিক ঃ ছাই হবে। এ সব যদি আমাদের সৈন্যরা করত তবে বুঝতাম যুদ্ধ হবে কিন্তু এসবত করছে ওই দাসীপুত্র প্রদ্যোতের সৈন্যরা। মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু রহস্য রয়েছে।

২য় নাগরিক ঃ তাই নাকি ভাই ?

১ম নাগরিক ঃ হাঁ, আমি ঠিকই বলছি। কাউকে বল না। আমার এক দূর সম্পর্কের শ্যালক হচ্ছেন দণ্ড-নিগ্রাহিক। তিনি মহামাত্যের কাছে শুনেছেন যে মাহারাজের মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনই মহারাণী কৌশাম্বীর সমস্ত দ্বার খুলে দিবার আদেশ দিলেন ও বললেন, প্রদ্যোতের সৈন্য যদি কৌশাম্বীতে প্রবেশ করে তবে যেন তাদের বাধা না দেওয়া হয়।

২য় নাগরিক ঃ কারণ ?

১ম নাগরিক ঃ কারণ কিছু মহারাণী বলেননি, শুধু এইমাত্র বলেছেন, ওরা আমাদের মিত্র পক্ষ।

২য় নাগরিক ঃ মিত্র পক্ষ! মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু গোপন রহস্য আছে। শেষে কি মহারাণী প্রদ্যোতের খপ্পরে পড়ে গেলেন।

১ম নাগরিক ঃ না না সে কথা বল না। সে কথা বলাত দূর চিন্তা করাও পাপ। জানো না তিনি কোন কুলের কন্যা। সে বংশ হৈহয় বংশ। আমার ত মনে হয় দাসীপুত্রই ওঁর চালে আটকে পড়েছে।

২য় নাগরিক : সে কি রকম ? সে কিরকম ?

১ম নাগরিক : মহারাণী ওকে দিয়ে দুর্গ সুদৃঢ় করিয়ে ওকেই তাড়িয়ে দেবেন।

২য় নাগরিক : প্রদ্যোতও ওত কাঁচা ছেলে নয়। দেখছ না সমস্ত কৌশাম্বী প্রদ্যোতের সৈনিকে ভরে গেছে। এখন ওদের এখান হতে উৎখাত করা চারটি খানি কথা নয়।

১ম নাগরিক : তবে কি হবে ভাই ?

২য় নাগরিক : কি করে বলব। দেখতে থাক যা হচ্ছে।

১ম নাগরিক : আরে বৃষ্টি নেমে গেল।

[আশ্রয়ের সন্ধানে দুজনে ছুটছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছে। ময়ূর নৃত্য করছে]

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরেব জন্য গ্রাহক হতে হয। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫0 পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫ 00।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয।

- যোগাযোগেব ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. V No. 1 : Sraman : May 1977
Registered with the Register of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

পরলোকগত পূরণচাদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্মসম্বন্ধে, কলেজে অধ্যয়নকালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ব এবং ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখাজীর বইখানি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রমণ

জ্যৈষ্ঠ । ১৩৮৪ পঞ্চম বর্ষ । দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
পঞ্চম বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

।পাহাড়ী, সঁ

পুরুলিয়ার আরেকটি জৈনপুরাক্ষেত্র গোলামারা

শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুরুলিয়া শহরের ছ' মাইল উত্তরে পুরুলিয়া রঘুনাথপুর সড়কের উপর ছড়্রা গ্রাম। এই গ্রামের মাইল দুই উত্তর পূর্বে গোলামারা। গোলামারা গ্রামে ঢোকার কিছু আগে রিলিফ রোড ছেড়ে বাঁ-হাতি মাঠের মাঝে দুটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। এর একটি পাথরের, অপরটি ইঁটের।

পাথরের ধ্বংসাবশেষ পাশের জমি থেকে সামান্য উঁচু। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশেষ আকৃতির পাথরের খণ্ডগুলি প্রমাণ করে যে, একদা এখানে একটি পাথরের দেবালয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই লুপ্ত মন্দিরের কোন আকৃতিই নেই। ধ্বংসাবশেষের উপর দু-তিন স্তর পাথর দিয়ে ঘেরা বর্গাকার জায়গায় এখানে প্রাপ্ত তিনটি পাথরের মূর্তি সিমেণ্টের মেঝেতে গাঁথা আছে। তিনটিই জৈন তীর্থংকর মূর্তি।

সবচেয়ে বড় মূর্তিটি তীর্থংকর মহাবীরের। এটির উচ্চতা ৪′ ৬½″। কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান মহাবীরের দুটি হাতই কাঁধ থেকে কটি পর্যন্ত ভগ্ন। কটি থেকে দুটি হাতেরই নিপুণভাবে রূপায়িত পাঁচটি আঙুল জঙ্ঘার উপর ন্যস্ত। উপর জঙ্ঘা পর্যন্ত মূর্তিটি পূর্ণ রিলিফ পদ্ধতিতে খোদিত। মহাবীরের কুঞ্চিত কেশ মস্তকের মধ্যস্থলে খোঁপার আকারে বিন্যস্ত; দীর্ঘকর্ণ—মুখমণ্ডল বিকৃত। মহাবীরের তলজঙ্ঘের দুপাশে দুটি পার্শ্বচরমূর্তি। এই মূর্তি দুটি পরস্পর বিপরীত ঠামে একটু পাশ ফিরে একটি পা পিছনে মুড়ে এক পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। উভয়েরই হাতে চামর; কটিদেশ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ধুতির ন্যায় বস্ত্রে আবৃত; উভয়েরই কর্ণে কুণ্ডল; কণ্ঠে, বাজুতে, কটিতে অলঙ্কার। মূল মূর্তির প্রস্ফুটিত পদ্মের নীচে একটি লিপি খোদিত। এটির অনেক অংশই বিকৃত; তাছাড়া প্রতিদিনের ঘৃত-ভস্মের লেপনে অস্পষ্ট। লিপির নীচে দু প্রান্তে দুটি পরস্পর বিপরীত মুখী সিংহ। সিংহের দুপাশে দুটি জোড়হস্তে শ্রদ্ধাবনত মূর্তি উপবিষ্ট। সিন্দুরলিপ্ত মহাবীর বর্তমানে ভৈরব নামে পূজিত হচ্ছেন।

মহাবীরের ডানদিকের ভাস্কর্যটির উচ্চতা ১′; প্রস্থ ৫½″। এখানে একই সঙ্গে দুটি তীর্থংকর মূর্তি পাশাপাশি একটি মাত্র ত্রিস্তরবিশিষ্ট ছত্রের নীচে একটি মাত্র প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। উভয়েরই চুল চূড়াকার; কর্ণে কুণ্ডল; উভয়েরই পিছনে অলংকৃত সিংহাসনের আভাস। একটি তীর্থংকরের ডানদিকে; অপরটির বাঁ দিকে একটি করে পার্শ্বচর মূর্তি। উভয়েরই হাতে চামর

অনুরূপ আরেকটি পার্শ্বচর মূর্তি দুটি তীর্থংকরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। প্রস্ফুটিত পদ্মের নীচের স্তরের মাঝখানে একটি ফুলের অলংকরণ। এই অলংকরণের বাঁ দিকে একটি অর্দ্ধচন্দ্র। ফলে, ডানদিকের মূর্তিটি চন্দ্রপ্রভর বলে সনাক্ত করা যায়। অলঙ্করণটির ডানদিকে একটি শ্রদ্ধাবনত মূর্তি চোখে পড়ে। পাদপীঠের এই অংশটি মেঝের ভেতর প্রোথিত থাকায় অপর তীর্থংকর মূর্তিটির সনাক্তিকরণ সম্ভব হয়নি।

মহাবীরের মূর্তিটির বাঁ দিকের মূর্তিটি উচ্চতায় ১´ ৭´´ এবং প্রস্থে ১০½´´। ইনিও কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। মস্তকের চুল চূড়াকার; পশ্চাদ দেশে সিংহাসনের আভাস। মূল মূর্তির দুপাশে দুটি পার্শ্বচর মূর্তি চামরহস্তে আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান। খোদিত পাথরের প্রান্তভাগে দুটি করে (একটির উপরে আরেকটি এই ক্রমে) মোট চারটি ক্ষুদ্র তীর্থংকর মূর্তি। মূলমূর্তির মাথার উপরে ত্রিস্তর ছত্রের আচ্ছাদন; তার দুপাশে স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র। এগুলির নীচে দু-প্রান্তে বাদ্যযন্ত্র হাতে দুটি উড়ন্ত নারী মূর্তি। পাদপীঠের নিম্নাংশ মেঝেতে প্রোথিত থাকার জন্য মূর্তিটিকে সনাক্ত করা যায়নি।

উপরে আলোচিত তিনটি মূর্তিই কাল পাথরে খোদিত।

পাথরের ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি একটি ইঁটের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। যদিও এটি আজ প্রায় সমতল ভূমির পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে তথাপি ধ্বংসাবশেষ দেখে এবং প্রাপ্ত ইঁটগুলি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, এখানেও এককালে একটি প্রাচীন ইমারত ছিল। ইঁটের ধ্বংসাবশেষের এক প্রান্তে খেনো জমির উপরে একটি খোদিত পাথরের খণ্ড ভূপ্রোথিত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। এটি একটি বীরস্তম্ভ (virakal) বা সীমানাস্তম্ভ (boundary stone) যা এ অঞ্চলের অনেক স্থানে চোখে পড়ে। এটির উর্দ্ধাংশে একটি উপবিষ্ট সিংহের মূর্তি। সিংহের নীচে পাথরের একপিঠে অর্দ্ধরিলিফ পদ্ধতিতে খোদিত যোদ্ধবেশে পুরুষমূর্তি। ভাস্কর্যটির অধিকাংশ মাটির নীচে এবং এটি বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত।

গোলামারার পুরাক্ষেত্রে আসার পথে শেষ যে গ্রামটি পড়ে নাম তার বাইকাটা। এই গ্রামের এক দুর্গা মন্দিরে ও তার অঙ্গনে গোলামারার পুরাক্ষেত্র থেকে নিয়ে আসা কয়েকটি পুরাবস্তু রাখা আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি কুলুঙ্গিতে প্রায় দেড়ফুট উচ্চতার যে মূর্তিটি রাখা আছে সেটি জৈন শাসনদেবী অম্বিকার। মূর্তিটির নানা অংশ ভগ্ন। দেবী অম্বিকা বাঁ হাতে একটি বালকের হাত ধরে আছেন। তাঁর ডানদিকে একটি পার্শ্বমূর্তি। দেবীর মাথার উপরে ফলসমেত গাছের ডাল; পদতলে সিংহ। দুর্গামন্দিরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে রাখা আছে একটি আমলক। এটি একটিমাত্র পাথরের খণ্ড কেটে তৈরী। খুব সম্ভব এটি গোলামারার অধুনালুপ্ত পাথরের মন্দিরের মাথায় শোভা পেত। মন্দির অঙ্গনের এক পাশে একটি বীরস্তম্ভ বা

সীমানাস্তম্ভ রাখা আছে। এটি গোলামারার পুরাক্ষেত্রের বীরস্তম্ভ বা সীমানাস্তম্ভেরই মত।

ইতিহাসবেত্তা শ্রীঅনন্ত প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৮ সালে গোলামারা পরিভ্রমণ করেন। তিনি ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে একটি সিংহারূঢ় নারীমূর্তি (জগদ্ধাত্রী? দুর্গা?) ভূপ্রোথিত অবস্থায় দেখতে পান। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, জৈন মন্দিরের কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোন হিন্দু মন্দিরও ছিল। খুব সম্ভব ইঁটের ধ্বংসাবশেষ সেই হিন্দু মন্দিরের। এছাড়া শাস্ত্রী মহাশয় কাছাকাছি একটি লিপি খোদিত পাথরের খণ্ড দেখতে পান। এতে লেখা ছিল এই কটি কথা—'শ্রীদানপতি সাধকস্য'। লিপিটিকে তিনি Nagari of the proto-Bengali type বলে বর্ণনা করেছেন এবং লিপিটির চরিত্র অনুযায়ী এটি একাদশ দ্বাদশ শতকের।[১]

Antiquarian Remains in Bihar, D. R. Patil, P. 145

সরস্বতী

মৃগয়ায় যাবার জন্য রাজধানী হতে বহির্গত হচ্ছিলেন উজ্জয়িনীরাজ গর্ধভিল্ল। নগরের উপান্তে যেখানে পথ দ্বিধাবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সেখানে সহসা দেখতে পেলেন দুই সাধ্বীকে যাঁরা রাজধানীর অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সামান্য দৃশ্য কিন্তু অসামান্য হয়ে দেখা দিল উজ্জয়িনীরাজ গর্ধভিল্লের চোখে। দুই সাধ্বীর একজন বৃদ্ধা, একজন যুবতী। যে যুবতী তাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

অনেক রূপ দেখেছেন গর্ধভিল্ল। কিন্তু এমন উপকরণহীন রূপ তিনি এর আগে কখনো দেখেননি। রক্ত প্রবালের মত অধর, সুধা ধবল কণ্ঠদেশ, কোমল বক্ষপট, কৃশ কটি। তাঁর মনে হল এ কোন মানবীর মূর্তি নয়, যেন প্রমূর্তা হয়ে দেখা দিয়েছে বনশ্রী। অশ্ব নিয়ে সাধ্বীদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন তিনি।

হঠাৎ পথ রুদ্ধ হওয়ায় ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করেন বয়স্কা আর্যিকা—কে তুমি ?

আমি উজ্জয়িনীরাজ গর্ধভিল্ল।

আপনি উজ্জয়িনীরাজ ?

হাঁ আমি।

বিসদৃশ আপনার আচরণ। সাধ্বীদের পথ ছেড়ে দাঁড়ান।

আপনার কাছে এক অনুরোধ জ্ঞাপন করবার আছে, আর্যিকা!

আমার কাছে আপনার কি অনুরোধ থাকতে পারে ?

উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদের বৈভবের মধ্যে আপনার সঙ্গিনীকে নিয়ে যেতে চাই—এই অনুরোধ।

এ অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয় উজ্জয়িনীপতি। আমরা সাধ্বী।

সে ত দেখতেই পাচ্ছি।

আমার সঙ্গিনীর পরিচয় হয়ত আপনি জানেন না ?

না। কিন্তু তাতে কি যায় আসে আর্যিকা, ওর আকৃতিই ওর পরিচয়।

কিন্তু তবুও আপনাকে ওর পরিচয় আমার দেবার আছে। ও সংসার সম্পর্কে আচার্য কালকের বোন সরস্বতী।

আচার্য কালক!

হাঁ। হয়ত ওঁর প্রভাবের কথাও আপনি শুনেছেন ?

শুনেছি।

তবে পথ ছেড়ে দাঁড়ান।

সাধ্বীদের সম্মুখ হতে অশ্বকে একটু সরিয়ে নেন গর্ধভিল্ল। তারপর বয়স্কাকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি যেতে পারেন।

বয়স্কা অগ্রসর হয়ে যান। কিন্তু সরস্বতী যেই অগ্রসর হতে যা'ব ওমনি গর্ধভিল্ল তার সম্মুখে আবার অশ্ব উপস্থাপিত করেন। ভয়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে যায় সরস্বতী। কিন্তু তার পূর্বেই তাকে ধরে অশ্বের ওপর তুলে নেন গর্ধভিল্ল।

আঁম্বিকা ফিরে দাঁড়ান। চীৎকার করে উঠেন। নিবৃত্ত হও পরদারিক, দুরিত, দূষিত—

কিন্তু তার পূর্বেই রাজধানীর অভিমুখে অশ্ব ছুটিয়ে দিয়েছেন গর্ধভিল্ল।

মুর্চ্ছাভঙ্গ হয় সরস্বতীর। বিস্ময় বিহ্বল অপলক চক্ষুর দৃষ্টি বর্ষণ করে বুঝতে চেষ্টা করে এ কোথায় এসেছে সে।

কোমল পুষ্কর পলাশে রচিত একটি শয্যা, সৌরভ তরুর নির্যাস পোড়ে রত্নাধারে। দূরে মরকতযুত বেদিকা, বৈক্রান্ত স্তবকে খচিত স্তম্ভশ্রেণী। তখন সহসা তার মনে পড়ে যায় তার মূর্চ্ছাহত দেহ লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিলেন উজ্জয়িনীরাজ গর্ধভিল্ল।

উজ্জয়িনীরাজ!—বলে সহসা সন্ত্রস্ত চীৎকার করে উঠে বসে সরস্বতী।

তার আহ্বান শুনে উজ্জয়িনীরাজ তার সামনে এসে দাঁড়ান।

আমায় মুক্তি দিন উজ্জয়িনীরাজ!

সরস্বতীর মুখের দিকে মুগ্ধ ও সাগ্রহ চক্ষুর অপলক দৃষ্টি তুলে বলেন গর্ধভিল্ল—কার কাছ থেকে তুমি মুক্তি চাও সরস্বতী?

সরস্বতীর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এক প্রেম বিধুর পুরুষের কণ্ঠস্বর যেন তার কানের কাছে বেজে উঠেছে, এমন কণ্ঠস্বর জীবনে এই প্রথম সে শুনতে পেল।

প্রণয়সংগীতের ঝংকার যেন নিশাবসানের বিহগ কাকলির মত সরস্বতীর অন্তরে এক নবোষার অরুণিত বিহ্বলতা সঞ্চারিত করে। সুস্মিত অধরপুট সহসা দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায় আচার্য কালকের বেদনাক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখ।

উজ্জয়িনীরাজ—

বল সুচারুরূপিনি!

আমায় মনস্থির করবার সময় দিন।

প্রত্যুত্তর দেবার পূর্বেই প্রতিহারী এসে সংবাদ দেয়·মুনি পুণ্ডরীক দ্বারে এসে অপেক্ষা করছেন।

অন্তঃপুর হতে বাহিরে এসে দাঁড়ান গর্ধভিল্ল।

পুণ্ডরীক বলেন, আচার্য কালক জানতে পেরেছেন যে আপনি সাধ্বী সরস্বতীকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছেন।

শান্ত স্বরে প্রত্যুত্তর দেন গর্ধভিল্ল, জ্ঞানী আচার্য ঠিকই জেনেছেন কিন্তু এই সামান্য সংবাদ দেবার জন্য আপনার এখানে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমি আচার্যের অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আপনি সাধ্বী সরস্বতীকে মুক্ত করে দিন।

সে সম্ভব নয়।

আপনি রাজ্যেশ্বর। আপনার এই আচরণ গর্হিত ও অকীর্তিকর।

মুনিবর! এক্ষেত্রে আমি প্রণয়ী।

কিন্তু আচার্য কালক আপনার এই আচরণ ক্ষমা করবেন না।

শ্লেষ জড়িত কণ্ঠে বলেন গর্ধভিল্ল, আমি জানতাম মুনিরা ক্রোধহীন ও ক্ষমা-পরায়ণ হন।

আপনি ভুল জেনেছেন। ক্ষমার অর্থ ক্লীবত্ব নয়। এক্ষেত্রে আচার্যেরও বিশেষ কর্তব্য রয়েছে।

হেসে ওঠেন গর্ধভিল্ল। বলেন, তাঁর কর্তব্যবোধ হতে আমার কর্তব্যবোধ কিছু ভিন্ন। নীলকঞ্জপ্রভ নয়নের প্রভাকে শুষ্ক নীরস করাকে তিনি কর্তব্য বলে মনে করতে পারেন কিন্তু গর্ধভিল্ল তা মনে করে না। সুকোমল চম্পকসঙ্কাশ চিবুক, মনসিজ মনোহরণ ভ্রূশরাসন, মুক্তাচ্ছ রদরুচি, যৌবনরাগে শোণীকৃত অধর বিশুষ্ক হবার জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেন নি।

আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আপনি সরস্বতীকে তার ভ্রাতার কাছে চলে যেতে দিন।

সে হয় না।

হয় না! তবে এক অন্তিম অনুরোধ কি আপনার কাছে জানাতে পারি?

নিশ্চয়ই।

যতদিন না আচার্য কালক তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন ততদিন যেন—

আবার হেসে ওঠেন গর্ধভিল্ল। বলেন ততদিন যেন তাকে শয্যাসংগিনী না করি! অদ্ভুত অনুরোধ! আচার্যের এ অনুরোধও আমি রক্ষা করতে অসমর্থ।

মহারাজ! অন্ততঃ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—

আমি যেন বলপ্রয়োগ না করি। না মুনিবর, আমি কামুক নই, প্রণয়ী। যত দিন না তার সম্মতি পাব তত দিন তার কুবলয় চরণ চুম্বনের আকাঙ্খা নিয়ে তার কক্ষের দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করে থাকব।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যান পুণ্ডরীক।

শুনে আশ্বস্ত হন আচার্য, উদ্বিগ্নও বোধ করেন। যত শীঘ্র সম্ভব সরস্বতীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে রাজাবরোধ হতে। কর্তব্য স্থির করে ফেলেন কালক।

ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে সাহী রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন আচার্য কালক। তারপর মন্ত্রণা ও কূটবুদ্ধিতে প্রভাবিত করে নিয়ে এলেন তাদের উজ্জয়িনী আক্রমণ করতে। উজ্জয়িনী আক্রান্ত হল। নিহত হলেন গর্ধভিল্ল।

মুক্তি পেয়েছে সরস্বতী। মুক্তি পেয়ে সে আচার্য কালকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার চোখ দুটী কেমন যেন বেদনাহত, অশ্রুসিক্ত!

আশ্চর্য হন কালক। বলেন, মুক্তিলাভ করে কি তোমার আনন্দ হচ্ছে না সরস্বতী?

দুই হাতে মুখ ঢাকে সরস্বতী। করতল অশ্রু প্রবাহে সিক্ত হয়। এই মুহূর্তে, এখানে আসবার পূর্বে সে বুঝতে পারেনি গর্ধভিল্লের প্রেম তার জীবনে একি রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু সে কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারে না।

সাধ্বী সংঘে তোমায় আমরা সসম্মানে গ্রহণ করব—বলেন আচার্য কালক।

মুখ হতে হস্ত অপসারিত করে সরস্বতী।

তোমায় মুক্ত করতে পেরেছি সেজন্য আমি আনন্দিত—পুনরায় বলেন আচার্য কালক।

কিন্তু…বলে আবার দু হাতে মুখ ঢাকে সরস্বতী।

আচার্য ভাবেন বোধ হয় লুণ্ঠনজাত গ্লানির বেদনায় ভেঙে পড়েছে সরস্বতী। তাই সান্ত্বনার সুরে বলেন, কিন্তু সেত তোমার ভুল নয় সরস্বতী। এক কামুক তোমায় অপহরণ করেছিল। তোমার অপরাধও নয়। আমার বিশ্বাস সে তোমার শুচিস্মিত দেহ স্পর্শ করতেও পারেনি।

খর হয়ে ওঠে সরস্বতীর চোখের দৃষ্টি। সে মুখ তুলে এবারে দৃঢ়স্বরে বলে, আপনার সে বিশ্বাস সত্য নয়।

চমকে ওঠেন আচার্য কালক। তবে কি গর্ধভিল্ল পুণ্ডরীকের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বলপূর্বক সরস্বতীকে উপভোগ করেছে! কিন্তু শান্ত স্বরে বলেন কালক, কিন্তু সেও তোমার অপরাধ নয় সরস্বতী, যদি এক কামুক লুণ্ঠক বলপূর্বক তার লালসা পরিতৃপ্ত করে থাকে—

মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠে সরস্বতী. না, আমায় লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলেও গর্ধভিল্ল এত হীন ছিলেন না—

বিস্মিত হন আচার্য কালক। কঠোর কণ্ঠে বলেন, তবে কি তুমি স্বেচ্ছায় তাঁকে তোমার দেহ দান করেছ?

না।

তবে?

কোনো প্রত্যুত্তর দিতে পারে না সরস্বতী। কেবল অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ তুলে বলে, আমায় শাস্তি দিন আচার্য।

জৈনদিগের দৈনিক ষট কর্ম

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

গুরূপাস্তি

যাঁহারা সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন—বিষয়ের প্রলোভন যাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারেনা—কামক্রোধাদি যাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, এরূপ মুনিদিগের সেবা বা উপাসনা করাও প্রত্যেক শ্রাবকের দৈনন্দিন কতর্ব্যের মধ্যে পরিগণিত। কায় মন ও বাক্যের দ্বারা প্রতিনিয়তই ইঁহাদিগের সেবা করা উচিত, ইহা জৈন শাস্ত্রের বিধি।[৪] এইরূপ মুনির পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করাও এই গুরূপাসনারই অন্তর্গত। তারপর এইরূপ গুরুকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া তাঁহার নিকট যথাবিধি নিজের আচরিত পাপের কথাও প্রকাশ করা উচিত।[৫] এইরূপে গুরুর নিকট স্বকৃত পাপের বিষয় উল্লেখ করিলে একদিকে যেমন গুরু সমস্ত বিষয় বুঝিয়া কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, অন্যদিকে আবার শ্রাবকের ইহা বলিতে বলিতে পাপের প্রতি ঘৃণা স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং সে পাপ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। ফলতঃ অপরের নিকটই হউক বা নিজ মনে মনেই হউক, স্বকৃত পাপের একবার আলোচনা করিলে তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

তবে আজকাল আর সাধারণতঃ সেই নির্গ্রন্থ দিগম্বর মুনি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। এইজন্য সেইরূপ মহাপুরুষদিগের কথা স্মরণ করা এবং সম্যগ্‌দৃষ্টি ও সম্যগ্‌জ্ঞান যাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঐরূপ ঐলক, ক্ষুল্লক,[৬] ও ব্রহ্মচারীকেই সেবা

---

৪ সাগারধর্মামৃত, ২।৪৬

৫ ঐ, ৬।১১

৬ উৎকৃষ্ট জৈন শ্রাবকদের মধ্যে দুই ভেদ—(১) ঐলক (২) ক্ষুল্লক। ক্ষুল্লক অপেক্ষা ঐলকের স্তর উচ্চ। ক্ষুল্লক একখানি কৌপীন ও একখণ্ড ক্ষুদ্র উত্তরীয় মাত্র ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট জলপানের জন্য একটি কমণ্ডলু, ভোজনের জন্য একটি পাত্র এবং মাটি হইতে কীট পতঙ্গাদি অপসারিত করিবার জন্য ময়ূরপুচ্ছনির্মিত পিচ্ছিকা থাকে। ক্ষুল্লককে বিশেষ যত্নের সহিত সামায়িক, প্রোষধোপবাস, স্বাধ্যায় ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

ঐলককে মুনিদিগের ন্যায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান করিতে হয়। রাত্রিতে তাঁহার জন্য মৌনাবলম্বন পূর্বক ধ্যানস্থ হইবার বিধান আছে। একখানি কৌপীন, পিচ্ছিকা ও একটি কমণ্ডলু ভিন্ন ঐলকের অন্য কোনও দ্রব্য রাখিবার নিয়ম নাই।

খাদ্য সম্বন্ধে উভয়কেই শ্রাবকের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে শ্রাবক স্বয়ং অভ্যর্থনা না করিলে যাচিয়া শ্রাবকের বাড়ীতে ইঁহারা ভোজন করেন না।

করা এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করা গুরুপাস্তির অনুকম্পরূপে বিহিত হইয়াছে।

স্বাধ্যায়

প্রত্যেক জৈনের পক্ষেই প্রতিদিন যথাসাধ্য কিছু সময় জৈনশাস্ত্র আলোচনা করা কর্তব্য। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে জৈনগণ শাস্ত্রগ্রন্থকে দেবতার মত ভক্তি ও পূজা করেন। সুতরাং শাস্ত্রালোচনও যে তাঁহাদের পক্ষে দৃঢ়ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্য, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যিনি গ্রন্থপাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে পবিত্রভাবে ভক্তির সহিত ঐ কার্য করিতে হইবে, ইহা জৈন শাস্ত্রের বিধি। অপবিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, অস্নাত অপবিত্র দেহে, অপরিষ্কৃত ও অপবিত্র স্থানে বসিয়া অশ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন বা আলোচনা করিলে উহাতে শাস্ত্রের অবমাননা করা হয় এবং সেরূপ অধ্যয়ন বা আলোচনায় কোনরূপ সুকৃতি লাভ হয় না বলিয়া জৈনশাস্ত্রকারগণ উহা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জৈনদিগের এই স্বাধ্যায় শব্দে শাস্ত্রের অধ্যয়ন মাত্রই বুঝতে হইবে না। ফলতঃ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ব্যতীতও স্বাধ্যায় ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। জৈনশাস্ত্রকারগণ স্বাধ্যায়ের কয়েকটি প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বাধ্যায় পাঁচপ্রকার—বাচনা স্বাধ্যায়, পৃচ্ছনা স্বাধ্যায়, অনুপ্রেক্ষা স্বাধ্যায়, আম্নায় স্বাধ্যায় ও ধর্মোপদেশ স্বাধ্যায়[৭]। বিশুদ্ধভাবে শাস্ত্র গ্রন্থের পঠন ও পাঠনের নাম বাচনা স্বাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাই যথার্থ স্বাধ্যায়। শাস্ত্র গ্রন্থের কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট বিনীতভাবে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিবার নাম পৃচ্ছনা স্বাধ্যায়। গুরুর নিকট হইতে শ্রুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অভ্যাস করার নাম অনুপ্রেক্ষা স্বাধ্যায়। শুদ্ধভাবে স্পষ্টরূপে (আর্য আম্নায়ানুসারে অর্থ বুঝিয়া) শাস্ত্র গ্রন্থ আবৃত্তি করার নাম আম্নায় স্বাধ্যায়। জনসাধারণকে উন্মার্গ হইতে সৎপথে আনিবার জন্য এবং তাহাদিগকে পদার্থের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ধর্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার নাম ধর্মোপদেশ স্বাধ্যায়।

এই পঞ্চবিধ স্বাধ্যায়ের মধ্যে যে কোন স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক শ্রাবকের পক্ষে প্রতিদিনই কর্তব্য। স্বাধ্যায়ের এই কয়টি ভেদ থাকায় জৈনদিগের মধ্যে দুইটী সুন্দর জিনিষ লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ইহাতে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—কি অক্ষরজ্ঞ, কি নিরক্ষর, কি উচ্চজাতি, কি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, সকলের পক্ষেই একপ্রকার না একপ্রকার স্বাধ্যায় পালন করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে সমাজের প্রত্যেকেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য

৭ তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র, ৯।২৫

বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বাঙ্‌লাদেশে যখন কথকতার প্রচলন খুব বেশী ছিল, তখন যেমন বঙ্গপল্লীর আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই হিন্দুপুরাণ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিত, স্বাধ্যায়ের এইরূপ নানাভেদ জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুণ এবং স্বাধ্যায় প্রত্যেক জৈনের অবশ্য কর্তব্য দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় জৈনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বহু জটিল ও গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধেও জৈন সাধারণ লোকের তেমনই যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরক্ষরেরাও দর্শনের প্রতিপাদ্য কঠিন কঠিন বিষয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ—এরূপ লোক বোধ হয়, জৈনদিগের মধ্যে ভিন্ন অপর কোনও ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। মুক্তি কি—মুক্তিলাভের উপায় কি, তত্ত্ব কয় প্রকার, প্রমাণ কাহাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার, জীব কয় প্রকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রত্যেক জৈন শ্রাবকই তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া আমি প্রকৃত পক্ষেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ধর্মেই এইরূপ ধর্মগ্রন্থের স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সংযম

জৈন শাস্ত্রকারদিগের মতে সংযম দুই প্রকার (১)—ইন্দ্রিয় সংযম, (২) প্রাণি সংযম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম ইন্দ্রিয় সংযম। আর প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হওয়ার নাম প্রাণি সংযম। এই দুই সংযম অভ্যাস করিবার জন্য প্রত্যেক শ্রাবককেই প্রতিদিন যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। 'আজ আমি এই জিনিসটি দেখিব না', 'আজ আমি এই জিনিসটি খাইব না' প্রতিদিন শ্রাবককে এইরূপ একটী একটী (শক্ত্যনুসারে একাধিক) প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই তাহার পক্ষে দৈনন্দিন কর্তব্য সংযম। এইরূপে অভ্যাস করিলে কালক্রমে তাহার দুই প্রকার সংযমই অভ্যস্ত হইবে এবং ধর্মবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া সে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ মুনি ধর্ম ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।

তপঃ

ধর্মে প্রবৃত্তি বাড়াইবার জন্য প্রতিদিনিই যথাশক্তি কিছু না কিছু তপশ্চর্যা বা আত্মধ্যানাদির অনুষ্ঠান করাও কর্তব্য। এইরূপ ক্রিয়ার আর এক নাম সামায়িক। ইহার অনুষ্ঠান আদৌ কঠিন নহে। 'ওঁ নমঃ সিদ্ধেভ্যঃ', 'শ্রীবীতরাগায় নমঃ', 'ণমো অরহন্তাণং', 'ণমো সিদ্ধাণং', ইত্যাদি মন্ত্রের যে কোন একটী যথাশক্তি স্থিরচিত্তে সংযত ও পবিত্রভাবে জপ করাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য কর্তব্য। এরূপ জপের দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা ও একাগ্রতা সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই তপশ্চর্যার মধ্যে আর একটী কার্য করিবারও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাবক যে যে পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, মনে মনে তাহার আলোচনা, তাহার জন্য অনুতাপ এবং সেইরূপ কার্য ভবিষ্যতে যাহাতে সংঘটিত না হয়, সে বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করাও তপশ্চর্যার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা যে অনেক উপকার হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। জৈনচার্যগণ তপস্যার দ্বাদশ প্রকার ভেদের বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয় প্রকার বাহ্য তপঃ ও ছয় প্রকার আভ্যন্তর তপঃ। অনশন, অবমৌদর্য, বৃত্তি পরিসংখ্যান, রস পরিত্যাগ, বিবিক্ত শয্যাসন ও কায় ক্লেশ, এই ছয়টি হইল বাহ্য তপঃ। খাদ্য-দ্রব্যাদি বাহ্যবস্তু বিষয়েই এই তপের বিধান ; তাই ইহার নাম বাহ্য তপঃ। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্য, স্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ ও ধ্যান, এই ছয়টি আভ্যন্তর তপঃ। এই দ্বাদশ-বিধ তপস্যা মুনিগণেরই মুখ্য কর্তব্য। তবে শ্রাবকগণ যথাশক্তি ইহাদের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই জৈন শাস্ত্রের নির্দেশ।

এক্ষণে সংক্ষেপে এই তপস্যাগুলির লক্ষণ নির্দেশ করিব। সংযম অভ্যাস করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য, স্বাদ্য, লেহ্য, পেয় এই চারি প্রকার ভোজন ত্যাগ করার নাম অনশন তপঃ। বিবিধ উৎসবাদি উপলক্ষে হিন্দু দিগের যে উপবাসের বিধান আছে, জৈনদিগের অনশন তপঃ অনেকটা সেইরূপ। উপোষিত অবস্থায় পূজা ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয় দমন এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণে (আকণ্ঠ পূর্ণ না করিয়া) ভোজন করার নাম অবমৌদর্য। অধিক পরিমাণে ভোজন যেমন স্বাস্থ্যের অনিষ্ট জন্মায় তেমনই ধর্মানুষ্ঠানের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। 'আজ মাত্র দুই বাড়ীতে যাইব। আহার মিলে ত ভাল, নইলে উপবাসী থাকিব।'—এইরূপ প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য করার নাম বৃত্তি পরিসংখ্যান। সংযমাভ্যাসার্থ ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, গুড়, লবণ, তৈল প্রভৃতির মধ্যে প্রতিদিন এক বা একাধিক রসত্যাগ করার নাম রস পরিত্যাগ।[৮] চিত্তের একাগ্রতাসাধনের জন্য নির্জন স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিবার নাম বিবিক্তশয্যাসন। শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিয়া নানারূপ কষ্ট সহ্য করার নাম কায়ক্লেশ। এই সকল তপগুলি সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তের একাগ্রতাসাধন প্রভৃতি বিষয়ে যে একান্ত উপযোগী, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। অবশ্য নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে হয়ত ইহাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিবেন না। কিন্তু সংযম অভ্যাস করাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে তাহা ত্যাগের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভোগের মধ্য দিয়া হয় না, এ কথা স্থির নিশ্চিত।

---

৮ হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ সংযমাভ্যাসের জন্য প্রতিদিন কোনও না কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

আভ্যন্তর তপের সকলগুলির লক্ষণ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি না। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয় ও ধ্যান ইহাদের অর্থ সকলেই জানেন। স্বাধ্যায়ের কথা ইতঃপূর্বেই বলা হইয়াছে। মুনি প্রভৃতির সেবা করার নাম বৈয়াবৃত্য। পরিগ্রহ পরিত্যাগের নাম ব্যুৎসর্গ।

দান

প্রতিদিন যথানিয়মে যে শ্রাবক কিছু না কিছু দান করে এবং যথাশক্তি তপশ্চর্যা করে সে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করিয়া থাকে।[৯] এই জন্যই সাগারধর্মামৃতকার শ্রাবকের দৈনন্দিন আচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"তাহার পর ভক্তির সহিত যথাশক্তি সৎপাত্রকে (দানাদির দ্বারা) সন্তুষ্ট করিয়া এবং আশ্রিত সকল লোকেরই সন্তোষ বিধান করিয়া যথাকালে পরিমিত আহার করিবে।"[১০]

দান করিবার সময়ে সৎপাত্রকেই দান করা উচিত। জৈনাচার্যগণের মতে সৎপাত্রের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও জঘন্য এই তিন শ্রেণী আছে। সংসারত্যাগী মুনিই উত্তম পাত্র। সম্যগ্‌দৃষ্টি সম্পন্ন শ্রাবক মধ্যম পাত্র আর যাহাদের সম্যগ্‌দর্শন নাই, এরূপ সাধারণ ক্ষুধাতুরাদি দুঃখী মাত্রেই জঘন্য পাত্র। উত্তম পাত্রে দান করিতে পারিলে তাহাতেই সমধিক ফললাভ হয়; তবে উত্তম পাত্র পাওয়া না গেলে অগত্যা মধ্যম বা অধম-পাত্রকেই দান করিতে হইবে – ইহা জৈন শাস্ত্রের মত ও গৃহস্থগণের প্রাত্যহিক কর্ম।

ইঁহাদের মতে দান চারিপ্রকার—অভয়দান, আহারদান, বিদ্যাদান ও ঔষধদান। এই চারিপ্রকার দানের মধ্যে সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ একটি প্রত্যহ প্রত্যেক শ্রাবকের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। সকল লোকের বাঞ্ছিত ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ—উৎকৃষ্ট সুখ প্রভৃতি লাভ করা প্রাণ না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রাণই ইহাদের সকলের মূল। সেই মূলীভূত প্রাণ রক্ষার জন্য যিনি অভয়দান করেন, তিনি কিই বা দান না করেন অর্থাৎ তাঁহার দানই সর্বোৎকৃষ্ট।[১১] অভয়দানের এই প্রশংসাসূচক বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে যে, জীব রক্ষা করার জন্য যে অহিংসা ব্রতের অনুষ্ঠান, তাহাও এই অভয়দানেরই অন্তর্ভুক্ত।

শাস্ত্রপাঠেই কর্তব্যাকর্তব্য বিষয় জ্ঞান জন্মে—শাস্ত্র পাঠেই ধর্মে অনুরাগ জন্মায়। পাপরাশি দূর করে এবং চিত্তকে পবিত্র করে; সুতরাং সেই শাস্ত্র দান করা একান্ত কর্তব্য।[১২] এই শাস্ত্রদানই বিদ্যাদান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাহার জন্য লোকে ভার্যা, ভ্রাতা এবং পুত্রকেও ত্যাগ করে, যাহা বিনা ব্রতাদি সকলই

৯ সাগারধর্মামৃত, ২।৩৯
১০ ঐ , ৬।২৩
১১ সুভাষিত রত্ন সন্দোহ, ৪৭৬
১২ ঐ , ৪৭৭

নষ্ট হয়, যাহার অভাবে পীড়িত হইয়া লোকে ক্ষুধার প্রকোপে অখাদ্য পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সংযত সাধুব্যক্তিকে সেই আহার দান করা কর্তব্য।[১৩]

শরীর সুস্থ থাকিলেই তপঃ ধ্যান প্রভৃতি সম্ভব। এই নিমিত্ত রোগ শান্তির জন্য সাধুব্যক্তিদিগকে ঔষধদান করা উচিত।[১৪] এইরূপে এই চারি প্রকার দানের মাহাত্ম্যই জৈন শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

শ্রাবকগণ যথাশক্তি এই সকল দানকার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সমাজে কাহারও কোন কষ্ট থাকিতে পারে না—মুনিগণ নিশ্চিন্তমনে তপশ্চর্যাদি কার্য করিতে পারেন; তাঁহাদের যদি কোনও অভাব অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর কিছুর জন্য না হউক অন্ততঃ পুণ্যার্জনের জন্যও শ্রাবক তাহা দূর করিতে পারে। বস্তুতঃ জৈন দিগের এই ষট্‌কর্ম একদিকে যেমন অনুষ্ঠাতার ধর্মোন্নতির কারণ হইয়া থাকে, অন্যদিকে সেইরূপ যাঁহারা ধর্মার্জনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয়, বরং তাঁহারা যাহাতে সুখে ও নিশ্চিন্তভাবে ধর্মার্জন করিয়া নিজের এবং অপরের উন্নতির বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন; সে কার্যে শ্রাবককে প্রবৃত্ত করাইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৩১ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও
সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৩১ ভাগ ৩য় সংখ্যায় [১৩৩১] মুদ্রিত, পৃঃ ১২৯-১৩৬।

১৩ ঐ, ৪৭৮
১৪ ঐ, ৪৭৯

মহাবীরের কেবল-জ্ঞানভূমি জৌগ্রাম

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল

অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

[পূর্বানুবৃত্তি]

জলেশ্বরনাথের পুরোহিত ব্রজকুমার ভট্টাচার্য বলেছিলেন, প্রবাদ, বেঁকে নদীর মরা সোঁতা থেকেই এই মন্দিরের চারপাশে এতো বড়ো বড়ো পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। তারপরে, কুলীন গ্রামের দত্তপাড়নিবাসী শ্রীমান্ গদাধর কোঙার আনলেন 'জুলকুল' গ্রামের খবর। জৌগ্রামের এই কাঁকী ও কংস নদীর তীরেই অবস্থিত সে গ্রাম। এবং সেখানে রয়েছেন অনন্ত বাসুদেব ঠাকুর। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর কাছে এসেছিলেন ষোড়শ শতাব্দে।

আমার ধারণা হলো, বেলে যদি উজুবেলে বা ঋজুপালিকা, ঋজুবালিকা বা ঋজুবালিকা হয় তাহলে, পাঠান্তর, ঋজুকূলার নাম থেকে অতি সহজেই জুলকূলা নামটি আসতে পারে — ঋজুকূলা/উজুকূলা/জুকূলা/জুলকূলা = জুলকূল। আমার দৃঢ় ধারণা, ঋজুকূলা এই মূল নামটি থেকে এই কংস নদীর আগের নামটি ছিল ভাষাতত্ত্বের নিয়মে—জুলকূলা। ঋজুপালিকা বা ঋজুকূলা নদী নামটি অপভ্রংশের যুগে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল বেলে বা জুলকূলা হয়ে। পরে, আমার অনুমান হয়, পঞ্চদশ শতাব্দে সন্নিহিত কুলীনগ্রামের ভাগবতাচার্য বৈষ্ণব বসুগণ জৈনগন্ধী জুলকূলা নামটি বদল ক'রে রাখলেন, কৃষ্ণের শত্রু—'কংস'। কিন্তু নাম বদল হয়; মরে না সহজে। নদী-নামটি গিয়ে আশ্রয় পেল গ্রাম-নামে।

আমার মনে হচ্ছে, ষোড়শ শতাব্দে যুগন্ধর স্থানীয় কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এই কংস নদীর প্রাচীনতর প্রবাহে মহাবীরের অহিংসা-সৌরভ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এই নদীর তীরে রাণাপাড়ায় অভয়াচণ্ডীর দেউল ছিল। সে দেবী অভয়া দুর্গা, মহিষবাহনা জৈন দেবী কোট্টকিরিয়া। নিকটেই ছিলেন পদ্মাবতী। মুকুন্দরাম তাঁর কালকেতু-ব্যাধের নিপীড়নে ভীত-নিপীড়িত পশুগণকে এই কংসনদীর তীরে এই চণ্ডীর দেউলে অভয়-আশ্রয় প্রার্থনা করিয়েছিলেন।

ঋজুপালিকা বা উজুবেলে ওরফে ঋজুকূলা, জুলকূলা বা কংসনদী নির্গত হয়েছে দামোদরের পরিত্যক্ত পুরাতন খাত-এলাকায় মসাগ্রাম-হাবাসপুরের নিকট "যোগদহ" থেকে। জৌগ্রামের নিকট কাঁকী হয়ে, বেলে হয়ে, পরে, নানা পুকুর ডোবা হয়ে

এখন এ নদী মরে গেছে। ঠিক আদি গঙ্গার দশা হয়েছে। তবে, আড়াই হাজার বছরের আগেকার প্রবাহিনীটিকে তার মরা সোঁতা দেখে আজও সবাই চিনতে পারবেন। দামোদরের প্রাচীনতর খাত বদল হবার ফলেই এর এই হাল। এ নদীকে আবার আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে। ঋজুকূলার উৎসে, নাম 'জোগদহ'। জোগ্রামের পূর্বনাম 'জোগগ্রাম'। এই যোগ-শব্দের যোগাযোগ, এই নদী ও এই গ্রামের একটি ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পরিচয় বহন করছে। শ্রীমান্ গদাধরের প্রস্তুত মানচিত্র এবং আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলি দেখে আমার ধারণা হয়েছে, এর তীর ভূমিতে অবস্থিত গ্রামগুলিতে অতি প্রাচীন জৈন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক কাহিনী আত্মগোপন করে আছে।

আর অনন্ত বাসুদেব ঠাকুর। জুলকূলার অনন্ত বাসুদেব। তিনি যে মহাবীরেরও পূর্বেকার একজন অর্হৎ। শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে এ-কথা বলেছেন জগদীশ চন্দ্র জৈন মহাশয়। "These countries were called Aryan because, it is said that the Titthayaras, the Cakkavattis, the Baladevas and the Vasudevas were born here. These great men are said to have attained omniscienc in these countries and by attending to their preachings a number of people were enlightened and had taken to ascetic life." (Pp. 250–51)

তৃতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দে রাঢ়দেশ আর্যদেশ। রাজধানী কোডিবরিস। কিন্তু, এর তিন শো বছর আগে মহাবীরের সময়ে, জৈন ভগবতী সূত্র মতে, অংগ বংগ, পাণ্ডা বা লাঢ়, লাড় বা রাঢ়, সম্ভবত: ছিল ষোড়শ মহাজন পদের অন্তর্ভুক্ত। এবং সারা দেশটি ছিল জৈন সম্প্রদায়ের এলাকা। মহাভারত মতে, অঙ্গ বঙ্গ ছিল একটি বিষয় বা জেলা। মহাবীর বারো বৎসরের বেশি সময় লাঢ় দেশের বজ্জ ও সূহ্ম ভূমিতে চারিকা করেছিলেন। এই রাঢ় আজকের পশ্চিমবঙ্গ। এবং Bihar in Western Bengal-এ তাঁর প্রভাব রয়েছে। জৃম্ভকগ্রামে তিনি এসেছিলেন দু'বার।

মহাবীর এখানে আসার আগে, এখানে বেয়াবত্ত নামে একটি চৈত্য ছিল। তাঁর সময়ে সেটির ভগ্নদশা। জোগ্রামে জলেশ্বরনাথের মন্দির-সন্নিহিত এলাকায় রয়েছে 'কামডাঙ্গা'। এই কামডাঙ্গায় কামরূপের যে কিরাত কাম জাতি তখন বসবাস করতো, এই ভাঙ্গা মন্দিরটি ছিল তাদেরই। মহামাতা কামাখ্যাচণ্ডীর দেউলে সম্ভবতঃ হঠযোগে বীর সাধনার বজ্র বা 'মণ্ডলচক্র' ছিল। ফলে, বৈর্ধাবর্ত বা বেয়াবত্ত চৈতির এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে, এমন-কি, দামোদর, দমোদা বা দমোদী নদীর নামটিও অস্থিক গ্রামের নিকটে 'বেয়াবই' হয়ে গিয়েছিল। মহাবীর ঐ ভাঙ্গা মন্দিরের নিকটেই বসেছিলেন। গ্রামের বাহিরে। পরিবেশ ছিল 'কাল

কৈবল্যদায়িনী'র।

এখানে জৈন জলেশ্বরনাথের হিন্দু সহচরী দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী। এই দেবী অনেক প্রাচীন কালের। সম্ভবতঃ এখানে জলেশ্বরনাথের চেয়েও পুরাতন। এবং এ'র আরাধনা কিরাত মতের। পণ্ডিতগণ যোগিনীতন্ত্রের বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন,—"সিদ্ধেশি! যোগিনী-পীঠে ধর্মঃ কিরাতজো মতঃ।" অর্থাৎ এখানকার বৈর্ধাবর্ত চৈত্যে প্রতিষ্ঠিতা, যোগিনী পীঠের সিদ্ধেশ্বরীর নিকট, ইন্দো-মোঙ্গোলীয় কিরাত কাম-জাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হতো। বর্তমান জলেশ্বরনাথের মূল জৈনমন্দিরের পাশে, মূল মন্দিরের সমকালে বা পরবর্তিকালে প্রতিষ্ঠিত সেই হিন্দুশাসনদেবীর অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির রয়েছে, তান্ত্রিককৃত্য অনুষ্ঠানের আসন সমেত।

শ্যামাগামী বা সামাগ নামে একজন গৃহস্থের কৃষিক্ষেত্রে তিনি বসেছিলেন। সে সামাগামীর পরিচয় সম্ভবতঃ আমরা জানি। আদিম শিকারী গোষ্ঠীর পুরোহিত একজন 'সামা' ছিলেন তিনি। তিনি আজব কাণ্ডে ছিলেন ওস্তাদ। মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ ভালো মন্দ শুভ শাকুন বলতে পারতেন তিনি। শিকার সফল হবে কিনা তাও জানাতে পারতেন আগে ভাগে। ঢাকের বাজনায় সমাধি হতো তাঁর। আর ঐ সামাগণের নাম থেকেই এ দেশের নাম হয় সুহ্ম বা সুহ্ম। আবার এই সুহ্মগণই হলেন রাঢ়ী।

রজবুপ্যার মতো সামারুপ্যা ছিলেন তাঁদের কুলদেবী। মহাবীর একজন সেই গৃহস্থ সামারই কৃষিক্ষেত্র আশ্রয় করেছিলেন। কৃষিপণ্য বলতে তখন তো ওগরা ধান আর তিল পাই। ইতিপূর্বে মহাবীর আর গোশাল অজয়-বর্ধমানের পণিয়ভূমি থেকে বীরভূমির কূর্মগ্রামে গিয়ে উর্ধ্ববাহু বেসয়ন ঋষির কাছ থেকে সূর্যরশ্মি পানের ভঙ্গীটি অধিগত করেছিলেন, সম্ভবতঃ গো-দোহন ছান্দে বসে। তিল গাছের জন্ম মরণ দেখেছিলেন তিনি ও গোশাল সেখানেই।

এখন শালগাছ নাই এখানে একটিও। কিন্তু, আড়াই হাজার বছর আগে ছিল না, তাও হলফ ক'রে বলা যাবে না। অদূরে বোড়িসিয়ার নিকটে বেহুলা নদীর বাঁকে, আকবরনগরের পাশে দামোদরতীরে এখনও শালগাছের সমারোহ দেখেছি। সুতরাং এখানকার অনস্তিত্ব হয়তো চিরস্থায়ী ছিল না।

মহাবীর 'বিজএণং মুহুত্তেণং' অর্থাৎ বিজয় নামক মুহূর্তে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। আর আশ্চর্য, রাঢ় ভূমির লৌকিক শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন 'বিজয় নাম বেলাতে'। জংভিয়গাম নগরের বাহিরে 'মহাবীর' সাধনা করেছিলেন। আর আশ্চর্য, এখানে নগর-বাহিরেই থাকতেন তখন নাড় ডোম্বিগণ তাঁদের 'কুড়িআ' ঘরে। নাথ পন্থে অজয়-কেন্দুবিল্বতে জয়দেবও সাধনা করতেন গ্রামের বাহিরে।

যাই হোক্, আলোচ্য পরিবেশে তেরসমস্স অংতরা বট্টমাণস্স, জে সে গিম্হাণং দোচ্চে মাসে চউত্থে পক্খে বইসাহ-সুদ্ধে, তস্স ণং বইসাহ-সুদ্ধস্স দসমী-পক্খেণং··· সুব্বএণং দিবসেণং বিজএণং মুহুত্তেণং জংভিয়-গামস্স নগরস্স বাহিয়া উজুবালিয়াএ নঈতীরে বিয়াবত্তস্স চেইয়স্স অদূর-সামংতে সামাগস্স গাহাবইস্স কট্ঠ-করণংসি সাল-পায়বস্স অহে গোদোহিয়াএ উক্কুড়ুয়-নিসিজ্জাএ আয়াবণাএ আয়াবেমাণস্স··· অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে ॥ ১২০, ক. প (ক বি), পৃ ৯৮।

[ত্রয়োদশ সংবৎসরে গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাসে চতুর্থ পক্ষে বৈশাখের শুক্ল পক্ষে দশমী তিথিতে···সুব্রত নামক দিবসে বিজয় মুহূর্তে জংভিয়গাম নামক নগরের বাহিরে উজুবালিয়া নদীর তীরে বেয়াবত্ত চৌতিয়ের অদূরে সামাগ নামক একজন গৃহস্থের কৃষিক্ষেত্রে শাল বৃক্ষের নীচে গো-দোহন ছাঁদে বসে মাথা উঁচু করে যখন সূর্যরশ্মি পান করছিলেন...(সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর) অনুত্তর নির্ব্যাঘাত নিরাবরণ কৃৎস্ন প্রতিপূর্ণ (সংপূর্ণ) 'কেবল' নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন লাভ করলেন ॥ ১২০ ॥ ঐ, পৃ ৯৯]

দ্বাদশ বৎসর যাবৎ মহাবীরের রাঢ় চারিকা এবং জোগ্রামে তাঁর সর্বোত্তম সাধনার। এই স্মৃতিটিকে সেকালের বাঙ্গালী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধরে রেখেছে তার পুরাতন নানা সাহিত্য কীর্তিতে। সে আলোচনায় আজ যাব না। সপ্তদশ শতাব্দের অনাদ্যের পুঁথিতে লেখা আছে ঃ কঠুর তপস্যা করে ছ আদশ বচ্ছর। তবু ত না পাল্য দেখা দেব মাআধর ॥·· ভকত বচ্ছল্যে [তাঁকে] সর্বলোকে বলে। হস্তবেস্ত হঞা প্রভু ভক্ত নিল কোলে ॥ প্রসন্ন হইঞা বর দিলেন মাআধরে। জন্ম লঅগা তুমি জোউবনের ঘরে ॥ কঠুর করিঞা কৈল আমাদ্দের পুজা। আমার আশীর্বাদে হৈইল গোউরের রাজা ॥ ভকতের মনবাঞ্ছা করিঞা পুরণ। বর দিঞা বৈকণ্ঠে গেলেন নিরঞ্জন ॥ (বি. ভা. সা. প্র. ৩, পৃ ১১০-১১)

—এ পদের ব্যাখ্যা আমি করবো না। আপনাদের মনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগে কি না, দেখুন।

বাৎসরিক দিওয়ালী উৎসবটি বাঙ্গালী আজও পালন করে থাকে, পাবাপুরীতে মহাবীরের তিরোভাব, নির্বাপণ বা নির্বাণ রাত্রিটিকে স্মরণ ক'রে। সে-ও ঐ সামা বা শ্যামাপূজার রাত্রিতে। মাতা সিদ্ধেশ্বরী 'কেবল জ্ঞান' দায়িনী শ্যামা যেন তাঁকে সংবরণ করে নিলেন, তাঁর নির্বাণ মুহূর্তটিতে।

After Mahavira attained *kevala*-hood, a *samavasarana* (religious conference) was held on the bank of the river Ujjuvalia, but it is said that the first preaching of Mahavira

remained unsuccessful. Then after traversing twelve *yojanas,* Mahavira is said to have returned to Majjhima Pava where the second *samavasarana* was convened in the garden of Mahasena. (J. C. J. P. 261).

অর্হত্ত্ব লাভের সময়ে মহাবীর জ্ঞোগ্রামে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। তাঁর অনুচর ও অনুরাগী শিষ্য জুটেছিল কিছু। অর্হত্ত্বলাভের পরে, [দিগম্বর মতে] ঋজুকূলার তীরে একটি 'সমবসরণ' বা ধর্মসভা অহূত হয়েছিল। মহাবীর তাঁর নবলব্ধ কেবলজ্ঞানের ও ধর্মমতের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও প্রচার ক'রেছিলেন সেই সভায়, কিন্তু, এখানে তখন কেউ তা গ্রহণ করেননি। তাঁর সভা প্রায় পণ্ডই হয়েছিল।

তারপরে তিনি কথায় কথা বারো যোজন পথ আড়াআড়িভাবে অর্থাৎ সোজাসুজি অতিক্রম ক'রে প্রত্যাবর্তন করলেন মজ্ঝিম পাবাতে। সেকালের বারো যোজন পথ, যেকালে লোক কথায় কথায় ষাট হাজার বৎসর বেঁচে থাকতো, বগলে ক'রে সূর্য ধরে নিয়ে আসতো, স্বর্গে মর্তে নিমেষে লক্ষ যোজন পার হয়ে যাতায়াত করতে পারতো।

পূর্ণ অর্হত্ত্বলাভের আগেকার, ছদ্মস্থকালে মহাবীরের রাঢ় চারণার বিবরণ আচারাঙ্গ সূত্র থেকে উদ্ধৃত করছি। এটি একটি উৎকৃষ্ট কবিতার মতো সুগন্ধী।

সর্বদা সুরক্ষিত হয়েও মহাবীর কুশ কাঁটা, কালা-ঝলা এবং কুঁজি-ডাঁশের নানাবিধ যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন ॥ ১ ॥

তিনি লাঢ়দেশের বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমিতে চাবিকা করেছিলেন। তখন লাঢ়দেশের এই সব অঞ্চলে পথ বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। তিনি এখানে কঠিন শয্যায় শয়ন করতেন এবং কঠিন আসনে উপবেশন করতেন ॥ ২ ॥

লাঢ়দেশে তাঁর অনেক বিপদ্ ঘটেছিল। সন্নিবেশবাসী অনেকে তাঁকে আক্রমণ করেছিল। এমন-কি, রুক্ষ দেশের যে-অংশের লোক ধর্ম মানতো, সেখানেও তাঁকে কুকুরে কামড়েছিল এবং তাড়া করেছিল ॥ ৩ ॥

কেউ কেউ রাগী কুকুরকে টেনে ধরে রাখতো। তারপরে, সাধুকে মারধর ক'রে চেঁচাতো-ছু ছু। এবং সেই ক্রুদ্ধ কুকুর লেলিয়ে দিতো ॥ ৪ ॥

অধিবাসিগণ ছিল এই ধরণের। অন্য সাধুগণ বজ্জভূমিতে মোটা চালের ভাত খেতেন এবং বাঁশের শক্ত লাঠি নিয়ে সেখানে যাতায়াত করতেন। তাঁরা লাঠি রাখতেন কুকুর তাড়াবার জন্যে ॥ ৫ ॥

এইভাবে সুরক্ষিত হয়েও তাঁদিগকে কুকুরে কামড়াতো এবং ছিঁড়ে ফেলতো। লাঢ়ে ভ্রমণ ছিল কঠিন ব্যাপার ॥ ৬ ॥

জীবিত প্রাণীদের বিরুদ্ধে লাঠি ব্যবহার না-ক'রে, শরীরের যত্ন ত্যাগ ক'রে, অনগারিক শ্রমণ মহাবীর গ্রামের লোকেদের এবং চাষীদেব অশ্লীল গালাগালি সহ্য করেছিলেন। ॥ ৭ ॥

রণাঙ্গনের পুরোভাগে হস্তীর মতো মহাবীর বিজয়লাভ করেছিলেন।' লাঢ়দেশে কখনও কখনও তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছুতে পারতেন না ॥ ৮ ॥

বাসনামুক্ত মহাবীর কোনো গ্রামে পৌঁছুলে, গ্রামবাসিগণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতো গ্রামের উপান্তে এবং তাঁকে আক্রমণ করে বলতো এখান থেকে দূর হও ॥ ৯ ॥

তাঁকে তারা আঘাত করতো লাঠি দিয়ে, ঘুঁষি মেরে, লাথি মেরে, ফল ছুঁড়ে, ঝাব্‌রা দিয়ে আর খোলাভাঙ্গা ছুঁড়ে। বার বার তাঁকে প্রহার ক'রে, অনেকে মিলে একসঙ্গে চীৎকার করতো ॥ ১০ ॥

একবার তিনি যখন স্থির, নিষ্কম্প হয়ে বসেছিলেন, তারা তাঁর গায়ের মাংস অথবা গোঁফ ছিঁড়ে নিয়েছিল, তাঁর চুল ছিঁড়ে দিয়েছিল। তাঁর গায়ে ধূলো মাখিয়ে দিয়েছিল ॥ ১১ ॥

অনেকে মিলে ধরে তাঁকে ওপরে তুলে মাটিতে আছড়ে দিয়েছিল; অথবা তাঁর যোগাসনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। নিজ শরীরের যত্ন ত্যাগ ক'রে শ্রমণ মহাবীর অদীনভাবে কষ্ট সহ্য করেছিলেন, কারণ, তাঁর মনে কোনো বাসনা ছিল না ॥ ১২ ॥

রণাঙ্গনে সেনাপতি চারদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ার মতো মহাবীরের অবস্থা হয়েছিল। সকল কাঠিন্য সহ্য ক'রে ভগবান্ মহাবীর অচঞ্চল ছিলেন এবং কেবল জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। ॥ ১৩ ॥

—এবং এ হেন কষ্ট সহ্য করে রাঢ়দেশেই হলো তাঁর অর্হত্বলাভ। মহাবীর তাঁর তপস্বীজীবনের ছদ্মস্থ কালে, নানাস্থানে নানাভাবে, কোথাও কোথাও আরও ভয়ংকরভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু, রাঢ়ভূমির বর্ণনা খুঁটিয়ে দেওয়ায়, এবং রাঢ়ভূমিতে কেবল জ্ঞান-প্রাপ্তির ইঙ্গিত থাকায়, আমাদের নিশ্চিত ধারণা, মহাবীর এই জোগ্রামে বসেই অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। এ যেন ঠিক সেই প্রবাদের 'কষ্ট ক'রে কেষ্ট পাবার' ব্যাপার।

আচারাঙ্গ সূত্রের টীকাকারের মতে, লাঢ়দেশের দুটি বিভাগ—বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমি জ্যাকোবি সাহেবের অভিমতে, লাঢ় হলো চিরায়ত রাঢ়দেশ বা পশ্চিমবঙ্গ। বৌদ্ধগণ এই দেশকে বলতেন—লাল। তিনি আরও বলেন, এই লাল দেশেই হচ্ছে বিজয়ের পিতৃকুল। বিজয় হলেন, সিংহলীয় উপাখ্যানের বিজেতা। সুব্ভভূমি সম্ভবতঃ সূহ্মদের দেশ এবং এই সূহ্মগণ রাঢ়ীদের সঙ্গে অভিন্ন।

আচারাঙ্গ সূত্রের টীকাকারের মতে, তৃতীয় সংখ্যক পদের পাঠে 'লুক্‌খ দেশীভত্তে' কথাটির অর্থ হচ্ছে,—সেখানে জীবনধারণ প্রণালীও খুব কঠিন ছিল। সেখানকার লোকেরা তুলার বদলে ঘাসের কাপড় পরতো।

কল্পসূত্রের ১২২ সংখ্যক সূত্রমতে, অর্হত্ব লাভের পূর্বে ছদ্মস্থরূপে চারিকা কালে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অস্থিকগ্রামে প্রথম বর্ষা যাপন করেছিলেন। কল্পসূত্রের

টীকাকারের মতে, অস্থিক গ্রামের পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান। কারণ, জনৈক যক্ষ শূলপাণি যে-সব লোক হত্যা করেছিলেন, তাদের প্রভূত হাড় সংগ্রহ ক'রে, সেখানে একটি স্তূপ হয়ে গিয়েছিল। সেই অস্থি-স্তূপের উপর বর্ধমানের অধিবাসিগণ একটি মন্দির তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন।

মহাবীর এই সময়ে অর্থাৎ তাঁর চারিকাকালে এক বৎসর (মতান্তরে, ছয় বৎসর) পণিতভূমিতে যাপন করেছিলেন। টীকাসমূহের মতে, পণিতভূমি হলো বজ্রভূমির অন্তর্গত একটি স্থান।

মহাবীরের সমকালে উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রনগর, গোণ্ডগৌড়, পশ্চিমবঙ্গে (সেকালের বঙ্গ) তাম্রলিপ্ত, খর্বটদেশ, কোডিবরিস, পার্থালিস-ব্রডমন (বোড়েডোমন—বর্ধমান), চম্পাদেশ, পাণ্ড্যভূমি,—কিরাত, বজ্জী ও অস্ট্রিক সাম্‌মা বিভাজিত রাঢ় ভূমিতে বজ্জ ও সুম্‌হ নামে রাঢ় রাষ্ট্র এবং অনেক ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্য এবং অনেকগুলি, যেমন কোল্লাক, মোরাগ, কলম্বুক, চোরায় ইত্যাদি সন্নিবেশের অস্তিত্ব থাকার সঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায়। নগ্ন শ্রমণ মহাবীরকে রাঢ়দেশে বিভিন্ন সন্নিবেশ ও গ্রামবাসী সভ্য গৃহস্থগণই সঙ্গত কারণে এবং স্বাভাবিক ভাবেই উৎপীড়িত করেছিলেন। তবে, আমাদের এ-ও মনে রাখতে হবে, তখন তাঁর তপস্বীজীবনের ছদ্মস্থ কাল।

সেই সময়ে আর্যসভ্যতা সবে মাত্র নানা প্রবাহে রাঢ়দেশে বিস্তৃতি লাভ করছিল। জৈন ধর্ম, বিশেষ ক'রে পার্শ্বনাথের ধর্ম এদেশে মহাবীরের ষষ্ঠ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পূর্বেই প্রচারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাঢ়বাসী প্রায় সকলেই জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যাদি ধর্ম গ্রহণ করেছিল। পারস্পরিক মিলন-মিশ্রণও ঘটছিল। আর্যভাষী হিন্দু সভ্যতার প্রসার তখনও এদেশে তেমন ঘটেনি। এদেশের লোকেরা তখন কথা বলতো, অনার্য অস্ট্রিক, দ্রাবিড় অথবা কিরাত ভাষায়। আর্যভাষা ও সংস্কৃতি তখন ছিল উপর উপর।

মহাবীরের পরে, শৈশুনাগ, নন্দ, মৌর্য রাজন্য বর্গ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এ'দের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, খারবেল (চেদি) প্রধান। মৌর্যের পরে শুঙ্গ। অতঃপর গ্রীকশক্তি, সাতবাহন, শক, সীথিয়ান, গুপ্ত। কুশান ও গুপ্তযুগে জৈনধর্ম খুব প্রবল ছিল। ভগবতী সূত্র মতে, পুণ্ড্রপতি মহাপদ্ম (নন্দ) ছিলেন আজীবিক ভক্ত। অশোকের নাতি সম্পাই-এর সময়ে রাঢ় বঙ্গ আর্যদেশ বলে পরিগণিত হয়েছিল। তখন কোডিবরিস আর তাম্রলিপ্ত যথাক্রমে রাঢ় ও বঙ্গের রাজধানী।

সপ্তদশ শতাব্দে জোগ্রামে সাংস্কৃত চর্চার খ্যাতি ছিল দেশ-জোড়া। সাড়ে তিন শো বছর আগে, ধর্মঠাকুরের কবি রূপরাম চক্রবর্তী সে সংবাদ দিয়েছেন সগৌরবে। জৃম্ভক আর জো-এর মাঝামাঝি শব্দ দিয়ে, এই সময়ের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এই জোগ্রামের 'জোগ্রাম' নামটি সম্ভবতঃ প্রচলিত করে থাকবেন।

মহাবীরের চারিকার সার্ধ-ত্রয়োদশ বৎসরে, অর্হত্বলাভের স্থান আজ চিহ্নিত

করা হচ্ছে এই জৃম্ভকগ্রাম বা জোগ্রাম। আর নদী ঋজুকূলা হচ্ছে এই কংসে বা জুলকূলা নদী—কাঁকী, জোল আর পুকুর ডোবাতে রূপান্তরিত। জংভির বা জোগ্রামের জংভয় অসুর হলেন জলেশ্বরনাথ। এঁরই মন্দিরের পাতালঘরে সম্ভবতঃ সেই বৈর্ধাবর্ত চৈতিয়—সব মিলিয়ে 'ন্যাংটা গোঁসাই'-এর মঠ'। মহাবীর অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন এই স্থানেই।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীমান্ গদাধরের সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও সমাহৃত স্থানীয় জৈন এলাকার প্রত্নকীর্তিগুলি আমি সযত্নে পরীক্ষা করে দেখেছি। বাঁকুড়া-ধলভূমের পরেশনাথ, শারেঙ্গগড় ও পাপরা মৌজাতে মাটির তলায় সম্প্রতি দেখে এলাম পার্শ্বনাথ আর মহাবীরকে। দণ্ডিস্বামী, বলরাম ব্যানার্জী, অজিত দাস প্রমুখ এই এলাকা জুড়ে জৈন-কীর্তি আমাকে দেখিয়েছেন।

জৈন পণ্ডিতগণ মহাবীরের নির্বাণের তারিখ প্রায় নির্ভুলভাবে স্থির করেছেন ৪৬৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। তাঁর জীবৎকাল ৭২ বৎসর। ফলে, তাঁর জন্ম বৎসর হবে ৫৩৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। আমাদের নির্ণয় মতে, ১৯৭৭ সালে, মহাবীরের জন্মের পরে ২৫১৬ বৎসর এবং নির্বাণের পরে ২৪৪৪ বৎসর চলছে। ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর গৃহত্যাগের বৎসর ৫০৯ খৃষ্টপূর্বাব্দ। এই হিসাবে ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁর অর্হত্ত্বলাভের বৎসর হবে ৪৯৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

অর্থাৎ আজ থেকে ২৪৭৩ বৎসর পূর্বে, মহাবীর এই জৃম্ভকগ্রাম বা জোগগ্রাম—জোগ্রামে কেবল জ্ঞান দর্শন লাভ করেছিলেন ঋজুকূলা বা জুলকূলা কংসে নদীর তীরে বসে।

আজ ১৯৭৭ সালের ২৮-এ এপ্রিল, বৈশাখী শুক্লা দশমী (বঙ্গাব্দ ১৫ই বৈশাখ, ১৩৮৪) তিথিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ-কথা স্বীকৃত হোক্। তাঁর আশীর্বাদে "কেবল-দর্শন-জয়ন্তী"—সভা সার্থক হোক্।

স্বয়ং শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর আমাদের স্কন্ধে ভর ক'রে, নিজের পথ নিজেই দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন,—এ আমাদের পিতৃপুণ্যের ফলে।

এবার জিনদেবের ভক্ত মহোদয়গণ, মহাবীরের এই অর্হত্ত্বলাভের স্থানটিতে তাঁদের যথাবিহিত কৃত্য করবেন, এই নিবেদন ও প্রার্থনা। বিশেষ ক'রে, আমার আজকের বক্তব্য পেশ করা রইলো আজকের এই সভার মান্যবর সভাপতি শ্রীযুক্ত গণেশ লালওয়ানী এবং শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত বিজয় সিংহ নাহার মহাশয়দ্বয়ের বরাবরে।*

* বর্ধমান-জোগ্রামে জলেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে ভগবান্ "মহাবীর কেবল-দর্শন" জয়ন্তী সমিতি'র আয়োজিত কেবল দর্শনের প্রথম স্মরণোৎসব-সভায় ২৮।৪।১৯৭৭ তারিখে পঠিত বিশেষ অতিথির ভাষণ।

ভগবান মহাবীর ও রাঢ়দেশ

শ্রীভোজরাজ জৈন

প্রখ্যাত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় সুস্পষ্টভাবে এই মত পোষণ করিতেন যে বঙ্গদেশে এক সময় জৈন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈনাগমে শেষ তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের সাধনকালীন ভ্রমণে রাঢ় অঞ্চলের একটি বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লিখিত আছে। মহাবীর স্বামী সাধক অবস্থায় বিভিন্ন চাতুর্মাস উদ্‌যাপন করিতে এই অঞ্চলের নানাস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্যের দ্বারা ঐ কথা পুষ্টিলাভ করিতেছে।

ভগবান মহাবীরের তৃতীয় চাতুর্মাস অতিবাহিত হয় ভাগলপুরের নিকট নাথনগরে (চম্পাপুরী)। তারপর মংখলীপুত্র গোশালকসহ কুমোরপুরগ্রামের পথে (কুমারাক সন্নিবেশ) মন্দার পর্বত (মন্দার অরণ্য), হার্সাডিয়া বীরপলাসীর (অপভ্রংশ বারাপলাসী, প্রাচীন নাম ব্রাহ্মণগ্রাম) নিকটস্থ উষ্ণ প্রস্রবণ হইয়া ভুরভুরি নদীতীর ধরিয়া এবং সুবর্ণ-বালুকা ও মোরাক্ষী এই দুই নদীর সঙ্গমস্থল ও হিজলো বা প্রাচীন দুমকা (স্বর্ণখল) হইয়া কুরুয়া (কোলায় সন্নিবেশ) গ্রামে একটি ভগ্নগৃহে কয়োৎসর্গ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। সেই স্থান হইতে পাতাবাড়ী (পত্রকালয়) হইয়া সুবর্ণবালুকা-মোরাক্ষী নদীর উত্তরতীরে জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য গোম্পদ ধরিয়া মশান জোড় বা মোর বাঁধের পূর্বদিকস্থ শালবৃক্ষের ঘন বন শালদহ পার হইয়া কুমোরপুরের (কুমারাক সন্নিবেশ) বাহিরে মহাবীর পাহাড়ীতে (রমনীক চম্পক উদ্যানে) কায়োৎসর্গে স্থিত হন।

যে রমনীক চম্পক উদ্যানে ভগবান মহাবীরের কায়োৎসর্গ ধ্যানের কথা মহাবীর চরিতে পাওয়া যায় সেই উদ্যানের কথা কুমোরপুর গ্রামে প্রচলিত কিম্বদন্তীতেও পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রামবাসী শ্রীশম্ভুনাথ মণ্ডল বলেন যে পূর্বপুরুষদের মুখে তাঁহারা শুনিয়াছেন যে একসময় মহাবীর পাহাড়ী ও ভৈরব পাহাড়ীর আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত স্বর্ণ চাঁপা গাছের বন ছিল। শাস্ত্র বর্ণনার সহিত কিম্বদন্তীর সাদৃশ্য এই একটীই নহে, আরও অনেক আছে এবং এই কারণেই কিংবদন্তীগুলি উপেক্ষনীয় নহে। গ্রাম-বাসীরা আরো বলেন যে বহুদিন পূর্বে মহাবীর পাহাড়ীর উপরে তিনকোণ পাপড়ীযুক্ত পাথরের পদ্মফুলের ওপরে মহাবীর কিম্বা বুদ্ধের মূর্তি ছিল, পরে কোন একসময় তাহা চুরি যায়—এইরূপ তাঁহারা পূর্বপুরুষদের মুখে শুনিয়াছেন। বৃটিশ শাসনকালে কুমোরপুর গ্রামে একজন নজরবন্দী ছিলেন। তিনি সে সময় আজ যাঁহারা প্রবীণ গ্রামবাসী,

তাঁহাদের বলিয়াছিলেন যে এই পাহাড়গুলির ভিতরে অনেক মন্দির ও মূর্তি আছে। আরও শুনা যায় যে বহু দিন পূর্বে ভৈরব পাহাড়ীর উপরে একটি বেলগাছ ছিল। ঐ গাছের তলায় তখনকার গ্রামবাসীরা মাঝে মাঝে প্রত্যুষে একজন দীর্ঘ জটাধারী সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইত। একথা ভিত্তিহীন নহে। জৈনাগম মহাবীর চরিত্রে দেখা যায় যে রমনীক চম্পক উদ্যানে জটাধারী সন্ন্যাসীর (সিদ্ধার্থ বয়ন্তর) শ্রমণ মহাবীরের শিষ্য গোশালককে উপদেশ দিবার স্থান ভৈরব পাহাড়ী। জৈনগ্রন্থে ভগবান মহাবীরের সমসাময়িক পার্শ্বনাথ পরম্পরার মুনিচন্দ্রের কুমারাক সন্নিবেশের বাহিরে চন্দ্র পাহাড়ীতে শিবত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে তাঁহার তিরোধান এইখানে হওয়ায় এই পাহাড়ী চন্দ্রপাহাড়ী নামে খ্যাতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বলা যায়, ভগবান মহাবীর এই অঞ্চলেরই বিভিন্ন স্থানে নানা উপসর্গ সহ্য করিয়াছিলেন একথা মহাবীর চরিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে ঐ সকল স্থলে দেবমন্দির নির্মিত হয়। উপসর্গস্থলে নির্মিত মন্দিরগুলি লোক মুখে শূলীর মঠ নামে পরিচিত হয়; অঞ্চলটীর নাম হয় শূলীর মঠের মাঠ। কালক্রমে জনসাধারণের ভাষায় ঐ নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে শূলীর মাঠ হইয়া পড়ে। এই নাম আজ পর্যন্ত চলিতেছে।

রমনীক চম্পক উদ্যান ত্যাগ করিয়া মহাবীর ও গোশালক চোরিচা গ্রামের (চোরাক সন্নিবেশ) দিকে যান। সেখানে গুপ্তচর সন্দেহে তাঁহারা ধৃত হন। সম্ভবতঃ সেই হেতু স্থানটীর নাম চোরচোর জঙ্গল হয়। পূর্বে এই চোরচোর জঙ্গল সুদূর নেপালের তরাইএর প্রান্তস্থিত যোগবনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরক্ষকেরা তাঁহাদের হাত পা বাঁধিয়া একটা কূপে নিক্ষেপ করে। সেই স্থানটী আজো সন্ন্যাসীর শূলী নামে পরিচিত। দৈবক্রমে ঠিক সেই সময় সোমা ও জয়ন্তী নাম্নী পার্শ্বনাথ সম্প্রদায়ের দুই আর্যিকা সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা শ্রমণ ধৃত হইয়াছে শুনিয়া সেই স্থানে আসেন ও মহাবীরকে চিনিতে পারিয়া আরক্ষকদের তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে বলেন। আর্যিকাদের চোখ হইতে সেদিন অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল। বোধহয় সেই বেদনার্দ্র স্মৃতিকে বহন করিবার জন্য, পাহাড় নয়, পর্বত নয়, সমতল মাঠের মাঝখানে নয়নাকৃতি দুইটি ছিদ্র হইতে অশ্রুধারার ন্যায় আজো জল বহির্গত হইতেছে। স্থানটীর বর্তমান নাম বুড়িঝুরির ঝরণা। ঐ ঝরণার জলের এক অলৌকিক গুণও আছে। যে সকল শিশু অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করে এই জলে তাহাদিগের চক্ষু ধুইলে বা স্নান করাইলে তাহারা অচিরে শান্ত হয়।

মুক্তিলাভ করিয়া মহাবীর ও গোশালক পৃষ্ঠ চম্পায় যান। এই পৃষ্ঠ চম্পা বীরভূমেরই অন্তর্গত। মহাবীর এখানে চতুর্থ চাতুর্মাস্য ব্যতীত করেন। বোধহয় এই কারণে জিনেশ্বরের নামে পৃষ্ঠচম্পার নাম হয় পৃষ্ঠজিনোদ্ধারপুর, তাহাই বর্তমানে কাপিষ্ঠা জীনধারপুর।

প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা এখানে না বলিয়া পারিতেছি না। মহাবীর চরিতে দেখা যায় যে মহাবীর যখন দক্ষিণ বাচাল (ডেউচা) হইতে কনকখল আশ্রমের (খড়ের ডাঙ্গায় কংকালিতলা) পথে উত্তর বাচাল (অংগার গড়) হইয়া সেয়ংবিকা (সাঁইথিয়া) নগরী যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে যক্ষের মণ্ডপ (যোগী পাহাড়ী) গর্তবাসী এক দৃষ্টিবিষ ভীষণ সর্প (চণ্ডকৌশিক) তাঁহার পায়ে দংশন করে। দংশিত স্থান হইতে রক্তের পরিবর্তে দুধ বাহির হয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সন্ন্যাসী ভানুবিজয়জীর মত বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন সর্পদংশনে শ্রমণ ভগবান মহাবীরের চরণ নির্গত দুধ বিফলে যায় নাই কারণ ভাবী চরম তীর্থংকরের ন্যায় অনন্ত বীর্য মহাপুরুষগণের এক ফোঁটা রক্তও মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না। যে দুধ নির্গত হয় তাহাই কনকখল আশ্রম অঞ্চলে (খড়ের ডাঙ্গা, কুমারপুর, মালডিঙ্গা, গণেশপুর) শ্বেত মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হউক বা না হউক একথা ঠিক যে উপরোক্ত সমস্ত স্থানগুলি খড়িমাটিতে পরিপূর্ণ।

প্রবন্ধ আর দীর্ঘ না করিয়া পরিশেষে এই কথা বলিতে চাই যে ভগবান মহাবীরের পাদপূতঃ স্থানগুলির পুনরুদ্ধারের কাজে অগ্রসর হইবার এই উপযুক্ত সময়। আশা করি এদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

মৃগাবতী

[পূর্বানুবৃত্তি]

দশম দৃশ্য

[কৌশাম্বীর রাজসভা]

১ম সামন্ত : মহাদণ্ডনায়ক! আপনি কি জানেন আজ এই সভা কিজন্য আহ্বান করা হয়েছে ?

মহাদণ্ডনায়ক : না আর্য।

১ম সামন্ত : মহামাত্য, আপনি ?

মহামাত্য : আমিও কিছু জানি না।

১ম সামন্ত : আশ্চর্য! কৌশাম্বীর চারদিকে পরিখা বিস্তৃত করা হয়েছে, প্রাকার দৃঢ়, যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের সৈন্যদলে ভর্তি করা হচ্ছে, অস্ত্র শস্ত্র আনানো হচ্ছে...আর এ সমস্ত কাজ হচ্ছে প্রদ্যোতের তত্ত্বাবধানে আর এর আপনারা কিছুই জানেন না ?

মহামাত্য : মহাদেবীকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন যথা সময়ে এর স্পষ্টীকরণ করব। আপনারা প্রদ্যোতের কাজে বাধা দেবেন না। ওরা আমাদের মিত্র পক্ষ।

১ম সামন্ত : মিত্রপক্ষ ? আক্রমণকারী মিত্রপক্ষ ?

মহামাত্য : রহস্যত বটেই। যদি মহাদেবী আজকের সভায় এর স্পষ্টীকরণ না করেন তবে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।

[সানুচর মৃগাবতী প্রবেশ করছেন। সকলে দাঁড়াচ্ছে। মৃগাবতী আসন গ্রহণ করলে সকলে আসন গ্রহণ করছে। মহামাত্যর সঙ্গে সামান্য বার্তালাপ করে মৃগাবতী উঠে দাঁড়াচ্ছেন]

মৃগাবতী : আজকের এই সভায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের সভা কেন আহ্বান করেছি তা জানবার জন্য হয়ত আপনারা সকলেই সমুৎসুক। [ঔৎসুক্য ধ্বনি] প্রাকার সুদৃঢ় ও যুদ্ধসামগ্রী একত্রিত

হতে দেখে আপনাদের ঔৎসুক্য হওয়াই স্বাভাবিক। এত আপনারা দেখছেনই যে কৌশাম্বী এখন বহিশ'ত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পূর্ণ সমর্থ। এমন কি দু' তিন বছর অবরুদ্ধ হলেও খাদ্যের অভাব হবে না। আর এ সমস্ত কাজ হচ্ছে চণ্ড প্রদ্যোতের সহযোগিতায়। প্রদ্যোত দুর্গ আক্রমণ করতে এসে কেন কৌশাম্বীকে দুর্ভেদ্য করে তুলল তা আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

সকলে : হাঁ মহারাণী।

মৃগাবতী : সেই সব বলবার জন্যই আজ এই সভা আহ্বান করেছি। এত আপনারা সকলে জানেন প্রদ্যোত যখন কৌশাম্বী আক্রমণ করল তখন অকস্মাৎ মহারাজের মৃত্যু হয়। উদয়ন তখন নাবালক। তাই মহারাজের অভাবে আমি নিঃসহায় হয়ে পড়লাম। সেই সময় কৌশাম্বীর এত সামর্থ্য ছিল না যে প্রদ্যোতের আক্রমণ প্রতিহত করে।

সকলে : মহারাণী!

মৃগাবতী : আমি জানি আপনারা সকলে আমার সঙ্গে ছিলেন ও আমার জন্য যুদ্ধ করতেন। কিন্তু যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত ছিল। তারপর আমার জন্য এত রক্তক্ষয় হোক সে আমি চাইনি। তাই আমাকে কূটনীতির আশ্রয় নিতে হল। আমি প্রদ্যোতের কাছে গোপনে বলে পাঠালাম যে আমি তাঁর সঙ্গে যেতে প্রস্তুত যদি তিনি নগরী সুরক্ষিত করে দেন। কারণ কুমার নাবালক ও নগরী অরক্ষিত।

১ম সামন্ত : প্রদ্যোত কি সে কথা বিশ্বাস করলেন?

মৃগাবতী : সেত আপনারা প্রত্যক্ষই দেখছেন। কিন্তু এখন প্রদ্যোত অধীর হয়ে উঠেছেন। আমাকে এখন তাঁর কাছে যেতে হবে। তাঁর কাছে যাবর দিনও স্থির হয়েছে। কালই আমায় সেখানে যেতে হবে।
[উষ্মা সূচক ধ্বনি]
আপনারা সকলে শান্ত হন। চেটক কন্যা ও কৌশাম্বীর অগ্রমহিষী

জানেন কিভাবে নিজের সম্মান রক্ষা করতে হয়। প্রদ্যোত আমার এই দেহের প্রত্যাশী। তাই আপনারা আগামীকাল আমার মৃতদেহ প্রদ্যোতের শিবিরে পৌঁছে দেবেন। এবং সে কথা বলবার জন্যই আজ আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি।

সুমন্বান : সে হয় না মহারাণী! আমরা আপনার জন্য যুদ্ধ করব।

মৃগাবতী : তা সম্ভব নয় সুমন্বান। কৌশাম্বী অবন্তীর সৈনিকে পরিপূর্ণ। আপনারা মৃত্যু বরণ করতে পারেন কিন্তু আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন না।

মহামাত্য : আপনি ঠিকই বলছেন কিন্তু...

মৃগাবতী : আর কিন্তু নয়। আমার সংকল্প দৃঢ়, তছাড়া আর পথও ত নেই। আমি কথা দিয়েছি। তাই আগামীকাল আপনারা আমার এই শরীর প্রদ্যোতের শিবিরে পৌঁছে দেবেন।

ধনবাহ : এক উপায় অবশ্য আছে। যদি আপনি ভগবান মহাবীরের শ্রমণী সংঘে প্রবেশ করেন তবে সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যেতে পারে।

মৃগাবতী : আমিও তাই চেয়েছিলাম শ্রেষ্ঠিন্ যেদিন বসুমতী দীক্ষিত হল সেদিন হতে। সমস্যাত আজ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়।

মহামাত্য : সম্ভব। কিন্তু সমস্যা এখন মহাবীর কোথায় আছেন? এবং আপনিই বা কি করে তাঁর কাছে যাবেন।

ধনবাহ : আমিত শুনেছি তিনি শ্রমণ ও শ্রমণী সংঘ সহ এদিকেই আসছেন। হয়ত তিনি আজই এসে পড়তে পারেন। এখনো একদিন হাতে রয়েছে। তাই এ সম্বন্ধে কালই বিচার করা যাবে।

মহামাত্য : তাই হবে। কালকের দিন দেখেই যথাকর্তব্য স্থির করা হবে। আদেশ দিন মহাদেবী, আজকের এই সভা বিসর্জিত করি। [মহাদেবী আদেশ দিচ্ছেন] আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠী ধনবাহকে।

[সভা ভঙ্গ হলে একে একে সকলে চলে যাচ্ছেন। একটুপরে মহাবীরের জয়ধ্বনি শোনা যাবে]

একাদশ দৃশ্য

[চন্দ্রাবতরণ চৈত্য। মহাবীরের প্রবচন সভা]

মৃগাবতী : [মহাবীরকে প্রদক্ষিণ করে] ভগবন্ আমি নির্গ্রন্থ প্রবচন শ্রবণ করলাম নির্গ্রন্থ প্রবচনে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। আমি আপনার সাধ্বী সংঘে প্রবেশ করতে চাই। কিন্তু তার জন্য আমায় অবন্তীপতি প্রদ্যোতের আদেশ নিতে হবে। ওঁর আদেশ পেলে আপনি যেন তার প্রতিবন্ধ না করেন।

মহাবীর : দেবানুপ্রিয়া! তোমার যেমন অভিরুচি।
[মৃগাবতী ধীরে ধীরে প্রদ্যোতের দিকে যাচ্ছেন]

বিদূষক : মহারাজ! যা দর্শনীয় তা দর্শন করুন। দেবী মৃগাবতী এদিকেই আসছেন।

প্রদ্যোত : চুপ কর মুর্খ। তীর্থংকরের প্রবচন সভায় কি এরূপ ভাবনা করা উচিত? তা ছাড়া এই রূপ। এই রূপত আমার মনে কামনার উদ্রেক না করে এক লোকোত্তর ভাবনায় হৃদয় আপ্লাবিত করে দিচ্ছে।

মৃগাবতী : মালবপতি! আজ আপনার শিবিরে যাবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু তীর্থংকরের দর্শন ও সান্নিধ্যে আমার হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংসারের অসারতা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখানে সব কিছু ক্ষণিক ও দুঃখময়। আমি সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করে প্রব্রজিত হতে চাই। কিন্তু তা আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। তার জন্য কি আপনি আমায় অনুমতি দেবেন?

প্রদ্যোত : আমার অনুমতি? না না—তার ত কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা মহাদেবী! আপনি স্বচ্ছন্দে সাধ্বী সংঘে প্রবেশ করুন।

মৃগাবতী : মালবপতি! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, সঙ্গে সঙ্গে ঋণীও। তবুও আপনার কাছে আর একটি অনুরোধ আছে। কুমার উদয়নকে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করছি এখন আপনি তার ও এই রাজ্যের সংরক্ষণ করবেন।

প্রদ্যোত : তাই হবে মহাদেবী! আমি কালই উদয়নকে রাজ্যাভিষিক্ত করে অবন্তী ফিরে যাব। যতদিন প্রদ্যোত জীবিত থাকবে ততদিন কেউই উদয়নের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আপনার কাছেও আমার এক অনুরোধ আছে —

মৃগাবতী : কি অনুরোধ মালবপতি ?

প্রদ্যোত : আমার বোন মৃগাবতীর দীক্ষা মহোৎসবের সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন।

মৃগাবতী : আমি ধন্য হলাম মালবপতি!

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. V No. 2 : Sraman : June 1977
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

পরলোকগত পূরণচাঁদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্মসম্বন্ধে, কলেজে অধ্যয়নকালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ব এবং ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখাজীর বইখানি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ় । ১৩৮৪ পঞ্চম বর্ষ । তৃতীয় সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
পঞ্চম বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৮৪ ॥ তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

১নং চিত্র : পঞ্চদশ শতাব্দীর (সম্ভবতঃ আরও পূর্বের) কাগজের উপর জৈন চিত্রকলা

২নং চিত্র : সপ্তদশ শতাব্দীর রাজপুত যুগের পুথির পটের উপর জৈন চিত্রকলা

৩নং চিত্র : অষ্টাদশ শতাব্দী রাজপুত যুগের পুথির পটের উপর জৈন চিত্রকলা

জৈন চিত্রের বিকাশ

শ্রীঅজিত ঘোষ

॥ জৈন চিত্রের ইতিহাসের স্বল্পতা ॥

ভারতীয় আর্টের ইতিহাসে জৈন চিত্রের যে অনন্যসুলভ স্থান আছে সে বিষয়ে কাহারও বিশেষ লক্ষ্য পড়ে নাই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডাবলিউ হুটীম্যান (W. Huttemann) *Baessler Archive*-এ 'Miniturен zur Jinacarita' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (Bd I 1, 2, 1913)। বার্লিনে রক্ষিত দুইখানি কল্পসূত্রের পুথি অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল; চিত্রগুলিও পুথি হইতে গৃহীত। পর বৎসর ডাঃ কুমারস্বামী এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে *Journal of Indian Art and Industry* নামক পত্রিকার ১৬ খণ্ডে তাঁহার 'Notes on Jaina Art' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের মূলে ছিল কল্পসূত্রের তিনখানি পুথি; তাহার মধ্যে একখানি ছিল পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের (১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) এবং দুইখানি কালকাচার্যকথানকম্ (*Kalakacarya Kathanakam*) এর পুথি। এই পুথিগুলি তাঁহার নিজের পুথি। অধুনা এ বিষয়ে লিখিত তাঁহার পুস্তিকা *An Introduction to Indian Art* ও বোষ্টনের *Catalogue of the Indian Collection in the Museum of Fine Arts* ৪র্থ ভাগে এই বিষয়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত তালিকায় কেবলমাত্র জৈন চিত্র ও পুথির ফির্রিস্তিই আছে। যাহা হউক, এই বিশদ আলোচনা পূর্বের আলোচনার মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস করে নাই। এই তালিকায় ৩৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকার ভিতর মাত্র ছয় পৃষ্ঠায় জৈন চিত্র সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইয়াছে, জৈন আর্ট সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা এখনও হয় নাই; কিন্তু জৈন আর্ট অন্ততঃ এই উভয় আর্টের শেষ ভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যে সংশ্লিষ্ট সেকথা পূর্বে একরূপ স্বীকৃত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়না।

॥ জৈন পুথির পাটার চিত্র ॥

আলোচ্য প্রবন্ধে আমি জৈন চিত্রের বিকাশের ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাচীন পুথির আবরণ বা পাটায় ও সচিত্র পুথির চিত্রের আলোচনা করিয়াছি। এগুলি আমার সংগৃহীত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতে পরবর্তীকালের চিত্র; এতদ্ভিন্ন জৈন মন্দির ও ভাণ্ডার অথবা তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত সচিত্র পুথিরও আলোচনা করিয়াছি। আমার পূর্ববর্তী সমালোচক দিগের এতগুলি চিত্র দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা হয় নাই; তাঁহারা কেবলমাত্র তাঁহাদের সংগৃহীত

কয়েকখানি পুথির উপরই তাঁহাদের প্রবন্ধ রচনা করিয়া ছিলেন। কিন্তু জৈন পুথির আবরণ অথবা পাটার চিত্রগুলির আলোচনা না করিলে জৈন চিত্রের আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারেনা এবং ইতিপূর্বে আর কেহই এ বিষয়ে আলোচনা করেন নাই। ডাঃ কুমারস্বামী এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, যদিও তিনি সূচী শিল্পের আবরণের (embroidered covers) কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, —'পুস্তকের আবরণের নিদর্শনগুলি হইতে জৈন কারিকরের নিপুণতার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। চিকণ তোলা পুস্তকের আবরণগুলির পরিকল্পনায় সজীবতা যেমন লক্ষিত হয়, তেমনিই সেগুলিতে শিল্পীর কারুকার্যের ও ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। (The Embroidery of the book-covers is vigorously designed and admirably and patiently executed.)[১] ডাঃ কুমারস্বামী পুস্তকের আবরণগুলি চিত্রিত হইত ছাড়া আর কোন কথাই তাঁহার শেষোক্ত আলোচনায় বলেন নাই। চিত্রিত পুথি অপেক্ষা পাটাগুলির চিত্র দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া আলোচনা করিবার তাঁহার সুবিধা হয় নাই। বোস্টন মিউজিয়াম অফ্ ফাইন আর্টসে ভারতীয় চিত্রকলার বিভিন্ন বিভাগের চিত্র সংগ্রহের প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় চিত্র তালিকায় একখানিও এরূপ চিত্রের উল্লেখ নাই; শুধু যে জৈন পুথির পাটার চিত্রের উল্লেখ নাই, তাহা নয় কোন পুথির পাটার চিত্রের কথাই এ সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, একখানিও জৈন-পুথির পাটার চিত্র এই জন্যই প্রকাশিত হয় নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা জৈন পুথির আবরণীর চিত্র সকল হইতে এই শ্রেণীর চিত্রের বিকাশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের আলোচনা করিব। মূলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমরা অনুরূপ ত্রিবর্ণের চিত্র প্রকাশ করিলাম; ইহাতে একবর্ণের চিত্র অপেক্ষা মূল চিত্রের সৌন্দর্যানুভূতির সহায়তা করিবে আশা করি। এই প্রবন্ধ পাঠে যদি পাঠক দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ['শ্রমণে' ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশন সম্ভব নয় বলিয়া একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইল। —সম্পাদক]

॥ প্রাচীন জৈন চিত্র সংরক্ষিত হয় নাই ॥

ভাস্কর্যে অতি প্রাচীন জৈন-মূর্তি সকল মথুরা ও উড়িষ্যায় সংরক্ষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, প্রাচীন জৈন চিত্রগুলি সেভাবে সংরক্ষিত হয় নাই। উড়িষ্যায় রামগড় পর্বতে যোগিমারা গুহায়[২] যে সকল প্রাচীর রঞ্জিত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি জৈন চিত্র।[৩] উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী জৈনদিগের

---

১ *Journal of Indian Art and Industry*, Vol. XVI No. 90,

২ *Annual Report of the Archaeological Survey of India*, 1903 4 p. 150.

৩ V. Smith, *A History of Fine Arts in India & Ceylon*, p. 274.

একটী গুহায় জৈন চিত্রের ক্ষীণ নিদর্শন (traces of paintings) দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর সিত্তনভাসাল প্রাচীর রঞ্জিত চিত্র (the Sittanavasal frescoes)[৪]-ও জৈনদিগের চিত্র। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মার (৬০০-৬২৫ খৃঃ অঃ) রাজত্বকালে এগুলি চিত্রিত হইয়াছিল। তিনি আপনাকে 'চিত্রকরপুলি' (চিত্রকর শার্দূল অর্থাৎ শিল্পীপ্রধান) বলিয়া অভিহিত করেন। এগুলি অজন্তা ও বাগ প্রাচীর রঞ্জিত চিত্রের শিল্পপদ্ধতির (technique) অনুযায়ী, কিন্তু ইহাদের সহিত জৈনদিগের ক্ষুদ্র চিত্রের (miniature paintings) কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। Sittanavasal প্রাচীর রঞ্জিত চিত্রের আর্ট হিসাবে মূল্য কি তাহা এখনও পর্যন্ত অবিসংবাদিত ভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট ডিষ্ট্রিক্ট তিরুমলাই-এ প্রাচীর গাত্রে ও ছাদের চিত্রগুলি খৃষ্টীয় একাদক শতকের চিত্র। আর্টের দিক দিয়া এগুলির মূল্য বড় বেশী নয়।[৫] জৈনেরা ভাস্কর বিদ্যায় অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। জৈন ভাস্কর্য প্রাচীন জৈনদিগের সভ্যতার নিদর্শন। সুপ্রাচীনকালে জৈনরা ভাস্কর্য বিদ্যায় সুসজ্জী-করণে এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহা দেখিবামাত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় (They produced decorative sculpture of the highest excellence)। পাথর খুদিয়া তাঁহারা ভক্তের এমন নিখুঁত প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিতেন, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা ধর্মমার্গে উন্নত ছিলেন এবং চি্গুলিও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল। এগুলি দেখিলে মন ভক্তি শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন যে বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলি জৈন ভাস্করদিগের চিত্র হইতে গৃহীত। সুবৃহৎ মূর্তিসকল এমন সুন্দরভাবে পাথর কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে যে, উহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাদের পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী ছিল। কমনীয় মূর্তিগুলির লাবণ্য ও বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী চিত্রগ্রাহী ছিল। জৈন মূর্তিতে বিদেশীয় শিল্পপদ্ধতির কোনরূপ স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। পরবর্তী জৈনদিগের স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্কর্যে সুসজ্জীকরণ (ornamentation) প্রথা তাঁহাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও শিল্পানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। যে জাতির স্থপতি ও ভাস্কর মৌলিকতায় এতদূর উন্নত হইয়াছিল, সে জাতির ভিতর চিত্রবিদ্যার উন্নতি কি হয় নাই?

॥ জৈন ও বৌদ্ধ ক্ষুদ্র আকারের মূর্তির তুলনা ॥

যদি আমরা Sittanavasal প্রাচীর রঞ্জিত চিত্রগুলি আলোচনার বিষয়ীভূত না করি তাহা হইলে বলিতে পারি জৈন চিত্র বিশাল বৌদ্ধচিত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে না।

৪ Jouveau Dubrenil, *Pallava Painting*, 1920.

৫ V. Smith, *A History of Fine Arts in India & Ceylon*, p. 344.

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর নেপালী এবং বাঙ্গলার পাল যুগের বৌদ্ধদিগের পুথির ক্ষুদ্র চিত্রের সহিত জৈন পুথির চিত্রের তুলনা করিলে পার্থক্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধপুথির চিত্রগুলির রেখাচিত্র (drawing) জৈনদিগের অপেক্ষা উন্নত স্তরের ও তাহাদের চিত্র গতানুগতিক আইন কানুন কম মানিয়া চলিয়াছে (less conventional and formal)। অঙ্কনের ভিতর সঙ্গতি (balance) ও ছন্দ (rhythm) যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জৈনদের অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের, বর্ণ সম্পাতের ভিতরও অধিকতর সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় (colouring is more harmonious)। চিত্রগুলি অনুভূতিতেও যেরূপ আঘাত দেয়, সেরূপ আঘাত জৈন চিত্র দিতে পারে না। এ বিষয়ে বৌদ্ধ প্রাচীর রঞ্জিত চিত্র-অঙ্কনকারীদের সহিত আবার এ শ্রেণীর চিত্রকরদের পার্থক্য খুব বেশী। তাঁহাদের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি হইতে ইঁহারা অনেক দূরে নামিয়া আসিয়াছেন। আর এরূপ হইবারই কথা। কারণ চিত্রের মানদণ্ডের পরিবর্তনের সহিত অঙ্কন পদ্ধতিরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এখানে সহজ চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি (technique) অনুসৃত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ সম্পাতের প্রাচুর্য আছে, ফলে সুসজ্জীকরণ চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সুকুমার কলায় ইহার পরবর্তী যুগেও জৈনেরা যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছিল, যাহার নিদর্শন আবু পর্বতের দিলওয়ারা মন্দিরের নর্তকীদের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও ক্ষুদ্র জৈন পুথির চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুথির চিত্র ও এই চিত্রের সময়ের পার্থক্য বড় বেশী নয়। ক্ষুদ্র মূর্তিগুলিতে অনুভূতির লীলা বা ভাবভঙ্গীর বিকাশ তেমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। ভাবের অভাবই এগুলিতে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপেও খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এইরূপ ঘটিয়াছিল। সেখানেও মূর্তির সৌন্দর্যের কাছে চিত্রের সৌন্দর্য ম্লান ছিল। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে মোগল চিত্রের ন্যায় জৈন চিত্র নয়—জৈন চিত্রে ধর্ম বিশ্বাসের অনুভূতির ছাপ পাওয়া যায়। এগুলির উদ্দেশ্য বড় বড় জৈন ধর্ম প্রচারক ও সাধুদিগের জীবন ও বাণী রেখায় অঙ্কিত করা মাত্র।

॥ জৈন চিত্রের উৎপত্তি ॥

গুজরাট রাজপুতানাই জৈন চিত্রের উৎপত্তিস্থল। যে সময় জৈন চিত্রের উদ্ভব হইয়াছিল সেই সময় এই ভূভাগে সভ্যতার বিকাশ অধিক পরিমাণেই হইয়াছিল এবং চিত্র গুলিতেও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুত স্টেটগুলি ও তাহাদের অধিকৃত গুজরাটের রাজ্যগুলি সকলই স্বাধীন ছিল। তাহাদের পরস্পরের ভিতর ঈর্ষার ভাব ছিল। যুদ্ধবিগ্রহও মাঝে মাঝে হইত। তথাচ ইহাদের ভিতর একটা সৌভ্রাতৃত্বের ভাব দেখা যাইত ; কারণ একই ধর্ম সকলেরই অনুষ্ঠেয় ছিল। জৈন শিল্পীরা এই ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা দূরে দূরে বাস করিয়াও আপনাদের ভিতর একটা বন্ধনের ভাব পোষণ করিত। অধিকন্তু জৈন মন্দিরগুলি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থাকিলেও জৈনেরা এই সকল মন্দিরে সর্বস্থান

হইতে মিলিত হইবার সুযোগ পাইত বলিয়া বন্ধনের দৃঢ়তা অনুভব করিতে পারিত। ভাষার পার্থক্য ছিল সত্য; কিন্তু যে মূল ভাষা হইতে প্রাদেশিক ভাষাগুলি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সাহায্যে একের ভাষা অন্যে সহজে বুঝিতে পারিত। এবং মূল ভাষার কাব্য ও সাহিত্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রাদেশিক ভাষাগুলিও পুষ্ট হইয়াছিল। ফলে প্রাদেশিক ভাষায় মূলের অনুভূতি ও ভাবধারা অক্ষুন্ন ছিল ও প্রাদেশিক ভাষা-ভাষীদের জীবন প্রথাও একই আদর্শে চালিত হইত। এই সকল কারণেই আর্টেরও সমতা ছিল। প্রাচীন জৈন স্থপতি ও ভাস্করদিগের পরিকল্পনার অনন্য সাধারণ কৌশল, মূর্তিগুলির অবয়বের ও ভাবভঙ্গীর যথাযথ চিত্রণ, এমন-কি গতি বিধির সুন্দর চিত্রণ, জাতীয় সৌন্দর্য বোধকে জাগরিত করিয়াছিল। অপরদিকে চিত্রকরেরা বড় বড় ধর্মোপদেষ্টা ও সাধুদিগের চরিত্র অঙ্কিত করিয়া জাতির ভিতর ধর্মভাবের ও সৌন্দর্য-বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করিয়াছিল।

॥ পুথির ক্ষুদ্র চিত্র ॥

'কল্পসূত্র' 'ও কালকাচার্য কথা'ই হইতেছে অতি আবশ্যক পুথি, ইহাতে চিত্র আছে। 'কালকাচার্য' পুথি অনেক স্থলেই 'কল্পসূত্রে'র ভিতরই দেখিতে পাওয়া যায়। সচিত্র পুথি যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে ১২৩৭ খৃষ্টাব্দের একখানি তালপত্রের পুথি। এখানির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে এখানিতেই সর্বপ্রথম মানবের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, অবশ্য দেবতা ও দেবভাবাপন্ন মানবের চিত্রও ইহাতে আছে। চিত্র দুইখানি হইতেছে প্রচারক (apostle) হেমচন্দ্র ও রাজা কুমারপালের।[৬] খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পুথিগুলির সহিত অনেকেই পরিচিত আছেন। পুথির আবরণীর কাগজের উপর যে চিত্র অঙ্কিত ছিল তাহার প্রতিলিপি ১নং প্লেটে প্রদর্শিত হইল। পুথিখানি হারাইয়া গিয়াছে। মনে হয় এখানি ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত ১৪২৭ খৃষ্টাব্দের পুথির অপেক্ষা প্রাচীন। আমি আর একখানি সচিত্র পুথিতে একই প্রথায় অঙ্কিত চিত্র দেখিয়াছি। দেখিয়া আমার মনে হয় যে পত্রগুলি রৌপ্য অক্ষরে লিখিত হইয়াছে এবং এইরূপ পদ্ধতিই সেসময় বা তাহার পূর্ববর্তী সময়ে প্রচলিত ছিল। এই রীতি অলঙ্কার বহুল (ornate)[৭] এবং এ প্রকার পুথি লিখিতে খরচও খুব বেশী হইত, কারণ লাল কিংবা নীল জমির ওপর রৌপ্য দ্বারা লিখিত হইত। আমাদের মনে হয় এই প্রথার উচ্ছেদকল্পে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে

৬ Reproduced in Nahar and Ghosh's *Epitome of Jainism*.

৭ ইণ্ডিয়া অফিস পুথির 'Notes on Jain Arts', ১৷২৩ নং প্লেটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই পঞ্চদশ শতকের (ও সম্ভবতঃ তাহার পূর্বেরও) অঙ্কন রীতি বুঝিতে পারা যাইবে।

সহজ ও সরল রীতিতে চিত্রাঙ্কন প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অক্ষরে লিখিত পুথির প্রচলনও ছিল। আমি একখানি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগের পুথি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দেখিয়াছি; কিন্তু পঞ্চদশ শতকের সহজ সরল রীতির পুনরাবির্ভাব কোথাও আর দেখি নাই। পঞ্চদশ শতকের ক্ষুদ্রচিত্রে রক্তবর্ণ স্থানে প্রথমে পূর্বের মতই সুন্দর নীলবর্ণ ও স্বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; তৎপরে জাঁকজমকবিহীন রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ ব্যবহৃত হইত, স্বর্ণের চিহ্নমাত্রও আর দেখিতে পাওয়া যাইত না।

॥ জৈন-চিত্রের তিনটী বিকাশ-পদ্ধতির যুগ ॥

যে সকল উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে জৈন চিত্রের বিকাশে তিনটী রীতি বা পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

(১) প্রাচীন বা আদিম রীতি – খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত যে রীতি অনুসৃত হইয়াছিল তাহাকে জৈন শিল্পের আদিম যুগ বলা যাইতে পারে। যে ত্রিবর্ণ চিত্র ১নং প্লেটে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পঞ্চদশ শতকের যে দুইখানি চিত্রের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে ও পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে ও ষোড়শ শতকের পুথির চিত্র।

(২) মোগল রীতির সাহচর্যে আসিয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্যযুগ।

(৩) সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগের জৈন শিল্পরীতি যখন রাজপুত শিল্পের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং অষ্টাদশ শতকের শিল্প যখন রাজপুত শিল্পের ভিতর আপনার সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিল তখনই জৈন চিত্রের শেষ যুগ।

[ক্রমশঃ

যশোদা

সামন্তরাজ সমরবীরের অন্তঃপুরে বর্দ্ধিত হয় যশোদা।

এই সেই যশোদা যার জন্ম সময়ে প্রভূত যশঃ অর্জন করেছিলেন সমরবীর পরাজিত শত্রুকে নিহত না করে মুক্ত করে দিয়ে। গণৎকার গণনা করে বলেছিল এই কন্যার তার সঙ্গে বিবাহ হবে যার বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে যশোদা, তাই যশোদার অনুরূপ বরের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সমরবীর। নানা স্থানে দূত প্রেরণ করেছেন কিন্তু অভিমত পাত্রের সন্ধান কোথাও পান নি।

এমন সময় অভাবিত ভাবেই একদিন এলেন কুমার বর্দ্ধমান পিতা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তাঁর আবাসে। কার্য শেষেই তিনি আবার ফিরে গেলেন। যে কাজ নিয়ে এসে ছিলেন সেকাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে দেখতে পেলেন না, জানতেও পারলেন না যে যতক্ষণ তিনি সমরবীরের সঙ্গে কথা বলছিলেন ততক্ষণ লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়িয়ে ইন্দুলেখার মত এক নারী তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

সেই লতাকুঞ্জের অন্তরালে সিন্ধুবার তরুর ছায়াতলে তারপর হতে প্রতিদিনই এসে দাঁড়ায় যশোদা। চেয়ে থাকে সুদূরের নিবিড় নীলাঞ্চিত দিগবলয়ের দিকে। তার বক্ষের গভীরে সকল নিঃশ্বাস যেন দুর্বার এক আগ্রহে একটি পদধ্বনির জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

কিন্তু সে পদধ্বনি আর শোনা যায় না। কেবল ঊর্দ্ধ আকাশ বায়ুকে আর্তকূজনে বেদনামুখরিত করে উড়ে যায় কলবিংকের পংক্তি। সেদিকে চেয়ে বাষ্পাসারে কেমন যেন মেদুর হয় যশোদার নীল নয়নদ্যুতি। অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উঠে আসে এক নীরব প্রার্থনা। এসো সিদ্ধার্থ তনয় এসো। তোমার প্রতীক্ষা করে আছে তোমার প্রেমিকা। যশোদার এই স্তবকিত কুন্তলে নিজের হতে পরিয়ে দিয়ে যাও সিন্ধুবার ফুলের মঞ্জরী।

কন্যা!

অন্যদিনের মতো সেদিনো সে এসে দাঁড়িয়েছিল সিন্ধুবার তরুতলে। হারিয়ে গিয়েছিল নিজের মনের ভাবনায়। হঠাৎ আহ্বান শুনে চমকে ওঠে। দেখতে পায় পিতা সমরবীর তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সমরবীর বলেন, শান্ত হও যশোদা। তোমার বাসনা সফল হবে।

প্রস্ফুট সিন্ধুবার কুসুমের মত প্রসন্ন হাস্যে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে যশোদার কুন্দেন্দু সুন্দর মুখচ্ছবি।

সমরবীর বলেন, চিন্তা করো না কন্যা। মূর্তিমতী ঐন্দবী দ্যুতির মত এক সুচারু-দর্শিনী আমার ঘরে তাঁর প্রতীক্ষা করে রয়েছে সে কথা জানেন না বর্দ্ধমান।

পিতা! সেকথা জানতেও পারবেন না তিনি কোনোদিন।

মৃদু হাস্যে যশোদার উদ্বিগ্ন চিত্তকে সহসা লজ্জিত করে দিয়ে বলেন—পারবেন। কারণ আমি কাল প্রভাতেই যাচ্ছি মহারাজ সিদ্ধার্থের কাছে। তারপর—

করুণাদ্রবিত কণ্ঠে বলেন সমরবীর, তারপর এক শুভলগ্নে আমিই তোমাকে বর্দ্ধমানের হাতে সমর্পণ করব।

কিন্তু যদি—

তিনি তোমায় গ্রহণ না করেন? করতেই হবে যশোদা। ভবিষ্যৎবাণী কখনো মিথ্যা হয় না। আমি দেখেছি তাঁর বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন।

মিথ্যা হয়ওনি। ক্ষত্রিয়কুণ্ডপুর হতে ফিরে এসেছেন পিতা। রথ হতে অবতরণ করেই ছুটে এসেছেন তার কাছে। তারপর মৃদুহাস্যে হৃদয়ের প্রসন্নতা মুক্ত করে দিয়ে বলেন, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ সফল হয়েছে। মহাদেবী ত্রিশলার আগ্রহে তোমাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন উদারচেতা বর্দ্ধমান।

সিন্ধুবার তরুতলে লতাপ্রতানের অন্তরালে সন্ধ্যার ছায়া নিবিড় হয়ে আসে। পিতাকে প্রণাম করে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে যশোদা। কর্পূর প্রদীপের সুরভিত ধূমলেখা যেন আলিম্পন রচনার জন্য উৎসুক হয়ে, যশোদার পুলকিত কপোল ও চিবুক বারবার স্পর্শ করে। অনুভব করে যশোদা তার জীবনের কামনা যেন এতদিনে সুরভিত হয়ে উঠেছে।

বধূ হয়ে ক্ষত্রিয় কুণ্ডপুরের রাজপ্রাসাদে আসে যশোদা। সমস্ত দিন উৎসবের আনন্দে ব্যতীত হয়। বর্দ্ধমানের সঙ্গলাভের সুযোগ হয় না। মধ্যরাত্রি এনে দেয় সেই সুঅবসর।

কর্পূর দীপের প্রশান্ত আলোকে যশোদার মুখখানি তুলে ধরেন বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমানের পিপাসিত বাসনার ক্ষণমেদুর আশাগুলি যেন হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে। এই কয় দিনে কতবারই না দেখেছেন তিনি সেই সুন্দর মুখচ্ছবি। অথচ সেই অতিপরিচিত সুন্দর মুখখানি বারবারই কত নূতন বলে মনে হয়েছে। দেখতে অদ্ভুত লাগে আর ভালোও লাগে। এবং কি আশ্চর্য মনে আরও মোহ জাগে। যশোদাকে আরো নিকটে টেনে নেন বর্দ্ধমান। তারপর উৎসুক প্রণয়ীর মতো সস্পৃহ নেত্রসম্পাতে তার স্তবকিত কুন্তলে পরিয়ে দেন সিন্ধুবার ফুলের মঞ্জরী।

কালচক্রে ধাবিত হয় মাস, ঋতু ও বৎসর। আসে নিদাঘের পর প্রাবৃষা, শিশির ও বসন্ত। পুষ্পিত হয়ে ওঠে আশোক, অর্জুন, কিংকরাত। পুষ্পিত হয়ে ওঠে

যশোদার জীবনকুঞ্জও। নূতন প্রাণের আবির্ভাবে মনে সাধ জাগে। সেই সাধ পূর্ণ করার জন্য বর্দ্ধমানকে একদিন বলে, তোমার সঙ্গে বনবিহারে যাবার ইচ্ছে করছে প্রিয়। তারপর স্বামীর মুখের দিকে স্মিত নেত্রে তাকিয়ে ব্রীড়াবশে নতমুখিনী হয় যশোদা।

বর্দ্ধমান তার চিবুক স্পর্শ করে বলেন, তাই হবে প্রিয়া।

অনেককালের অরণ্য। বহুল বল্কল প্রিয়াল ও কপিথ বৃক্ষের ছায়ায় সমাকীর্ণ। লতাপরিবৃত শত শত নক্তমাল, কোবিদার ও শোভাঞ্জন। সেই অরণ্যে যশোদাকে নিয়ে প্রবেশ করেন বর্দ্ধমান।

বনহরিণীর মতো যশোদার সে কি আনন্দ! দেখ দেখ আর্যপুত্র, সহকার সংলগ্ন নবমল্লিকার কি অপূর্ব শোভা। শালশাল্মলীর কি অপূর্ব কান্তি সমারোহ। তারপর অলস পদভঙ্গে এগিয়ে যায় এক পত্রালী সুন্দর তরুর দিকে। বলে এর নাম কি প্রিয়তম?

তমাল।

এর?

কর্ণিকার।

আবার ফিরে আসে যশোদা। বর্দ্ধমানের বাহু আশ্রয় করে অরণ্যের সমস্ত লতা-পাদপের পুষ্প সুরভি যেন আত্মসাৎ করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে।

মধ্যাহ্ন তখন অতিক্রান্ত হয়েছে। কমলকিঞ্জল্কে সমাচ্ছন্ন এক সরোবরের ধারে তাঁরা তখন বিশ্রাম নিরত। বর্দ্ধমানের উরুতে মাথা রেখে নবল বকুল পল্লবের ছায়াতলে তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর শুয়ে রয়েছে যশোদা।

হঠাৎ যশোদার সুখতন্দ্রা ভেঙে যায়। উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন বর্দ্ধমানও। অনতিদূর হতে ভেসে আসা বীণার তন্ত্রী ঝংকার ও তার সঙ্গে কিন্নর মিথুন কণ্ঠনিঃসৃত শ্রুতিরমণীয় স্বর লহরী সমস্ত বনবায়ুকে যেন সহসা আপ্লুত করে দেয়।

উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ান তারপর সেই স্বর লহরী লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে হয়না। সেই সরোবরের অপর প্রান্তে তাঁরা দেখতে পান পুন্নাগ তরুতলে শৈবালাসনে উপবিষ্ট কিন্নর মিথুনকে। ধীরে ধীরে তাঁরা তাদের নিকটে এসে দাঁড়ান।

গীত বন্ধ হয়। উঠে দাঁড়ায় কিন্নর তরুণ ও তরুণী। উভয়কে নমস্কার করে।

প্রশ্ন করেন বর্দ্ধমান, তোমরা কে?

প্রত্যুত্তর দেয় কিন্নর যুবক। বলে, আমরা কিল্বীষক দেবতা। ইন্দ্রকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আপনার মহাভিনিষ্ক্রমণের কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

তার কোনো প্রয়োজন ছিলনা—প্রত্যুত্তর দেন বর্দ্ধমান। দেবরাজকে বোলা, তা আমার স্মরণ আছে।

দেব! তাই বলব—বলে তাঁদের প্রণাম করে তারা পিছু সরে যায়। তারপর বাতাসে কোথায় বিলীন হয়ে যায়।

বিস্মিত দৃষ্টি তুলে বিমূঢ়ের মতো বর্দ্ধমানের মুখের দিকে তাকায় যশোদা। বলে, ওরা তোমায় কি বলে গেল প্রিয়?

অন্যমনস্কের মতো বলেন বর্দ্ধমান, আজ সেকথা থাক যশোদা।

না প্রিয়। তোমার অভিনিষ্ক্রমণের কি কথা বলছিল ওরা। তা শোনা অবধি আমার মন ব্যাকুল হয়ে আছে।

তাইত বলছিলাম আজ সেকথা থাক প্রিয়া।

না প্রিয়তম।

তবে শোন। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলেন বর্দ্ধমান—অচিরেই এই সংসার আমায় পরিত্যাগ করে যেতে হবে।

অকস্মাৎ দৃষ্টিহারা হয় যশোদার দুই নীলকঞ্জপ্রভ নয়ন। অগ্নি জ্বালা বর্ষণ করে যেন অপরাহ্নের স্নিগ্ধ চৈত্র বায়ু। দোহদপূর্তিব আনন্দিত প্রাণ সহসা যেন মূর্চ্ছাহত হয়।

যশোদা বলে, ক্ষমা কর স্বামি, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছিনা।

বর্দ্ধমান তুলে ধরেন যশোদার মুখখানি। দেখেন তার দুই চোখ হতে দরবিগলিত অশ্রু মণিসরের মত দুইগণ্ড বয়ে ভূতলে গড়িয়ে পড়ছে।

বর্দ্ধমান নিজের বক্ষে ধারণ করেন যশোদাকে। বলেন, সেইজন্যই আজ তোমায় বলতে চাইনি সেকথা। কিন্তু এও সত্য আমায় যেতে হবে জগতের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য।

বর্দ্ধমানের আশ্লেষ হতে নিজেকে মুক্ত করে নেয় যশোদা। তারপর বর্দ্ধমানের মুখের দিকে চেয়ে দু হাতে অশ্রু মুছে নেয়। বলে, জগতের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য?

আবেগ শিহরিত কণ্ঠে বলেন বর্দ্ধমান, হ্যাঁ যশোদা।

এক নূতন হর্ষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যশোদার অশ্রুপ্লুত নয়ন। অরণ্যের শাখা প্রশাখার পত্রচ্ছেদ অবকাশ হতে লুটিয়ে পড়ে যশোদার মুখে একফালি সূর্যালোক। সেই সূর্যালোকে আরো যেন উদ্ভাসিত দেখায় যশোদার অনন্য সুন্দর মুখচ্ছবি। মন্ত্রধ্বনির মত আবার সে উচ্চারণ করে—জগতের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। তারপর ধীরে ধীরে বলে, তবে তাই হবে প্রিয়!

হিন্দু ও জৈন কাল বিভাগ

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

হিন্দুরা যেমন কালকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিভাগে ভাগ করিয়া থাকেন, জৈনগণও তেমনি উহাকে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। আজ এই দুইরূপ কালবিভাগ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

হিন্দুদিগের সত্যযুগ নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও ধর্মের কাল, সেই সময় পাপের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। পুরাণে সত্যযুগের ধর্ম এইরূপ কথিত আছে ঃ

কৃতে ধর্মশ্চতুষ্পাদঃ সর্বে ধর্মরতা জনাঃ।
বর্ণাশ্রমাচাররতা স্তপোব্রত পরায়ণাঃ ॥
নারায়ণর্চনাপরাঃ শোকব্যাধি বিবর্জিতাঃ।
সত্যোক্তিভাষিণঃ সর্বে সদয়া দীর্ঘজীবিতাঃ ॥
ধনধান্যাদিসম্পন্না হিংসাদম্ভবিবর্জিতাঃ।
পরোপকারিণশ্চৈব সর্বশাস্ত্রবিদস্তথা ॥
অহো সত্য যুগস্যাস্তি কঃ সংখ্যাতুং গুণান্‌ক্ষমঃ।
অধর্মাচরণং তত্র জনাঃ কেচিন্ন কুর্বতে ॥
—পাদ্মে, ক্রিয়াযোগ সার, ২৬/৩-৭

অর্থাৎ সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম; সকলেই ধর্মপরায়ণ বর্ণাশ্রমাচাররত, তপোব্রতরত, নারায়ণ পূজারত, শোকব্যাধিহীন, সত্যবাদী, সদয়, দীর্ঘজীবী, ধনী, হিংসাদিবিহীন, পরোপকারী, পণ্ডিত। এই সত্য যুগের সমস্ত গুণ গণনা করিতে পারে, এমন কে আছে? এই যুগে কেহই অধর্মাচরণ করে না।

এই সময়ে মানবের আয়ু লক্ষবর্ষ পরিমিত এবং মৃত্যু ইচ্ছাধীন। মানবদেহের পরিমাণ ২১ হস্ত। এই সময়ে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই চারি অবতার জন্মগ্রহণ করেন। সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বর্ষ।

সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ। ইহার পরিমাণ ১২৯৬০০০ বৎসর। এই সময়ে মানব দেহের পরিমাণ ১৪ হাত এবং মানুষের আয়ু দশ সহস্র বৎসর। এই সময়ে বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র এই তিন অবতাররূপে ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এই যুগ সম্বন্ধে পুরাণকার বলেন ঃ

ত্রেতাযুগে সমায়াতে ধর্ম পাদোনতাং গতঃ।
অল্পক্লেশান্বিতা লোকাঃ কেচিৎ কেচিদ্দয়াশয়াঃ ॥

বিষ্ণুধ্যানরতা লোকা যজ্ঞদান পরায়ণাঃ। ইত্যাদি

—পাদ্মে, ক্রিয়াযোগ সার, ২৬/৮১

অর্থাৎ, ত্রেতাযুগে ধর্মের একপাদ লোপ পায় (অর্থাৎ তখন তিন ভাগ ধর্ম ও একভাগ অধর্ম)। লোকের সুখের সহিত অল্প অল্প ক্লেশ ভোগ আরম্ভ হয় (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুখ উপভোগ করিতে পারে না)। বিষ্ণুপূজা ও যজ্ঞদানাদি চলিতে থাকে।

ফলতঃ, এই সময় হইতে অধর্মের সূচনা। ধর্মের প্রাবল্য হেতু তাহার প্রভাব সম্যকরূপে পরিলক্ষিত হয় না সত্য, তবে এখন যে অধর্ম বীজরূপে দেখা দেয়, তাহাই কলিযুগে ফলপুষ্পাদি সমন্বিত মহাবিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া মানবের অশেষ অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় হইতেই মানুষের দুঃখেরও সূত্রপাত হইয়া থাকে।

তারপর, দ্বাপর যুগ। ইহার পরিমাণ ৮৬৪000 বর্ষ। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ এই দুইরূপে ভগবান এই সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই সময়ে মানুষের দেহের পরিমাণ ৭ হাত এবং তাহার জীবনকাল সহস্র বর্ষ। এই যুগের ধর্ম পুরাণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ত্রেতাযুগস্যাবসানে দ্বাপরে যুগ আগতে।
দ্বিপাদো ভূতবান্ ধর্মঃ সুখদুঃখান্বিতা নরাঃ ॥
কেচিৎ কেচিৎ পাপরতাঃ কেচিদ্ধর্মরতাস্তথা।
কেচিৎ কেচিৎ গুণৈর্হীনাঃ কেচিৎ কোচিন্মহাগুণাঃ ॥
অত্যন্তদুঃখিনঃ কেচিৎ কেচিচ্চাতিধনাস্তথা। ইত্যাদি

—পাদ্মে, ক্রিয়াযোগ সার, ২৬/১৩-১৫

অর্থাৎ, দ্বাপর যুগে ধর্ম দ্বিপাদ (এবং অধর্ম দ্বিপাদ), মানবের সুখ ও দুঃখ সমপরিমাণ। মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ পাপী এবং কেহ কেহ পুণ্যবান; কেহ কেহ নির্গুণ, কেহ কেহ গুণশালী, কেহ কেহ নির্ধন, কেহ কেহ ধনী।

এই সময়ে পাপ ও পুণ্যের প্রভাব সমান এবং সেইজন্য সুখ ও দুঃখের পরিমাণও সমান।

অতঃপর কলিকাল, ইহার পরিমাণ ৪৩২000 বৎসর। এই সময়ে ভগবান কল্কি রূপে আবির্ভূত হন। মানবের দেহের পরিমাণ ৩½ হাত এবং তাহার জীবন কাল ১২0 বৎসর। এই কালের বর্ণনা পুরাণে এইরূপ পাওয়া যায় ঃ

কলৌ যুগে চ বিপ্রেন্দ্র সর্বপাপৈক মন্দিরে।
এক পাদোঽভবেদ্ধর্মঃ সর্বে পাপরতা জনাঃ ॥ ইত্যাদি

—পাদ্মে, ক্রিয়াযোগ সার, ২৬/১৮-১৯

অর্থাৎ কলিকালে পূর্ণ পাপ বিরাজ করে। এই সময়ে ধর্ম মাত্র একপাদ (ও ত্রিপাদ পাপ) এবং সকলেই পাপরত।

সংক্ষেপে ইহাই হিন্দুদিগের চারি যুগের বর্ণনা। দেবতাদিগের যুগের পরিমাণ অবশ্য ইহা হইতে অনেক বেশী। সে সম্বন্ধে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এখন জৈন দিগের কাল বিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। জৈনগণ প্রধানতঃ কালকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। যথা উৎসর্পিণী কাল ও অবসর্পিণী। এই উৎসর্পিণী কালে ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া থাকে আর অবসর্পিণী কালে দিন দিন অবনতি পরিলক্ষিত হয়। উৎসর্পিণী কালে মানুষের আয়ু ও দেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর অবসর্পিণী কালে উহা দিন দিন কমিতে থাকে। ইহার এক এক কালের পরিমাণ দশ কোটাকোটি সাগর বৎসর অর্থাৎ দশ কোটি সাগরকে দশ কোটি সাগর দ্বারা গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহাই উৎসর্পিণী বা অবসর্পিণী কালের বৎসরের পরিমাণ। এই সাগরের সংখ্যার গণনা করা অসম্ভব। এই দুই কালে এক কল্প হইয়া থাকে।

এই দুই কাল আবার প্রত্যেকে ছয় ভাগে বিভক্ত। অবসর্পিণী কালের প্রথম বিভাগের নাম সুষমা সুষমা। ইহার পরিমাণ চার কোটি সাগর বর্ষ। এই সময় মানুষের আয়ু তিন পল্য পরিমাণ। (এই পল্য সংখ্যার পরিমাণও অতি বৃহৎ ও গণনা করা একরূপ অসম্ভব।) এই সময় মানবের শরীরের উচ্চতা ১২০০ গজ। তিন দিন অন্তর ক্ষুধা হইয়া থাকে। এবং কল্প বৃক্ষের ফল দ্বারা উহা নিবৃত্ত হয়। এই সময় মানুষের কোনও পীড়া থাকে না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুই জনে এই সময় একই মাতার উদর হইতে জন্মগ্রহণ করে। পরে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা পতিপত্নীর মত ব্যবহার করে। আবার পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিবার পরক্ষণেই মাতাপিতা পরলোক গমন করেন। শিশু নিজের আঙ্গুল চুষিয়া ৪৬ দিনে পূর্ণ যৌবন লাভ করে। স্ত্রী ও পুরুষ দুই জনে একই সময়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

ইহার পর সুষমা কাল ; তাহার পরিমাণ তিন কোটাকোটি সাগর। এই সময়ে মানুষের উচ্চতা কমিয়া ৮০০০ গজ হয় আর আয়ু দুই পল্য পরিমিত হয়। ইহাও আবার দিন দিন কমিতে থাকে। দুই দিন অন্তর ক্ষুধা হয়। ভোজ্য দ্রব্য কল্পবৃক্ষ হইতে প্রসূত হয়। এই দুই কালে রাজা মহারাজ কেহই থাকেন না। সিংহাদি ক্রূর জন্তুর স্বভাবও এই সময় শান্ত থাকে।

ইহার পর সুষমা দুঃষমা নামক তৃতীয় বিভাগ। ইহার পরিমাণ দুই কোটাকোটি সাগর। একালে মানুষের আয়ু দুই পল্য পরিমিত এবং দেহের উচ্চতা ৪০০ গজ। এই সময় মানুষ একদিন অন্তর ভোজন করিয়া থাকে ; এই বিভাগের শেষ হইতেই প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়। এতাবৎকাল পর্যন্ত মানুষের কোনও প্রকৃত ইতিহাস হইতে পারে না।

তখন পর্যন্ত সকল মানুষই একরূপ থাকে, তাহাদের পরস্পরে আচারাদিগত কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় পর্যন্ত মানুষ কোনও ধর্ম কর্ম সম্পাদন করে না, তাহার কোনও নাম পর্যন্ত উৎপন্ন হয় না; স্ত্রী পুরুষকে 'আর্য' বলিয়া ডাকে আর পুরুষ স্ত্রীকে 'আর্যে' বলিয়া সম্বোধন করে। এই তৃতীয় কালের অন্তে কুলকর বা মনু জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সময় হইতেই নাম উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ বিভাগের নাম দুঃষমা সুষমা কাল। ইহার পরিমাণ ৪২০০০ বৎসর কম এক কোটাকোটি বৎসর। এই সময়ে মানুষের আয়ু ৮৪ লক্ষ পূর্ব[১] বৎসর এবং দেহের পরিমাণ ১১০০০ গজ। ইহার পরে শরীরের উচ্চতা ক্রমশঃ কমিযা ৭ হাত মাত্র হয়। এই সময় হইতেই জীবন ধারণের জন্য মানুষেব শ্রম করিতে হয়। এসময় হইতেই রাজ্য, ধর্ম, বিবাহ, বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতির সূত্রপাত হয়। এ সময়েই জৈন দিগের ২৪ জন তীর্থংকর বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। চক্রবর্তী, নারায়ণ, প্রতি নারায়ণ নামক শলাকা পুরুষ বা মহাত্মাও এই সময়েই জন্মগ্রহণ করেন।

অবসর্পিণী কালের পঞ্চম বিভাগের নাম দুঃষমা কাল; ইহার পরিমাণ ২১০০০ বৎসর। এই সময়ে মানুষের জীবন কাল এবং দেহের পরিমাণ অতিশয় কমিয়া যায়। এ কালের প্রথমেই মানুষের আয়ু হয় ১২০ বৎসর আর শরীরের পরিমাণ হয় ৭ হাত। আবার প্রতি হাজার বৎসরে পাঁচ বৎসর হিসাবে আয়ু কমিয়া যায়। এইরূপ কমিতে কমিতে অবশেষে মানুষের দেহের পরিমাণ হয় দুই হাত। এই সময় মানুষ মাংস ভক্ষণ করে এবং বানবের মত বৃক্ষে বাস করে। এই সময় ধর্মের একান্ত অভাব হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ বিভাগের নাম দুঃষমা দুঃষমা। এই সময় অবনতির চরম সীমায় আরোহণ করে। এই কালের যখন ৪৯ দিন মাত্র বাকী থাকে, তখন সাতদিন ধূলি বৃষ্টি সাতদিন ঝড়, সাতদিন জলবৃষ্টি, সাতদিন অগ্নি বৃষ্টি, সাতদিন প্রস্তর বৃষ্টি, সাতদিন মৃত্তিকা বৃষ্টি এবং সাতদিন কাষ্ঠবৃষ্টি হয়। আর এই বৃষ্টিকালে সকল পশু, পক্ষী, মানুষ, নগর, গ্রাম, দেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কেবল যাহারা মাতা পিতার সংযোগে উৎপন্ন, তাহারা দেবতার কৃপায় পর্বতের গুহা প্রভৃতি সুরক্ষিত স্থানে যাইয়া আত্মরক্ষা করে। ইহার নাম প্রলয় কাল। ইহাই বোধ হয় জৈনদিগের Story of Deluge। কোন জাতির মধ্যে এই Deluge বৃত্তান্তের কিরূপ বর্ণনা আছে, তাহা ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার বাসনা আছে। তবে এখানে এটুকু মাত্র বলিয়া রাখি যে, পৃথিবীর সকল জাতির Mythology বা পুরাতন গ্রন্থে এই ব্যাপারের এক একটী বিবরণ বা version আছে।

---

১ সংখ্যা বিশেষ।

এইরূপে অবসর্পিণী কাল সম্পূর্ণ হইলে উৎসর্পিণী বা উন্নতি কালের প্রারম্ভ হয়। এই কালের ছয় বিভাগ। প্রথম বিভাগের নাম দুঃষমা দুঃষমা—কাল পরিমাণ ২১০০০ বৎসর।

ইহার পর দুঃষমা—কাল পরিমাণ ২১০০০ বৎসর। এই সময় মানুষের আয়ু এবং দেহের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ইহার পর ক্রমে সুষমা দুঃষমা। দুঃষমা সুষমা, সুষমা এবং সুষমা সুষমা কাল। এই সকল কালে ক্রমশঃ চারিদিকেই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় কালে অবসর্পিণীর চতুর্থ কালের মত আবার ২৪ তীর্থংকর প্রভৃতি ৬৩ জন শলাকা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

এইরূপে উৎসর্পিণী কাল সমাপ্ত হইলে পুনরায় অবসর্পিণী কালের আরম্ভ হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের বিবরণ মতে জগত দিন দিন উন্নতির অবস্থা হইতে অবনতির দিকে যাইতেছে। অবনত অবস্থা হইতে ক্রমিক উন্নতির কথা হিন্দুদিগের কাল বিভাগের বিবরণে নাই। অবশ্য কলি যুগান্তে মহাপ্রলয়ের পর পূর্ণ উন্নতির কাল সত্য যুগ আসে সত্য, তবে তাহাতে ক্রমিক অবনতি ভিন্ন উন্নতির উল্লেখ নাই; কেননা সত্য যুগের প্রারম্ভ হইতেই অবনতির সুচনা আরম্ভ হয়। আর সত্য যুগও ক্রমিক উন্নতির ফল নহে। উহা ধ্বংসের পরে নূতন করিয়া গড়া এক অভিনব পদার্থ।

জৈনদিগের মত কিন্তু এরূপ নহে। তাহাদিগের মতে উন্নতির পরে অবনতি হয় সত্য, তবে সে অবনতি আসে পূর্ণ উন্নতির পরে। প্রথমে অবনত অবস্থা হইতে মানব ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া যখন চরম উন্নতি লাভ করে তখন ধীরে ধীরে তাহার অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে যখন সে অবনতির চরম অবস্থায় উপনীত হয়, তখন আবার ধীরে ধীরে তাহার উন্নতির সূচনা হইতে থাকে।

সুতরাং, জৈন মত আলোচনা করিলে মনে হয় যে ইহা Darwin-এর Evolution Theory বা ক্রম বিকাশবাদের একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিতেছে। Darwin-এর মতে জগৎ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জৈনগণ বলিতেছেন—হাঁ তাহা সত্য, তবে এই উন্নতির পর আবার অবনতি আসিবে। অতএব হে মানব, তুমি তাহার জন্য প্রস্তুত হও।

Darwin কেবল উন্নতির কথা বলিয়াছেন, হিন্দুগণ কেবল অবনতির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। Darwin Optimist আর হিন্দুগণ এক্ষেত্রে Pessimist। কিন্তু জৈনগণ মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা জগতের ক্রমিক উন্নতি ও ক্রমিক অবনতি এই দুইয়ের কথাই বলিয়াছেন। জৈনদিগের এই কাল বিবরণ জিন মুনির আদিপুরাণ ও জৈন হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে এক বিষয়ে হিন্দু ও জৈন গণের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় পক্ষের মতানুসারেই জগৎ বর্তমানে ক্রমিক অবনতির পথে যাইতেছে। Darwin এর মত এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মত সম্পূর্ণরূপে এই মতের বিরোধী সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মতে এখন জগতের দিন দিন সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতেছে, অবনতির কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনেক অংশে তাঁহাদের এই মত পোষণ করে।

এক্ষণে বিশেষজ্ঞগণ, Darwin, হিন্দুগণ ও জৈনগণের জগতের উন্নতি বা অবনতির সম্বন্ধে এই তিন 'theory'র গুণাগুণ বিচার করিবেন, এই আশায়ই এই প্রবন্ধ লিখিলাম। তবে আমার মনে হয়, Darwin ও হিন্দুগণ এ বিষয়ের এক এক দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। জৈনগণ উভয় দিকেরই আলোচনা করিয়াছেন এবং হয়ত তাঁহাদের মতই যুক্তিযুক্ত। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়।

কায়স্থ সমাজ, ভাদ্র ১৩৩২ [ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা] পৃ ২৬৬-২৭২

বীরপত্নী যশোদা/শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত

কি তোমার দিন চর্যা
অভিজ্ঞান বার্তা আলাপন
বর্ধমান অর্ধাঙ্গিনী
তুমি একা একান্ত রোদন।
ভাঙিল জিনের গৃহ
চূর্ণ হোল গৃহিণী প্রতিমা
হায় কেহ গাহে নাই
শব্দহীন বিচ্ছেদ গরিমা॥

মহাবীর প্রণাম/শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী

গ্রীষ্মের বুকে বর্ষার ধারা স্নিগ্ধ শ্যামল ভূমি,
পৃথিবীর তীরে শান্তির নীড় গড়ে দিলে একা তুমি!
অনাচার আর ব্যাভিচারে ভরা ঘুম ভাঙা এক ভোরে,
তৃষিত হৃদয় চকিত আলোয় চাতকের সম ওড়ে।
নীল সরোবরে শ্বেত পদ্মের সুবাস-হৃদয়-তম,
সূর্যের রঙ্ সারা গায়ে মেখে নীরব পাহাড় সম।

অঙ্গ বঙ্গ মগধ কোশল স্বর্গ মর্ত্য রাত্রি দিন,
ত্রিশলা-তনয় ত্রিকালদর্শী রিপুজয়ী মহাজিন!

কঠোর সাধনে দ্বাদশ বর্ষ বিগত করুণ-আঁখি
হে তীর্থংকর হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিলে মিলন রাখি।
জড় বলি যারে বলিলে তাহারে প্রাণ চঞ্চল অতি
তিমিরাবৃত পৃথিবীর পথে জ্বালিলে জ্ঞানের জ্যোতি।
তোমার চরণ স্পর্শ ধন্য আগত ধূসর ভবিষ্যৎ,
মর্ত্য ধূলায় আসিল নামিয়া ইন্দ্র বিজয়ী রথ।

তাপসের প্রাণ/শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত

আলোকের সরোবরে
রাত্রিকে খুঁজেছি আমি কতবার,
ওগো রাত্রি, কোথা রাত্রি তুমি,
প্রদোষ সীমান্তলগ্ন এ অঁাধার নয়
যেখানে অন্বিষ্ট সেই যামিনীর বাণী
তার সে অম্লান রূপ আছে সংগোপনে
যেন বিমুক্ত করুণাধারা তাপসের প্রাণে,
ভাবনার ফুলগুলি যেমন ছড়ানো
কিংবা আছে মায়ালোকে মালার প্রত্যয়ে ;
তাদেরও প্রহরগুলি একই কাহিনী
সব কিছু যেখানে বিলীন,
তাই নিশীথের এ লাবণ্য চেতনার রূপ,
অভীপ্সিত রাত্রি শুধু কেবল শাশ্বত,
এখানে পরম ধ্যান ইন্দ্রধনু হ'য়ে
(বুঝি) আলোকের পরপারে আরো জ্যোতির্ময় !
কেবলীর অনুভব নীলিমার শেষে,
তাই রাত্রিকে খুঁজেছি আমি কতবার ।

স্বর্গীয় রাজর্ষি দেবকুমার জৈন

স্বল্পায়ু লাভ করে সংসারে যাঁরা অধিকাধিক কাজ করে যান স্বর্গীয় রাজর্ষি দেবকুমার জৈন তাঁদের একজন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে মার্চ তাঁর জন্ম হয়। মৃত্যু ১৯০৮ এর ৫ই আগষ্ট। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর জীবনে জৈন ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে তিনি যে ভাবে যোগ দেন তার তুলনা হয় না। বাঙ্‌লা ভাষায় জৈন ধর্মের ভাবধারা প্রবাহিত হোক সে দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'শ্রমণে' আমরা যে 'প্রশ্নোত্তরে জৈনতত্ব' প্রকাশ করেছিলাম তার প্রথম প্রকাশনের মূলেও ছিল তাঁর উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য।

আরার বিখ্যাত জমিদার পরিবারে দেবকুমারের জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১১ বছর সেই সময় তাঁর পিতা চন্দ্রকুমার পরলোক গমন করেন। তাই অত্যন্ত অল্প বয়সে সংসার ও জমিদারীর সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপরে এসে পড়ে। কিন্তু দেবকুমার সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে সেই অবস্থার সম্মুখীন হন। পারিবারিক এই বিপত্তির জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অধিক দূর পর্যন্ত লাভ করতে পারেন নি, মাত্র আই. এ. পর্যন্ত পড়বার সুযোগ লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পিপাসা ছিল অপরিসীম। সেজন্য শ্রবণ বেলগোলা হতে প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ নেমি সাগর বর্ণীকে ডাকিয়ে নিজের কাছে রাখেন ও তাঁর কাছে শাস্ত্রধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। তাঁর অনুজ ধর্মকুমারকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য বম্বে হতে লালা রামজী শাস্ত্রীকে ডাকিয়ে আনান।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আরা হতে যখন 'জৈন গেজেট' প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়, তখন তার সম্পাদনার কাজও তিনি গ্রহণ করেন। এই কাগজের মাধ্যমে ধর্ম, তীর্থক্ষেত্রের সুব্যবস্থা আদির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর অনুজ ধর্মকুমারের মাত্র ১৮ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। এতে তিনি গভীর দুঃখ পান ও সংসার যে নশ্বর তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে আরও দত্তচিত্ত হয়ে যান। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আরায় 'জৈন ধর্ম প্রচারিণী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য—জৈন ধর্ম ও দর্শনের প্রচার। এই উদ্দেশ্যে তিনি আরো দু'টি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম, 'জৈন ইয়াং এসোসিয়েশন'। উদ্দেশ্য ঃ নবযুবকদের মনে ধর্মপ্রেম উৎপন্ন করা। দ্বিতীয়, 'সেণ্ট্রাল জৈন পাবলিশিং হাউস'। উদ্দেশ্য : অমূল্য জৈন ধর্ম গ্রন্থাদি প্রকাশিত করা। কালান্তরে সেণ্ট্রাল জৈন পাবলিশিং হাউস হতে বহু অমূল্য সংস্কৃত, প্রাকৃত, ইংরেজী ও হিন্দী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর ভদৈনী ঘাট স্থিত নিজস্ব ধর্মশালায় তিনি 'স্যাদ্বাদ পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে 'স্যাদ্বাদ মহাবিদ্যালয়' রূপে বিকসিত হয়। ঐ বছরই আরায় 'জৈন সিদ্ধান্ত ভবনে'র প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে ভারতের একটী প্রমুখ জৈন গ্রন্থাগার। এখান হতে দ্বৈভাষিক 'জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর—জৈন এণ্টিকোয়ারী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নিজের বিধবা ভ্রাতৃবধূ চন্দাবাঈকে (ধর্মকুমারের স্ত্রী) তিনি পণ্ডিত নিযুক্ত করে সংস্কৃত ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করান ও স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ সেবা মূলক 'বালা বিশ্রামে'র প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে তার সংস্থাপিকা-সঞ্চালিকা করে দেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় দিগম্বর জৈন মহাসভা কুণ্ডলপুর-এর অধ্যক্ষ পদে তিনি বৃত হন। ঐ বৎসরই তিনি দাক্ষিণাত্যের জৈনতীর্থক্ষেত্র পরিদর্শনে গমন করেন ও সেখানে প্রাচীন হস্তলিখিত জৈন পুঁথির দুর্দশা দেখে মনে মনে সঙ্কল্প করেন যে যতদিন না তিনি এদের সংরক্ষণ ও শাস্ত্রোদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারবেন ততদিন তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবেন। এর জন্য ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী স্থাপনের তিনি সঙ্কল্প করেন কিন্তু সেই সঙ্কল্প কাজে রূপায়িত করবার আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের জীবনও যে বেশী দিনের জন্য নয় তা তিনি তখনি বুঝতে পারেন এবং সেজন্য উইল করে 'সেণ্ট্রাল জৈন ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী'র জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট পূর্ণ জাগরুক অবস্থায় বর্ণীজীর কাছে সংলেখনা ব্রত গ্রহণ করে কলকাতায় তিনি তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

স্বর্গীয় দেবকুমারের কাছে বাঙ্‌লা সাহিত্যও একভাবে ঋণী। বাঙ্‌লা সাহিত্যে জৈন ধর্ম বিষয়ক চর্চার যাঁরা সূত্রপাত করেন তিনি তাঁদের একজন। তাঁর অর্থানুকূল্যে বাঙ্‌লা ভাষায় জৈন ধর্ম দর্শন বিষয়ক ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। আমরা তাই সকলের সঙ্গে তাঁর জন্মশতাব্দী সমারোহ বৎসরে তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরেশনাথ

[ভ্রমণ কথা]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী

[আমরা মাঘ ১৩৮৩ 'ভ্রমণে' একালীন পরেশনাথ যাত্রার বিবরণ প্রকাশ ক'রেছিলাম। সে পথছিল মধুবনের দিক হতে। এখানে নিমিয়াঘাটের দিক হতে আজ হতে প্রায় ৫০ বছব আগের পরেশনাথ তীর্থযাত্রার বিবরণ প্রকাশ করছি। —সম্পাদক]

কোলিয়ারীর বাংলোর উত্তর দিকের জানালা দিয়া চোখে পড়িত—উত্তুঙ্গ ধূসরবর্ণ পরেশনাথ। বাংলোর বাহির হইলেই সর্বাগ্রে চোখে পড়িত। পরেশনাথ যে ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তির নিকট আদরণীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোলীয়ারীতে প্রথম আসিয়াই ইচ্ছা হইল—একবার পরেশনাথ ঘুরিয়া আসি। আমার predecessors-দের (মাইনিং ষ্টুডেণ্ট্‌স্) কাছে শুনিলাম যে তাঁহাদেরও বহুকাল হইতে যাইবার ইচ্ছা আছে, তবে ঐ কিন্তুর জন্য হয় নাই। ভরসা দিলেন—একবার নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। বলা বাহুল্য তাঁহাদের ভরসায় আমার মন উঠিল না। কিন্তু উহাদের সঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। 'মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'—আমিও একদিন যাইব মনে করিয়াই মনকে প্রবোধ দিলাম।

এই সময় বড়দিনের বন্ধে আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয় নাটোর হইতে এখানে আসিলেন। একদিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম যে তাঁহারি উৎসাহে ও আগ্রহাতিশয্যে পরেশনাথ অভিযানের দল গঠিত হইতেছে। অবশেষে আমরা দলে আটজন হইলাম। আমরা তিনজন মাইনিং ষ্টুডেণ্ট্‌স্, আমাদের ম্যানেজার বাবুর দুই ভাই, আমার অগ্রজ, ঠাকুর মধুসূদন ও কোলীয়াবীর চৌকিদার ভোলা।

রাত্রি সাড়ে দশটায় ট্রেণ। ভোলা চৌকিদারের স্কন্ধে চালডালের বস্তা চাপাইয়া, তৈরী জল খাবারের পাত্র মধুসূদনের হেপাজতে দিয়া যাত্রা করিলাম। পাহাড়ের উপর বেশী শীত হওয়ার আশঙ্কায় সকলেই কিছু অতিরিক্ত শীতবস্ত্র লইয়াছিলাম। যখন যাত্রা করিলাম তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনও কোলিয়ারী হইতে পুরোপুরি দু'মাইলের কম হইবে না। গাড়ী না পাওয়ার কোন ভয় ছিল না। কারণ B. N. R -এর ট্রেণ বারোমাস ঘণ্টা দুই আড়াই লেট্ হয়। টাইমটেবিলে সাড়ে

দশটার স্থলে ৯টা লিখিলে অজানা লোকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত। এরকম শীতের দিনে আড়াই ঘণ্টা কাল ষ্টেশনে পড়িয়া হিহি করিয়া কাঁপিতে হইত না। যাক্—

যথা সময়ে ৯টার ট্রেণে (অবশ্য B. N. R.-এর সাড়ে দশটা) গোমো জংশনে পৌঁছিলাম। খানুড়ীর পরবর্তী ষ্টেশন গোমো এবং B. N. R.-এর এই লাইনের এইখানেই পরিসমাপ্তি। গোমো হইতে আমাদের ট্রেণ পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায়। গাড়ীর উপরই ঘুমান গেল। পরদিন সকালেই ট্রেণে আমরা E. I. R.-এর নিমিয়াঘাট ষ্টেশনে নামিলাম। দেখিলাম আর একদল পরেশনাথ যাত্রী নামিয়াছে। পাহাড়টী ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল। চালডালের বস্তা ষ্টেশন ঘরে রাখিয়া আমরা হাঁটিতে সুরু করিলাম। ৯টার সময় পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছান গেল। পূর্বেই শুনিয়াছিলাম যে পাদদেশ হইতে পাহাড়ের চূড়োয় উঠিতে হইলে ছয় মাইল পাহাড় ভাঙ্গিয়া উঠিতে হইবে। যাহা হউক উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম প্রথম পথটা মন্দ নয়; পথে মাইল পোষ্টও আছে।

দেড় মাইল উঠিবার পর একটা গুরুগম্ভীর হুঙ্কার শব্দ কানে আসিতে লাগিল। তখন শব্দের কারণটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আরও আধ মাইল উঠিয়া প্রথম ঝরণা পাইলাম। ঝরণার জল তর্ তর্ বেগে নীচে নামিয়া আসিতেছে। নীচু হইতে ভারি গুরুগম্ভীর শব্দ শোনা যাইতে ছিল—আমরা ঝরণার পাশে ১৫ মিনিট কাল বসিয়া রহিলাম। হাতমুখ ধুইয়া মাথায় জল দিলাম। খাওয়ার জন্য পাত্রে জল ভরিয়া লইলাম। বিশুদ্ধ সুন্দর জল! যেমন ঠাণ্ডা তেমনি পরিষ্কার। ঝরণার আশেপাশের সুন্দর দৃশ্যে মন ভরিয়া উঠিল। সেখান হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিতেছিল না।

আরও দু'মাইল উপরে উঠিলাম, যতই উপরে উঠিতে ছিলাম পথটা ততই খাড়ি হইয়া পড়িতেছিল। আর পথটা ঠিক যেন দোতালায় উঠিবার জন্য দালানের বাহিরের লোহার গোল সিঁড়ি। চার মাইল উঠিয়া আবার ঝরণা পাইলাম।

পাহাড়টি নানাবিধ ছোটবড় গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ। পথের পার্শ্বে প্রায়ই বাঁশগাছ দেখিলাম। আর একস্থানে কলাগাছ দেখিতে পাইলাম। সেই স্থানটী চিহ্ন করিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, কারণ গোমো ষ্টেশনে খিচুড়ী ভোগের জন্য কলাপাতার আবশ্যক হইবে। চার মাইল পর আর কোন ঝরণা নাই। আমাদের সংগৃহীত জল ছাড়া পথের সম্বল স্বরূপ কমলালেবু লইয়াছিলাম।

চার মাইল উঠিবার পর পথটা ক্রমেই এত খাড়ি হইয়া পড়িয়াছিল যে আমাদের উঠিতে কষ্ট হইতেছিল। টুকু, নরেন, যতীন, প্রবোধ একটু আগাইয়া পড়িয়াছিল।

আরও কিছুদূর উঠিবার পর দেখিলাম তাহারা বসিয়া আছে, আর জল্পনা কল্পনা করিতেছে যে পরেশনাথের মন্দির পর্যন্ত উঠিতে পারিবে কিনা ; শেষে 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' স্থির হইল।

ক্রমে আরও এক মাইল উঠিয়া ডাকবাংলো পাইলাম। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়াও কোন লোকের সাড়াশব্দ পাইলাম না। ডাকবাংলো হইতে মন্দিরে পৌঁছিতে আরও আধ মাইল হাঁটিতে হইবে। এ পর্যন্ত আমরা সাড়ে পাঁচ মাইল হাঁটিয়াছি। ডাকবাংলোর পর পথটা এত খাড়ি, আর এত সঙ্কীর্ণ যে দুইজন মানুষ পাশাপাশি যাইতে পারে না। তাছাড়া পথটি কোমর পর্যন্ত দীর্ঘ ঘাসে ভরা। আমাদের বিশেষ সাবধানতা সহকারে উঠিতে হইয়াছিল, কারণ একবার দক্ষিণে কি বামে পা ফস্কাইলেই পাহাড়ের নীচে পড়িয়া মৃত্যু।

মন্দিরে যখন উঠিলাম, তখন বেলা আড়াইটা। নীচে দূর হইতে পরেশনাথ যেমন ধূসরবর্ণ দেখায়, মন্দির হইতেও আমরা চারিদিক সেইরূপ দেখিয়াছিলাম। মন্দিরের আরও নীচে পাতলা পাতলা মেঘমালা দেখিলাম। হয়ত আমরা মেঘের কাছ দিয়াই উঠিয়াছি, কিন্তু সান্নিধ্যবশতঃ অনুভব করিতে পারি নাই।

পরেশনাথজীকে দর্শন করিয়া প্রণামী দিয়া পুণ্য সঞ্চয় পূর্বক ডাকবাংলোয় নামিয়া আসিলাম। এই পাহাড়ে পরেশনাথের মন্দিরটীই বৃহৎ। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট আরও ২৪টী মন্দির আছে সেগুলি দর্শন করিতে হইলে পাহাড়ের উপর একদিন রাত্রিবাস করিতে হয়।

ডাকবাংলোয় আসিয়া বাসা হইতে আনিত লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি জলযোগ করা গেল।

এইবার নামা আরম্ভ হইল। আমরা ঠিক যখন ডাকবাংলো হইতে নামিতেছি, তখন ষ্টেশনের সেই দল ডাকবাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কোনো তাড়াতাড়ি ছিল না। তাহারা সেই রাত্রি সেইখানে থাকিয়া পরের দিন নামিবে।

নামিবার সময় যদিও উঠিবার মত কষ্ট হইতে ছিল না তবুও পা দুটো ক্রমেই ভারী হইয়া আসিতেছিল। নামিবার পথে চিহ্নিত স্থান হইতে কলার পাতা কাটিয়া লইলাম।

একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরেশনাথে যেরূপ জঙ্গল, তাহাতে হাতী পর্যন্ত অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা একটী পাখী পর্যন্ত দেখি নাই। ভোলা চৌকীদার বলিল, "এখানে সবই আছে, কিন্তু বাবা পরেশনাথজীর কৃপায় কেহই তাহাদের দর্শন পায় না।"

নামিবার সময়ও আমরা দুই দল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের যখন পাহাড়ের

পাদদেশে পৌঁছিবার আরও এক মাইল পথ বাকী আছে, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সঙ্গে লণ্ঠন ছিল ধরাইয়া লইলাম।

আমরা যখন ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়াছি, তখন অপর দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা আমাদের দেরী দেখিয়া কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন রাত্রি সাতটা। সাড়ে সাতটায় ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি গাড়ীর তখনও আধ ঘণ্টা দেরী।

সাড়ে আটটার মধ্যেই গোমোতে পৌঁছিলাম। তারপর খিচুড়ী ভোগের পালা। সেদিনকার মশলাহীন খিচুড়ী যেরূপ তৃপ্তিদায়ক ও মুখরোচক হইয়াছিল, তাহা আজও মনে আছে।

ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঘুম দেওয়া গেল। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটার ট্রেণে কোলিয়ারীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পরেশনাথের যে নয়নাভিরাম মৌন গম্ভীর সৌন্দর্য দেখিয়াছিলাম, তাহা আজও যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে।

কায়স্থসমাজ, শ্রাবণ ১৩৩২ [ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা] পৃঃ ২০৪-৭

রোহক

নন্দী সূত্রের টীকায় এক বুদ্ধিমান বালকের কথা বলা হয়েছে। আজ আমি তোমাদের তার কথা শোনাব। সংসারে যে কাজ ধন, জন বা গায়ের জোরে হয়না, সে কাজ বুদ্ধি দিয়ে হয়। 'পঞ্চতন্ত্রে' তোমরা 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য' নিশ্চয়ই পড়েছ। এক ক্ষুদ্র খরগোসের কাছে তাই কিনা পশুরাজ সিংহ হেরে গেল। এমনি আমাদের গল্পের বালক রোহক। দেখত তোমাদের মাথায় এমন সব বুদ্ধি খেলে কিনা?

সেকালে উজ্জয়িনীর কাছে ছোট্ট একটী গ্রাম ছিল। সে গ্রামে নাচিয়েরা বাস করত। নাচিয়েদের গ্রাম বলে তার নাম ছিল নটগ্রাম। এই নটগ্রামে ভরত নামে একটী লোক থাকত। ভরতের ছোট্ট পরিবার। তারা স্বামী স্ত্রী দু'জন ও রোহক। রোহক ভরতের আগের পক্ষের ছেলে।

একবার ভরত রোহককে উজ্জয়িনী দেখাতে নিয়ে গেল। রোহক দেখে এল বড় বড় বাড়ী, সুন্দর সুন্দর বাগান। রোহক তা শুধু দেখে এলই না, মাথায় পুরে নিয়ে এল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা সিপ্রার ধারে সে যখন তার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গেল, যখন তার বন্ধুরা তাকে জিগ্যেস করল, হ্যাঁ ভাই, তুই কি দেখে এলি?—তখন সে উজ্জয়িনীর বর্ণনাই দিলনা, সমস্ত উজ্জয়িনীর ছবি নদী তীরের বালিতে এঁকে দেখাল। ঠিক সেই সময় সেইখান দিয়ে ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীর রাজা যাচ্ছিলেন। তিনি বালিতে উজ্জয়িনীর ছবি আঁকা দেখে ঘোড়া হতে নেমে ছেলেদের কাছে এলেন। তারপর আরো ভালো করে সেই ছবি দেখে ছেলেদের জিগ্যেস করলেন—এ ছবি কে এঁকেছে? ছেলেরা রোহককে দেখিয়ে বলল, এ এঁকেছে।

রাজা রোহককে জিগ্যেস করলেন, তোমার নাম কি?

রোহক নিজের নাম বলল।

রাজা তখন শুধু 'বেশ' বলে চলে গেলেন কিন্তু মনে মনে ঠিক করে গেলেন ভীবষ্যতে তিনি এই ছেলেটীকে তাঁর মন্ত্রী করে নেবেন। কিন্তু তার আগে আরো পরীক্ষা করতে হবে।

রাজা উজ্জয়িনীতে ফিরে গিয়ে পরদিনই নটগ্রামে দশ গাড়ী তিল পাঠিয়ে দিলেন। বলে পাঠালেন আজ সন্ধ্যার মধ্যে দশগাড়ীতে কত তিল আছে তা গুণে বলতে হবে নইলে তিনি সকলের মাথা কেটে নেবেন।

শুনে গ্রামের লোক মাথায় হাত দিয়ে বসল। দশগাড়ী তিল আধবেলায় তারা কি করে গুণবে ?

রোহক খাবার জন্য তার বাবাকে ডাকতে এসেছিল। রোহক তার বাবার সঙ্গে খায়। বলল, বাবা চল, অনেক বেলা হয়েছে। খাবে।

ভরত গ্রামের অন্য লোকদের সঙ্গে তিল কি করে গুণবে সেকথা ভাবছিল। বলল, যা এখন বিরক্ত করিসনা।

রোহক খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বলল, আমার বুঝি ক্ষিধে পায়না ?

ভরত মুখ তুলে সস্নেহে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই খা-গে যা। আমরা এখন কাজে ব্যস্ত আছি।

রোহক বলল, কাজ ? কোথায় কাজ ? তোমরাত কেবল বসে ভাবছ।

ভরত বলল, ভাবব না ? আজ সন্ধ্যার মধ্যে দশগাড়ীতে কত তিল আছে তা গুণে রাজাকে জানাতে হবে নইলে তিনি আমাদের সকলের মাথা কেটে নেবেন।

রোহক হেসে বলল, এর জন্য এত ভাবনা !

তার মানে ?

মানে খুব সহজ। আজ সন্ধ্যাবেলা তোমরা রাজার কাছে যাবে। গিয়ে বলবে মহারাজ আমরাত নাচিয়ে, নাচ দেখিয়ে বেড়াই, অঙ্ক কষতেত কখনো শিখিনি যে গুণে বলব। তবে মহারাজের আদেশ অমান্যও করা যায় না। তাই যেমন আমরা সব কিছু উপমা দিয়ে বলি, এও তেমনি উপমা দিয়ে বলব। আকাশে যত তারা আছে আপনার এই দশ গাড়ীতে তত তিল আছে। যদি বিশ্বাস না হয় তবে কাউকে দিয়ে গুণিয়ে দেখে নিন।

সে কথা গ্রামবাসীদের মনে নিল। সন্ধ্যেবেলা তারা গিয়ে সেকথা রাজাকে বলল।

রাজা শুনে খুসী হলেন। বললেন, এ উত্তর তোমাদের কার মাথায় এসেছিল— সত্য বলবে।

তারা উত্তর দিল, মহারাজ আমাদের কারু মাথায় নয়, রোহকের মাথায়।

এর কিছুদিন পরেই নটগ্রামে আবার রাজার দূত এল। এবারে দশ গাড়ীতে কত তিল আছে এ ধরণের প্রশ্ন নয়। রাজা বলে পাঠিয়েছেন, তিনি শুনেছেন, নট গ্রামের কাছের শিপ্রার বালি নাকি খুব ভালো। তাঁর একটি দড়ীর দরকার। সেই বালি দিয়ে একটী দড়ী তৈরী করে তারা যেন তাড়াতাড়ি তাঁকে পাঠিয়ে দেয়।

গ্রামের লোক আবার মাথায় হাত দিয়ে বসল। বালির দড়ী—এ যেন সোণার পাথরবাটি। একবার ভাবল রাজার মাথার ঠিক আছে কিনা কিন্তু পর মুহূর্তে ভাবল

নিজের মাথা ঠিক রাখতে হলে সেকথাও রাজাকে আর বলা যায়না। তবে উপায় ?—উপায় রোহক। তাই তারা এবারে গিয়ে রোহককে ধরল।

শুনে রোহক বলল, ঠিক আছে। তোমরা রাজাকে গিয়ে বল, মহারাজ, আমরা ত নট, তাই দড়ী পাকাতে ববে শিখলাম। তবে যখন আপনার আদেশ তখন নিশ্চয়ই পাকাব। কিন্তু এক নিবেদন আছে। রাজ ভাঁড়ারে পুরুণো কত কি জিনিষ থাকে তাই বালির দড়ীও আছে নিশ্চয়। তা যদি একবার আমাদের পাঠিয়ে দেন তবে তাই দেখে নূতন দড়ী পাকিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

তারা গিয়ে সেকথা রাজাকে বলল। শুনে রাজা লজ্জিত হলেন, মনে মনে খুসীও। তবু মনের ভাব ব্যক্ত না করে গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমাদের একথা কে বলতে বলেছে ?

প্রত্যুত্তর এল, রোহক।

তারপর মাসখানেকও অতিক্রান্ত হয়নি। একদিন সকালে নটগ্রামে রাজার হাতী এসে উপস্থিত হল। সুন্দর সুঠাম হাতী নয়, বৃদ্ধ অসুস্থ জরদগব হাতী, এই মরে কি সেই মরে। দূত বলল, গ্রামের খোলামেলা হাওয়ায় হাতীটি ভালো থাকবে বলে রাজা একে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমরা একে ঘাস, পাতা, ধান খাইয়ে ভালো করে তুলবে ও রোজ সন্ধ্যেবেলা হাতী কেমন থাকে রাজাকে গিয়ে জানিয়ে আসবে। কিন্তু সাবধান! এটি রাজার খুব প্রিয় হাতী। তাই হাতী মরে গেলেও মরে গেছে একথা কখনো কেউ গিয়ে রাজাকে বলবে না। বললে রাজা তাকে কঠোর সাজা দেবেন।

রাজার আদেশ, তাই গ্রামবাসীরা কি করে! হাতীকে তারা ঘাস, পাতা, ধান খাওয়ায় ও রোজ সন্ধ্যেবেলা রাজাকে গিয়ে জানিয়ে আসে, হাতী কেমন আছে। কিন্তু সেই হাতী ভালো হওয়াত দূরের ক্রমশঃ খারাপ হতে হতে একদিন মরে গেল।

এখন উপায় ? হাতী মরে গেছে সেকথা রাজাকে জানানো যাবে না ? অথচ কেমন আছে জানাতে হবে। তারা যখন অনেক ভেবে চিন্তেও কিছু ঠিক করতে পারল না তখন রোহককে ডেকে পাঠাল।

সমস্ত শুনে রোহক বলল, এর জন্য কোনো ভাবনা নেই। তোমরা রাজাকে গিয়ে বলবে, মহারাজ, হাতী ত আজ উঠছে না, বসছে না; খাচ্ছে না, দাচ্ছেনা ; নড়ছে না, চড়ছে না ; এমন কি নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিচ্ছে না।

তখন রাজা বলবেন, তবে কি হাতী মরে গেছে ?

তোমরা বলবে, মহারাজ, তার আমরা কি জানি। সেত আপনিই বলতে পারেন।

গ্রামবাসীরা রোহক যেমন বলেছিল ঠিক ঠিক সেই রকম বলল।

শুনে রাজা চুপ হয়ে গেলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, তোমাদের একথা কে বলতে বলেছে—রোহক?

হ্যাঁ মহারাজ।

তারপর অনেকদিন রাজার লোক আসে না। গ্রামের লোকও একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে—ঠিক এমন সময় আবার একদিন রাজার লোক এল। এবারে রাজা বলে পাঠিয়েছেন—তিনি নিজে নটগ্রামে আসবেন। তারা যেন রাজার বসবার জন্য একটা সুন্দর ছোট্ট মণ্ডপ তৈরী করে রাখে। তবে সেই মণ্ডপের ছাদ হবে, নটগ্রামের বাইরে পাথরের যে শিলা পড়ে রয়েছে সেই শিলা দিয়ে। কিন্তু মনে রাখবে সেই শিলা ওখান হতে সরানো যাবে না।

শুনে গ্রামের লোকেদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। শিলা না সরিয়ে তা দিয়ে তারা মণ্ডপের ছাদ করবে কি করে?

বারবার তিনবার রোহক তাদের বাঁচিয়েছে। এবারো সেই তাদের বাঁচাবে। তাই তারা রোহককে ধরল।

সমস্ত শুনে রোহক বলল, তোমরা এক কাজ কর—ওই শিলার চারপাশের মাটি দেড় মানুষ পরিমাণ কেটে ফেল।

তারা তাই কেটে ফেলল।

রোহক বলল, এবারে শিলার চারকোণে চারটী থাম দিয়ে মাঝের মাটি কেটে নাও।

থাম দিয়ে মাটি কেটে বার করতেই গ্রামের লোকেরা দেখল যে সেখানে একটী সুন্দর মণ্ডপ তৈরী হয়ে গেছে। তখন তারা নাচতে নাচতে রাজকে গিয়ে সেই খবর দিয়ে এল।

রাজা সমস্ত শুনে সেই মণ্ডপ দেখতে এলেন। দেখে খুসী হলেন। বললেন, কার বুদ্ধিতে এ মণ্ডপ তৈরী হয়েছে?

সকলে বলল, রোহকের।

রাজা তখন রোহককে রাজধানীতে আসতে বললেন। তবে সে যেন না শুক্লপক্ষে আসে না কৃষ্ণপক্ষে, না দিনে আসে না রাত্রে, না আলোয় আসে না ছায়ায়, না আকাশ দিয়ে আসে না পায়ে হেঁটে, না পথ দিয়ে আসে না বিপথ দিয়ে, না স্নান করে আসে না স্নান না করে।

রোহক পণ্ডিতের কাছে গিয়ে পাঁজি দেখাল তারপর অমাবস্যা নেমে প্রতিপদ লাগা এক সন্ধ্যায় গলা অবধি স্নান করে চালুনির ছাতা মাথায় দিয়ে ম্যাড়ার

পিঠে চড়ে রথের চাকার দাগের মাঝখান দিয়ে রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হল। রাজা, দেবতা ও গুরুর কাছে খালি হাতে যেতে নেই বলে সে যাবার সময় এক ড্যালা মাটি তুলে নিয়েছিল। সেই মাটির ড্যালা রাজার সম্মুখে রেখে রাজাকে প্রণাম করল।

রাজা বললেন, রোহক, এ তুমি কি এনেছ?

রোহক বলল, মহারাজ, আপনি পৃথ্বীপতি তাই আপনার জন্য পৃথ্বী এনেছি।

উত্তর শুনে রাজা খুসী হলেন ও তাকে নিজের কাছে রেখে তার লেখা পড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ভবিষ্যতে রোহক মন্ত্রী হয়ে যে খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল সে কথা আর বলতে হবে না।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. V No. 3 : Sraman : July 1977

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

পরলোকগত পূরণচাঁদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদ্গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈন ধর্ম সম্বন্ধে, কলেজে অধ্যয়নকালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি বিশেষ পরিমাণে সচেতন হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখার বইখানি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ । ১৩৮৪ পঞ্চম বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
পঞ্চম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮৪ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

পাহাড়কাটা আদিনাথ মূর্তি
শত্রুঞ্জয়, পালিতানা

নির্গ্রন্থ
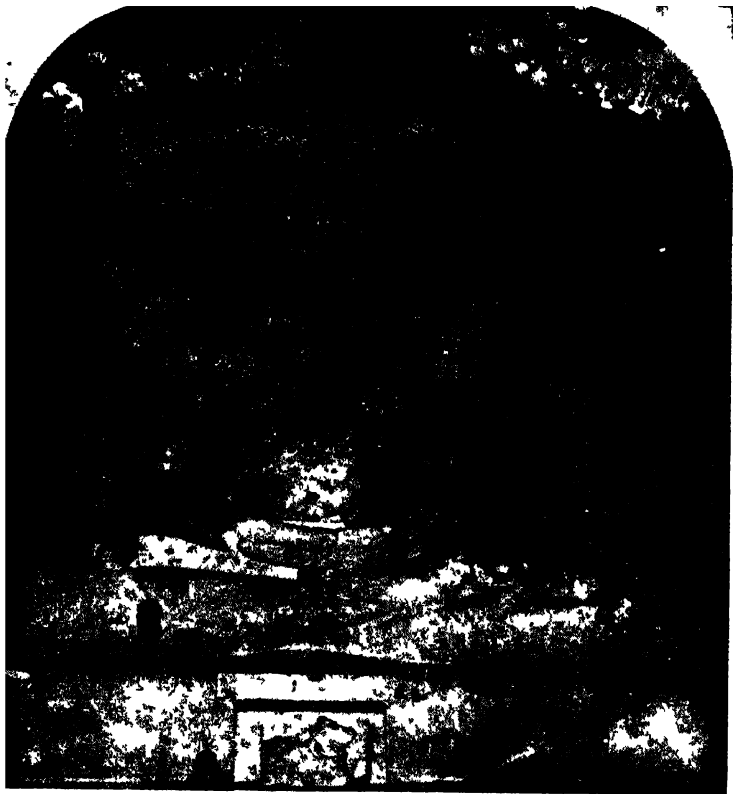
শ্রীকন্‌হৈয়ালাল সেঠিয়া

[বন্ধুবর শ্রীকন্‌হৈয়া লাল সেঠিয়া রাজস্থানের এ যুগের একজন প্রখ্যাত কবি। হিন্দীতে, রাজস্থানীতে এমন কি উর্দুতেও তিনি কবিতা লিখেছেন। সে কবিতা প্রাণোচ্ছল, রসঘন ও সহৃদয় সঞ্চারী। তাঁর মাটি ও দেশপ্রেম নিয়ে লেখা কবিতা রাজস্থানের লোকের মুখে মুখে। সম্প্রতি তাঁর রাজস্থানী ভাষায় লেখা 'নীল টঁাস' সাহিত্য একাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। কিন্তু সেহ বাহ্য। তাঁর কবিতা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজ অশব্দের প্রায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যা সামান্য ক'টি ছত্রে, এক আধটী চিত্রকল্পে এক নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় যেখানে মানুষ নিজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, নিজের সত্বার পরিচয় লাভ করে। শাস্ত্রে যে 'কবির্মনিষী'র কথা বলা হয়েছে মনে হয় এ যেন ঠিক সেই। ভাষা সূত্রধর্মী অথচ ভাব সর্জনায় সূত্রের মতই অতল গভীর। তার তল আর পাওয়া যায় না কারণ যখন পাওয়া যায় তখন 'ভাষা' আর থাকে না, 'তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি' হয়।

সম্প্রতি মহাবীরের ২৫০০তম নির্বাণ উপলক্ষে মহাবীরের ওপর কয়েকটী কবিতা রচনা করেছেন শ্রী সেঠিয়া। সেই কবিতা ও সমধর্মী আরো কিছু কবিতা নিয়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'নির্গ্রন্থ' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সেই কাব্যগ্রন্থের ষোলটী কবিতার বঙ্গানুবাদ 'শ্রমণে'র পাঠকের জন্য আমরা এখানে উপস্থিত করছি। —সম্পাদক]

১

পড়ল না চাপা
আড়াই হাজার বছরের
আবর্জনার তলায়
মহাবীর ;
ছড়িয়ে গেল
ছুঁয়ে
মন্বন্তর সংবৎসর ;
হল
চিতিই স্থিতি,
নিমজ্জিত মহাধ্যানে
কালের কোলাহল,
নিরাবরণত্বের দর্পণ
এই মহাকাশ ;
হল না গ্রথিত
পরিপ্রেক্ষীর গ্রন্থিতে
কেবলী[১] নির্গ্রন্থ।

২

লড়তে রইলে
অর্হৎ হওয়া পর্যন্ত
একেলাই যুদ্ধ,
সইতে রইলে
নিজেই সংঘর্ষের বেদনা,
কারণ
দেবতাদের হাতে আছে
কেবল উপসর্গ[২]
ও দুন্দুভি।

১ কেবল অর্থাৎ নিরাবরণ, বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ জ্ঞান—এরূপ জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষকে কেবলী বলা হয়।

২ সাধন অবস্থায় দেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট বিঘ্ন।

৩

ভেঙে

পুরনো অলঙ্কার

গড়োনি

নূতন কোন আভরণ,

অস্বীকার করে

স্থাপিত মূল্য

রচোনি

নূতন কোন মূল্য বোধ,

কেবল দিলে

রাগ-বিমুক্ত দৃষ্টি,

হল

অনেকান্ত[৩]

সত্যের মুক্তি।

৪

কেউ

বিলোয় ফল,

কেউ ফুল,

কেউ কিশলয়,

কিন্তু বেলা পড়তে

লাগে ঝরতে শুকোতে

পচতে ;

তুমি এলে

বিলোলে বীজমন্ত্র

'অনুকম্পা' ;

---

৩ বস্তুকে দৃষ্টি কোণ হতে দেখার পদ্ধতি। একান্ত আগ্রহে বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয় না।

বললে, হও
আত্মার মালী,
বাঁচ কষায়[৪] হতে,
বাঁচবে বনের
সবুজ গাছ গাছালি।

৫

তুমি জন্মেছিলে রাজকুলে,
পালিত হলে ঐশ্বর্যের মধ্যে,
সেকথা বারবার বলতে ক্লান্ত হয় না
তোমার শিষ্য ও ভক্তরা ;
যা হতে তুমি মুক্ত
তা দিয়ে তোমার পরিচয়
দিয়ে এসেছে তারা
আজ পর্যন্ত,
রাগের পরিপ্রেক্ষীতেই
বৈরাগ্যের মূল্যাঙ্কন
এখন ছাড়তে হবে,
ছাড়তে হবে এই কঞ্চুকের মোহ,
অন্যথায় বলবে
যুগ চেতনার সংবাহক
তথা কথিত অকুলীন ও অকিঞ্চন
ছিল অবাধ ভোগের
প্রতিক্রিয়ামাত্র
মহাবীরের দেশনা।[৫]

৬

করে দেবে
তিরোহিত
মন্বন্তরের সঞ্চিত তমঃ
প্রকাশের একটি মুহূর্ত,

৪ ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ।
৫ উপদেশ।

হোতেই স্ব-র স্ফূরণ
ভেঙে যাবে

নয়ত গভীর অসতের মূল,
পুরুষার্থের হাতে
পথ শ্রেয়র,

গতিতে
মাইলের শেষ প্রস্তর
সিদ্ধ শিলা।[৬]

৭

করলে না তুমি
মহাভিনিষ্ক্রমণের জন্য
কারো ঘুমের প্রতীক্ষা ;
নিজে জাগলে,
জাগালে চারিদিক,
দিলে বোধ—
সংযোগ বিয়োগ
প্রতিক্রিয়া
নেই তাদের
আপন কোন অস্তিত্ব.
সংবেদনা
মরীচিকা পুদ্গলের,[৭]
আত্মার গুণ
নির্বেদ।

৬ লোকের শার্ষভাগস্থিত চন্দ্রাকৃতি পৃথ্বী যেখানে মুক্তাত্মারা অবস্থান করেন।
৭ জড় পদার্থ।

৮

জানান দিল
স্বপ্ন
তোমার আগমনের,
পেল
নিরর্থকতা
নূতন অর্থ,
খোলা চোখ
বর্তমান
বন্ধ চোখ
ভবিষ্যৎ।

৯

জ্বাললে না
ধুনী,
জ্বললে
নির্ধূম অন্তস্তূপে,
দিলে
কর্মকাষ্ঠের হবিঃ,
প্রকটিত হল
চেতনার আঁচতে
হিরণ্য পুরুষ।
হল
স্ব-ই সমগ্র।

১০

ছিল তোমারই
নিষ্কাশিত ক্রোধ
চণ্ড কৌশিক,[৮]

---

৮ সর্প। কাহিনী: সর্প দংশন করলে মহাবীরের ক্ষতস্থান হতে দুগ্ধ নির্গত হয়, বিষের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

ছাড়ান বিবর
ভোলেনা বিষধর
করল দংশন
কিন্তু ছিল সেথায়
'কেবল'
ছড়াবে কোথায়
গরল ?

১১

রচে অনেক উপসর্গ
হেরে গেল
অন্ধ বিশ্বাসের অগ্রণী
শূলপাণি,[৯]
আধি-ব্যাধি
পারল না করতে ভঙ্গ
অভঙ্গ সমাধি।
প্রাপ্ত ছিল ভাব মোক্ষ,[১০]
ছিল কেবল
কর্ম ভোগে অনুবন্ধিত
দ্রব্য মোক্ষ।[১০]
ফিরে গেল যাতনার
শত ফণা ঊর্মি।
রইল অচঞ্চল চেতনার তল,

৯ যক্ষ। কাহিনী: মহাবীর যখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন শূলপাণি নানা ভাবে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করবার চেষ্টা করে কিন্তু ধ্যান ভাঙতে সমর্থ হয় না।

১০ বন্ধহেতুর অভাব ও সমস্ত কর্মের আত্যন্তিক ক্ষয়ই মোক্ষ। ক্ষয়িক জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রাদি রূপ যে পরিণামে নিরবশেষ কর্ম আত্মা হতে বিযুক্ত করা হয় সেই পরিণামকে ভাব মোক্ষ বলে ও সম্পূর্ণ কর্ম আত্মা হতে পৃথক হওয়াকে দ্রব্য মোক্ষ বলে।

হল উৎক্রান্ত
ধ্যানের উৎকর্ষ,
সহজেই পৌঁছে গেলে
তের গুণস্থানে।[১১]
খুলে গেল বন্ধন,
হলে সর্বজ্ঞ
হল অনুভূত
কৈবল্য।

১২

করলে
সমূহের ভাষায়
অনুভূতকে অভিব্যক্ত,
হল
সত্যকে শুনবার
সম অবসর
সমবসরণ,[১২]

---

১১ যে প্রক্রিয়ায় আত্মা নিম্নতম অবস্থা হতে ক্রমশঃ উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হয় তা গুণস্থান ক্রমারোহের বিষয়। যদিও জ্ঞান-দর্শন চারিত্রের শুদ্ধি ও অশুদ্ধির তারতম্যের ওপর তা অসংখ্য প্রকারের তবু বোঝাবার সুবিধার জন্য তাকে চৌদ্দটী ভূমিকায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ গুণস্থান শেষ গুণস্থানের পূর্ববর্তী। যেমন নির্মেঘ পূর্ণিমা রাত্রে চাঁদের সমস্ত কলা প্রকাশিত হয়, ত্রয়োদশ গুণস্থানে স্থিত পুরুষের তেমনি আত্মিক চৈতন্য, জ্ঞান, দর্শন, আনন্দ প্রভৃতি গুণাবলী পরিপূর্ণরূপে বিকসিত হয়। এই গুণস্থানকে সযোগী কেবলী গুণস্থান বলে। নিরাবরণ, বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ জ্ঞান বিকশিত হয় বলে কেবলী, কিন্তু কতকাংশে মন, বচন ও কায়ার প্রবৃত্তি থাকে বলে সযোগী। এই অবস্থাকে যোগদর্শনের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

১২ তীর্থংকরের উপদেশ দেবার স্থান।

বিলোলে
রত্নত্রয়,[১৩]
হল উদ্ভাসিত
দিব্য অতিশয়ে[১৪]
আত্মার
অনন্ত চতুষ্টয়।[১৫]

১৩

জ্ঞানের নবনীত,
দর্শনের অমৃত,
চারিত্রের কৌস্তুভ মণি,
তপের উপলব্ধি,
ভূতির বিভূতি,
কৈবল্যের ভূমিকা,
অপরিগ্রহ;[১৬]
এই শতদল
পাপড়ি
ব্রত যম নিয়ম
ইতি
অথ সংযম।

১৪

নয় কোনো
যাচকের প্রার্থনা

১৩ সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র। পদার্থের প্রকৃতস্বরূপ যথাযথ রূপে স্থির করার রুচিকে সম্যক দর্শন বলে। সম্যক দর্শন হলে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয়। সম্যক দর্শন ও সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হবার পর সংযমাদি চারিত্রকে সম্যক চারিত্র বলে। এই তিনটিকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। উমাস্বাতি এদের মোক্ষমার্গ বলেছেন।

১৪ শাস্ত্রে তীর্থংকরের নির্মল শরীর, স্বেদরহিততা, আদি ৩৪ প্রকার বিশেষ গুণের যে উল্লেখ আছে তাকে অতিশয় বলা হয়।

১৫ অনন্ত চতুষ্টয় চার প্রকার: অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্য।

১৬ পঞ্চম মহাব্রত—বিষয়ে আসক্তিহীনতা, নির্মমত্ব।

যে দেবতা
পূর্ণ করুন 'কামনা,
নয় কোনো
সম্ভ্রমের আবেদন
যে ইন্দ্র করুন
রিপুর হনন।
কেবল প্রণতি
তাঁদের
যাঁরা অরিহন্ত,
যাঁরা সন্ত,
হোক না তাঁদের
যে কোন ধর্ম,
যে কোন পন্থ,
মাত্র সমর্পণের
বর্ণমালা
ণমোকার মন্ত্র।[১৭]

১৫

·নয় হিংসার
নঞ্ অর্থক বোধ,
অহিংসা
এক মৌলিক তত্ত্ব,
চিন্তনীয় যাতে
দৃষ্টির-ও পরে
দর্শন,
জীবনের-ও পরে
আত্মা,

১৭ নমস্কার মন্ত্র। অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায় ও সমস্ত লোকের সমস্ত সাধুকে যেখানে নমস্কার করা হয়।

যার
মীমাংসা
অনেকান্ত,
ভূমিকা
সর্বোদয়।

১৬

করো গ্রন্থি হতে মুক্ত আমায়
বীতরাগ ভগবন্ত!
জ্ঞান গৌণ, দর্শন অনুরঞ্জন,
সবার ওপর চারিত্র।
আত্ম ধর্মের মর্ম বোঝাও
জীবন হোক পবিত্র,
যেন নিজের ওপর অনুকম্পা করি
ধরি তোমার পন্থ।
পারি নাই হতে নবনীত আজো,
কবে হতে মথি তক্র?
কর সমগ্র, যাক ভেঙে যাক
জনম মরণ চক্র,
যাতনা যে দেয় জনম জনমের
বদ্ধ কর্ম অনন্ত।
নেই সমন্বয় আপনার সাথে,
ছলনা আমার ছন্দ,
পূর্ণত নয় সংবেদন, চলে
প্রিয় অপ্রিয় দ্বন্দ্ব,
দাও সমত্ব, বুঝি যে তত্ব
কৃপা সিন্ধু অরিহন্ত!

সমগ্র 'নিগ্রর্ন্থ' কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীগণেশ লালওয়ানী।
বইটী প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

জৈন চিত্রের বিকাশ

শ্রীঅজিত ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

তিন যুগের প্রতিমূর্তির মস্তকের আদর্শ বিভিন্ন ছিল। আদিম যুগে প্রতিমূর্তির মুখের পার্শ্বচিত্রই প্রদর্শিত হইত, মধ্যযুগে মোগলরীতি অনুসারে অঙ্কিত সুস্পষ্ট বহিঃরেখাবিশিষ্ট প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হইত এবং শেষ যুগে রাজপুত অঙ্কন পদ্ধতি অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের মুখ বর্তুলাকার করিয়া পুরুষদিগের মুখ গাল-পাট্টা দাড়ির দ্বারা আবৃত করা হইত।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতিকে আমি জৈন শিল্পের 'আদিম যুগ' নামে অভিহিত করিয়াছি। কারণ এগুলি সুপ্রাচীন কালের, এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়না। একরূপ লোপ পাইযাছে বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এযুগের পুথির চিত্রগুলির সমতা আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একরূপ, তবে যেটুকু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা শিল্পীর চাতুর্যের জন্যই। এ যুগের শিল্পের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে এবং বোস্টন মিউজিয়ামের চিত্র ও আমার সংগৃহীত চিত্র প্রাপ্ত চিত্রগুলির মধ্যে আর্টের দিক হইতে যাচাই করিলে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হয়। দেবকার্য সম্পর্কীয় চিত্রগুলির সুন্দর নমুনা এযুগের চিত্রে ও তীর্থংকর দিগের প্রতিমূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, 'জৈন শিল্পীরা আনুষ্ঠানিক বিধি ব্যবস্থাগুলির এরূপভাবে অনুসরণ করিত যে হাজার বৎসরের ভিতর যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাদের ভিতর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।'[৮] এ যুগের নমুনা জৈন দিগের পিত্তল ও স্ফটিকের প্রতিমূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

॥ সুসজ্জীকরণের উপযোগিতা ও শিল্প পদ্ধতি ॥

জৈন চিত্রে শিল্প পদ্ধতির সৌন্দর্য ছাড়াও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য (intrinsic charms) আছে। এগুলির ড্রইং সাধারণতঃ আড়ষ্ট ও অনমনীয়। কিন্তু লালিত্য ও প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় এবং নীল ও শ্বেতবর্ণ উজ্জল স্বর্ণাভ ও রক্তাভের মধ্যে থাকে বলিয়া নেত্রতৃপ্তিকর। উজ্জল স্বর্ণ ও রক্তবর্ণ শিল্পীর পরিকল্পনার মূল। চিত্রগুলির অবয়ব ও প্রত্যেক অলঙ্কারখানির সুসমঞ্জস অবস্থান দেখিয়া মনে হয় শিল্পরা ইহা সুসজ্জীকরণ বিদ্যার (decorative art)

---

৮ V. Smith ; *A History of Fine Arts in India & Ceylon*, pp. 267-68

সহজ জ্ঞান (instinct) বশেই করিয়াছেন। এগুলিতে বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। ইহাদের শিল্প পদ্ধতি কাহারও নিকট হইতে গৃহীত নয়। ইতিহাসে ইহাদের পূর্বে এ পদ্ধতির চিত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না। এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছিল তৎকালের শিল্পীরাই। শিল্পীরা বোধহয় এইরূপ ভাবেই পুথির উপর চিত্র আঁকিতেন—পত্রের যেটুকু স্থানের ভিতর চিত্রটী অঙ্কিত করিতে হইবে তাহা গলিত স্বর্ণ কিংবা স্বর্ণের পাত দিয়া মুড়িয়া ফেলা হইত।

পট ভূমিকার উপর গাঢ় রক্ত বর্ণে ও রঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত করা হইত। তৎপরে চিত্রের পরিকল্পনা মত শিল্পী সুবর্ণের চিত্র অঙ্কিত করিত।

গলিত স্বর্ণ ব্যবহারে শিল্পীরা যে সংযম দেখাইয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ ও বিস্ময়কর। কাঙ্গড়া ও পাহাড়ীশিল্পের যুগ পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় শিল্পী যেভাবে সুবর্ণের ব্যবহার করিত, তাহাতে তাহাদের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এ যুগের পারস্য দেশের চিত্রেও সুবর্ণের প্রয়োগ অধিকমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জৈন দিগের চিত্রের মতো তাঁহাদের চিত্রে সুবর্ণ চিত্রখানিকে প্রভাবান্বিত করে নাই। রেখা চিত্র, চক্ষু, চক্ষুপল্লব, কর্ণ, অঙ্গুলী প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত হইত। এ ভাবে জৈন চিত্রগুলি অঙ্কিত হওয়ায় নরনারীর মুখ-মণ্ডল, পোষাক-পরিচ্ছদ, পুষ্পের সাজসজ্জা ও অন্যান্য সজ্জা সুবর্ণের সহিত এক রঙা দেখাইত (appear as if painted flat with gold)। নাসিকার পার্শ্বচিত্র প্রায়শঃ অঙ্কিত হইত না এবং সময় সময় রক্তবর্ণে অঙ্কিত হইত। গোলাকার দ্রব্যের চিত্রে ছায়া (shade) শিল্পীরা দিত না, এমন কি আলো-ছায়ার (light and shade) ব্যবহার তাহারা যে জানিত তাহার নিদর্শন তাহাদের চিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতনা। এরূপ ব্যবহার না জানিলেও চিত্রগলি নমনীয় ছিল। রেখান্যাসের শিল্প কৌশলে (drawing of the contour) চিত্রগুলি অঙ্কিত হইত বলিয়া সময়ে সময়ে মনোরম হইত। আবার কখনও কখনও অস্বাভাবিক চিবুকের আয়তন বৃদ্ধি দ্বারাও সুন্দর হইত এবং যেখানে মুখমণ্ডলের পার্শ্ব চিত্র প্রদর্শিত হইত, সেখানে শিল্পী দুই চক্ষু অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিত যে, সে সমতল জিনিসের চিত্র অঙ্কিত করিতেছে না। ফলে স্বভাবতঃ দর্শকের মনে কৌতূহলের উদ্রেক হইত, কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যাইত যে শিল্পী চিত্রখানিকে নমনীয় করিয়া অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু অঙ্কিত করায় শিল্পীর চিত্র কতকটা অস্বাভাবিক হইত। চিত্রগুলি সরলভাবে অঙ্কিত করিবার জন্য তাহারা এইরূপ করিত। চিত্রখানির অঙ্কন এখন একরূপ সম্পূর্ণ হইল; শিল্পী এখন তূলির সাহায্যে পোশাকের অংশবিশেষ ও নরনারীর অবয়েবর প্রান্তরেখা নীলবর্ণে ও জীবজন্তুর গাত্র গাঢ় নীলবর্ণে রঞ্জিত করিল।

সুবর্ণ যখন চিত্রে লাগাইত তখন কতকাংশ শিল্পী ইচ্ছা করিয়াই কিংবা না জানাইয়াই সাদা রাখিয়া দিত। সন্ন্যাসী দিগের পোষাক শ্বেতবর্ণের হইত। কখনও কখনও শিল্পী পঞ্চম প্রকারের রঞ্জক (pigment) গাঢ় তাম্রমল (deep verdigris) ব্যবহার করিত। ইহা ছাড়া অন্য কোনো বর্ণ শিল্পীরা পুথির চিত্রে ব্যবহার করিতনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পরবর্তীকালে পুথির চিত্রে সুবর্ণের স্থলে হরিদ্রা বর্ণ ব্যবহৃত হইত। রক্তবর্ণের পাদ ভূমিকার স্থলে নীলবর্ণের পাদভূমিকা হইত।

প্রাচীন যুগে রক্তবর্ণের জন্য হিঙ্গুল ব্যবহৃত হইত। তৎপরে সিন্দূর ব্যবহৃত হইত। নীলবর্ণের জন্য নীলোপল (lapis lazuli), মুক্তার মত শ্বেতবর্ণের জন্য শ্বেত বর্ণের খনিজ পদার্থ সম্ভবতঃ সূক্ষ্ম সাদা বালি (ka-o-lin), হরিদ্রাবর্ণের জন্য হরিতাল, সবুজ বর্ণের জন্য malachite নামক হরিদ্বর্ণ খনিজ পদার্থ বিশেষ ব্যবহৃত হইত। হরিতাল ভিন্ন এই সকল খনিজ পদার্থ গুজরাত ও রাজপুতানার খনি এবং হরিতাল কুমায়ূন পর্বতের খনি হইতে পাওয়া যাইত। হিঙ্গুল ও নীলোপল বিদেশ হইতে রপ্তানী হইত।

জৈনদিগের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিকৃতিতে বেশ সামঞ্জস্যের ভাব লক্ষিত হয়। সৌধ-শিল্পের সুসজ্জীকরণের রীতিগুলিও এ সব চিত্রে বেশ সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অনেকগুলির পরিকল্পনায় স্থপতিশিল্পের রীত্যনুসারে সুন্দর গৃহাদির অংশ বিশেষ সংস্থাপন করিত। সুন্দর সুসজ্জিত পূজার্চনার স্থানে সাধু পুরুষদিগকে বসান হইত; অনেক স্থলে সূক্ষ্ম কারুকার্যযুক্ত সিংহাসন, কৌচ ও মণিমাণিক্যখচিত আস্তরণ প্রাচীন পুথির পাতায় দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রে সুন্দরভাবে পুষ্পের কারুকার্য দেখা যায়। জীবজন্তু বা পক্ষী, বিশেষতঃ সুবৃহৎ স্বর্ণের হংস চিত্রের ধারে অঙ্কিত হইত এবং কখনও কখনও জৈনদিগের অষ্ট প্রতীকের চিত্রও অঙ্কিত হইত।

॥ ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিকৃতিগুলি সাময়িক সচিত্র লেখ্য ॥

হারিরি পুথি সম্বন্ধে মার্টিন যাহা বলিয়াছেন, "এগুলি না থাকিলে সে সময়ের পরিচয় যৎসামান্য পাইতাম" এ ক্ষেত্রেও তাহা সত্য। সে-সময়ের শিক্ষা ও সভ্যতার বিষয় ইহা হইতে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা অমূল্য। এগুলি হইতে রাজসভার চিত্র, গার্হস্থ চিত্র, যুদ্ধের চিত্র ও ধর্মজীবনের চিত্র বেশ সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায়। সময়োপযোগী রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, স্থাপত্য ও আসবাবপত্রের নিদর্শনও পাওয়া যায়।

॥ ইহার দোষ সমূহ ॥

এসব চিত্রে শিল্পীর নিকট হইতে চিত্রিত ব্যক্তির চরিত্র-চিত্র পরিস্ফুট করা আশা করা যায় না। বাস্তবিক সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী, রাজারাণী, যোদ্ধা ও নরনারীর চিত্র যেন একই ছাঁচে ঢালা। প্রত্যেকটীই একটী আদর্শের অনুযায়ী, ব্যক্তিত্বের ছাপ তাহাতে

বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ণবহুল এসব চিত্র বহিরঙ্গের (formal) —এগুলিতে অনুভূতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর অনুভূতির বিকাশ দেখিতে না পাইলে চিত্র শিল্পের মধ্যেই স্থান পায় না। জৈন আর্টের মত মোগল আর্ট'ও এই কারনে দোষবহুল, যদিও উভয় আর্টের মধ্যে পার্থক্য আছে। জৈন আর্টিস্টদের চিত্রে মনস্তত্বের ও ধর্মতত্বের ভাবভঙ্গী বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাধু সন্ন্যাসীদের জীবন চরিত ব্যাখ্যা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। শিল্পীর দূরদৃষ্টি যদিও অনেক কঠিন দৃশ্যের চিত্র (যেমন উজ্জয়িনীর অবরোধ চিত্র, মহাবীরের চূড়াকরণ চিত্র, যাহা প্রত্যেক কল্পসূত্রের পুথিতেই দেখিতে পাওয়া যায়) অঙ্কিত করিয়াছে, তথাপি বলিতে হইবে চরিত্র চিত্রণে কবির মতই শিল্পী ব্যাখ্যা করিয়াছে। অনুভূতির বিকাশের আরম্ভ এই সময় হইতেই হইয়াছে; রাজপুত, বিশেষতঃ কাঙ্গড়া চিত্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই অনুভূতির বিকাশে।

॥ ডাঃ কুমারস্বামীর মতের আলোচনা ॥

ডাঃ কুমারস্বামী সম্প্রতি বলিয়াছেন: 'এ শিল্প নক্সানবীশের চিত্র; মহাকাব্যের ঘটনার উজ্জ্বল বিবৃতি (যেমন মহাবীরের চরিত্র, বুদ্ধচরিত্র ঘটনার বিবৃতি মাত্র), যেখানে প্রত্যেক ঘটনাই অনন্তের দিক হইতে চিত্রিত হইয়াছে।'[৯] ইহাকে উৎসাহ জনিত অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তাঁহার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন—'ইহাকে কেবলমাত্র নক্সা বলিলে, বুঝিতে হইবে ইহা প্রতীকের শিল্প ও ইহা অঙ্কিত করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়।' (To call this pure drawing, implies that it is an art of symbols and indifferent to representation.)[১০] কল্পনা বলে এরূপ চিত্র প্রকাশের চেষ্টা কখনও হয় নাই বা ইচ্ছা করিয়া প্রকাশের চেষ্টা হয় নাই তাহা বলা যায় না, যাহা হইয়াছে তাহা হইতে ইহাই বলা যায় যে চিত্রগুলি আদিম যুগের ও বালকের চিত্রের মত। অঙ্কন সূক্ষ্ম বটে কিন্তু পরিস্ফুট নহে তবে কোমলতারও অভাব নাই। কুমারস্বামী তাঁহার "Introduction to Indian Art"-এ বলিয়াছেন—'এ শিল্প সুন্দর ও তেজস্বী অঙ্কনের পরিচায়ক, সুন্দর হস্তাক্ষরের নিদর্শক্, নমনীয়, অশান্ত, চিন্তা প্রবণ তবে ভাবপ্রবণ নয়।' (This is art of fine and nervous draughtsmanship, caligraphic, facile and restless, intellectual rather than emotional.)[১১] এখানে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন ও Jain Art-এর

৯ *Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Arts,* Boston. pt. iv. p.37

১০ ঐ।

১১ *Introduction to Indin Art,* p. 116.

catalogue-এ স্বীকার করিয়াছেন ইহা সুন্দর হস্তাক্ষরের নিদর্শক নয়। একথা খাঁটি সত্য। কিন্তু calligraphic (সুন্দর হস্তাক্ষরযুক্ত) বুঝাইতে তিনি বলিয়াছেন যে, 'মাধুর্য বা রেখা সম্পাতে মাধুর্য সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়াই করা হয় নাই।' (That is to say elegance or an elegant combination of line is not deliberately sought.)[১২] চিত্রকে সুন্দর হস্তাক্ষরের মত করিতে হইলে যে ইচ্ছা করিয়া মধুর করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই কিংবা কয়েকটী রেখার একত্র মধুর মিলনেই যে ঐরূপ ফলোদয় হইবে তাহা অসঙ্কোচে বলা যায় না। প্রকৃত কথা হইতেছে জৈন চিত্রের রেখাগুলি calligraphic নয়; রেখা পরিস্ফুট ও নম্র প্রবণ। সুন্দর কেলি-গ্রাফিক চিত্রে যে মধুর ছন্দ ও বক্র রেখায় অবাধগতি দেখিতে পাওয়া যায় এ সব চিত্রে তাহা নাই। ডাঃ কুমারস্বামী আরও বলিয়াছেন: 'আদর্শ দেখিয়া এ সব চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। বর্ণসম্পাতও কোন বিশেষ কারণের জন্য হয় নাই। ইচ্ছা করিয়া বর্ণসম্পাত হয় নাই বলিয়া মধুর হইয়াছে।'[১৩] এখানেও আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। বাস্তবিক জৈন আর্ট সুসজ্জীকরণের (decorative) আর্ট। আদর্শ বা প্যাটার্ণের সংস্রব ইহাতে খুব বেশীই আছে; পরিকল্পনার স্থান এ চিত্রে সর্বাগ্রে, বর্ণের স্থানও ইহাতে বড় কম নয়। সুসজ্জীকরণের সহজ জ্ঞানে জৈন শিল্পী চিত্রের অনাবৃত স্থানগুলি অলংকার দিয়া পূর্ণ করে। তিনি বলিয়াছেন 'সত্য সত্যই শিল্পীর ড্রয়িং গণিত বিদ্যায় সমীকরণের ন্যায় সুসমঞ্জস অথবা রচয়িতার পৃষ্ঠায় শব্দ বিন্যাসের ন্যায়।' (The drawing is, in fath, the perfect equilibrium of a mathematical equation, or a page of a composer's score.)[১৪] এই উক্তি হইতেই কি প্রমাণিত হইতেছে না যে শিল্পী পরিকল্পনায় কুশলী এবং আদর্শের মূল্যও বেশ ভাল বুঝিতেন। ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিতে অলঙ্কারের আবশ্যক, কারণ চিত্রগুলি পুথি সুসজ্জী-করণের জন্যই ব্যবহৃত হইত। সাধারণতঃ লাল রঙের চৌখুপীর দক্ষিণ বা বাম দিকে পুথির পাতায় এগুলি চিত্রিত হইত। কখনও কখনও পাতে দুইখানি চিত্র হইত।

॥ চিত্রিত পুথির পাটা ॥

পুথির ক্ষুদ্র প্রকৃতির মত পাটার চিত্র এক আদর্শের নয়—এক রকমের দৃশ্য এগুলিতে অঙ্কিত হয় না। একই চিত্র সময়ে সময়ে বিভিন্ন পুথিতে স্থান পাইত কারণ জৈন শিল্পীরা মৌলিকতার দিকে ততদূর লক্ষ্য রাখিত না, যতদূর রাখিত

১২ *Catalogue of the Indian Collections, etc.* pt. iv, p. 33.

১৩ ঐ।

১৪ ঐ।

ব্যবহারিক উৎকর্ষ সুসজ্জীকরণের দিকে। যাহা হউক পাটার অথবা আবরণীর বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া যায়—বিষয় বস্তুর ও চিত্রাঙ্কনের পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল চিত্রে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়, কারণ এগুলি জীবন হইতে গৃহীত। চির প্রচলিত আইন কানুনের বন্ধন মুক্ত হইয়া শিল্পী এগুলিতে অঙ্গ ভঙ্গীর লীলা প্রদর্শন করিতে, মাধুর্য, শুচিতা ও রসের সম্যক পরিচয় দিতে পারিয়াছেন।

॥ চিত্রগুলির বিভিন্নতা ও অঙ্কন কৌশল ॥

পুথির আবরণ বা পাটাতন দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর নাম পাথরি (Pathri) ও অপর শ্রেণীর নাম পুথ (Puth)। পাথরির ভিতর পুথিখানি রক্ষিত হয় ও পুথের উপর রাখিয়া পুথিখানি পঠিত হয়। পাথরির আয়ত বোর্ডের আকার ঠিক পুথির মতই। পুরু কাগজে বোর্ড তৈয়ারী হয়। পুথও পুরু কাগজের লম্বায় পুথির অনুরূপ, চওড়ায় পুথির দেড়গুণ বেশী। আটার দ্বারা জোড়া কাগজের এবং চওড়া দিকে এমন ভাবে জোড়া যে উপরের অংশ পুথির চওড়ার সমান ও নীচের অংশ উপরের অংশের নীচে লম্বমান অবস্থায় শিথিল ভাবে থাকে (flap)—এই অংশের দুই দিক খোলা থাকে। ইহার ভিতর পুথিটী রাখিয়া পড়া হয়। বর্তমানে পাথরি ও পুথ দুই-ই বস্ত্র ও সিল্ক দ্বারা জড়াইয়া রাখা হয়। সুবর্ণের সূত্র দ্বারা কিম্বা নানা বর্ণের চিত্রিত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা অথবা মুক্তাফল (seedpearl) দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

আমি যে সকল পুথির আবরণ দেখিয়াছি তাহার অধিকাংশই পুথ শ্রেণীর। উভয় শ্রেণীর চিত্রিত পাটার উপর একই প্রথায় চিত্র অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কাগজের বোর্ড মোটা কাপড়ে মোড়া হয়। তারপর ঐ কাপড়ে হয় কলি চুণ, না হয় gypsum নামক খড়িমাটির ন্যায় খনিজ দ্রব্য বিশেষ লাগান হয়। এই শেষোক্ত পদার্থ গুজরাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার উপর অঙ্কন কার্য আরম্ভ হয়। রঙ করা হইত ধূনার ন্যায় গাছের নির্যাস হইতে। আবার ইহার দ্বারা পালিশ কার্যও হইত। রঙের জলুস ইহাতে বাড়িত ও ইহাকে চাকচিক্যশালী করিত। এই সম্বন্ধে দুইটী ভুল সাধারণতঃ লোকেরা করিয়া থাকে, উহা সংশোধন করা আবশ্যক। একটী হইতেছে এগুলি কাগজের মণ্ড (papier-mache) যাহা হইতে বাক্স, খেলনা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়, তাহা নয় এবং দ্বিতীয়তঃ এগুলি লাক্ষা চিত্র নয়। পুথের উপরের অংশ ও মলাটের ভিতরের দিকে শোভাজনক আবরণ চিত্রিত হইত এবং শেষোক্ত দিকে মঙ্গল জনক অষ্ট প্রতীকের চিত্রই অধিকাংশ স্থলে থাকিত।

মলাটের চিত্রগুলির বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিগুলির মত ছিলনা; ইহার একটী কারণ হইতে পারে রঙের সহিত কলিচুণ মিশ্রিত হইয়া রঙকে ফিকা করিয়া

নিত, অপর একটী কারণ হইতেছে প্রাচীন ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিগুলিতে খনিজ রঙ ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তাহার স্থলে রক্তোপল (ochre) এবং ভেষজ রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হইত। ইহাও আমরা অনুমান করিতে পারি যে, প্রাচীনকালে যেরূপ যন্ত্র লইয়া রঙ প্রস্তুত হইত পরবর্তীকালে সেরূপ যন্ত্রের সহিত তাহা হইত না।

॥ জৈন চিত্রের উৎপত্তি ॥

জৈন চিত্রের উৎপত্তির সঠিক সংবাদ এক্ষণে আমরা দিতে পারি নাই। এগুলি সম্বন্ধে জারনাথ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিনা। তাঁহার মতে এ চিত্র প্রাচীন পাশ্চাত্যদিগের চিত্র হইতে গৃহীত। আমার মনে হয় প্রাচীন চিত্র হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক এমন কি তাহার পরবর্তী সময়ের চিত্রগুলি দেশের চিত্র হইতেই গৃহীত। এ চিত্রে যাজক সম্পর্কীয় ভাবধারায় বিকাশপ্রাপ্ত অঙ্গ ভঙ্গী বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই জৈন শিল্পে সংরক্ষণ শীলতার পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট। একখানি চিত্র ঠিক অপর একখানি চিত্রের অনুরূপ। জৈন সাধুদিগের চরিত্রের ঘটনা লইয়া চিত্রগুলি অঙ্কিত হওয়ায় চিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় নাই। এই নিয়মানুগ (formal), নীরস (frigid) আর্টে শিল্পীর স্বাধীনতা ছিলনা, ফলে কল্পনার অবাধ গতি বা তুলিকার অব্যাহত গতি না থাকায় চিত্রগুলি আড়ষ্ট হইত, সজীব হইত না। বাইজাণ্টাইন আর্টের মতই ইহা নিয়মানুগত শিল্প ছিল সত্য, তাই বলিয়া একথা স্বীকার করা যায়না যে জৈন দিগের কোনো নিজস্ব আর্ট ছিলনা।[১৫] জৈন আর্ট স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ না করিলেও ইহাতে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে যে, ইহাকে পৃথক আর্ট বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। অপরপক্ষে জৈন দিগের বৈষয়িক (secular) আর্ট নামে যাহাকে অভিহিত করা হয়, তাহা যেন আর্টই নয় ও উহাকে জৈন দিগের আর্টের সহিত পৃথক করিবার জন্য জৈন দিগের বৈষয়িক আর্ট বলিবার কোন কারণও দেখিতে পাওয়া যায়না। তথা-কথিত জৈন বৈষয়িক (secular) আর্ট কিংবা গুজরাতের ব্যবহারিক আর্ট যে নামেই ইহাকে অভিহিত করা হউক ইহা ঠিক নাম করণ করা হইবে না এবং আমরা যাহা পূর্বে বলিয়াছি[১৬] অর্থাৎ ইহা সাধারণ দেশের লোকের আর্টের প্রকাশ ভঙ্গী—খাঁটি দেশী জিনিষ। ইহার নিদর্শন 'বসন্ত

১৫ N. C. Metha : *Studies in Indian Painting.*

১৬ A, Ghose : A Comparative Study of Indian 'Painting' in *Historical Quarterly,* II, p. 306.

বিলাস' শ্রেণীর চিত্রে এবং 'লব ও চণ্ড' চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।[১৭] কল্পসূত্রে ও এই শ্রেণীর অন্যান্য চিত্র যাহা জৈন আর্ট নামে অভিহিত হইতেছে, তাহার সহিত এগুলির কোনরূপ সংশ্রবই নাই। জৈন চিত্রের ভিতর এগুলিকে উপস্থিত করিবার কারণ কি? খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির সহিত সমসাময়িক বাঙ্গলা দেশের পুথির পাটাতনের চিত্রের অদ্ভুত সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত পাটাতনের চিত্র যাহা আমার কাছে আছে তাহা হইতেই আমি একথা বলিলাম। সংস্কৃত 'বিষ্ণু পুরাণে'র পুথি যাহা ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে লিখিত হইয়াছিল, তাহার পাটাতনের চিত্র ২ নং প্লেটে দেওয়া গেল। [চিত্রটী না পাওয়ায় শ্রমণে দেওয়া সম্ভব হইল না।—সম্পাদক] ইহাদের অবয়বের চিত্র, প্রধাণতঃ চিত্রের কল্পনা জৈনদিগের অনুরূপ—অতিরিক্ত কোণ বিশিষ্টতায় (angularities), আকর্ণ বিস্তৃত নয়নে (elongated eyes) এবং দেহের অবনমনে (inclination of the bodies) ও সর্পিল ড্রয়িং-এ উভয় প্রকার চিত্রের বেশ সমতা আছে। পঞ্চদশ শতকের উভয় দেশের শিল্পীর ভিতর বর্ণের পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু পটভূমিতে চীনা সিন্দুর ব্যবহারে উভয় দেশের শিল্পীর সমতা যথেষ্ট রহিয়াছে। জৈন শিল্পের সম্বন্ধে আমরা যেমন বলিতে পারি যে, জৈন চিত্র তালপত্রের পুথিতেই হউক বা কাগজের উপরই চিত্রিত হউক, উহা প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত; সেইরূপ বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধেও বলিতে পারি প্রাচীন চিত্রের ধারা পঞ্চদশ শতকের চিত্রে অনুসৃত হইয়াছে মাত্র। বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণব শিল্পের প্রভাবে পরবর্তী শতকে এই শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাবে মানবের জীবনে ও চিন্তাধারায় যেমন নূতনত্ব অনিয়াছিল, শিল্পেও সেইরূপ আনিয়াছিল। গুজরাটে জৈন শিল্পের ধারাও মোগল প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। এখানে আর একটী কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই যে, রেখা সম্বন্ধীয় ধারা (linear tradition) খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে জৈন ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিতে ও বাঙ্গালা দেশের পুথির পাটাতনের চিত্রে যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে অর্থাৎ যেরূপ সমতা আছে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের একখানি সচিত্র উৎকল দেশের তাল পত্রের পুথিতেও সেইরূপ আছে। এই পুথিখানি আমার সংগ্রহে রক্ষিত হইয়াছে। এরূপ সচিত্র • উৎকল দেশের তালপত্রের পুথির নিদর্শন ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। এগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

পঞ্চপুষ্প, মাঘ, ১৩৩৭ [তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ, চতুর্থ সংখ্যা] পৃঃ ৪৮১-৪৯০

---

১৭ N. C. Mehta: *Indian Painting*, etc; 'An Early Illuminated Manuscript' in *Rupam*. Nos. 22-23, p. 61 ff. 3; O. C. Ganguly: 'The Vasanta Vilas' in *Ostasiatische Leitschrift*.

হাওড়ার রামপূজা এবং মহাবীর

অধ্যাপক শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীমতী অণিমা মুখোপাধ্যায়

হাওড়ার সাঁত্রাগাছি অঞ্চলের রামরাজা-তলায় (দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের রামরাজাতলা ষ্টেশনের সন্নিকটে) বারোয়ারী 'রামরাজা' ঠাকুরের চারমাস ব্যাপী পূজা ও মেলা এবং অন্তে আড়ম্বর পূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে বিজয়ার ঐতিহ্য আনুমানিক ২৫০/৩০০ বছরের প্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের এই বৃহৎ 'বারোয়ারী'র ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান কালে আমরা একটি প্রাচীন ছড়াগানের কয়েকটি পংক্তি সংগ্রহ করি। বহুপূর্বে নাকি রামরাজা বিজয়ার দিনে এই ছড়া গানটি গাওয়া হত।

আহা মরি কি সভা হেরি সখের বাজারে
ধন্য ধন্য এই বারোয়ারী, ঠিক যেন অযোধ্যাপুরী,
সবাই বসে ব্রহ্মচারী, জপে রাম হরে।
দক্ষিণ হতে উলুবেড়ে, যত সব লোক আসে নৌকা চড়ে
চিড়ে মুড়কি ফলার করে যায় ত্বরা করে।
ন্যাংটা গোঁসাই মহাবীরের হাতে লাল নিশান ওড়ে
রং মেখে সং নড়ে চড়ে, তুড়ুক সওয়ার ঠ্যাকার করে।
আহা মরি কি সভা হেরি সখের বাজারে।

ছড়ার মধ্যের এই 'ন্যাংটা গোঁসাই' মহাবীরের উল্লেখ আমাদের অপরিসীম কৌতূহলের উদ্রেক করে। বস্তুত অনুসন্ধানে জানা যায়, রামরাজা বিজয়ার শোভাযাত্রায় কিছুকাল পূর্বেও পুরোভাগে লাল রঙের একটি বিশালকায় মৃন্ময় উলংগ পুরুষমূর্তি দেখা যেত, তার হাতে থাকত ত্রিকোণ পতাকা। বর্তমানে সম্ভবতঃ এর পরিবর্তেই একটি ছোটো শিশুর গায়ে তুলো লাগিয়ে তাকে লাল কাপড় পরিয়ে এবং একটি বৃহৎ লাঙ্গুল যুক্ত করে মহাবীর (হনুমান) এর আদলে সং সাজান হয়। প্রাচীন ছড়াটিতে উল্লিখিত 'ন্যাংটা গোঁসাই মহাবীর' আর যাই হোক হনুমান নয়। কারণ, হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সহজ সম্পর্কযুক্ত হলেও সাধারণ নিয়মে 'ন্যাংটা গোঁসাই' আখ্যাযুক্ত কোনক্রমেই হতে পারেন না। পক্ষান্তরে স্মরণ করা যেতে পারে, শ্রমণ ভগবান মহাবীরের 'অর্হত্ত্ব'

লাভের স্থান বর্দ্ধমানের জোগ্রামে অবস্থিত 'ন্যাংটা গোঁসাই'কে পণ্ডিত গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল শ্রমণ ভগবান মহাবীর বলে চিহ্নিত করেছেন।[১] (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের প্রবন্ধ—মহাবীর কেবল দর্শন জয়ন্তী স্মরণিকা-১৩৮৪ দ্রষ্টব্য)

রামপূজার কয়েকটি বিশেষ কৃত্য ও স্থানীয় অপরাপর কয়েকটি তথ্যগত পরোক্ষ প্রমাণ থেকে আমাদের মনে হয়, হাংড়ার এই প্রাচীন বারোয়ারী পূজার উপর জৈনধর্মের কিছু প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমী থেকে পূজা আরম্ভ হয়ে শ্রাবণের শেষ রবিবার পর্যন্ত এই চারমাস ব্যাপী পূজা বা চাতুর্মাস্যের কালে [চাতুর্মাস্যের সময় আষাঢ় শুক্লা পূর্ণিমা হতে কার্তিক শুক্লা পূর্ণিমা—সম্পাদক] পুরোহিত এবং সেবায়েতগণ সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার গ্রহণ করে থাকেন। এটি বৈষ্ণব পূজা-রীতি অনুযায়ী যেমন হতে পারে, তেমনি কোনো অন্তর্লীন জৈন প্রভাবজাত হওয়াও বিচিত্র নয়।

রামপূজা স্থানের প্রায় সংলগ্নস্থানে বর্তমানে 'শঙ্করমঠ' অবস্থিত। এটি দশনামী পুরী সম্প্রদায় কর্তৃক ১৩২৬ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে এই স্থানে স্থানীয় জমিদার ও রামপূজার প্রবর্তক চৌধুরীরা চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহাবীরের জয়ন্তী উৎসব এবং কার্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রাত্রিশেষে মহাবীর নির্বাণ উৎসব পালন করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ উক্ত মাঠে শঙ্করমঠের প্রতিষ্ঠার কারণে এই উৎসব বন্ধ হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয়, মঠ-সংলগ্ন পুষ্করিণীতে মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই শ্যাওলা আচ্ছাদিত মাথার ওপর লোমওয়ালা অতিবৃহৎ ও প্রাচীন মৎস্য সংরক্ষণের খবর পাওয়া যায়। প্রাচীনত্বের চিহ্নস্বরূপ এই সকল মাছ বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বেও এই মঠ-সংলগ্ন পুষ্করিণীতে বর্তমান ছিল।

মহাবীরের জয়ন্তী ও নির্বাণ উৎসবের স্থানে এই মৎস্য সংরক্ষণের বিষয়টি আমরা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। আবার বিশেষ বিশেষ জৈন পর্বের দিনে যেমন, বৈশাখী শুক্লা প্রতিপদ বা নবরাত্রি ব্রত আরম্ভের দিন—ইত্যাদি দিনগুলিতেই উক্ত শঙ্করমঠের বর্তমানেও প্রচলিত বিশেষ উৎসব যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক এবং জৈন-আচারের স্মারক।

১ জোগ্রামের 'ন্যাংটা গোঁসাই' যে শ্রমণ ভগবান মহাবীর তা আজো সুপ্রমাণিত নয়। তাছাড়া এই 'ন্যাংটা গোঁসাই' সম্পর্কে যতটুকু বিবরণ আমরা স্থানীয় লোকেদের কাছ হতে অবগত হই তাতে মনে হয় তিনি তান্ত্রিক বা যোগী সম্প্রদায়ের কোনো সাধক ছিলেন। এবং তাঁর সময়ও খুব প্রাচীন নয়। নগ্ন হলেই যে জৈন হতে হবে এমনো কোনো নিয়ম নেই। বহু হিন্দু সন্ন্যাসীও নগ্ন বিচরণ করেন। রামের সম্মুখে লাল নিশানধারী তীর্থংকর মহাবীরের কল্পনা কষ্ট কল্পনা নয় কি? কেবল মাত্র কৌপীনধারী হনুমানকে 'ন্যাংটা গোঁসাই' কেন বলা যাবে না তাও ঠিক বোঝা গেল না।—সম্পাদক

এতদ্‌ব্যতীত হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বহু 'নাথ'সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে। নাথ-বৃদ্ধগণ অদ্যাবধি পার্শ্বনাথের সংগে তাঁদের সম্পর্ক স্বীকার করেন। মহাবীর 'নাত-পুত্ত', ধর্মে মূলতঃ নাথ-যোগী। [?—সম্পাদক] হাওড়ার স্থানীয় জমিদার সান্যাল-বংশ কর্তৃক মহাবীর ডাঙ্গা বা মাঠে মহাবীর জয়ন্তী ও নির্বাণ উৎসব পালনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই পুণ্যস্থানে পরে শঙ্করমঠের প্রতিষ্ঠা হয়। রাম জৈনগণের ধর্মেও গৃহীত হয়েছেন। রামবিজয়ার শোভাযাত্রায় পূর্বে ন্যাংটা গোঁসাই মহাবীরের মূর্তিরই অগ্রাধিকার ছিল। এর বর্তমান রূপান্তর হল তীর্থংকর মহাবীরের পরিবর্তে মহাবীর হনুমান সাজিয়ে শোভাযাত্রা—হিন্দুত্বের মহিমায়।

হাওড়ার বাগনান অঞ্চলের অধিবাসী এক আচার সম্পন্ন পরিবারকে আমরা ১৫।২০ বৎসর পূর্বে দেখেছি। এ'রা নাকে-মুখে সাদা কাপড় বেঁধে রাখতেন এবং নিরামিষাশী জৈন আচার পালন করতেন।

এই সমস্ত অসাধারণ ইংগিতবাহী তথ্যগুলি এবং হাওড়ার সুপ্রাচীন এই বারোয়ারী রামরাজা পূজার সঙ্গে এবং নিকটবর্তী শঙ্কর মঠের পূর্বোক্ত অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে মহাবীরের তথা জৈন ধর্মের এই অন্তর্লীন ঘনিষ্ঠতা থেকে আমাদের সংগত ও দৃঢ় অনুমান এই যে দক্ষিণ রাঢ়ের হাওড়া অঞ্চলে শতাব্দ বাহিত জৈনধর্মের একটি চর্চাকেন্দ্র ছিল—যার রেশ এখনও এই অঞ্চলের লৌকিক ধর্ম-কর্ম জীবন চর্যায় কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও পরোক্ষভাবে চলে আসছে।

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের রাঢ় চারিকার ঐতিহাসিক ভূগোলে হাওড়া অঞ্চলের কোনো সংস্রব খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু সুবর্ণকূলা ও রূপ্যকূলার মধ্যবর্তী 'বাচাল' দেশের সন্নিহিত এই এলাকা জৈনধর্মের প্রবাহ হতে অসম্পৃক্ত নাও হতে পারে।

ভগবান মহাবীরের কেবল জ্ঞান ভূমি

শ্রী বি. এল. নাহাটা

তীর্থংকর যেখানে জন্ম গ্রহণ করেন, দীক্ষা প্রাপ্ত হন, নির্বাণলাভ করেন সেই স্থানকে কল্যাণক ভূমি বা তীর্থ রূপে মান্যতা দেওয়া হয়। ভগবান মহাবীরের জন্মস্থান ক্ষত্রিয়কুণ্ড ও নির্বাণস্থলী পাবাপুরী। কিন্তু তিনি যেখানে কেবল জ্ঞান লাভ করেন তা আজো সঠিক নিরূপিত হয়নি। এমনিতে ত বরাকর যা গিরিডী হতে সম্মেত শিখর যাবার পথে পড়ে তাকে কেবল জ্ঞান ভূমি বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু শ্রীবিজয়েন্দ্র সূরির মতানুসারে এই মান্যতা দীর্ঘদিনের নয়। জৈনাগমে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে তা সমর্থিত হয়না।

জৈনাগম অনুসারে সাধনাবস্থার ত্রয়োদশ বর্ষে ভগবান মহাবীর মধ্যমা পাবার উদ্যান হতে প্রব্রজন করে জংভীয় গ্রামে আসেন এবং সেখানে বৈশাখ শুক্লা ১০মীর দিন ছায়া পূর্বগামী হলে শেষ প্রহরে সুব্রত নামক দিবসে বিজয় নামক মহূর্তে জংভীয় গ্রামের বাইরে উজুবালুকা নদীর তীরে এক জীর্ণ শীর্ণ চৈত্যের অনতিদূরে শ্যামক নামক গৃহপতির ক্ষেত্রে শাল বৃক্ষের নীচে গোদুহিকা আসনে সূর্যাভিমুখী হয়ে নির্জলা উপবাসের ষষ্ঠ দিবসে চন্দ্রমার সঙ্গে উত্তরা ফাল্গুনী যোগে, ধ্যানের প্রথমাবস্থা অতিক্রম করে জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় এই চারি প্রকার ঘাতী কর্ম ক্ষয় করে কেবল জ্ঞান ও দর্শন প্রাপ্ত হন। সেই রাত্রে প্রব্রজন করে তিনি মধ্যমা পাবায় আসেন। জংভীয়া হতে পাবার দূরত্ব ১২ যোজন অর্থাৎ ৪৮ ক্রোশ।

আচার্য বিজয়েন্দ্র সূরী তাঁর 'তীর্থংকর মহাবীর' গ্রন্থের ২৪৪ পৃষ্ঠায় লিখছেন যে জংভীয় গ্রাম মগধ দেশে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে এর উল্লেখ খানুমত নামে হয়েছে। 'বীর বিহার মীমাংসা'য় (পৃষ্ঠা ২৮) ত্রয়োদশ চাতুর্মাস্যের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখছেন যে চাতুর্মাস্যের পর প্রব্রজন করে ভগবান মহাবীর জংভীয় গ্রামে আসেন। জংভীয়গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করে তিনি মেঁঢিয় গ্রাম হয়ে ছম্মাণি যান ও ছম্মাণি হতে মধ্যমাপাবায় ফিরে আসেন। মহাবীরের কানে কীলক প্রবেশ করানো রূপ উপসর্গ ছম্মাণি গ্রামের উপান্তে সংঘটিত হয় ও খরক বৈদ্য মধ্যমাপাবায় তা নিষ্কাশিত করেন।

মুনি কল্যাণ বিজয়জী 'শ্রমণ ভগবান মহাবীর' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় মহাবীরের কেবল জ্ঞান ভূমি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখছেন যে আজকাল হাজারীবাগের পূর্বে, পার্শ্বনাথ পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্বে দামোদর নদীর তীরে ভগবান

মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করেছিলেন বলে বলা হয় কিন্তু সেই স্থানই যে কেবল জ্ঞান ভূমি তা নিশ্চয় করে বলা দুষ্কর। কারণ দামোদর নদী হতে মধ্যমা পাবার দূরত্ব পূর্বোক্ত দূরত্ব হতে অনেক বেশী।

কোন কোন বিদ্বান আজী নদীকে ঋজুবালুকা নদীর অপভ্রংশ বলে মনে করে আজী নদীর তীরস্থিত জমগাঁও কে জংভীয়গ্রাম বলে বলে থাকেন ও আরো বলেন যে সেখান হতে মধ্যমা পাবার দূরত্ব প্রায় বারো যোজন। [শ্রীবিজয় ধর্ম সূরী সংশোধিত 'প্রাচীন তীর্থমালা সংগ্রহ' ভাগ—১]

কিন্তু একথাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ প্রথমতঃ আজী ঋজু বালুকার অপভ্রংশনয়, এই নামেরই এক প্রাচীন নদী। জৈন সূত্রে আজী ও আদি নামে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আজী তট হতে মধ্যমা পাবার দূরত্ব ৪৮ ক্রোশের অনেক বেশী।

ভগবান মহাবীর দ্বাদশ চাতুর্মাস্য চম্পায় ব্যতীত করেন। সেখান হতে চাতুর্মাস্য শেষে প্রব্রজন করে ছম্মাণি হয়ে মধ্যমায় আসেন ও আবার মধ্যমা হতে প্রব্রজন করে জংভীয় গ্রামে যান। এভাবে জংভীয় গ্রাম যেখানে ভগবান মহাবীর কেবল জ্ঞান লাভ করেন তা চম্পা ও মধ্যমা পাবার মধ্যবর্তী কোন স্থান তা বলা যায়। আমার অনুমান মহাবীরের কেবল জ্ঞান ভূমি জংভীয় গ্রাম ও ঋজুবালুকা নদী চম্পার পশ্চিমে ও মধ্যমা পাবা যাবার রাস্তায় কোন স্থানে ছিল।

স্বর্গীয় ডঃ নেমিচন্দ্র শাস্ত্রী, 'জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর'-এ [ভাগ ২৬ কিরণ ১] প্রকাশিত 'জৈন সাহিত্যে প্রতিপাদিত মগধ জনপদ' নামক নিবন্ধে লিখছেন—যে জংভীয় গ্রামে ভগবান মহাবীর কৈবল্য প্রাপ্ত হন বর্তমানে তাকে জমুই গ্রাম বলা হয়। বর্তমান মুগের হতে তা ৫০ মাইল দক্ষিণে ও রাজগৃহ হতে ৩৫ মাইল দূরে কিউল নদীর তীরে অবস্থিত। কিউল ঋজুকূলা বা ঋষ্যকূলার অপভ্রংশ। কিউল ষ্টেশন হতে জমুই ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। জমুইর তিন মাইল দক্ষিণে এনমেগড় নামে এক টীলা আছে। কানিংহাম একে ইন্দ্রদ্যুম্ন পালের বলে অভিহিত করেছেন। খনন কালে এখান হতে অনেক মুদ্রা পাওয়া যায়। জমুই ও লিছুয়াড়-এর মধ্যে মহাদেব সিমরিয়া নামে এক গ্রাম আছে যেখানে সরোবরের মধ্যে তিন-চার শ' বছর পুরুনো মন্দির আছে। জমুই হতে ১৫-১৬ মাইল দূরে লক্ষীসরায়। জমুই ও রাজগৃহের মধ্যে সিকন্দরা গ্রাম। রাজগৃহ ও সিকন্দরার মধ্যে অম্বসট্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে আম্রবন ছিল। আজকাল এই গ্রামকে সিলাও বলা হয়।

ঋজুকুলার উল্লেখ 'তিলোয় পন্নত্তী' ও 'হরিবংশ পুরাণে' ও পাওয়া যায়। এই ঋজুকুলাকে বর্তমানে কিউল নদী বলা হয়।

শ্রী সুমেরু চ'াদ দিবাকর তাঁর ভগবান মহাবীর সম্পর্কিত গ্রন্থে লিখছেন জমুইর নিকটস্থ কেবালী গ্রাম ভগবান মহাবীরের কেবলজ্ঞান ভূমি হওয়া সম্ভব।

এই বিষয়ে প্রাচীন তীর্থ মালায় যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন উল্লেখ ১৫৬৫ সম্বতের হংসসোম রচিত তীর্থমালায় পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে সমেতশিখর হতে ২০ ক্রোশ দূরে ঋজু বালুকা নদীর তীরে জংভীগ্রামে তারা কেবল জ্ঞান ভূমির বন্দনা করেছিল।

সম্মেত শিখর আগলি বীস কোস রজু বালুকা নই পাসই
জংভীগাম বিশস্তালতু।
বর্দ্ধমান তিহাঁ নাণ ভণীজই সুমুখি জিণবরবীর নমীজই
আণী ভাব রসালতু ॥ ৩৪ ॥
ইম সুণীই' লোকাঁনী বাত, তিহাঁ জইনই' কাঘীজাএ
ইহাঁথী কীজই ধ্যানতু।

সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি বিজয়সাগর তীর্থমালায় লিখছেন—

গিরি আগিঁ কোশে বারে উপরিথী দেব জুহারে।
ঋজু বালুঅ জংভীগাম, বীরহ জিন কেবল ঠাম ॥ ১২

অষ্টদশ শতকের পূর্বার্দ্ধে রচিত শীল বিজয় কৃত তীর্থমালায় বলা হয়েছে—

গিরিথী দূরে' দক্ষিণ দিশি দেখিই' রিজু বালুকা রে নাম।
দামোদর তটনী হমণ'া বহেঁ বীর জিন কেবল ঠাম। ১৩ ॥

এভাবে ষোল শতক হতে আজ পর্যন্ত কয়েকজন জৈন বিদ্বানদের কেবলজ্ঞান ভূমি সম্পর্কিত অভিমত উপরে ব্যক্ত করলাম। এতে স্থান নিরূপণে সাহায্য করবে আশা করি।

'আচারাঙ্গ সূত্র' (জংভীয় গ্রামে) মহাবীরের কেবলজ্ঞান উৎপন্ন হতেই সেখানে প্রথম দেশনা দেবতাদের সম্মুখে ও পরবর্তী দেশনা (পাবা পুরীতে) মানুষের সম্মুখে দেন উল্লিখিত হয়েছে। যথা—

তও ণং সমণে ভগবং মহাবীরে উপ্পন্ন ণাণ দংসণ ধরে অপ্পাণং চ লোগং চ অভিসমেক্‌খ পূব্বং দেবাণং ধম্ম মাইক্‌খংতি, তও পচ্ছা মনুস্‌সাণং।

—আয়ারচূলা ১. অ. ১৫ সূ. ৪২

যেমন আগেই বলা হয়েছে কেবল জ্ঞানভূমিরূপে বর্তমান মান্যতা-পাওয়া তীর্থ বরাকর নদী তীরে গিরিডি ও মধুবনের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থান হতে দেড় মাইল পূর্ব-দক্ষিণে জংবুয়া নামক গ্রাম আজো বিদ্যমান যেখানে ১০০ ঘরের বসতি রয়েছে। তাই এই সকল বিষয়ের সম্যক পর্যালোচনা করেই কেবলজ্ঞানভূমি নিরূপিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে জংভিয়গ্রাম-ঋজুকুলা হতে মধ্যমা পাবার দূরত্ব ৪৮ ক্রোশ এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এ খুবই ঠিক যে এই দীর্ঘ দিন পরে বহু স্থান নাম পরিবর্তিত হয়ে গেছে, গ্রাম, নগর ও নদীর স্থিতিও পালটে গেছে তবুও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান করলে সত্য একদিন অবশ্যই নিরূপিত হবে।

শ্রেণিক

তোমাদের এক বুদ্ধিমান বালকের কথা বলেছি। আজ আর এক বুদ্ধিমান বালকের কথা বলব। তার নাম তোমরা সকলে জান, যিনি পরে গিয়ে মগধের সম্রাট হয়েছিলেন। বিম্বিসারের কথা কেনা জানে ?

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদনখকণা তাঁর।

তোমরা বিম্বিসারকে বুদ্ধের ভক্ত বলে জান। কিন্তু জৈন সাহিত্যে বিম্বিসার ছিলেন মহাবীরের পরম ভক্ত। এবং সেইটিই ঠিক বলে মনে হয়। কারণ বিম্বিসারের পট্টমহাদেবী চেলনা ছিলেন মহাবীরের মামাতো বোন। রাজানুকূল্য লাভ করেছিলেন বলেই মহাবীর তাঁর তীর্থংকর জীবনের বেশীর ভাগ চাতুর্মাস্য রাজগৃহে কাটিয়েছিলেন যখন বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে। জৈন সাহিত্যে বিম্বিসারের নাম আবার শ্রেণিক। শ্রেণিক বিম্বিসার।

শ্রেণিক যখনো রাজা হন নি। যখন তোমাদের মত ছোট ছিলেন, তখনকার কথা।

মগধে তখন রাজত্ব করছেন রাজা প্রসেনজিৎ। ধৃতরাষ্ট্রের মত তাঁরো একশ' ছেলে। শ্রেণিক তাদের একজন।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে এমনকি গায়ের জোরে সমস্ত রাজপুত্রই প্রায় সমান। তাই প্রসেনজিতের ভাবনা এঁদের মধ্যে তিনি কাকে রাজ্য দিয়ে যাবেন। শেষে তিনি স্থির করলেন—এদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও বিনয়ী হবে তাকে তিনি রাজ্য দিয়ে যাবেন। তাই তিনি ছেলেদের পরীক্ষা নেওয়া স্থির করলেন ও একদিন রাঁধুনীকে ডেকে একশজনের কয়েকদিন খাবার মত নরম খাজা তৈরী করতে বললেন। খাজা তৈরী হলে তা বেতের ঝুড়িতে ভরিয়ে ভালো করে মুখ বন্ধ করে এক প্রশস্ত ঘরে রাখিয়ে দিলেন। তারপর একশজনের কয়েকদিন খাবার মত কয়েক ঘড়া জল বেশ করে মুখ বন্ধ করে সেই ঘরে রাখিয়ে দিলেন। এ সমস্ত কাজ শেষ হলে একশজন রাজপুত্রকে সেই ঘরে ভরে দিয়ে বললেন—আজ হতে কয়েকদিন তোমাদের এই ঘরে থাকতে হবে। বাইরে হতে তোমরা খাবার কি জল পাবে না। এখানে খাজা ও জল রয়েছে। তবে তাতেও কোনো সুবিধে হবে না। কারণ জালা বা ঝুড়ির মুখ খোলা যাবে না। এখন যেভাবে পার থাক—বলে রাজা চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের

দরজায় তালা পড়ে গেল আর ছেলেদের মধ্যে হাহাকার। কত দিনে তালা খোলা হবে—কেউ জানে না। ততদিন কিছু না খেয়ে তারা বাঁচবে কি করে? বিশেষ করে জল? ছেলেরা ত মাথায় হাত দিয়ে বসল। বসল না শুধু একজন—শ্রেণিক। সে বলল, না খেতে দিয়ে আমাদের মেরে ফেলা কখনো বাবার উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর মধ্যে কোনো রহস্য রয়েছে। হয়ত তিনি আমাদের পরীক্ষা নিতে চান। তাছাড়া এই ঘরে খাজা ও জল রাখাবারই বা উদ্দেশ্য কি?—তাই এখন আমাদের দেখতে হবে জালা ও ঝুড়ির মুখ না খুলে কিভাবে আমরা খাজা ও জল খেতে পারি।

সকলে শ্রেণিকের কথার অনুমোদন করল। বলল, ঠিক। কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

সম্ভব বলে শ্রেণিক একটা ঝুড়ি নিয়ে খুব জোরে নাড়তে লাগল। সেই ঝাঁকুনিতে নরম খাজা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বেতের ঝুড়ির ফাঁক দিয়ে মেঝেয় এসে পড়তে লাগল।

সকলে তখন শ্রেণিকের দেখাদেখি বেতের ঝুড়ি নাড়তে লাগল। এভাবে অনেক খাবার বেরিয়ে এল। এখন জল?

শ্রেণিক বলল, আমি তারও ব্যবস্থা করছি বলে তরতর করে একফালি কাপড় ছিঁড়ে জালার গায়ে লেপটে দিল। তোমরা জান জালার গা ঘামে। সেই ঘামে সেই কাপড় ভিজে যেতে লাগল। কাপড় নিঙড়ে শ্রেণিক জল বার করল।

তাই দেখে আর আর রাজপুত্ররাও ঐভাবে ঘড়ার জল বার করতে লাগল। এভাবে খাজা ও জল খেয়ে তাদের কয়েক দিন কেটে গেল।

কয়েকদিন পরে ঘরের তালা খোলা হল। প্রথমেই ঘরে ঢুকলেন প্রসেনজিৎ নিজেই। দেখলেন ছেলেরা না খেয়ে কেউ নেতিয়ে পড়েনি। বেশ সুস্থই রয়েছে।

প্রসেনজিৎ তখন তাদের জিগ্যেস করলেন এক'দিন না খেয়ে তারা কিভাবে কাটাল?

ছেলেরা তখন যেভাবে তারা খাজা ও জল খেয়েছে সেকথা বলল।

প্রসেনজিৎ প্রশ্ন করলেন, এ বুদ্ধি তোমাদের কার মাথায় এসেছিল?

সবাই একস্বরে বলল, শ্রেণিকের।

শুনে প্রসেনজিৎ খুসী হলেন। কিন্তু মুখে সে ভাব দেখালেন না। বরং শ্রেণিকের নিন্দে করে বললেন, ও দরিদ্র, তাই ওমন সুন্দর খাজা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল।

প্রসেনজিতের এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে যাতে শ্রেণিকের মনে অভিমান না জাগে ও অন্য ছেলেরা শ্রেণিকের হিংসে না করে। এবং শ্রেণিক যে কেমন বিনয়ী তাও এ হতে বোঝা যাবে। শ্রেণিক বাবার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বাবার কটূক্তি শুনেও চুপ করে রইলেন।

ক'দিন পরেই প্রসেনজিৎ আবার ছেলেদের পরীক্ষা নিলেন।

এবার রাঁধুনীকে ডেকে ছেলেদের জন্য পায়েস তৈরী করতে বললেন। পায়েস তৈরী হলে তাঁর একশ' ছেলেকে একশ' থালে এক সঙ্গে খেতে দিলেন। ছেলেরা পিঁড়িতে বসে যেই সেই পায়েস খেতে যাবে ওমনি তাদের ওপর একশ' কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হল। কুকুরদের অনেকক্ষণ খেতে দেওয়া হয়নি, তাই ছাড়া পেতেই তারা একসঙ্গে একশ' থালায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর আর রাজপুত্ররা ভয় খেয়ে যখন পিঁড়ি হতে উঠে এল, শ্রেণিক এলনা নিজের পাশের থালা কুকুরের মুখের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নিজের থালার পায়েস খেতে থাকল।

প্রসেনজিৎ এবারো খুসী হলেন। কিন্তু মুখে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব এনে বললেন, কুকুরের সঙ্গে খেয়ে শ্রেণিকের জাত গেছে। আর-আর রাজপুত্রেরা থালা হতে উঠে এসে ভালোই করেছে—নিজেদের জাত বাঁচিয়েছে।

কিন্তু শ্রেণিক এবারো চুপ করে রইল।

এরপর একদিন প্রসেনজিৎ শ্রেণিককে ডেকে বললেন, দেখ শ্রেণিক, আমি দু' দু'বার তোমার পরীক্ষা নিয়েছি। আর একবার তোমার পরীক্ষা নেব। তাতে যদি তুমি উত্তীর্ণ হতে পার তবে তোমার মঙ্গল হবে।

একথা বলার ক'দিন পরেই রাজবাড়ীর একদিকে আগুন লাগল। প্রসেনজিৎ তখন শ্রেণিককে ডেকে বললেন, শ্রেণিক, রাজবাড়ীর যেদিকে আগুন লেগেছে সেদিকে সবই পুড়ে প্রায় নষ্ট হয়ে যাবে—তবু ওর মধ্যে যা বাঁচাবার থাকে তা বাঁচাও।

শ্রেণিক সেকথা শুনে আগুনের মধ্যে দিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল ও সেখান হতে সোণাদানা না নিয়ে ভম্ভা—রণভেরী তুলে নিয়ে এল।

প্রসেনজিৎ দেখে খুসী হলেন কিন্তু মুখে বিরক্তির ভাব এনে বললেন, শ্রেণিক, তোমার পেটের চিন্তাই দেখছি বেশী। এখন এই ভম্ভা ঘরে ঘরে বাজিয়ে বেড়াও ও তোমার ভায়েরা পাতে যা ফেলে যায় তাই খাও। এ যেদিন পারবে সেদিন বুঝব তুমি চতুর আর সেদিন তোমায় আমি আমার সিংহাসন দিয়ে যাব।

শ্রেণিক পূর্বের মত এবারো চুপ করে রইল। শ্রেণিক ভম্ভা তুলে নিয়ে এসেছিল—তাই তার আর এক নাম হল, ভম্ভাসার—বোধহয় এ হতে বিম্বিসার নামের উদ্ভব হয়ে থাকবে।

তোমরা ভাবছ—এসব গল্প শুধুই গল্প। কিন্তু তা নয়। এসব গল্পের মধ্যে রাজনীতি ধারা রয়েছে। যেমন ধর প্রথম গল্পটি। শত্রু যদি দুর্গাবরোধ করে তবে রাজা কি করবে? প্রথমেই তাকে দুর্গের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা ঠিক রাখতে হবে। শ্রেণিক তাই করেছিল। দ্বিতীয় গল্পে শত্রু যদি পরাক্রমশালী হয় তবে রাজার কি কর্তব্য? শ্রেণিক যা করেছিল তাই। অন্যের রাজ্য তার হাতে তুলে দিয়ে

নিজের রাজ্য বাঁচিয়ে নেওয়া। এ হতে বোঝা গেল শ্রেণিক নিজের রাজ্য রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু নিজের রাজ্য রক্ষা করতে পারাটাই সব নয়। সে রাজ্য বিস্তার করতে পারবে কিনা? শ্রেণিক যে পারবে তা তৃতীয় গল্পের বিষয়—শ্রেণিক ভম্ভা অর্থাৎ রণভেরী তুলে নিয়ে এসেছিল। প্রসেনজিৎ যে বললেন তোমার খাবার চিন্তাই বেশী এখন ঘরে ঘরে এই ভম্ভা বাজিয়ে বেড়াও ও তোমার ভায়েরা পাতে যা ফেলে যায় তাই খাও তবে বুঝব তুমি চতুর—তার অর্থ তুমি বীর ও তোমার মনে রাজ্য-বিস্তারের ইচ্ছা রয়েছে। এখন এই রণভেরী দেশে দেশে নিয়ে যাও ও রাজ্য বিস্তার কর ও ভায়েদের পরিত্যক্ত এই সিংহাসন অধিকার করে নাও। এবার বুঝতে পারছত প্রসেনজিতও কম চতুর ছিলেন না। কি বল?

কি বললে?- এরপর কি হল? তবে বলি শোন।

এরপর প্রসেনজিৎ অন্য অন্য ছেলেদের সামান্য সামান্য জাগীর দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন শ্রেণিককে নিজের কাছে রাখলেন কিন্তু কিছু দিলেন না। কিন্তু শ্রেণিক এতেও রাগ করল না।

রাগ করল না কিন্তু যখন লোকেরা প্রসেনজিতকে এসে বলত আপনি যখন সকলকে জাগীর দিলেন, ওকে কেন কিছু দিলেন না যখন এর প্রত্যুত্তরে প্রসেনজিৎ বলতেন, ওকে জাগীর দিয়ে কি করব—ও কিপটে, ও দরিদ্র। এবং লোকে যখন এসব কথার তাৎপর্য না বু'ঝে শ্রেণিকের নিন্দে করতে লাগল তখন শ্রেণিকের মনে কষ্ট হল। তখন সে একদিন কাউকে কিছু না বলে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেল।

তারপর অনেক দেশ ঘুরে অনেক বনজঙ্গল ভেঙে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রেণিক একদিন বেন্নাতটে এল।

বেন্নাতটে থাকেন শ্রেষ্ঠী ধনপতি। খুব সম্পন্ন নন। ঘুরতে ঘুরতে শ্রে'ণক একদিন তাঁর ওখানে এসে রাত্রি বাসের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করল।

শ্রেষ্ঠী প্রথম দেখাতেই শ্রেণিকের প্রতি কেমন যেন আকৃষ্ট হলেন। তাই শুধু রাত্রিবাসের আশ্রয়ই দিলেন না, ক্রমে তাকে নিজের ব্যবসায়ের সরিক করে নিলেন ও শেষে কুলশীলের পরিচয় না নিয়েই তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বছর না ঘুরতে শ্রেণিকের এক ছেলে হল। শ্রেণিক তার নাম রাখল অভয়কুমার। অভয়কুমারের গল্প তোমাদের আর একদিন বলব।

শ্রেণিক যখন এভাবে শ্রেষ্ঠীর ঘরে সুখে বাস করছে তখন বেন্নাতটে সমুদ্রগামী এক বণিক এল। এসেই সে তেজমতুরীর সন্ধান করতে লাগল।

তেজমতুরী এক ধরণের উদ্ভিদ যার এক মাষা একপোয়া তামার সঙ্গে আগুনে পোড়ালে তামা সোনা হয়ে যায়।

কিন্তু তেজমতুরী চোখে দেখাত দূরের তার নামই বেন্নাতটে কেউ শোনে নি।

ক্রমে তেজমতুরীর কথা শ্রেণিকের কানে গেল। সে ধনপতিকে গিয়ে বলল, আপনি বণিককে গিয়ে বলুন আমরা তেজমতুরী দেব, কিন্তু তার জন্য এক মাসের সময় চাই। এবং তার মূল্য সোনা দিয়ে দিতে হবে।

ধনপতির শ্রেণিকের ব্যবসায়িক বুদ্ধির ওপর শ্রদ্ধা ছিল কারণ তার আসার পর হতে তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তেজমতুরী ? তিনি দেবেন কোথা হতে ? ঘরেত তেজমতুরী নাই।

শ্রেণিক বলল, তার জন্য ভাবনা কি। কারণ তেজমতুরী যেখানে হয় তা আমি জানি। তাই একমাস সময় নিয়েছি।

ধনপতি তাই বণিককে সেকথা বলে এলেন। শ্রেণিক বেন্নাতটে আসবার পথে এক অরণ্যে তেজমতুরী দেখে এসেছিল। সেই তেজমতুরী সে সেখান হতে তুলে নিয়ে এল।

ধনপতি সেই তেজমতুরী বণিককে দিলেন। বণিক তার বিনিময়ে ধনপতিকে সোনা দিল।

প্রথম দেখাতেই সেই বণিক শ্রেণিককে চিনতে পারল, বলল আপনাকে আমি রাজগৃহে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

শ্রেণিক একটু হেসে বলল, না ভদ্র, আমি কোনো কালেই রাজগৃহে ছিলাম না।

রাজগৃহ বুঝতে পেরেছ ? রাজার ঘর মানে কারাগার।

বণিক বুঝল, শ্রেণিক নিজের পরিচয় দিতে চায়না তাই আর কিছু বলল না।

বণিক ঘুরতে ঘুরতে এরপর রাজগৃহে এল।

রাজসভায় শ্রেণিককে না দেখে বণিক প্রসেনজিৎকে শ্রেণিকের কথা জিজ্ঞাসা করল। প্রসেনজিৎ তখন বললেন, শ্রেণিক অনেকদিন রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। এখন কোথায় আছে আমি জানি না।

বণিক তখন শ্রেণিক কোথায় আছে তা প্রসেনজিৎকে বলল। প্রসেনজিৎ তখন বেন্নাতট হতে শ্রেণিককে ডাকিয়ে নিলেন ও সমস্ত রাজ্য তার হাতে তুলে দিলেন।

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. V No. 4 Sraman : August 1977

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No R N 4582/73

পরলোকগত পূরণচাঁদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্ম সম্বন্ধে, কলেজে অধ্যয়ন কালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ব এবং ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখাজীর বইখানি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রমণ

ভাদ্র । ১৩৮৪ পঞ্চম বর্ষ । পঞ্চম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
পঞ্চম বর্ষ ॥ ভাদ্র, ১৩৮৪ ॥ পঞ্চম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী
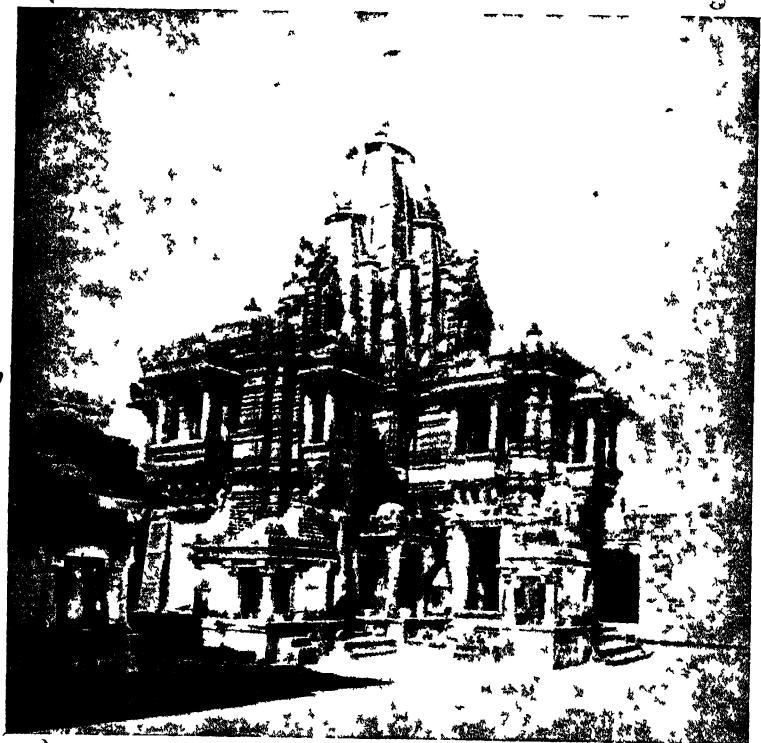
রামজী গান্ধারিয়ার চৌমুখ মন্দির
শত্রুঞ্জয় পালিতানা

জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা

বিভূতিভূষণ দত্ত

১৩৩৫ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৮-৩০ পৃষ্ঠা) আমরা নাম সংখ্যা প্রণালী বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে বৈদিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সময় পর্যন্ত নাম সংখ্যাব উৎপত্তি, প্রয়োগ ও ক্রমপরিণতির সমগ্র ইতিহাস যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছিল। ১৩৩৬ সালের 'পত্রিকা'য় অপর এক প্রব'ন্ধ ঐ বিষয়ের পুনরালোচনা করি। তাহাতে মুখ্যতঃ নাম সংখ্যা নিঘণ্টু সঙ্কলনের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস এবং কতগুলি সংজ্ঞার উপপত্তি ও প্রয়োগেতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্তী গবেষণার ফলে এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রথম প্রবন্ধের দু'একটি স্থল পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্রকলেবর প্রবন্ধের অবতারণা।

অর্দ্ধমাগধী সাহিত্য

প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন অর্দ্ধমাগধী সাহিত্যে নাম সংখ্যার ব্যবহার নাই। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত 'বৃহদগচ্ছের গুর্বাবলী' হইতে নাম সংখ্যা প্রয়োগের একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিযা মন্তব্য করা গিয়াছিল যে, 'এই প্রকার প্রমাণও অতীব বিরল।' এই সকল কথার সংশোধন আবশ্যক। জৈন আগম গ্রন্থাদিতে (৫০০-৬০০ খ্রীষ্ট পূর্ব সাল) নাম সংখ্যা প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাই নাই। খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে রচিত 'অনুযোগদ্বার সূত্রে' একমাত্র রূপ (=১) সংজ্ঞার প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়।[১] কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জিনভদ্রগণি নাম সংখ্যার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা 'পণ সত্তগ তিগ পণ তিগ দুগ চউট্ঠিক্কো'[২] =১৮৪২৩৫ ৩৭৫; 'সুন্নিংদিয় দুগ পংচয় ইক্কগ তিগ'[৩] =৩১৫২৫০; ইত্যাদি। আচার্য নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, 'বার খং ছক্কং'[৪] =৬০১২; 'পন্নাস মেকদালং

---

১ অনুযোগদ্বারসূত্র, হেমচন্দ্র সূরি কৃত টীকা সহ, ১৯৮০ বিক্রম সংবতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ১৪৩ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২ জিনভদ্রগণি প্রণীত বৃহৎক্ষেত্রসমাস মলয়গিরি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৭ বিক্রম সম্বতে ভাবনগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ১। ৮৫ দ্রষ্টব্য।

৩ ঐ, ১। ৩৯১

৪ নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী-প্রণীত গোম্মটসার, কেশববর্ণীকৃত জীবতত্ত্বপ্রদীপিকা, অভয়চন্দ্রকৃত মন্দপ্রবোধিকা এবং টোডরমলজি কৃত হিন্দি ভাষা টীকা সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; জীবকাণ্ড, ১২৫ গাথা।

ণব ছপ্পন্নাসসুন্নণবসদরী'[৫] =৭১০৫৬১৪১৫০ ; 'ছাদালসুন্নসত্তয়বাবন্নং'[৬] = ৫২৭০৪৬ ইত্যাদি[৭]। প্রাচীন জৈন গাথা সাহিত্যেও নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। যথা—'পণসুন্নং চউরাসীয়' = ৮৪০০০০০।

'ছাত্তান্ন তিন্নিসুন্নং পংচেব য ণব য তিন্নি চত্তারি।
পংচেব তিন্নি ণব পংচ সত্ত তিন্নেব তিন্নেব ॥
চউ ছ দ্দো চউ এক্কো পণ দো ছক্কেক্কসোথঅট্ঠেব।
দো দো নব সত্তেব য অংকট্ঠানা পরাহুত্তা ॥'

অর্থাৎ, ৭৯, ২২৮, ১৬২, ৫১৪, ২৬৪, ৩৩৭, ৫৯৩, ৫৪৩, ৯৫০, ৩৩৬। এই সকল গাথা যে কত কালের প্রাচীন, তাহা নিরূপণ করিতে পারি নাই। কোন কোন জৈন গাথা অতি প্রাচীনকালের। এমন কি, কোন কোন আগমগ্রন্থেও গাথার অনুবাদ আছে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা প্রথম দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাইয়াছি, অভয়দেব সূরির (১০৫০ খ্রীস্ট সাল) টীকাতে[৮] এবং অপরটা হেমচন্দ্র সূরির (১০৮৯-১১৭৩ খ্রীস্ট সাল) টীকাগ্রন্থে[৯]। গুণচন্দ্র গণি 'নং দ সিহিবুদ্দ' (= ১১৩৯) বিক্রম সম্বতে আপনার 'মহাবীরচরিয়ম্' রচনা করেন।[১০] বাদিরাজ সূরি 'শাকাব্দে নগবাধিরন্ধ্র' (৯৪৭) গণনে সংবৎসরে' 'পার্শ্বনাথচরিয়ম্' রচনা সমাপ্ত করেন।

মধ্যযুগের জৈন সংস্কৃত সাহিত্য

মধ্যযুগের জৈনগণ সংস্কৃত ভাষায় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ—মৌলিক ও টীকা, উভয় প্রকারেরই রচনা করিতেন। ঐ সকল গ্রন্থে নাম সংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। জৈনাচার্য জিনসেন তৎকৃত 'নেমিপুরাণ' বা 'জৈন হরিবংশ পুরাণে' তাহার বহুল উপযোগ করিয়াছেন। একটা প্রমাণ দিতেছি—

৫ ত্রিলোকসার, ৩১৩ গাথা, [পঞ্চাশদেকচত্বারিংশন্নবষট্ পঞ্চাশচ্ছূন্যং নবসপ্ততিঃ] নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী-প্রণীত ত্রিলোকসার মাধবচন্দ্র ত্রৈবিদ্য-দেবকৃত ব্যাখ্যা সহিত ১৯৭৫ বিক্রম সম্বতে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬ ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা; [ষট্চত্বারিংশচ্ছূন্য-সপ্তকদ্বিপঞ্চাশৎ]

৭ ত্রিলোকসার, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯৩ গাথা দ্রষ্টব্য।

৮ স্থানাঙ্গসূত্র, অভয়দেব সূরি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৫ বিক্রম সম্বতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ৯৫ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯ অনুযোগদ্বার সূত্র, ১৪২ সূত্রের টীকা।

১০ C. D Dalal & L. B. Gandhi, *A Catologue of Manuscripts in the Jaina Bhandaras at Jesalmer*, Baroda, 1923, p. 45.

'স্থান ক্রমাত্রিকং দ্বে চ ষট্ চত্বারি নব দ্বিকং'[১১]

ঐ স্থলে উদ্দিষ্ট সংখ্যা ২৯৪৬২৩। জিনসেন ৭০৫ শকে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। পার্শ্বদেব গণি 'গ্রহরসরুদ্র' (=১১৬৯) বিক্রম সম্বতে 'ন্যায়প্রবেশপঞ্জিকা' রচনা করেন[১২]; শ্রীচন্দ্রসূরি 'কর্ণনয়নসূর্য' (=১২২২) সম্বতে শ্রাবক প্রতিক্রমণ সূত্রবৃত্তি প্রণয়ন করেন[১৩]; রত্নপ্রভ সূরি 'বসুলোকার্ক' (=১২৩৮) সম্বতে 'উপদেশমালা বৃত্তি' রচনা করেন।[১৪] বোম্বাই প্রদেশে প্রাপ্তব্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি বিষয়ক পিটার্সনের পুস্তকে এই প্রকারের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।[১৫] প্রসিদ্ধ জৈন টীকাকার মলয়গিরি 'বৃহৎক্ষেত্র সমাস' ও 'সূর্য প্রজ্ঞপ্তি'র উপর তৎকৃত টীকাতে নাম সংখ্যার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন।[১৬] তিনি দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতকের শেষ ভাগে গুজরাট-রাজ কুমারপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শান্তিচন্দ্রগণি নামে অপর এক জৈন টীকাকারও কতিপয় স্থলে নাম সংখ্যার উপযোগ করিয়াছেন।[১৭] তিনি ১৫৯৫ খ্রীষ্ট সালে জীবিত ছিলেন।

দক্ষিণাগতি

প্রথম প্রবন্ধে অকাট্য প্রমাণ সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নাম সংখ্যা সহায়ে বিজ্ঞাপিত সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে সাধারণতঃ বামাগতি অবলম্বনীয় হইলেও কখনো কখনো দক্ষিণাগতিও অনুসরণ করিতে হয়। তাহাতে উদ্ধৃত প্রমাণ দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীন নহে; হয় ত পঞ্চদশ খ্রীষ্ট শতকের পূর্বকালের নহে। ঐ সময়ে আমি ঐরূপ মনে করিতাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের ধারণাও তাহা দেখিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, 'অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীনত্বের

১১ নেমিপুরাণ, ৫ম সর্গ, ৫৫০ (?) শ্লোক। বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ৭৫ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে।

১২ Dalal & Gandhi, *op. cit* p. 30.

১৩ *Ibid*, p. 21.

১৪ *Ibid.*, p. 40.

১৫ Peterson, *Fourth Report on the Search of Sanskrit Mss in the Bombay Presidency* 'শরঋতুদর্চিঃ শশাঙ্ক'=১৫৬৫ (p 67), 'দ্ব্যঙ্কমনু'=১৪৯১ (p 83), 'বানাষ্টবিশ্বদেব'=১০৮৫, 'বসুবস্বাশা'=১০৮৮, 'বসুবস্বর্ক'=১২৮৮ (p 92), ইত্যাদি।

১৬ বৃহৎক্ষেত্রসমাস টীকা, ১। ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২-৪৫; ৫। ৫-৬, ইত্যাদি। সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি মলয়গিরি কৃত টীকা সহ ১৯৭৫ বিক্রম সম্বতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কতৃর্ক প্রকাশিত; ২০ ২৩ ও ১০০ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭ জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি শান্তিচন্দ্রগণি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৬ বিক্রম সম্বতে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত; ১০৩ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিরোধী।'[১৮] দক্ষিণাগতি কত কালের, ইহা স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রকারান্তরে বোঝা যায় যে, উহা ১৪০৩ খ্রীষ্ট সালের অর্বাচীন বলিয়া তাঁহার ধারণা। যাহা হউক, আমাদের ঐ ধারণা ভুল। কারণ, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতকে মলয়গিরি, দশম শতকে নেমিচন্দ্র, অষ্টম শতকে জিনসেন এবং ষষ্ঠ শতকে জিনভদ্রগণি দক্ষিণাগতির অনুসরণ করিয়াছেন দেখা যায়। বস্তুতঃ 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস' ও 'সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি'র টীকার কুত্রাপি মলয়গিরি বামাগতি অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার মতে 'অষ্টকঃ পঞ্চকঃ সপ্তকঃ শূন্যং দ্বিকঃ চতুষ্কঃ ত্রিকঃ সপ্তকঃ পঞ্চকঃ'[১৯] = ৮৫৭৭০২৪৩৭৫ ; 'ত্রিকঃ চতুষ্কঃ ত্রিকঃ শূন্যং সপ্তকো নবকঃ ত্রিকঃ শূন্যং এককঃ সপ্তকঃ ষট্কঃ'[২০] = ৩৪৩০৭৯৩০১৭৬ ; 'এককো দ্বিকোঽষ্টকস্ত্রিকঃ ষট্কোঽষ্টকো নবকঃ'[২১] = ১২৮৩৬৮৯, ইত্যাদি। নেমিচন্দ্র, জিনসেন এবং জিনভদ্রগণির গ্রন্থে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়েরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নেমিচন্দ্র লিখিয়াছেন,[২২]

'এক্কট্ঠ চ চ য ছস্সত্তয়ং চ চ য সুন্ন সত্ততিয়সত্তা।
সুন্নং ণব পণ পংচ য এক্কং ছক্কেক্কগো য পণগং চ॥'
অর্থাৎ ১৮৪, ৪৬৭, ৪৪০, ৭৩৬, ০৯৫, ৫১৬, ১১৫।
'বিধুনিধিণগনবরবিণভাণিধিণয়ণবলাদ্ধিণিধিখরাহত্থি।
ইগিতীসসুন্নসহিয়া জংবুএ লদ্ধাসিদ্ধত্থা॥'[২৩]

এস্থলে কথিত সংখ্যা ১১৭৯১২০৯২৯৯৯৬৮০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য, বল = ৯, ঋদ্ধি = ৯, খর = ৬। বামাগতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত নেমিচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে আমরা পূর্বেই অনুবাদ করিয়াছি। এই প্রকার আরও দেওয়া যাইতে পারে।[২৪] জিনসেন বলেন—

১৮ প্রবাসী, ১৩৩৬ সাল, পৌষ ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

১৯ বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১।৩৬ (টীকা)

২০ ঐ, ১।৫৮ (টীকা)

২১ সূর্য প্রজ্ঞপ্তি, ২০ সূত্র (টীকা)

২২ গোম্মটসার, ৩৫৬ গাথা

একাষ্টচ্চ চ ষট্সপ্তকং চ চ চ শূন্য সপ্তত্রিকসপ্ত।
শূন্যং নব পঞ্চ পঞ্চ চ একং ষট্কেকশ্চ পঞ্চ কং চ॥

২৩ ত্রিলোকসার, ২১ গাথা

বিধুনিধিনগনবরবিনভোনিধিনয়ন বলর্দ্ধিনিধিখরহস্তিনঃ।
একত্রিংশচ্ছূন্যসহিতাঃ জম্বোলব্ধসিদ্ধার্থাঃ॥

২৪ গোম্মটসার, জীবকাণ্ড, ৬২৫ গাথা ; ত্রিলোকসার, গাথা ২৫, ২৮, ৭৫০

'একমষ্টৌচ চত্বারি চতুঃ ষট্‌সপ্তভিশ্চতুঃ ।
চতুঃ শূন্যং চ সপ্তত্রিসপ্তশূন্যং নবাপি চ ॥
পঞ্চ পঞ্চৈকং ষট্‌ চ তথৈকং পঞ্চ তত্বতঃ ।
সমস্ত শ্রুত বর্ণানাং প্রমাণং পরিকীর্তিতং ॥'[২৫]

অর্থাৎ ১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬১৫ । জিনভদ্রগণির মতে 'দুবীস চোয়াল সুন্নট্‌ঠ' [২৬] =২২৪৪০০০০০০০০ ; 'ইগবন্না চউবীসং অট্‌ঠ সুন্ন' [২৭] =৫১২৪০০০০০০০০ ; 'বত্তীসংদো সুন্না চউরো সুন্নট্‌ঠ'[২৮] = ৩২০০৪০০০০০০০০; ইত্যাদি । বামাগতির দুইটী দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 'বৃহৎক্ষেত্রসমাসে'র অপর কুত্রাপি নাম সংখ্যায় বামাগতি অনুসৃত হয় নাই । সর্বত্রই দক্ষিণা গতি । কেহ শঙ্কা করিতে পারেন, ঐ দুই স্থলেও দক্ষিণাগতি অনুসরণ করা যাইতে পারে নাকি ? না, সেই উপায় নাই । তথায় বামাগতি ধরিতেই হইবে, তাহার অকাট্য কারণ আছে । একটার প্রমাণ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল । বস্তুতঃ ঐ সকল গণিত বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই । জৈনশাস্ত্র মতে ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের আকৃতি একটা বৃত্তাংশের ন্যায় ।
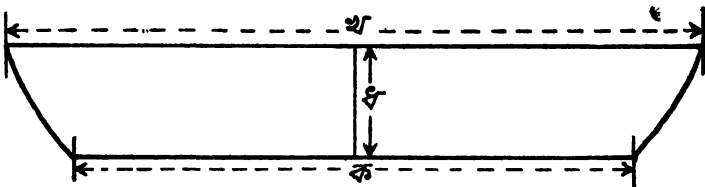
তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তারের পরিমাণ এই দেওয়া আছে,[২৯]

ক$_{২}$ = ৪১৪৯০০৯৭৫০০ বর্গকলা

খ$_{২}$ = ৭৫৬০০০০০০০০ বর্গকলা ।

ব = ৪৫২৫ কলা ।

---

২৫ নেমিপুরাণ, ১০ সর্গ, ৩৯-৪০ শ্লোক ; পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপির ১৩৩ ম পত্রের ২য় পৃষ্ঠা ।

২৬ বৃহৎক্ষেত্র সমাস, ১ । ৬৯

২৭ ঐ, ১ । ৭০

২৮ ঐ, ১ । ৭১

২৯ ...সত্তাণউই সহস্‌স পংচসয়া ।
অউণাপন্নং কোড়ি ইগয়ালীসং চ কোড়িসয়া ॥ ৬৮
পণসয়রী ছক্ক অট্‌ঠসুন্নাইং ৬৯
—বৃহৎক্ষেত্রেসমাস, ১ম অধ্যায় ।

ঐ প্রকার বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল গণনা করিবার জন্য জিনভদ্রগণি এই নিয়ম দিয়াছেন,[৩০]

$$ক্ষেত্রফল = \sqrt{\frac{ক^২ + খ^২}{২}} \times ব$$

উত্তরার্দ্ধ ভারতবর্ষের ক্ষেত্র ফল গণনা করিতে হইলে, এই নিয়মে তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তারের প্রমাণাঙ্ক প্রয়োগ করিতে হইবে। অধুনা

$$\sqrt{\frac{ক^২ + খ^২}{২}} = \sqrt{৫৮৫৪৫০৪৮৭৫০}\ কলা,$$

$$= ২৪১৯৬০\ \frac{৪০৭১৫০}{৪৮৩৯২০} কলা,$$

$$= ২৪১৯৬০\ \frac{৪০৭১৫}{৪৮৩৯২} কলা,$$

এই বৃহৎ ভগ্নাংশকে জিনভদ্রগণি এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন[৩১],

'কল লখ্ক দুগং ইয়াল সহস্‌সা ণব সয়া সঠহিয়া।
সুন্নমবণেউ অংসং চউ সুন্নগ সত্ত এগ পণ ॥
ছেউ চউ অট্‌ঠ তিন ণব দুগা য বাহে স উত্তরদ্ধস্‌স।'

এ স্থলে অঙ্কপাতে সর্বত্র দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। উত্তরার্দ্ধ ভারতবর্ষের

$$ক্ষেত্রফল = ২৪১৯৬০\frac{৪০৭১৫}{৪৮৩৯২} \times ৪৫২৫\ বর্গকলা$$

$$= ২৪১৯৬০ \times ৪৫২৫ + \frac{৪০৭১৫ \times ৪৫১৫}{৪৮৩৯২}\ বর্গকলা,$$

$$= ১০৯৪৮৬৯০০০ + \frac{১৮৪২৩৫৩৭৫}{৪৮৩৯২}\ বর্গকলা,$$

এই ভগ্নাংশে লবের উল্লেখ করিতে গিয়া জিণভদ্রগণি বলিয়াছেন[৩২]—

'পণ্ সত্তগ তিগ পণ তিগ দুগ চউট্‌ঠিক্কো।'

সুতরাং ইহাতে যে বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সংশয়ই থাকিতে পারেনা। জিনভদ্র গণির ব্যবহৃত

৩০ বৃহৎক্ষেত্র সমাস, ১। ৬৬
৩১ ঐ, ১। ৮৩-৮৪
৩২ ঐ, ১। ৮৫

বামাগতির অপর দৃষ্টান্তও এই প্রকার নিঃসংশয়। তাহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই।

দক্ষিণাগতির এতদপেক্ষাও প্রাচীন একটা দৃষ্টান্ত আছে। একটা বৃহৎ সংখ্যার—কত বৃহৎ অধুনা বলা যায় না ; কারণ মূলের কতকাংশ ত্রুটিত হইয়া গিয়াছে—উল্লেখ করিতে 'বখ্শালী গণিত কর্তা বলিয়াছেন—৩৩

'ষড়্‌বিংশশ্চ ত্রিপঞ্চাশ একোনত্রিংশ এব চ।
দ্বাষ (ষ্টি) ষড়্‌বিংশ চতুশ্চত্বারিংশ সপ্ততি ॥
চতুঃষষ্টি ন (ব)………………২ শানন্তরম্ ।
ত্রিরশীতি একবিংশ অষ্ট………...পকং ॥"

ঐ গ্রন্থে ইহাকে অঙ্কেও প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা—

'২৬৫৩২৯৬২২৬৪৪৭০৬৪৯৪…………৪৩২১৮'

সুতরাং এস্থলে যে দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাত করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'বখ্শালীগণিত' খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট সালের প্রারম্ভে, অথবা তাহার অনতিকাল পরে রচিত হইয়াছিল।৩৪ পরবর্তীকালেও দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শান্তিচন্দ্রগণি (১৫৯৫) একমাত্র ঐ ক্রমেই সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। অসমীয়া ভাষার এক গণিত গ্রন্থে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়ই যথেচ্ছ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।৩৫

৩৩ The Bakhshali Manuscript—*A Study in Mediæval Mathematics*, Parts I & II, etdited by Q. R. Kaye, Calcutta, 1927, p. 58, প্রথম দিক।

৩৪ Bibhutibhusan Datta, 'The Bakhshali Mathematics''. *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. 21 pp. 1-60. বিশেষ ভাবে ৫০-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৫ কাঙ্কিনাথ প্রণীত 'ধীরমোহিনী অঙ্কার্যা', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯, ১-৮ পৃষ্ঠা। কাঙ্কিনাথের ব্যবহৃত নাম সংখ্যা কতকটা কৌতুককর। তিনি লিখিয়াছেন,

মুনি অম্বর পাখা পাখা।
বাণ চন্দ্রদিব লেখা॥
ঘোড়া ছিত দিবা বাম।

অর্থাৎ ১৫২২০৭ × ৭৩ = ১১, ১১১, ১১১

নবগ্রহ অষ্টবসু সপ্ত সাগর ষড়্‌রস বাণ।
বেদ রাম করো নবান্তক অঙ্ক ইহাকে জান ॥

অর্থাৎ ৯৮৭৬৫৪০২

সসি রামবাণ অষ্টবসু সুন্য কর বেদ।
সড়্‌রস নবগ্রহ শসি কর জান॥

অর্থাৎ ১৫৮০২৪৬৯১২।

বিষম সংশয়

এইরূপে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে নাম সংখ্যা প্রণালীতে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়ই অনুসৃত্ত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে এক বিষম সংশয় উপজাত হয়। সংখ্যাবাচক বাক্য বিশেষকে অঙ্কে পাত করিতে কোন গতি অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের উপায় কি? সংস্কৃত সাহিত্যে একটা বিধি পাওয়া যায়, 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' বা 'অঙ্কস্য বামাগতি' কিন্তু এই বিধি যে সর্বক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে, তাহা পূর্বে উপস্থাপিত প্রমাণ হইতেই নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ গূঢ় ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, নাম সংখ্যা প্রণালীতে দক্ষিণাগতি ব্যবহারের যত প্রমাণ এই পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রায় সমস্তই প্রাকৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে অথবা প্রাকৃত গ্রন্থের সংস্কৃতে রচিত টীকা হইতে, অথবা জৈনাচার্যদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে। সেই হেতু সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত সংখ্যা বাক্যে না হয় বামাগতি বিধি মানা যাইবে। কিন্তু অন্যত্র কি কর্তব্য? মলয়গিরি ও শান্তিচন্দ্রগণি নাম সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কচিহ্ন দ্বারাও উদ্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের লেখাতে সংশয়ের স্থান নাই।

কোন কোন স্থলে ভিন্নোপায়ে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কোন গতি অনুসর্তব্য। যথা মহাভারতের বিরাটপর্বের কাশীরাম দাসকৃত ভাষান্তরের সমাপ্তিকাল— 'চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়' (= ১৫২৬); যোধরাজের 'হাম্মির রাসো'র রচনাকাল 'চন্দ্রনাগবসুপঞ্চ' (= ১৭৮৫) সম্বৎ; জয়-বিজয়গণি প্রণীত 'সম্মেত শিখর রাসে'র রচনাকাল 'শশিরসসুরপতি' (= ১৬১৪) বিক্রম সম্বৎ এবং প্রীতি-বিমল সূরি প্রণীত 'চম্পকশ্রেষ্ঠীকথা'র রচনাকাল 'শশিরস বাণাগ্নি' (= ১৬৫৩) সম্বৎ। বর্তমানে প্রচলিত শক ও সম্বৎকাল জানি বলিয়াই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এ সকল স্থলে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে, বামাগতি নহে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এখানে বিভ্রাটে পড়িবেন। নেমিচন্দ্রের গ্রন্থে আছে, 'খ বার ইগিদালং' ৩৬ (= ৪১১২০), 'গয়ণতিহগতেবণ্ণং' ৩৭ (= ৫৩২৩০)। এই সকল স্থলে যে বামাগতিক্রমে অঙ্কপাত করিতে হইবে, তাহা নিঃসংশয়। কারণ, অঙ্কের বামে শূন্য থাকিতে পারে না। সেই কারণেই তৎপ্রদত্ত অপর এক দৃষ্টান্তে দক্ষিণাগতি ধরিতে হইবে। যথা—'সত্তরসং বাণউদী নভণব সুন্নং ৩৮(= ১৭৯২০৯০)। তাঁহার অপর কয়েকটি দৃষ্টান্ত অন্য

৩৬ ত্রিলোকসার, ৩৪৭ গাথা, [খ দ্বাদশ এক চত্বারিংশৎ]

৩৭ ঐ, [গগনত্রিদ্বিকত্রিপঞ্চাশৎ]

৩৮ ঐ, ৭৫০ গাথা; [সপ্তদশ দ্বানবতিঃ নভোনবশূন্যং]

রকমে যাচাই করা যায়। তিনি জম্বুদ্বীপের পরিধির পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছেন ৩৯—

'জোয়ণসগদুদু ছাক্কিগি তিদয়ং' ইত্যাদি ;

এবং তাহার ক্ষেত্রফলের পরিমাণ৪০—

'পন্নাসমেকদালং ণব ছপ্পন্নাসসুন্নণবসদরী' ইত্যাদি।

জম্বুদ্বীপের পরিধি ও ক্ষেত্রফল গণনা করিবার নিয়ম তিনি দিয়াছেন। সেই নিয়মে গণনা করিয়াই নিরূপণ করা যায় যে, এ সকল স্থলে বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। জিনভদ্রগণি সর্বত্র দক্ষিণাগতি ধরিলেও দুই স্থলে যে বামাগতি ধরিয়াছেন, তাহাও অঙ্কগণনা দ্বারা বুঝিতে পারি। কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও আছে, যে সকল স্থলে সংশয় নিরসনের কোন সহজ উপায় নাই।

কবি চণ্ডিদাসের একটা পদে নাকি আছে৪১—

'বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রসগীত পরিমাণ॥'

বিধু = ১, নেত্র = ৩, পঞ্চবান ৫ × ৫ = ২৫। দক্ষিণাগতিতে হয় ১৩২৫। এখানে বামাগতি হইতেই পারে না। কিন্তু 'নবহুঁ নবহুঁ রস' = ৯৯৬, না ৬৬৯? 'শোভনস্তুতি' টীকাকার জয়বিজয়গণি আপনার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,৪২—

'শ্রীবিজয়সেন সূরীশ্বরস্য রাজ্যে সুযৌবরাজ্যে তু।
শ্রীবিজয়দেব সূরেরিন্দুরসাশ্বীন্দুমিত বর্ষে॥'

এ স্থলে 'ইন্দুরসাশ্বীন্দু' = ১৬৭১, না ১৭৬১? শ্রীযুক্ত হীরালাল রসিকদাস কাপড়িয়া বিশেষ বিচার সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দক্ষিণাগতিক্রমে ১৬৭১ সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

[ক্রমশঃ

৩৯ ঐ, ১২ গাথা, [যোজনানাং সপ্তদ্বিদ্বিষডেকং ত্রয়ং]

৪০ ঐ, ৩১৩ গাথা, [পঞ্চাশদেকচত্বারিংশন্নবষট্ পঞ্চাশ চচ্ছূন্যং নবসপ্ততিঃ]

৪১ প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৭৭৪ পৃষ্ঠা।

৪২ এইটি এবং অপর কতিপয় দৃষ্টান্তের সন্ধান আমি বোম্বাই নগরীবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল রসিকদাস কাপডিয়ার নিকট পাইয়াছি। তিনি 'শোভনস্তুতি'র এক সংস্করণ মুদ্রিত করিতেছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ সাধারণে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহার অংশ বিশেষ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

মনে পড়ে

[ভগবান মহাবীর ক্রীতদাসী চন্দনবালাকে দাসত্ব হতে মুক্ত করে শ্রমণী সংঘে প্রমুখ স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ঘটনার আড়াই হাজার বছর পরেও কি আমরা তাদের সত্য সত্যই বন্ধ মুক্ত করতে পেরেছি? সেই কথা স্মরণ করে—]

মনে পড়ে—
কৌশাম্বীর পথে পথে
যেদিন ফিরিতেছিলে
ভিক্ষাপাত্র করে
সেদিন আমিও ছিলাম তব পাশে
ঘরে ঘরে
আমিও ফিরেছি লয়ে
ভিক্ষাপাত্র করে।

মনে পড়ে—
মানবীর বেদনায়
সকরুণ আর্দ্র তব চোখ,
মনে পড়ে—
প্রদোষের বিষণ্ণ আলোক,
ছায়াছন্ন বনান্ত নির্জন,
বার বার ফিরে আসা
রিক্তপাত্র, শূন্য মন।

ভিক্ষা পাত্র করে
সেদিন ফিরেছি ঘরে ঘরে।

ভিক্ষাপাত্র করে
আজো আমি ফিরি প্রভু
ঘর হতে ঘরে।

সায়াহ্নের রক্ত রাগে
সে বেদনা আজো বক্ষে জাগে,
সকরুণ তব চোখ
আজো যেন দেখি অপলক,
কোথা এর শেষ ?

অনির্দেশ
ভিক্ষাপাত্র করে
আজো আমি ফিরি ঘরে ঘরে।

সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যে কয়েকজন জৈন লেখক ও তাঁহাদের রচনা

ডাঃ রামজীবন আচার্য

গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক বর্ধমান মহাবীর ভারতভূমিতে জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন। বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত চব্বিশজন তীর্থঙ্করের শেষতম হইলেন মহাবীর। জৈনধর্ম বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে জৈনদর্শনও গড়িয়া উঠিতে থাকে। উমাস্বামী, শ্রুতসাগর, কুন্দকুন্দ, প্রভাচন্দ্র, সমন্তভদ্র প্রভৃতির জৈন দার্শনিক গ্রন্থ সমুল্লেখ্য।

জৈনদর্শনগ্রন্থের কথা বাদ দিলেও বহু জৈনলেখক বিবিধ সময়ে আবির্ভূত হইয়া সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। শ্রব্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, উপাখ্যান, চম্পূ প্রভৃতি সাহিত্যশাখায় জৈন লেখকবৃন্দের রচনা প্রসৃত হইয়া আছে।

নবম খ্রীষ্টাব্দের রচয়িতা জিনসেন হরিবংশ, আদিপুরাণ, পার্শ্বাভ্যুদয় প্রভৃতি রচনা করেন।

দশম খ্রীষ্টাব্দের জৈন লেখকগণের মধ্যে সোমদেব, সিদ্ধর্ষি, অমিতগতি, ধনপাল প্রভৃতির নাম সমুল্লেখ্য। সোমদেব চালুক্যাধিপতি অরিকেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া যশস্তিলক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি সংস্কৃত চম্পূশ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গদ্য-পদ্য উভয়ের দ্বারা বাহিত এই গ্রন্থ জৈনধর্ম ও মতবাদ ইত্যাদিকে উচ্চে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সিদ্ধর্ষি উপমিতিভব প্রপঞ্চকথা নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সংস্কৃত উপাখ্যান সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। অমিতগতি দিগম্বর জৈনশাখার এক কবি। সুভাষিতরত্নসন্দোহ ইঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থ। সংস্কৃত সংগ্রহমূলক কাব্যে সুভাষিত রত্নসন্দোহ এক অমূল্য সংযোজন। ধনপাল রচিত তিলকমঞ্জরী সংস্কৃত গদ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। ধনপাল ধারাধিপতি মুঞ্জের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। নায়িকা তিলকমঞ্জরীর নামে ধনপাল গ্রন্থটির নাম-করণ করিয়াছেন। তিলকমঞ্জরী ও সমরকেতুর প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। ধনপাল তিলকমঞ্জরীতে বাণ, ভবভূতি, রাজশেখর, রুদ্র প্রভৃতি কবির উল্লেখ করিয়াছেন।

জৈন লেখকবৃন্দের মধ্যে হেমচন্দ্র বহু গ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার গুরুর নাম দেবচন্দ্র। চালুক্যরাজ জয়সিংহের রাজত্ব সময়ে ইনি বর্তমান ছিলেন। আহমদাবাদের ধন্ধুক নামক স্থানে ইঁহার জন্ম। অদ্ভুত প্রতিভার-অধিকারী হেমচন্দ্র সূরি তাঁহার গ্রন্থরাজির দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

১. কাব্যানুশাসনবৃত্তি—হেমচন্দ্রের ভারতীয় অলঙ্কার ও নন্দনতত্ত্ব জ্ঞানের দিগ্‌দর্শন। ভারতীয় অলঙ্কার ও রসগ্রন্থগুলির মধ্যে হেমচন্দ্রের এই গ্রন্থ সমুজ্জল হইয়া থাকিবে।

২. ছন্দোঽনুশাসনবৃত্তি—হেমচন্দ্ররচিত প্রাকৃতে ছন্দবৈচিত্র্যের অপূর্ব গ্রন্থ।

৩. অভিধান চিন্তামণি ও দেশীনামমালা—ভাষা ও কোষগ্রন্থ।

৪. অনেকার্থসংগ্রহ, নিঘণ্টুশেষ—ভাষা ও কোষগ্রন্থ।

৫. দ্ব্যাশ্রয় মহাকাব্য—হেমচন্দ্র বিরচিত শ্লেষপ্রধান মহাকাব্যে মহাকবি ভট্টির রাবণবধ মহাকাব্যের রচনাশৈলীর অনুসৃতি দৃষ্ট হয়।

৬. প্রমাণ পরীক্ষা—ন্যায় বিষয়ক গ্রন্থ।

৭. পরিশিষ্ট পর্ব ইত্যাদি হেমচন্দ্রের অন্যান্য রচনা।

সাহিত্যতত্ত্ব, ছন্দ, মহাকাব্য, ভাষা ও কোষগ্রন্থ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে হেমচন্দ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার তদানীন্তন লেখকসমাজে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থনিচয় পাঠে তাঁহার 'কলিকালসর্বজ্ঞ' উপাধিকে যথার্থ বলিয়া মনে হয়।

হেমচন্দ্রের শিষ্যের নাম রামচন্দ্র। তাঁহার রচিত নাট্যগ্রন্থ নির্ভয়ভীমব্যায়োগ। গ্রন্থটি নাট্যশাখার ব্যায়োগশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রামচন্দ্ররচিত নির্ভয়ভীমব্যায়োগ মহাকবি ভাসপ্রণীত মধ্যমব্যায়োগ নাট্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্যায়োগ প্রকল্প নাট্য। জৈন কবি বিজয় পালের দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে এক অভিনব যোজনা। দাক্ষিণাত্যের কবি হস্তিমল্লের কাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। যশশ্চন্দ্র নামক নাট্যকার প্রকরণ শাখার এক নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাহার নাম মুদিতকল্যাণপ্রকরণ। প্রকরণ দশম অঙ্কের নাট্য গ্রন্থ।

মলয়সুন্দরীকথা কথাশ্রেণীর সংস্কৃত সাহিত্যে এক উপাদেয় গ্রন্থ। গ্রন্থকারের পরিচয় অনুল্লিখিত। রাজকুমার মহাবল ও রাজকুমারী মলয়সুন্দরীর প্রেম-প্রণয় এবং পরিশেষে সন্ন্যাসগ্রহণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিমূলক গীতিকাব্যে নবম খ্রীষ্টাব্দের জৈন লেখক শোভনের শোভনস্তুতি ও একাদশ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত হেমচন্দ্রের বীতরাগ্যস্তাত্র সমুল্লেখ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রবন্ধ চিন্তামণি চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দের লেখক মেরুতঙ্গবিরচিত এক মূল্যবান গ্রন্থ। সংস্কৃত উপাখ্যান সাহিত্যে এই গ্রন্থের এক বিশেষ স্থান আছে।

কেবল ধর্মাদর্শের মধ্যে নিহিতবুদ্ধি না থাকিয়া বহু বহু জৈনমনীষী কাব্যসর্জনায় আত্ম-নিয়োজন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের কয়েকজনের মাত্র কথা এখানে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। সে কথা আবার বিস্তৃত নয়, সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইল। ধর্মমতের কথা না ধরিলেও জৈনলেখকগণের রচনারাজির উদ্ধার, পুনঃ প্রকাশ ও প্রচার প্রাচীন ভারতীয় মনীষীর পরিচায়ন-স্বরূপে কাজ করিবে।

বীরভূমে জৈন প্রভাব

শ্রীঅরুণ চৌধুরী

বর্তমান বীরভূম মূলতঃ প্রাচীন রাঢ়ভূমির উত্তর ভাগের অন্তর্গত। গঙ্গার দক্ষিণ দিক থেকে দামোদরের উত্তর তীর পর্যন্ত ছিল 'উত্তির লাডম' বা উত্তর রাঢ়ের এলাকা। এর আরেক নাম সুহ্ম। বীরভূম প্রাচীন সুহ্ম ভূমির অন্তর্ভুক্ত। আজ এ জিলার এলাকাধীন অঞ্জন নদের তীরে সুহ্মেশ্বরী দেবীর মূর্তি রয়েছে; রয়েছে তাঁর সুপ্রাচীন মন্দির। ঐ মন্দির ও মূর্তির দ্বারা সুহ্মের সাথে বীরভূমের সংস্রব সুপ্রমাণিত বলা যায়। বাংলার সর্বত্রই আর্য সংস্কৃতি এবং প্রাক্‌আর্য সংস্কৃতি ধারার মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয় ঘটেছে। এই মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের একটি অন্যতম পীঠস্থান বর্তমান বীরভূম জিলা। আজও এর জন-সমাজে এবং জন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে ঐ সমন্বয়ের সন্ধান মিলবে। এ জিলার পূজা-পার্বণ, জনগণের ধ্যান-ধারণা, আচার-বিচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেই এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অবশ্য বহুদিকের বিবরণ এখনও সংগৃহীত হয়নি। তা সময় ও সুদীর্ঘ পরিশ্রম সাপেক্ষ। তা যদি কখনও হয়, তবে ঐ সমন্বিত রূপের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কন সম্ভবপর হতে পারে। সেই অপূর্ণতার কথা স্মরণ রেখেও আজও যদি এ জিলার জন জীবনের দিকে অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি নিয়ে তাকানো যায়, সামান্য খোঁজ খবরও নেওয়া যায়, এ জিলার বহু মন্দির, কিংবা মাঠে ঘাটে পুকুর পাড়ে পড়ে থাকা প্রাচীন মূর্তির অথবা এ জিলার জনপদ, পুকুর, পরিত্যক্ত ভিটার কিয়দংশের বিষয়ে অনুসন্ধান করা যায়, তাহলেও বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে। ঐ সব তথ্যাদি পূর্ণাঙ্গ বাঙালীর ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ মালমসলাও সরবরাহ করতে পারবে।

এ জিলার জন সংস্কৃতিতে নিষাদ বা দাস-দস্যুদের সংস্কৃতির প্রভাব অসামান্য। এ জিলার জন সংখ্যার বিপুল অংশ হাড়ি, ডোম, মাল, বাগ্‌দী, কেওট, বাউড়ি, ভল্লা, লেট, রাজোয়ার, খয়রা, ঢেকর প্রভৃতি। এরা সকলেই যে প্রাচীন নিষাদ জাতির বংশধর বা তাদের সংস্কৃতির ধারক-বাহক, এটাও সুপ্রমাণিত। ঐ নিষাদ সংস্কৃতির সাথেই পরবর্তীকালে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক বা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নান জাতীয় ধ্যানধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছে। একে অপরের কাছ থেকে নিয়েছে এবং সে ভাবেই এক মিশ্রিত রূপ খাড়া রয়েছে। নিষাদের পূজিত মনসা, ধর্ম ঠাকুর, চণ্ডী প্রভৃতিও আজ উচ্চবর্ণে হিন্দু সমাজে পূজা পায়। আবার আর্য সংস্কৃতির ধারক ঐ সব ধর্মমতকেও নিষাদ সংস্কৃতির উত্তর সাধকেরা মেনে নিয়ে আপোষ করেছে।

এই আপোষ, মিলন মিশ্রণের চুলচেরা বিচার সর্বক্ষেত্রে করা না গেলেও সামান্য বিশ্লেষণেই বহু উপাদান যে খুঁজে পাওয়া যাবে, একথাও বলা চলে।

বীরভূম প্রাচীন রাঢ়ভূমির উত্তর ভাগের অন্তর্গত, একথা আগে উল্লেখ করেছি। রাঢ়ভূমিতে জৈন ধর্ম প্রচারার্থে মহাবীর বা বর্ধমান সশিষ্যে এসেছিলেন, একথা আয়ারাঙ্গ বা আচারাঙ্গ সূত্রে উল্লেখিত। ধর্ম প্রচারক মহাবীরকে রাঢ়বাসী বাধা দিয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে 'ছু' 'ছু' শব্দ করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। রাঢ়ভূমিতে (বজ্রভূমি ও সুহ্ম ভূমি) ধর্মপ্রচারে প্রবল বাধা পেলেও তিনি সুদীর্ঘ বারো বছর এখানে ছিলেন। এখানে যে জৈন ধর্ম প্রচারিতও হয়েছিল, বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত জৈন মূর্তিগুলি তার অন্যতম সাক্ষ্য। তাছাড়া, বর্ধমান নামকরণের সাথে অনেকে মহাবীর বা বর্ধমানের সংস্রবের কথা বলেন। জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস যে 'গোদাস-গণ' প্রতিষ্ঠা করেন তা কালক্রমে চার শাখায় বিভক্ত হয়, তাম্রলিপ্তিক, কোটিবর্ষীয়, পুণ্ড্রবর্ধনীয় প্রভৃতি তন্মধ্যে অন্যতম। সবগুলিই বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদ। তাম্রলিপ্ত দক্ষিণ বঙ্গের এলাকা, কোটিবর্ষ ও পুণ্ড্রবর্ধন উত্তর বঙ্গের এলাকা। আরেকটি শাখার নাম খব্বড়িয়া। সেটিও কোন স্থানের (জনপদের) নাম হওয়াই স্বাভাবিক এবং ঐ জনপদ রাঢ়ভূমির কোথাও অবস্থিত হবে বলেও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। খব্বড়িয়া কি বর্তমান বীরভূমের খড়বোনা? খড়বোনার সরাক নামক সম্প্রদায় অতীতে জৈন ধর্মাবলম্বী শ্রাবক বা গৃহস্থ জৈন ছিল বলেই মনে হয়।

বসন্ত বিলাস গ্রন্থের দশম সর্গে দেখা যায়, চালুক্য রাজ বীরবলের মন্ত্রী বাস্তুপাল (১২১৯-১২৩৩ খৃঃ অব্দ) যখন একবার জৈনতীর্থ পরিক্রমায় বের হন, তখন তাঁর সাথে গিয়ে ছিলেন লাট, গৌড, মরু, ধারা, এবং বঙ্গের সংঘপতি গণ। এই লাট 'রাঢ়'-এর অপভ্রংশ হওয়াই স্বাভাবিক, তাহলে তেরো শতকেও রাঢ়ে জৈন সংঘ ছিল, এ অনুমান করা চলে। অবশ্য রাঢ়ে জৈন বিহারের কোন নিদর্শন এখনও অনাবিষ্কৃত। একমাত্র পৌণ্ড্রবর্ধনের জৈন বিহার বাংলদেশে জৈন বিহারের নিঃসন্দিগ্ধ নিদর্শন। তেরো শতকে রাঢ়ে জৈন সংঘ থাকলে, বীরভূমেও তখন জৈন প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। কারণ বীরভূম রাঢ়ের অন্যতম বিভাগ।

বীরভূমে জৈন ধর্মমত যে চালু হয়েছিল, পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে তা ধরা পড়ে। এ জিলায় জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতেরই সাক্ষ্যবাহী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় জৈন ধর্মমতের তুলনায় বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন সমধিক। সামগ্রিকভাবেই বাংলা দেশের এই চিত্র। এ জিলায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তির সংখ্যা অনেক। জিলার বহু মন্দিরে, নানা স্থানে প্রাপ্ত মূর্তিতে, আচারে আচরণে, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও পূজাপার্বণে এমন কি নরনারীর নামে পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাবের নজির পাওয়া যায়।

সমাজের নিম্নকোটির নিষাদ সংস্কৃতির ধারক বাহক বাউড়ি ও মাল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও 'শ্রীমতী', 'দ্বারবাসিনী' প্রভৃতি প্রাচীন নাম খুঁজে পাওয়া যায়। এ জিলায় জৈন ধর্মমত খুববেশী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল কিনা তা বলা দুরূহ। বিশেষতঃ জৈন ধর্মমত হিন্দুধর্মের মধ্যে অতি সহজেই আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়েছিল। একারণে অতীতে ধর্মমতের প্রভাব প্রতিপত্তি কতখানি ছিল তা নিরূপণ করা সুকঠিন। তবু, ঐ ধর্মমতের প্রচার ও প্রসার যে এই জিলায় হয়েছিল, তার প্রমাণোপযোগী মালমসলা দুষ্প্রাপ্য নয়।

এ জিলার বহু স্থানেই প্রাচীন জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, তান্ত্রিক বা বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। আগেই বলেছি, তার মধ্যে কিছু সংখ্যক জৈন মূর্তিও আছে। ঋষভনাথ বা আদিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতির মূর্তিই সাধারণতঃ পাওয়া গিয়েছে। এখনও মল্লারপুর গ্রামের উপান্তস্থিত মল্লেশ্বর শিব (সিদ্ধনাথ) মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন পুরুষ মূর্তি দেখা যায়। ওই পুরুষ মূর্তিটি দুই হাত উত্তানভাবে জানুদ্বয়ের উপরে ন্যস্ত রেখে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট। পাদপীঠে দুইটি কুকুর অল্প কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি কুকুরদ্বয় অপহৃত হয়েছে। ঐ মূর্তিটি কোন জৈন তীর্থংকরের বলেই অনুমিত হয়। মহাবীর বা বর্ধমান রাঢ়ে ধর্মপ্রচারে এসে কুকুরের উপদ্রবে অস্থির হয়েছিলেন। উল্লিখিত কুকুর দ্বয় তারই দ্যোতক হওয়াও অসম্ভব নয়। তাছাড়া ঐ মন্দিরের শিবকেও সিদ্ধনাথ বলা হয়, যদিও তাঁর আলাদা মূর্তি আছে। জৈন ধর্মাবলম্বীরা পালযুগের পরে হিন্দু সমাজের মধ্যে যখন ক্রমবিলীন হয়ে যায়, তখন সিদ্ধ, কাপালিক, অবধূত প্রভৃতি উলঙ্গ সম্প্রদায়ের মাঝেই তারা লীন হয়, সেক্ষেত্রে সিদ্ধনাথ নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি?

বীরভূমের একান্ত সন্নিকটবর্তী নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথের কাছে তাঁতি বিরল গ্রাম অবস্থিত। তারই পাশে আরেকটি গ্রামের নাম জিনদিঘী। তাঁতি বিরল ও জিনদিঘীর মাঝামাঝি যায়গায় সুবৃহৎ জিনদিঘী নামক দিঘী অবস্থিত। এজন্যই গ্রামের নাম জিনদিঘী। এখন জিনদিঘীর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এ গ্রামে অনেক প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। তবে তা ভাঙা-চোরা। এই জিনদিঘী নাম জৈন সংস্রবের কথা উল্লেখ করেছেন বীরভূম বিবরণের রচয়িতা শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মনে হয় এই সংস্রবও নিতান্ত কষ্ট-কল্পনা নয়। এর মধ্যে ঐতিহাসিক যাথার্থ্য থাকাই স্বাভাবিক।

এর আগে রামপুর হাটের সন্নিকটস্থ খড়বোনার কথা বলেছি। খড়বোনাকে গোদাসগণের অন্যতম খর্ব্বাডিয়া শাখার সাথে সংযুক্ত করার কথা ভাবা যেতে পারে। এখানে 'সরাক' নামক এক সম্প্রদায় আছে, তাঁরা নিরামীষ আহারী। মাছমাংস কিছু খায় না। এমন কি শিশুরাও নয়। এদের উপাধি হল দত্ত, রক্ষিত, প্রামানিক, সিংহ,

দাস প্রভৃতি। এই সরাক শব্দ শ্রাবক থেকে আসা অসম্ভব কি? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানেও সংস্কৃত 'শ্রাবক' শব্দ থেকেই শরাক বা সরাক শব্দের উৎপত্তি বলা হয়েছে। জৈনধর্মে শ্রমণ (সন্ন্যাসী) ছাড়াও গৃহীদের ঠাঁই ছিল। এই গৃহীরাই হল শ্রাবক। নরনারী উভয়েই শ্রাবক বা শ্রাবিকা হতে পারত। জৈন সংঘে এই গৃহীদের ঠাঁই দেওয়া মহাবীরের একটি বিশেষ অবদান। এর ফলে জৈন ধর্মের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা বাড়ে। মনে হয়, খড়বোনার এই সরাকেরা সেই গৃহী জৈন শ্রাবকদেরই উত্তর-পুরুষ। গোতমঋষি, অধুঋষি, অনন্তঋষি, কাশ্যপ, আদিদেব—সরাকদের এই হল গোত্র বিভাগ। স্মরণীয় যে মহাবীর সমস্ত শ্রমণ সংঘকে এগারোজন গণধর বা সংঘ-নায়ক মধ্যে ভাগ করে দেন। এই গণধরদের প্রধান ছিলেন ইন্দ্রভূতি গোতম নামক ব্রাহ্মণ তনয়। মহাবীরের মৃত্যুর পর গণধর ইন্দ্রভূতি গোতম বারো বৎসর সংঘ নায়কত্ব করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু সরাক সম্প্রদায়কে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলনের ফল মনে করেছেন। [বীরভূম বিবরণ, ২য় খণ্ডের ভূমিকা] পরবর্তীকালে সংমিশ্রণ ঘটা বা সমন্বিত রূপের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে মূলতঃ যে এরা জৈন শ্রাবকদেরই বংশধর এটাই যথার্থ বলে মনে হয়। হিন্দুধর্মের আওতায় আসার পরেও এদের অতীতকে সরাক নামের মাধ্যমে সুচিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে পালরাজাদের আমলের পর থেকেই দিগম্বর বা নিগ্রন্থরা ক্রমশঃ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাতে থাকে এবং হিন্দু সমাজের সাথে মিশতে থাকে। পরবর্তী-কালে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধ, কাপালিক, অবধূত প্রভৃতি উলঙ্গ ধর্ম সম্প্রদায়-ভুক্ত হয় তারা। বীরভূমে ঐ সব উলঙ্গ ধর্ম সম্প্রদায়ের কোন চিহ্ন অবশ্য আজ সুস্পষ্ট ভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে বর্তমান তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, অট্টহাসফুল্লরা, ললাটেশ্বরী প্রভৃতি স্থানগুলি যে অতীতে নানা জাতীয় তান্ত্রিক, সিদ্ধ কাপালিক ও অবধূত প্রভৃতির আড্ডা ছিল এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। পঞ্চাশ বছর আগেও তারাপীঠ বা বক্রেশ্বরে উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের কাউকে কাউকে দেখা গিয়েছে।

রোহিণেয়

[একাঙ্কিকা]

প্রথম দৃশ্য

[রাজগৃহ। মধ্য রাত্রি। নির্জন রাজপথ]

[দূর হতে] চোর! চোর! চোর!

[একজন নাগরিক ঘর হতে বেরিয়ে আসছে]

১ম নাগরিক : রাজগৃহে ত এখন ওই একটী শব্দই শোনা যায়—চোর, চোর, চোর। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। আর রাত্রে চোখের পাতা এক করবার উপায় নেই। কি বিপদেই না পড়া গেছে।

[আর একজন নাগরিক ঘর হতে বেরিয়ে আসছে]

১ম নাগরিক : আরে! তুমিও ঘর হতে বেরিয়ে এলে?

২য় নাগরিক : না বেরিয়ে কি করি বল? ঐ শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? মহারাজ শ্রেণিকের রাজধানীতে এ কি ধরণের উৎপাত। প্রতি রাত্রে নাগরিকদের ধন লুট হয়ে যায় অথচ তার প্রতিকার নেই।

১ম নাগরিক : প্রতিকার নেই তা নয়। কিন্তু…

২য় নাগরিক : কিন্তু আবার কি?

১ম নাগরিক : কিন্তু আজ পর্যন্ত চোরকে কেউ দেখেও তো নি। সেদিন আমার কাকাতো ভায়ের বাড়ীতে চুরী হল। আমার কাকা বাড়ীতেই ছিলেন। আশ্চর্য! দরজা আপনা হতেই খুলে গেল আর জিনিষ পত্র আপনা আপনি বেরুতে লাগল।

২য় নাগরিক : বেরুতে লাগল? আপনা আপনি?

১ম নাগরিক : সেইত কথা! কেবল বেরুতেই লাগল তা নয়। আকাশের দিকে উঠতে লাগল।

২য় নাগরিক : তুমি তামসা করছ।

১ম নাগরিক : তামসা! আমি একেবারে যা সত্যি তাই বলছি। যাকে জিগ্যেস করো—গাথাপতি চুলনীপিতা, আর্য খন্দক, গৃহপতি ধন্য—সকলে এই কথাই বলবে।

২য় নাগরিক : মনে হচ্ছে সবটা যেন বিচিত্র, বিস্ময়কর।

১ম নাগরিক : এতে বিস্ময়ের কী আছে। চোর কেবল ধূর্তই নয়, সে আকাশ-গামিনী ও অদৃশ্যকারিনী বিদ্যায় পারংগত।

[ইতিমধ্যে দু'জন আরক্ষক আসছে]

১ম আরক্ষক : তোমরা কে ?

১ম নাগরিক : আমরা নাগরিক।

১ম আরক্ষক : নাগরিক ? এত রাত্রে ঘরের বাইরে কেন ?

১ম নাগরিক : এই হাওয়া খাচ্ছি। তাই।

১ম আরক্ষক : হাওয়া ? চলো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শ্মশানের হাওয়া খাইয়ে দি—মৃত্যুর মতো শীতল।

[ওদের বাঁধবার উপক্রম করছে]

১ম নাগরিক : আরে তোমরাত রাগ করলে ?

১ম আরক্ষক : রাগ ? না না রাগ করব কেন ? তবে নগরপালের হুকুম রাত্রিতে রাজপথে যাকেই দেখবে তাকে ধরে নিয়ে আসবে।

১ম নাগরিক : কিন্তু তুমি তো আমাদের চেন। আমরা নাগরিক।

১ম আরক্ষক : না না আমরা কাউকেই চিনি না।

[ইতি মধ্যে আরো দু'তিন জন লোক ছুটতে ছুটতে আসছে]

১ম আগন্তুক : [হাঁপাতে হাঁপাতে] আরে ভাই তোমরা কি কাউকে এদিকে যেতে দেখেছ ?

১ম নাগরিক : আওয়াজ শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কাউকে দেখি নি।

১ম আগন্তুক : তবে চোর কোন দিকে গেল ?

১ম নাগরিক : যেদিক হতে এসেছিল, সেই দিকেই চলে গেছে।

১ম আগন্তুক : তবে আমি কি করি! আমিত মারা গেলাম—আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল। [কাঁদতে আরম্ভ করল]

১ম নাগরিক : আরে তুমি কাঁদতে আরম্ভ করলে ? কেঁদ না। কেঁদে কি হবে ? [আরক্ষকদের দিকে চেয়ে] তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ ? চোর কোন দিকে গেল দেখ।

আরক্ষকদ্বয় : [হকচকিয়ে] দেখছি দেখছি···কিন্তু···[আরক্ষকেরা সরে পড়ছে]

১ম আগন্তুক : [কাঁদতে কাঁদতে] আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি এখন কি করি ?

১ম নাগরিক : [সান্ত্বনার ভঙ্গীতে] আর কেঁদে কী হবে ভাই। যা যাবার ছিল তা গেছে। তা আর ফিরবে না। তুমি নগরপালকে গিয়ে খবর দাও।

১ম আগন্তুক : তুমি ঠিক বলছ। কিন্তু তুমি—তুমি যদি আমার পরিস্থিতিতে পড়তে

তবে তুমিও কাঁদতে। দু'দিন আগে এক সার্থবাহ এক বহুমূল্য রত্ন আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। সেই রত্নও অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন আমি কি করি ?

১ম নাগরিক : অদৃশ্য হয়ে গেছে ?

১ম আগন্তুক : হঁ্যা তাই। না তালা ভাঙলে, না সিঁদ দিল। ঘরের দরজা খুলে আমি একটু বেরিয়ে ছিলাম। তার মধ্যে অদৃশ্য। কেউ বিশ্বাস করবে না যে চুরী হয়ে গেছে। সবাই বলবে আমি সেটা মেরে দিয়েছি। এখন আমি কি করি ? আমি মারা গেলাম। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

২য় নাগরিক : সত্যি যদি বলতে হয় তবে রাজগৃহে আর থাকাই যাবে না দেখছি। আমি সুরভিপুর চলে যাব কিনা তাই ভাবছি।

২য় আগন্তুক : আমরাও সেকথাই ভাবছি।

১ম নাগরিক : কিন্তু তার আগে রাজার কাছে গিয়ে সমস্ত বিষয়টা নিবেদন করলে হয়না ?

সকলে একসঙ্গে : হঁ্যা হঁ্যা তুমি ঠিক বলছ। একদম ঠিক।

১ম নগরিক : তবে চল কাল সকালে আমরা সকলে রাজার কাছে যাই)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শ্রেণিকের রাজসভা। সময় প্রভাত। সভাসদ পরিবৃত শ্রেণিক বসে রয়েছেন। মন্ত্রী অভয়কুমারও সেখানে উপস্থিত। নাগরিকেরা রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে]

১ম নাগরিক : মহারাজ, আপনার সুশাসনে এতদিন আমরা সুখে ছিলাম। কিন্তু এখন আর তা থাকা যাচ্ছে না

শ্রেণিক : কেন ? কি হয়েছে ?

১ম নাগরিক : মহারাজ, আমাদের সর্বস্ব লুট হয়ে যাচ্ছে ?

শ্রেণিক : লুট হয়ে যাচ্ছে ? কে লুট করছে ?

১ম নাগরিক : এক চোর।

শ্রেণিক : চোর ? কি নাম তার ?

১ম নাগরিক : শুনেছি তার নাম রোহিণেয়। লোহখুরের সে ছেলে।

শ্রেণিক : নগরপালকে তোমরা জানাওনি ? কি করছে সে ? সে তাকে ধরছে না কেন ?

১ম নাগরিক : জানিয়েছি মহারাজ। কিন্তু তাকে ধরা যাচ্ছেনা।

শ্রেণিক : [অভয়কুমারের দিকে চেয়ে] নগরপালকে ডাক দাও। আমি দেখছি কি ব্যাপার।

[অভয়কুমার নগরপালকে খবর দিচ্ছেন। নগরপাল এসে শ্রেণিককে অভিবাদন করে আদেশের প্রতীক্ষা করছে]

শ্রেণিক : এ নাগরিকেরা কি বলছেন শুনেছ। রৌহিণেয় যখন এদের ধনসম্পত্তি লুট করছে তখন তুমি আরামে ঘুমিয়ে রয়েছ। এতদিনেও তাকে ধরা গেল না কেন? আমার ত তোমারো ওপর সন্দেহ হচ্ছে। গোপনে গোপনে তার সঙ্গে যোগ সাজস নেই ত?

নগরপাল : না মহারাজ, সে রকম নয়।

শ্রেণিক : সেরকম নয় ত কি রকম? চোর চুরী করছে আর তুমি তাকে ধরতেই পারছ না।

নগরপাল : মহারাজ, সত্যি ত এই যে আমি তাকে ধরবার সমস্ত রকম প্রয়াস করেছি। কিন্তু তাতে সফলকাম হইনি। যদি আপনি আমায় দণ্ড দিতে চান ত স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন। কিন্তু একথা না বলে আমি পারব না যে চোর ভয়ানক ধূর্ত। তার ধূর্ততার সামনে আমার সমস্ত বুদ্ধি-চাতুর্য ও শক্তি পরাজিত হয়েছে। দিন নেই রাত নেই, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, আমি সমস্তক্ষণ তার সন্ধানেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। নগরের এমন কোন জায়গা নেই যা আমি দেখিনি, পাহাড়ের এমন কোনো গুহা নেই যেখানে তার অনুসন্ধান করিনি, কিন্তু তাকে আজো ধরতে পারলাম না। না জানি তার কাছে এমন কি বিদ্যা রয়েছে যাতে নিমেষে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

১ম নাগরিক : নগরপাল ঠিকই বলছেন মহারাজ। চোর দেখা যায় না। কেউ বলে সে আকাশগামিনী বিদ্যার অধিকারী ত কেউ বলে অদৃশ্যকারিনী বিদ্যার।

শ্রেণিক : [অভয়কুমারের দিকে তাকিয়ে] এখন কি করা উচিত অভয়?

অভয়কুমার : আজ হতে চোর ধরবার ভার আমিই নিলাম মহারাজ। আপনি নগরপালকে ক্ষমা করুন। আশা করছি সাত দিনের মধ্যেই আপনার সামনে চোরকে এনে উপস্থিত করব।

নাগরিকেরা : [সমস্বরে] জয় মন্ত্রীবর অভয়কুমারের জয়! জয় মহারাজ শ্রেণিকের জয়!

[ক্রমশঃ

অপূরণীয় ক্ষতি

প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠ-নির্ণয়, অনুবাদ, টীকা-টিপ্পনীর মত বর্গীকরণের কাজও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যাঁরা গবেষণার কাজে নিযুক্ত তাঁদের পক্ষে এ ধরণের কাজের উপযোগিতা অনেক বেশী। মনে করুন কেউ হয়ত 'লেশ্যা' নিয়ে কাজ করতে চান। জৈন, বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এই লেশ্যা শব্দ কোথায় কখন কি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে এ যদি তাঁকে সমস্ত জৈন, বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ঘেঁটে বার করতে হয় তবে তা স্বভাবতঃই একজনের বা এক জীবনের কাজ থাকে না। কিন্তু 'লেশ্যা' সম্বন্ধীয় বর্গীকৃত যদি কোন কোষ থাকে তবে সে কাজ কত সহজেই না হয়ে যায়। জৈন আগম সাহিত্যের এক হাজার বাছা বাছা শব্দের ওপর এই ধরণের বর্গীকরণের কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন আজ হতে পনের বছর আগে স্বর্গীয় মোহনলাল বাঁঠিয়া এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও তিনি যে একনিষ্ঠ ভাবে এ কাজে ব্রতী হয়ে ছিলেন তার তুলনা নেই। তারই পরিণাম স্বরূপ আমরা তাঁর কাছ হতে পেয়েছি 'লেশ্যা কোষ' ও 'ক্রিয়া কোষ'—কয়েক বছরের সাধনার পরিণাম। তারপর তিনি আরো ছ'টি কোষের কাজে হাত দিয়ে ছিলেন। যেমন—(১) পুদ্গল কোষ—ভাগ ১ (১৮ ফর্মা ছাপা হয়েছে), (২) সংযুক্ত লেশ্যা কোষ (৮ ফর্মা ছাপা হয়েছে), (৩) যোগ কোষ, (৪) ধ্যান কোষ, (৫) পুদ্গল পরিণাম কোষ ও (৬) পরিভাষা কোষ। ভগবান মহাবীরের জীবন সম্পর্কিত কোষও তিনি গত বছর হতে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যু এসে তাঁকে আমাদের মধ্য হতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বাঁঠিয়াজীর মৃত্যু তাই জৈন বাঙ্ময়ের অপূরণীয় ক্ষতি। সে ক্ষতি সহজে পূর্ণ হবার নয়। তবু আশার কথা এই যে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর শিষ্য ও সহযোগী শ্রীশ্রীচাঁদ চোরেড়িয়া, ন্যায় তীর্থ। তাঁকে কেবল উৎসাহিত করাই নয়, আর্থিক সহযোগ দানে অর্দ্ধমুদ্রিত গ্রন্থের প্রকাশন ও নূতন নূতন গ্রন্থ রচনার কাজকে অগ্রসর করার দায়িত্ব এখন সমগ্র জৈন সমাজের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও। আমরা এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

জৈনদর্শনে স্যাদ্‌বাদ
হরিমোহন ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভাণ্ডারের পরিপূরণ কল্পে যে যে সম্প্রদায় তাঁহাদের আপন আপন স্বাধীন চিন্তার ফলস্বরূপ বহুমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, জৈনগণ তাঁহাদের অন্যতম। কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দঃ শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে জৈনাচার্যগণ বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তর্কশাস্ত্রে বা প্রমাণশাস্ত্রে তাঁহারা যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এই চিন্তাধারার নাম 'স্যাদ্‌বাদ'। জৈন সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। এই দুই প্রধান শাখা আবার বহু প্রশাখায় বিভক্ত। এইরূপ একটী প্রশাখার নাম গচ্ছ। শুনা যায়, প্রায় এরূপ ৮৪টী গচ্ছ উদ্ভূত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর শাখার মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মজীবনে কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও দার্শনিক মতবাদে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে স্বতন্ত্র চিন্তার ধারা স্যাদ্‌বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার উদ্ভবের কারণ কি? ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈদিক আর অবশিষ্টগুলি অবৈদিক। এইরূপে বৈদিক ও অবৈদিক, এই দুইভাগে বিভক্ত করা ভিন্ন আরও অন্যান্য উপায়ে ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়; যেমন আস্তিক ও নাস্তিক, সেশ্বর ও নিরীশ্বর; কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে শেষোক্ত বিভাগগুলির কোন বিশেষ উপযোগিতা নাই বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহারা অবৈদিক, অবশিষ্টগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং উহারা বৈদিক। বৈদিক দর্শনগুলিকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—শ্রুতি প্রধান ও যুক্তিপ্রধান। পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা—এই দুইটী দর্শন শ্রুতি প্রধান। কারণ শ্রুতিবাক্যই ইহাদের প্রধান প্রমাণ। যদিও যুক্তি তর্ক প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি সে যুক্তি তর্কের প্রয়োগ কেবল শ্রুত্যর্থ উপপন্ন করিবার জন্য, কোন বিষয়ের অঙ্গীকার বা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য নহে। ন্যায়-বৈশেষিকাদি অবশিষ্ট দর্শনগুলি যুক্তি প্রধান, অর্থাৎ ঐ সকলে প্রধানতঃ যুক্তিবলেই স্বমত সংস্থাপন ও পরমত খণ্ডন করা হইয়াছে। যুক্তিই তাহাদের মূলভিত্তি। ঐ সকল দার্শনিকেরা যুক্তির সাহায্যে স্বমতবিসংবাদী শ্রুতিবাক্যের অর্থান্তর করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মোট কথা, যে দর্শন যতটা পরিমাণে যুক্তির উপর নির্ভর করিতে সাহস পাইয়াছে, তাহা ততটা পরিমাণে শ্রুতির নিগড় বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতএব বেশ বুঝা যায় যে, যে দর্শনগুলি অবৈদিক, তাহাদের বস্তুগত্যা একমাত্র অবলম্বন যুক্তি-তর্ক।[১] কারণ, তাহারাত বেদের নিকট পৃষ্ঠপোষণের প্রত্যাশা রাখে না, কেবলমাত্র যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়াই আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। এই জন্যই দেখা যায় যে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে যুক্তি তর্কই একমাত্র অবলম্বন—এই জন্যই তাঁহাদের মতবাদগুলি একটা প্রবল সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই জন্যই তাঁহারা যাহা প্রতীতি অথবা অনুমানসিদ্ধ, তদতিরিক্ত কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব বা কার্যকারিতা স্বীকার করেন না, বা করিতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ যুক্তি-তর্ক সহকৃত প্রবল সাধারণজ্ঞান বৌদ্ধ ও জৈন—উভয় চিন্তাধারাকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল বটে, আমরা কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইব যে, বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন আরও একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সেইখানে, যেখানে উহা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এক কথায় ব্যবহারোপযোগিতাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপিত করে। আমাদের জ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে এমন সংবাদ দিবে, যাহা দ্বারা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সার্থকতা লাভ করা যায়। এ পর্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন একই কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মত পার্থক্য নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সার্থকতার জন্য বস্তুর স্বরূপ কীদৃশ হওয়া উচিত—এইখানে জৈন বৌদ্ধ হইতে পৃথক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এস্থলে এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জৈনগণ উক্তপ্রকার প্রবল সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনের অপ্রতিকূল, প্রতীতি ও অনুমান সিদ্ধ জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে যে মতবাদে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই নাম 'স্যাদ্‌বাদ'। এই স্যাদ্‌বাদ জৈন দর্শনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। অগ্রে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কতকগুলি গোড়ার কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

জগৎসংসারকে বুঝিবার চেষ্টা হইতেই দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি এবং সেই চেষ্টার পরস্পর বিভিন্নতা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি। আমরা সেই সমুদায় চেষ্টাগুলিকে মোটামুটি দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ এক-প্রকার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় যাহা দ্বারা জগতের বস্তুজাতকে কয়েকটি সামান্য ভাবের (Abstract Concepts) ছাঁচে ফেলিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়, আর বস্তু-বিশেষের যে বিশিষ্টতা, তাহাও সেই সামান্য ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়া ধরা হয়। আবার এই কথাটিকেই আরো একটু বড় করিয়া ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে ঐ সকল সামান্য ভাবগুলিও একটী চরম সামান্যের (Highest General Concept) অন্তর্ভূত। এইরূপে বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বনে জগতের বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য হইতে

---

১ পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্বচনং যস্য তস্য কার্যঃ পরিগ্রহঃ ॥

পরিশেষে নির্বিশেষ সত্তা বা একত্বে পৌঁছান হয় দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটী চিরন্তন প্রণালী। ইহাতে বাস্তব জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বহুত্বের নিকট বিদায় লইয়া কেবল ভাব জগতের (Subjective) একটানা একত্ব, নিত্যত্ব অথবা সত্তারূপ চরম সামান্যের আশ্রয় লইতে হয় সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা মনন বা চিন্তনের সৌকর্ম সাধিত হয়। এই প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য দর্শনের আদি আচার্য থালিস বলিয়াছিলেন, অপই সকল বস্তুর উপাদান। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সর্বগ্রাসী সত্তাতেই সকল বৈশিষ্ট্যের পর্যাবসান ; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচার করিতেছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের সমুদায় বস্তুই একমাত্র জড়শক্তির প্রকারভেদ-মাত্র। আর এই প্রণালী অবলম্বনেই ভারতে অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে বাহ্য জগৎকে বুঝিবার আর একটি ঠিক ইহার বিপরীত প্রণালী আছে। আমাদের প্রতীতি জানাইয়া দেয় যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিলক্ষণ অথবা প্রত্যেক বস্তুই স্বলক্ষণ। কেন না, প্রত্যেক বস্তু কতকগুলি গুণের সমষ্টিমাত্র এবং প্রত্যেক সমষ্টিই অপর সমষ্টি হইতে ভিন্ন, এবং শুধু ইহাই নহে, —এই গুণগুলিও নিয়ত পরিবর্তনশীল। নিত্য অপরিণামী এবং বস্তু সমুদায়ে অনুগামী কোন সামান্য সত্তা আমাদের প্রতীতির গম্য নহে, অনুমানেরও যোগ্য নহে। মোট কথা হইতেছে এই যে, যাহা কিছু আমরা প্রতীতির সাহায্যে অনুভব করিতে পারি তাহা কেবল অনুক্ষণ পরিণম্যমান বিশেষ বিশেষ ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কতকটা এই প্রথা অবলম্বনে জগতে বহুত্ববাদের সৃষ্টি হইয়াছে, কতকটা এইরূপ চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য জগতে হবস্, গ্যাসেণ্ডি প্রভৃতি মনীষিগণ বহুত্ববাদ (Pluralism) ও স্বলক্ষণবাদে (Individualism) উপনীত হইয়াছেন। আর সম্পূর্ণ এই প্রণালী অবলম্বনেই বৌদ্ধেরা ক্ষণভঙ্গবাদ ও স্বলক্ষণবাদে উপস্থিত হইয়াছেন।

এখানে আমরা দেখিতে চেষ্টা পাইব যে, পূর্বোক্ত দুই বিপরীত চরম চিন্তা-পদ্ধতির সামঞ্জস্য হইতে স্যাদ্বাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কেবল স্যাদ্বাদ কেন যে কোন মতবাদই এইরূপ ভাব সংঘর্ষ ব্যতিরেকে বিকাশ লাভ করে না। এস্থলে ভাব জগতে পূর্বপক্ষ (Thesis) ও উত্তরপক্ষ (Antithesis) সংঘর্ষে সমন্বয় বা সমাধান (Synthesis) সম্ভাবিত হয়, এই প্রকার হেগেলের অভিমতের যথার্থ্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।[২] যে সময়ে জিনমতাবলম্বিগণ তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, ঠিক সেই সময়ে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের প্রবাহ ভারতে বহিয়া যাইতেছিল। একদিকে উপনিষদ্ গুরুগম্ভীর স্বরে প্রচার করিতেছিলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয় যে বহু এবং নানাগুণ বা রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই বহু

২ Schwegler's *History of Philosophy*, Introduction.

এবং নানারূপের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বস্তু সমুদায়ের যে বর্ণ, গঠন বা আকার, দ্রবত্ব, কাঠিন্য বা সংঘাতত্ব, তাপ বা শৈত্য, মিষ্টতা, তিক্ততা বা সৌরভ প্রভৃতি বিবিধ গুণ গ্রহণ করে, সে গুণসকল আমাদের ভ্রান্তির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহারা সর্বৈব মিথ্যা বা অবাস্তব। উহাদের সকলের মধ্যে অনুগত যে দ্রব্যত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য এবং অপরিণামী। বর্ণ, গঠন, দ্রবত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণসকল অসত্য বা ভ্রান্তিমূলক বিকারমাত্র। উহারা নিয়তপরিবর্তনশীল, সুতরাং উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নাই। একই মৃৎপিণ্ড হইতে ভাণ্ড কলসাদি বহুবিধ মৃন্ময় পাত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহাদের মধ্যে অনুগত একমাত্র মৃৎপিণ্ডই সত্য।[৩] ইহাকেই আরও একটু বড় করিয়া দেখিলে বলা যায় যেমন মৃৎপিণ্ড সকল মৃন্ময় বিকারের মধ্যে অনুগত, ঐরূপ সুবর্ণ কুণ্ডল-বলয়াদির মধ্যেও অনুগত ও নিত্য। আবার ঐ সুবর্ণ মৃত্তিকা এবং ঐরূপ অন্যান্য দ্রব্য মধ্যে অনুগত একটী বস্তু আছে। যাহার নাম সত্তা (Being)। উহার অপর নাম সামান্য বা জাতি। উহা সকল বস্তুতে অনুগত এবং নিত্য, অর্থাৎ উহার পরিণাম বা পরিবর্তন নাই।

অপরদিকে বৌদ্ধ বলিতেছেন যে, সামান্য এবং নিত্যত্ব বলিয়া কোন বস্তু নাই। আমাদের সহজ প্রতীতি বলিয়া দেয় যে, যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য, তাহার সমুদায়ই বিশেষ বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ বিশেষ গুণগুলি আবার সতত পরিবর্তনশীল। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশেষ গুণের অতিরিক্ত, সুতরাং অতীন্দ্রিয় কোন নিত্য সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। সেরূপ সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব প্রতীতি বা অনুমানসিদ্ধ নহে। যাহার প্রতীতি হয়, তাহা কেবল বিশেষ গুণ বা গুণব্যক্তি। ফলতঃ প্রত্যেক পরিণম্যমান বিশেষ গুণ প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন অস্তিত্বের সৃষ্টি করিতেছে।

জৈনেরা বলিলেন যে, পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধমত উভয়েই একদেশদর্শী বা একান্তবাদী। তাঁহাদের মতে প্রয়োজন সিদ্ধিই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পদার্থের জ্ঞান এরূপ হওয়া আবশ্যক যে উহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হয় ; উহা আমাদের ব্যবহারে সহায়তা করে। এই কথাটীই আরও একটু অন্যভাবে বলা যায় যে, যে জ্ঞানকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি তাহার কর্মই হইল, পদার্থের ব্যবহারোপযোগিতা প্রদর্শন করা।[৪] বস্তুর ব্যবহারোপযোগিতা সূচক জ্ঞানেরই মূল্য আছে কারণ, যদি আমার কোন বস্তুবিষয়ে এমন জ্ঞান হইয়া থাকে, যাহার সাহায্যে আমি সেই বস্তুটী হেয়, কি উপাদেয়, তাহা দ্বারা আমার প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে, কি না হইবে, ইহা বুঝিতে না পারি, তেমন জ্ঞান আমার বাস্তবিক কোন উপকার সাধন করে না।

৩ ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।১।৪

৪ প্রমাণাদর্থসংসিদ্ধিস্তদাভাসাদ্বিপর্যয়ঃ—পরীক্ষামুখ সূত্র, ১

উহার ব্যবহারিক জগতে কোন মূল্য নাই। সে জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, তাহার নাম বিপর্যয়।

তবেই দেখা যাইতেছে, সম্যগ্ জ্ঞান বা প্রমাণের স্বরূপই হইতেছে যে, তাহা পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবে এবং পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বই হইতেছে, অর্থক্রিয়া-কারিতা[৫] অর্থাৎ জ্ঞাতার প্রয়োজন সাধকতা। পদার্থের পদার্থত্ব নিষ্পন্ন সেইখানে, যেখানে সে জ্ঞাতার প্রয়োজনসিদ্ধি করে। প্রতীতি (Experience) আমাদের এই কথাই পরিস্ফুট রূপে জানাইয়া দেয়। এই প্রকার ব্যবহারোপযোগিতা মূলক প্রামাণ্য জ্ঞান কেবল জৈন দর্শনের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা বৌদ্ধ প্রমাণ বাদেরও মূল সূত্র। বৌদ্ধ ধর্মোত্তরাচার্য তাঁহার ন্যায়বিন্দুটীকায় দেখাইয়াছেন যে, যে জ্ঞান অবিসংবাদী অর্থাৎ অভীপ্সিত অর্থের প্রাপক, তাহাই সম্যগ্ জ্ঞান[৬]। বাৎস্যায়ন ঋষি ন্যায়সূত্র ভাষ্যের মুখবন্ধে জ্ঞানের প্রমাণ্য সম্বন্ধে এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন।[৭] ঐরূপ পঞ্চদশী ও বেদান্ত পরিভাষাকারমহোদয় গণও সংবাদি জ্ঞানের প্রামাণ্য ও বিসংবাদি জ্ঞানের ভ্রমাত্মকতা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আধুনিক প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যেও এই ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ বহুল প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা এই মত বাদের নাম দিয়াছেন—প্র্যাগ্ম্যাটিসম্ (Pragmatism)। এই প্র্যাগ্ম্যাটিসম্ বা ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ প্রাচীন পাশ্চাত্য মতবাদে অন্তর্নিহিত থাকিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রকট ভাবে দর্শন জগতে প্রথম বিকাশলাভ করে, উহার কিছু পরে William James, Dr. Schiller এবং Dewey প্র্যাগ্ম্যাটিসমের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন।

James বলিয়াছেন, প্রমাণ বা সম্যগ্ জ্ঞান তাহাকে বলি, যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, আমাদের জীবন যাত্রার বিশেষ সুবিধা হয়। আমার সম্মুখবর্তী এই টেবিলটির সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, তাহা প্রমাণ, কারণ আমি দেখিতেছি, এই জ্ঞানে আস্থা স্থাপন করিয়া আমার কার্যের সুবিধা হইতেছে, আমি দেখিতেছি যে, আমি উহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি; আমার কাগজপত্রগুলি রাখার সুবিধা হইতেছে।[৮] Dr. Schiller ইহারই নাম দিয়াছেন—'Humanism'। কারণ,

---

৫ বস্তুনস্তাবদর্থক্রিয়াকারিত্বং লক্ষণম্—ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে জৈনদর্শন, মণিভদ্রকৃত টীকা।

৬ অবিসংবাদকং জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানং। জ্ঞানমপি প্রদর্শিতমর্থং প্রাপয়ৎ সংবাদকমুচ্যতে—ন্যায়বিন্দু টীকা, পৃঃ ৩১

৭ ন্যায় সূত্র, বাৎসায়ন ভাষ্য, প্রারম্ভে প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ অর্থবৎ প্রমাণম্।

৮ The true is the name of whatever proves itself to be good in the way of belief and good too, for definite assignable reasons." James.' *Pragmatism*, p. 76.

তিনি বলিতে চান যে, মানবের সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসার বা জ্ঞান পিপাসার মূলে একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিহিত আছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিলেই, সকল অনুসন্ধিৎসা সার্থক হয়। সুতরাং কোন জ্ঞান প্রমাণ বা অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, উহা সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল।[৯]

এই Pragmatism বা ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ লইয়া আজ পাশ্চাত্য দর্শন-জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, এই প্র্যাগ্ম্যাটিসম্ বা ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ ভারতে নূতন নহে, বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতীয় প্রায় সকল দর্শনেই, অল্প বিস্তর রূপে উহা নিহিত রহিয়াছে। যাহা হউক, পাশ্চাত্য ব্যবহার প্রামাণ্যবাদী দার্শনিকেরা বলিতেছেন যে, আমরা এমন কোন জ্ঞানের সত্যতা বা প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, যাহা মানবের জীবন যাত্রার সহিত বাহ্যজগতকে ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট করেনা। জ্ঞান বলিতে এমন কিছু বুঝিতে পারিনা, যাহা কেবল জ্ঞাতার আন্তর ভাব-জগতে একটি সামঞ্জস্য (Formal Consistancy) স্থাপন করে মাত্র। জ্ঞানের সাফল্য সেইখানে, যেখানে উহা জ্ঞাতাকে বাহ্যবস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন পূর্বক উহা হেয়, কি উপাদেয়, তাহা জানাইয়া দেয়। সুতরাং বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে কেবল আন্তর ভাব-জগতের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই জ্ঞানের কার্য নহে। পরন্তু প্রতীতির সাহায্যে পদার্থ তত্ব নির্ণয় পুরঃসর উহা হিত বা অহিত, ইহা বলিয়া দেওয়াই জ্ঞানের সার্থকতা। এই জন্যই আজকাল পাশ্চাত্য জগতে আরিষ্টটলের বস্তুনিরপেক্ষ প্রামাণ্যশাস্ত্র (Formal Logic) মহাগোলে পড়িয়াছে। উহা আর তর্ক-শাস্ত্রের জনক আরিষ্টটলের নামের অথবা কেবল নিজের প্রাচীনতার দোহাই দিয়া প্র্যাগ্ম্যাটিক লজিকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জীবন সংগ্রামে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়া উঠিতেছেনা। কারণ Schiller প্রমুখ আধুনিক Pragmatic Logician-এরা যুক্তি সহকারে ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বাহ্য জগতের দেয় জ্ঞানের উপাদান উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের আকারের সামঞ্জস্য লইয়া থাকিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।[১০] কারণ, উহা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয় না।

---

৯ In an actual knowing the question whether an assertion is true or false is decided uniformly by its consequences —by its relation to the purpose which put the question."—Schiller's *Humanism*, p. 154.

১০ It is not possible to abstract from the actual use of the logical material and to consider forms of thought in themselves without incurring thereby a total loss, not only of truth, but also of meaning.—Preface to Schiller's *Formal Logic*

অনেকটা এইরূপ ব্যবহারোপযোগিতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তব জগতের প্রতীতিসিদ্ধ ও অনুপেক্ষণীয় বস্তু স্বভাবের জিজ্ঞাসাই জৈন-দর্শনের প্রারম্ভ। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য প্র্যাগম্যাটিক লজিক ও জৈন দর্শনের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কিনা, অথবা প্র্যাগম্যাটিক প্রামাণ্যবাদের প্রামাণ্য কতদূর গ্রাহ্য, সে সকল বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জৈন বলিতে চান, বাহ্যবস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিতে পাই, উহার স্বরূপ কেবল উপনিষৎ-কথিত নিত্য সত্তাতেই পর্যবসিত নহে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহাও বলা যায়না যে, উহা কেবল ক্ষণবিনাশী ও পরস্পর অসংবদ্ধগুণব্যক্তির প্রবাহমাত্র। উপনিষদ যে বলিয়াছেন, বস্তু স্বরূপ একান্ত নিত্য সত্তা তাহা অর্দ্ধসত্য আবার বৌদ্ধ যে বলিয়াছেন, নিত্যসত্তা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, প্রতীতির সাহায্যে যাহার উপলব্ধি করি, তাহা কেবল ক্ষণভঙ্গুর গুণপ্রবাহ, তাহাও অপরার্দ্ধ সত্য। সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়—উভয়ের সমবায়ে। প্রকৃত বস্তু স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যায়, উহা নিত্যও বটে। উহা সমান্যের আধার আবার বিশেষেরও আধার। একদিকে যদি বস্তুকে কেবল নিত্য বলা যায়, তাহা হইলে একান্ত পক্ষ আশ্রয় করা হয়; আবার অপরদিকে যদি উহাকে কেবলমাত্র নিয়ত পরিবর্তনশীল অনিত্য গুণ সমষ্টি বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও একান্ত পক্ষ অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বস্তু অনেকান্ত ধর্মাত্মক। উহা নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে।[১১] (Permanent in the midst of Changes.) নিত্যাংশে উহার নাম দেওয়া হয় 'দ্রব্য'; অনিত্য অথবা নিয়ত পরিবর্তনশীল গুণ সমষ্টি অংশে উহার নাম দেওয়া হয় 'পর্যায়'। জৈন দর্শনে দ্রব্য ও পর্যায়—এই দুইটী শব্দ উক্তরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফল কথা, বস্তু দ্রব্যপর্যায়াত্মক, বস্তু মাত্রই দ্রব্যও বটে, আবার পর্যায়ও বটে। এ ত্রিভুবনে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা ঐরূপ দ্রব্যপর্যায়াত্মক নহে।[১২]

[ক্রমশঃ

১১ আদীপমাব্যোম সমস্বভাবং স্যাদ্বাদমুদ্রানতিভেদি বস্তু— বী, পঞ্চম শ্লোক।

১২ দ্রব্যংপর্যায়বিযুতং পর্যায়া দ্রব্যবর্জিতাঃ।
ককদা কেন কিংরূপা দৃষ্টা মানেন কেনচিৎ॥

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. V No. 5 : Sraman : September 1977
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

পরলোকগত পূরণচাঁদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্মসম্বন্ধে, কলেজে অধ্যয়নকালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখাজীর বইখানি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
পঞ্চম বর্ষ ॥ আশ্বিন, ১৩৮৪ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

জৈন যতি সহ লেঃ কর্ণেল টড্

চন্দন মূর্তি

আমি জাতিস্মর।

কথাটা অহঙ্কারের মত শুনাইল বটে কিন্তু জাতিস্মরণ জ্ঞানের আমার একটুও অহঙ্কার নাই। কেনই বা থাকিবে? পূর্বস্মৃতি আমরা অনেকেই মনে আনিতে পারি কিন্তু তাহার জন্য কি কখনো অহঙ্কার করি? তবে আমি কেন জাতিস্মরণ জ্ঞানের জন্য অহঙ্কার করিব!

কেমন করিয়া জাতিস্মরণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম তাহা আমি বলিতে পারিব না। তবে সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। নিমচের পথে ধুঁধিয়া হইতে অনেকখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিলাম। কঙ্কর ও বালিময় পথ। কাছেপীঠে লোকালয় ছিলনা, না কোনো আশ্রয়। এতটা পথ হাঁটিয়া আসা সত্বেও গুল্ম জাতীয় ছোট ছোট উদ্ভিদ ও যূথভ্রষ্ট নাতিদীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে নাই। পা দুটো ভাঙিয়া আসিতেছিল কিন্তু তবুও হাঁটিতে থাকিলাম। তারপর যখন নিতান্তই অপারগ হইলাম তখন এক খর্জুর বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া বসিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম তাহা মনে নাই। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা ঘুম ভাঙিতে দেখি কাহারো কোমল হস্ত আমায় যেন ঠেলিতেছে ও বলিতেছে—দত্ত,ওঠো, ওঠো।

আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। এই বিজন অপরিচিত দেশে কে আমায় ডাকিবে? না আমারই ভুল। এ দেশ বিজনও নয়, অপরিচিতও নয়। ইহা সিন্ধু-সৌবীরের রাজধানী বীতভয়। আমি রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন জিনালয়ের কুট্টিম তলে উঠিয়া বসিয়াছি। আর যাহার কোমল হস্ত এতক্ষণ আমায় ঠেলিতেছিল দেখিলাম সেও আমার পরিচিত। তাহার নাম দেবদত্তা।

দেবদত্তা বলিতেছিল, দত্ত, তুমি অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে।

ঘুমাইবার আবার সময় অসময় কি? ঘুম পাইলেই ঘুমাইবার সময় কিন্তু সেকথা তাহাকে বলিতে পারিলাম না। শুধু বলিলাম, হাঁ। আমি দেবদত্তার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম। বোধহয় ভাবিতে ছিলাম কয়েক শত শতাব্দীর ব্যবধানও তাহার মুখশ্রীকে একটুও পরিম্লান করে নাই।

এখানে আমার পরিচয় দিয়া রাখি। আমার নাম দেবদত্ত। সিন্ধু-সৌবীরাধিপতির রাজপ্রাসাদে আমি মাল্যচন্দনাদি সরবরাহ করিয়া থাকি—কেবলমাত্র অন্তঃপুরিকা বা রাজবংশীয় ব্যক্তিদের জন্যই নয়, রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন জিনালয়ে ভগবান

মহাবীরের যে চন্দন কাষ্ঠ নির্মিত প্রতিমা অধিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার জন্যও। এই প্রতিমার সেকালে খুব নাম ডাক ছিল। কারণ মহাবীরের সমকালে এই একটি মাত্র চন্দন কাষ্ঠের প্রতিমা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিমা নির্মিত হয় নাই। একটুখানি ভুল করিলাম—আর একটি নির্মিত হইয়াছিল তবে তাহা ইহার আরো অনেক পরে এবং ইহারই নকল। সেকথা পরে বলিব।

চন্দন কাষ্ঠের এই প্রতিমা আমার ভালো লাগিত তবে দেবদত্তার মুখের মত নয়। না জানি দেবদত্তার মুখে এমন কি ছিল যে সেই মুখের দিকে চাহিলে আমি নিজেকেই ভুলিয়া যাইতাম। তাহার মুখ হইতে নিজের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই ফিরাইয়া লইতে পারিতাম না। আজও পারিলাম না।

দেবদত্তা রাজপ্রাসাদেরই একজন দাসী। এই জিনালয়ে অবস্থান করিয়া সে পুরোহিতকে সাহায্য করে। আর আমি?—আমি এই জিনালয়ে নিত্য ফুল লইয়া আসি। দেবদত্তা আমার হাত হইতে ফুল ও মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ করে।

দেবদত্তা ও আমার নামের সাম্যও বোধ হয় আকস্মিক নয়। মনে হয় আমাদের সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের। মনে হয় কেন, আমি তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মও দেখিতে পাইতেছি। বিনতায় সে ক্ষত্রিয় সুদাসের ঘরে সুপ্রিয়া রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, অহিচ্ছত্রায় নন্দিনীপিতার ঘরে নন্দিনী রূপে—কিন্তু মাঝখানে বাধা পড়িল। দেবদত্তা সহসা বলিয়া উঠিল, দত্ত, ওমন করিয়া তুমি কি দেখিতেছ?

দেবদত্তার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য দেখিলাম আজো সেইপ্রকার রহিয়াছে। সেই মাধুর্য আমায় কেমন যেন দ্রব দ্রব করিয়া দিল। কোন মুরজধ্বনিও বোধ হয় এত সুমিষ্ট নয়। বলিলাম, তোমাকে—

আমাকে?—আমাকে এত দেখিবার কি আছে?

বলিলাম, সে কথা তুমি কোন দিনই বুঝিতে পারিবে না। কারণ তুমি আমার চোখে নিত্যই নূতন। পদ্মকোরক যেমন একটু একটু করিয়া প্রস্ফুটিত হয় তুমিও তেমনি নিত্য প্রস্ফুটিত হইতেছ।

দেবদত্তা ইহার প্রত্যুত্তর দিল না। দেখিলাম তাহার গালে ঠোঁটে কে যেন আবীরের রঙ ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিজেকে সে মুহূর্তেই সংযত করিয়া লইল। বলিল, দত্ত, যেজন্য তোমায় ডাকিতেছিলাম—বৈতাঢ্য হইতে এক অতিথি আসিয়াছে। আসিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার জন্য বৈদ্যরাজকে ডাকিতে হইবে।

দেবদত্তা কিছু বলিলে তাহা আমি করিয়া দিতাম। অসুবিধা হইলেও করিতাম। কারণ তাহার কাজ করিয়া আনন্দ পাইতাম। তাই না বলিবার কারণই ছিল না।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বৈদ্যরাজকে ডাকিতে গেলাম। কিন্তু যাইতে যাইতেও বেশ অনুভব করিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি আমার পিঠের পরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। সমুদ্র গভীর ও নীল কিন্তু দেবদত্তার চোখের দৃষ্টি আরো বেশী গভীর ও সুনীল।

দেবদত্তা দেখিতে যে খুব সুন্দরী ছিল তাহা নয়। সামান্য দাসী মাত্রই ত ছিল। ধূর্তের মুখে আমি সুন্দরী নারীর রূপ বর্ণনা শুনিয়াছি। প্রবালের মত ওষ্ঠ, মুক্তার মত দন্তপংক্তি, মৃণালের মত ভুজদ্বয় ও বৈদূর্য মণির মত নখর দীপ্তি। না, দেবদত্তার এসব কিছুই ছিল না। তবু একথা না বলিয়াও আমি পারিব না—পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাহার পদপাতে রক্তকমল না ফুটুক, আমার হৃদয় রক্ত কমলের মতোই প্রস্ফুটিত হইত। শুধু আমারই নয়, খর্ব মর্কট সদৃশ বৃদ্ধ পুরোহিতকে কি আমি জানি না দেবদত্তার কথায় যে ওঠে বসে। আর দ্বারপাল ভৌষণ্ডিক? দেবদত্তা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলে সে নিজেকে পুষ্পোত্তর বিমানের অধিকারী বলিয়া মনে করে।

দেবদত্তার আমার প্রতি কি মনোভাব তাহা আমি জানি। কখনো বলিত, দত্ত, তোমার মত মানুষ দেখিনা, কখনো বলিত, তোমার স্নেহ আমাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তবে সে আবদ্ধ হইয়াছিল কিনা তাহা আজ বলিতে পারি না কিন্তু তাহার চোখের তরল প্রবাহে আমি যে মীনের মত আটকাইয়া গিয়াছিলাম সে কথা বলিতে পারি।

বৈদ্যরাজকে যখন লইয়া ফিরিলাম তখন রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যরাজ গৃহে ছিলেন না। তাই ফিরিতে বিলম্ব হইল। আকাশ তখন চাঁদনীতে এমনি ভরিয়া গিয়াছিল যে মনে হইতেছিল কোনও অজ্ঞাত শিল্পীর সুধা বিলেপন চূর্ণের ভাণ্ডই যেন উলটাইয়া গিয়াছে। আমি দেবদত্তার কথাই ভাবিতেছিলাম। সে না জানি কত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে—দেখিলামও ঠিক তাহাই। সে চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়াছিল। আমাদের আসিতে দেখিয়া আগাইয়া আসিয়া আমাদের ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ঘরে মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই মৃৎপ্রদীপের আলোকে অতিথিকে সেই প্রথম দেখিলাম। মনে হইল সুন্দর একহারা চেহারা—গৌরবর্ণ কিন্তু জ্বরের তীব্রতার জন্য সেই গৌরবর্ণ বান্ধুলি ফুলের মত ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে—মুখে সাধনালব্ধ দীপ্তি ও শুচিতা যাহা সহজেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি চোখ নিমীলিত করিয়া শুইয়া ছিলেন। পদশব্দে চক্ষুদ্বয় একবার উন্মীলিত করিয়া আবার নিমীলিত করিলেন।

বৈদ্যরাজ অনেকক্ষণ নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহারপর এক উৎকট নামোচ্চারণ পূর্বক বলিলেন—সান্নিপাতিক জ্বর। সাতদিন না কাটিলে কিছুই বলা

যায় না। আমি ঔষধ দিব কিন্তু পরিচর্যাই এক্ষেত্রে একমাত্র ঔষধ।

দেবদত্তা বলিল, বৈদ্যরাজ তাহার জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনি ইঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলুন।

বৈদ্যরাজ, মানুষের কি সাধ্য, সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু নীতিমূলক বাক্য ও উপদেশাদি দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়া ঔষধ লইয়া আসিলাম। কমলমধুর সঙ্গে তাহা মাড়িয়া দিনে চারবার খাওয়াইতে হইবে।

ঔষধ মাড়িয়া দেবদত্তার হাতে দিলাম। দেবদত্তা বলিল—দত্ত, তুমি যদি এইখানে থাকিয়া যাও ত ভালো হয়। জানি না কখন কি প্রয়োজন হয়—

বলিলাম, বেশত।

দেবদত্তা ঘরের মধ্য হইতে কম্বল আনিয়া দিল আমি তাহা অতিথিশালার বারান্দায় বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। দেখিলাম আকাশে চন্দ্র তখনো তেমনি সুধা বর্ষণ করিতেছে। আমার অন্তরেও সেই সুধা বর্ষিত হইতেছে। দেবদত্তার এত নিকট সান্নিধ্য সেই প্রথম লাভ করিয়াছিলাম।

সুখের দিন খুব সহজেই ফুরাইয়া যায়। দুঃখের দিন দীর্ঘ বিলম্বিত হয়। কিন্তু সেই দিনগুলি আমার সুখের ছিল কি দুঃখের তাহা আজো নিরূপণ করিতে পারি নাই। তবে সেই দিনগুলি, সুখেরই হউক বা দুঃখের, অতিক্রান্ত হইতে চলিল। দেবদত্তার আমি এক নূতন রূপ দেখিলাম। এই রূপ আমি এর পূর্বে দেখি নাই। অতিথির পরিচর্যায় দেবদত্তা নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে মনে হইল সে যেন আহার গ্রহণের কথাও ভুলিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম সে হয়ত রন্ধন করিবার সময় পাইতেছে না। তাই বাজার হইতে পিষ্টক কিনিয়া আনিলাম। পিষ্টক তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, দেবদত্তা, না খাইয়া খাইয়া তোমার শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তোমার জন্য পিষ্টক আনিয়াছি। তুমি খাও।

কিন্তু দেবদত্তা পিষ্টক খাইল না। বলিল—এখন আমি খাইতে পারিব না। তুমি একবার বৈদ্যরাজের কাছে যাও তাঁহাকে ডাকিয়া আন। ইনি সুস্থ হইয়া উঠিবেন জানিতে পারিলেই খাইব।

অগত্যা পিষ্টক তুলিয়া রাখিয়া বৈদ্যরাজকে ডাকিতে ছুটিলাম। বৈদ্যরাজ আসিয়া আবার নাড়ী ধরিলেন। প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, ক্রমে ভ্রূকুঞ্চন শিথিল হইল, শেষে ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা দেখা দিল। তাহারপর নাড়ী ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, এ যাত্রা ইনি রক্ষা পাইয়াছেন। দু'দিনের মাথায় ইঁহার জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইবে। সুস্থ হইয়া উঠিতে আরো সাতদিন লাগিবে।

বৈদ্যরাজ চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, দেবদত্তা, এবারত হইল। ইনি সুস্থ হইয়া

উঠিবেন জানিতে পারিলে। এখন পিষ্টক খাও।

দেবদত্তা একটু হাসিল। বলিল, দত্ত, তাহার এত কি তাড়া। আরো দু'দিন যাক না। না খাইয়া আমি মরিব না।

ইহার পর তাহাকে আর খাইতে বলিবার সাহস হইল না। বুঝিলাম অতিথি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেই সে আহার গ্রহণ করিবে। দেবদত্তাকে তখনো আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যতই দেখিতেছি ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেছি। দেবদত্তার সত্যই তুলনা হয় না। সংসারে এমন কে আছে যে রোগীর এমন পরিচর্যা করিতে পারে? একটা গভীর নিঃশ্বাস বুকের ভিতর হইতে আপনাআপনি বাহির হইয়া আসিল। বলিলাম দত্তা, বৈদ্যরাজ নয়, তুমিই এই অতিথিকে প্রাণ দিয়াছ।

দত্তা বলিয়া ইহার পূর্বে আমি তাহাকে কখনো ডাকি নাই। তাই প্রথমটায় সে একটু চমকিয়া উঠিল। তাহারপর অঞ্জলিবদ্ধ হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, আমি কে? তাহারপর একটু থামিয়া বলিল, দত্ত, তোমায় ইতিপূর্বে বলি নাই—ইনি একজন সাধক। চক্রেশ্বরী দেবীর সাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে বৈতাঢ্যপর্বতস্থিত জিনবিম্ব দর্শন করিয়া তাঁহার আদেশে চন্দনকাষ্ঠের জীবন্তস্বামী প্রতিমা দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তাহারপর কালগতিকে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাকে নিরাময় করিয়া তোলা কি আমাদের কর্তব্য নয়?

দেবদত্তা আমাদের কথাটি এমন ভাবে উচ্চারণ করিল যে তাহাতে আমার শরীরের ভেতর দিয়া এক আনন্দ শিহরণ প্রবাহিত হইয়া গেল।

দেবদত্তা তখনো বলিতেছিল—দত্ত, তিনদিন অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও যখন দেখিলাম ইঁহার অবস্থা ভালোর দিকে যাইতেছে না তখন আমিও চক্রেশ্বরী দেবীর শরণাপন্ন হইলাম। মনে মনে সংকল্প করিলাম ইনি ভালো হইয়া উঠিলেই আমি আহার গ্রহণ করিব। তাই ইঁহার নিরাময় হইয়া উঠিবার পেছনে চক্রেশ্বরী দেবীর প্রসাদই প্রধান জানিবে।

আমি বলিলাম, দত্তা, আমি চক্রেশ্বরী দেবীকে দেখি নাই। তোমাকেই দেখিতেছি। আমি আবারো বলিব। তুমিই অতিথির প্রাণ দিয়াছ।

দেবদত্তা ইহার কোনো প্রত্যুত্তর দিলনা

বৈদ্যরাজ কথিত সেই দুই দিনও অতিক্রান্ত হইল। দুই দিনের মাথায় সত্যই অতিথির জ্বর ছাড়িয়া গেল। দেবদত্তা ছয়দিন উপবাসের পর চক্রেশ্বরী দেবীর পূজা দিয়া আহার গ্রহণ করিল। ক্রমে অতিথিও সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অতিথি-শালায় থাকিবার আমার প্রয়োজনও তাই ফুরাইয়া গেল। আমি আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। আগের মত যেমন মাল্য চন্দনাদি লইয়া যাইতাম তেমনি যাইতে

লাগিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম অতিথি চলিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম, তিনি নাকি আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিবেন না, তাঁহার যাহা কিছু ছিল তাহা দেবদত্তাকে দিয়া গিয়াছেন।

থাকিবার মত তাঁহার কি ছিল তাহা আমি জানি না। দেবদত্তাও আমায় কিছু বলে নাই। কিন্তু আজ তাহাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখিলাম। দু' একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু সে তাহার ভালো মত প্রত্যুত্তর দিলনা। তাই আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি ঘরে ফিরিয়া গেলাম।

ভাবিয়াছিলাম পরদিন ইহা লইয়া তাহার সঙ্গে একটু রঙ্গ করিব। কিন্তু পরদিন যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। যে আমার নিকট হইতে মাল্যচন্দনাদি লইতে আসিল সে আমার পূর্ব পরিচিত দেবদত্তা নয়, অন্য কোনো দেবদত্তা। যদিও সে অলক্তক ব্যবহার করে নাই তবু যখন সে কুট্টিম ভূমির ওপর পা রাখিল তখন আমি আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম যে তাহার ওপর প্রবাল মণির রসধারা যেন প্রবাহিত হইয়া গেল। তাহার শুভ্র স্বচ্ছ দুকুলের পাড় দিয়া এক লঘু লাল বর্ণের ঢেউ খেলিতেছিল। নূপুরের ধ্বনি সেই তরঙ্গায়িত প্রবাল মণির রসধারাকে আরো যেন মনোহারী করিয়া দিয়াছিল। রত্নাবলী মালা আমি লক্ষ্যই করি নাই কিন্তু তাহার অঞ্চল হইতে বহির্নির্গত বাহুযুগল দেখিয়া মৃণাল বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাহার পাতলা চঞ্চল আঙ্গুলের নখপ্রভা তাহাকে যেন বলয়িত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিলে না জানি আরো কি দেখিতাম কিন্তু সেদিকে চাহিয়া দেখিবার আমার সাহস হইল না। আমি তাই নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম নিখিল শোভার মনোহারিণী এই পদ্মরাগ পুত্তলিকা দেবদত্তার দেহ আশ্রয় করিয়া কেন আমায় ছলনা করিতে আসিল। আমি নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিলাম।

দেবদত্তাই আমার হাত ধরিয়া টানিল। বলিল—দত্ত, তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না?

আমার হাতে বিদ্যুৎ স্পর্শের মত অনুভব করিলাম। বলিলাম, না দত্তা, আমি তোমায় সত্যই চিনিতে পারিতেছি না। এত রূপ তুমি কি করিয়া লাভ করিলে? তুমি কি সেই অচ্ছোদ সরোবরের সন্ধান পাইয়াছ যাহাতে স্নান করিলে মানুষ দিব্য কান্তি লাভ করে?

দেবদত্তা হাসিল। বলিল, না। আমি তোমায় সমস্ত বলিতেছি, কিন্তু এসব কথা তুমি আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। বলিয়া সে সেই কুট্টিমতলে বসিয়া পড়িল। আমিও তাই তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলাম।

দেবদত্তা বলিল, দত্ত, অতিথি চলিয়া গিয়াছেন তাহা তুমি শুনিয়াছ। আর তাঁহার সর্বস্ব আমায় দিয়া গিয়াছেন তাহাও তুমি শুনিয়াছ। তাঁহার সর্বস্বের মধ্যে আর কিছুই ছিল না। ছিল দুইটি গুলিকা যাহা তিনি চক্রেশ্বরী দেবীর কাছে লাভ করিয়াছিলেন। যাইবার সময় সেই গুলিকাদ্বয় তিনি আমায় দিয়া গেলেন। বলিলেন, যেহেতু আমি সংসার পরিত্যাগ করিতেছি তাই ইহাদের আমার আর প্রয়োজন নাই। তোমার পরিচর্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি ইহাদের গ্রহণ কর। যাহা কামনা করিয়া তুমি এই গুলিকা ভক্ষণ করিবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। কাল রাত্রে আমি রাজরানীর মত রূপ কামনা করিয়া একটি গুলিকা ভক্ষণ করিয়াছিলাম—

আমি মাঝখানে হাসিয়া বলিয়া উঠিলাম—তাই তুমি রাজরানীর মত রূপ লাভ করিয়াছ। তোমার দেহবর্ণ কাঞ্চনের মতো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তুমি আর দেবদত্তা নও, তুমি কাঞ্চনগুলিকা।

দেবদত্তা হাসিল, কিছু বলিল না।

আমি বলিলাম কাঞ্চনগুলিকা, তুমি এখন দ্বিতীয় গুলিকা লইয়া কি করিবে?

দেবদত্তা বলিল সেই কথাই ভাবিতেছি। যদি রাজরানী না হইতে পারি তবে রাজরানীর মত রূপ লইয়াই বা আমি কি করিব?

বুকের মধ্যে একটা ব্যথার মত অনুভব করিলাম তবু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, কাঞ্চনগুলিকা তুমি রাজরানী হইতে চাও?

বোধ হয় আমার স্বর কিছু বিকৃত হইয়া গিয়া থাকিবে বা কাঁপিয়া গিয়া থাকিবে। তাই সে বিস্মিতের মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, তুমি কোন রাজ্যের রানী হইবে?

দেবদত্তা বলিল, কাল হইতে আমি সেই কথাই ভাবিতেছি। ভারতবর্ষের পরাক্রান্ত নৃপতিদের মধ্যে পৌরুষসম্পন্ন স্বাভিমানী এমন কে রাজা আছেন যাঁহাকে আমি বরণ করিতে পারি?

আমার মনের মধ্যে তখনো আশার একটী ক্ষীণ বর্তিকা জ্বলিতেছিল। তাহা এখন একটী ফুৎকারে নির্বাপিত হইয়া গেল। কাঞ্চনগুলিকা নিজের ভাবনাতেই ডুবিয়াছিল তাই রক্ষা নইলে সে অবশ্যই দেখিত আমার মুখ বেদনায় নীল হইয়া গিয়াছে।

দেবদত্তা বলিল, আমি উদ্রায়ণকে বরণ করিতে চাহি না কারণ—

কারণ যাহাই থাক, হয়ত উদ্রায়ণ বৃদ্ধ হইয়াছেন হয়ত সেখানে সে দাসী হইয়া কাজ করিয়াছে সেখানে রাজরানী হইয়া সে কতখানি সম্মানীয় হইবে—কিন্তু আমি মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম কাঞ্চনগুলিকা ভারতবর্ষের নৃপতিদের মধ্যে দাসীপুত্রিকে যিনি পট্টমহাদেবীর আসনে বসাইতে পারেন তিনি একমাত্র অবন্তীরাজ

চণ্ডপ্রদ্যোৎ।

দাসীপুত্রির মধ্যে একটি শ্লেষ ছিল। কিন্তু দেবদত্তা তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। হয়ত তাহা তাহার কানেও যায় নাই। সে আমার কথা শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, দত্ত, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। ওমন পরাক্রমী বীর্যবান নৃপতি ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নাই। তাহারপর আমায় আর কোনো কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া উঠিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।

ভগ্ন হৃদয় লইয়া সেদিন আমি ঘরে ফিরিলাম। দেবদত্তাকে আমার ভালো লাগিত কিন্তু মনে মনে কবে হইতে তাহাকে যে কামনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আজ মুহূর্তেই যখন জগতের সমস্ত আলো আমার চোখে নিস্প্রভ হইয়া গেল তখন নিজেকে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ততক্ষণে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। আমি কবি নই, সামান্য মালাকর। তাই সেই মানসিক স্থিতিকে যে রূপ দিব তাহার সাধ্য নাই, তবু সেই মনঃস্থিতি লইয়া পরদিন ফুলের যোগান দিতে যাইতে পারিলাম না। না, পরদিনও না। এইভাবে পর পর কয়েক দিনই কাটিয়া গেল।

ভাবিতেছিলাম সংসারে এই কাঞ্চনগুলিকাই সমস্ত অনর্থের মূল। সাধক সেই কাঞ্চনগুলিকা পরিত্যাগ করিয়া ভালোই করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা দেবদত্তাকে কেন দিতে গেলেন? যদি এই কাঞ্চনগুলিকা সে না পাইত তবে সে রাজরানীর মত রূপ কামনা করিত না বা প্রদ্যোতের প্রতি আসক্ত হইত না। কাঞ্চনগুলিকা পাইয়াই না তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

আবার ভাবি—তাহার মাথা ঘুরিলেই বা আমার কি? সেত কোনো দিন আমার প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করে নাই, না আমি তাহার প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করিয়াছি। তবে এই অন্তর্দাহ কেন?

প্রশ্ন করা সহজ কিন্তু দেখিলাম সেই মানসিক পরিস্থিতিকে কাটাইয়া ওঠাও আমার পক্ষে বেশ শক্ত হইয়া উঠিল। মনকে দমিত করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু দেখিলাম তাহা বল্গাহীন অশ্বের মত আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। এই কয়দিন তাহাকে না দেখিলে কি হইবে? তাহারি চিন্তা দেখিলাম ক্রমশঃ আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাত্রে ভালো ঘুম হইল না। তন্দ্রার মত যদিও বা হয় তাহা তখনি ভাঙিয়া যায়। ভাঙিতেই দেবদত্তাকে সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তখন আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করি। দূর ছাই বলিয়া মন হইতে সেই চিন্তা আবার দূর করিবার চেষ্টা করি কিন্তু পর মুহূর্তেই দেখি বেলাভূমির অপসৃয়মান জলের মত তাহা দ্বিগুণ বেগে ফিরিয়া আসিয়া আমার মানসবেলায় আছড়াইয়া পড়ে।

আমি যাহার হাতে পুষ্পমাল্যাদি রাজবাড়ীতে প্রেরণ করিতাম দেবদত্তা প্রতিদিনই তাহাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিত। আর সেও প্রতিদিন আমার শেখানো মত আমি অসুস্থ সেকথা তাহাকে বলিয়া আসিত।

জানিনা দেবদত্তা সেকথা বিশ্বাস করিত কি না। প্রথম প্রথম হয়ত করিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্য হইলাম যখন সে পূর্বাহ্নে জানান না দিয়া আমার মালঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন পারিজাত ফুলের আলবালে জল সিঞ্চন করিতে ছিলাম সহসা দত্ত ডাক শুনিয়া পেছন ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম সে এক বৃক্ষ শাখায় হস্ত রাখিয়া শিথিল শ্যামালতার মত সম্মুখের দিকে ঈষৎ আনত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পথশ্রমে তাহার মুখমণ্ডল শ্রমবিন্দুতে পরিপূর্ণ।

দেবদত্তার কণ্ঠস্বরে সেই পূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করিলাম। আমার দেহের সমস্ত তন্ত্রী সেই স্বর মাধুরীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়া ছিলাম যদি তাহার সঙ্গে দেখা হয় তবে তাহাকে বেশ কয়টি কড়া কথা শুনাইয়া দিব কিন্তু দেখিলাম কার্যকালে আমি সমস্ত কিছু বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। আমার সমস্ত শরীর এক অননুভূত আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার সমস্ত দেহের তাপ যেন চন্দন রস স্পর্শে শীতল হইয়া গিয়াছে। আমার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দত্ত, তোমার সঙ্গে আমার নিভৃতে কয়টি কথা আছে।

আমার সঙ্গে ? নিভৃতে ? ভাবিলাম হয়ত আমি এতদিন কেন যাই নাই সেই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, হয়ত—হায়, আমারো দুরাশার কোনো অন্ত ছিল না। মনে মনে কত কি কথাই না ভাবিয়া লইলাম। কিন্তু তাহাকে কোথায় বসাইব। নিভৃত ? সে স্থান নিভৃতই ছিল। সেখানে কেহ ছিল না তাই পারিজাত কুঞ্জের এক বেদীর ওপর তাহাকে বসাইলাম ও তাহরে নিকটে বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু দেবদত্তা, আমি কেন এত দিন যাই নাই, আমার কি অসুখ করিয়াছিল, এখন কেমন আছি ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই করিল না। বলিল, দত্ত, তুমি যেদিন শেষ গিয়া ছিলে সেইদিন চণ্ডপ্রদ্যোৎকে স্মরণ করিয়া মহাত্মা প্রদত্ত আর একটী গুলিকা ভক্ষণ করিলাম।

গুলিকার কথায় সমস্ত শরীরে আবার জ্বালা অনুভব করিলাম। ধমনীতে রক্ত দ্রুত প্রবাহিত হইল—কিন্তু নিজেকে সংযত রাখিলাম। যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, তেমনি বসিয়া রহিলাম।

দেবদত্তা বলিতেছিল, যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমি আমার এই রূপ লাভ

করিয়াছি ঠিক সেইরকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই সেদিন চণ্ডপ্রদ্যোতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। স্বপ্নে আমার রূপ দর্শন করিয়া তিনি অবন্তী হইতে ছদ্মবেশে বীতভয়ে ছুটিয়া আসিয়াছেন। দেবদর্শন ছলে মন্দিরেই আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি আমাকে পট্ট মহাদেবী করিয়া লইয়া যাইতে চান কিন্তু সেই সঙ্গে এই চন্দন প্রতিমাটিকেও। আর সত্য বলিতে কি যে প্রতিমাটিকে এতদিন আমি সেবা যত্ন করিয়াছি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে আমারও মন সরিতেছে না।

মনে মনে বলিলাম—লইয়া গেলেই হয়, কিন্তু তাহা এত সহজ নহে। উদ্রায়ণ প্রতিদিন এই প্রতিমার আরাধনা করিতে মন্দিরে আসেন। মন্দিরে সেই প্রতিমা না দেখিলে তিনি স্বর্গমর্ত্য এক করিয়া দিবেন। প্রদ্যোৎ বীর হইতে পারেন কিন্তু উদ্রায়ণও কিছু কাপুরুষ নন।

আমায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দেবদত্তা বলিল—সেইজন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি। তোমার মত আমার হিতৈষী আর কেহ নাই। তোমায় একটি কাজ করিতে হইবে। কিন্তু অত্যন্ত গোপনে, যেন কেহ জানিতে না পারে। দারুশিল্পী শিব তোমার বন্ধু। তাহাকে দিয়া এই প্রতিমার অনুরূপ একটী প্রতিমা তোমায় গড়াইয়া দিতে হইবে। যত অর্থ লাগে তাহা আমি দিব।

বলিলাম, তাহা তখনি সম্ভব যখন সে এই প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া কাজ করিবে। আমার মনে হয় তাহা অসম্ভব।

দেবদত্তা বলিল—অসম্ভব কেন?

বলিলাম, এইজন্য যে এই প্রতিমা অন্যত্র লইয়া যাওয়া চলিবে না। আর যদি মন্দিরে বসিয়া সে কাজ করে তবে পুরোহিত, দ্বারপাল সকলেই জানিতে পারিবে।

দেবদত্তা ক্ষণিকক্ষণ কি ভাবিল। তাহারপর বলিল—দত্ত, প্রতিমা নির্মাণ কি একরাত্রে সম্ভব নয়?

বলিলাম, শিবের পক্ষে সম্ভব।

দেবদত্তার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, অদ্য রাত্রে তুমি শিবকে লইয়া আসিও। পুরোহিত ও দ্বারপাল যাহাতে না থাকে তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।

দেবদত্তা কি ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহা আমি জানি না। তবে সে চতুরা তাহা আমি জানি। তাহাছাড়া পুরোহিত ও ভৌষণ্ডিকের ওপর তাহার প্রভাবও রহিয়াছে। তাই শিবকে লইয়া রাত্রির প্রথমযাম উত্তীর্ণ হইলে মন্দিরে গেলাম। ভৌষণ্ডিক দ্বারে ছিল না এবং পুরোহিতকেও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। শিবকে গর্ভগৃহে বসাইয়া বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। বলিলাম—একাজ তোমায় এই রাত্রে করিয়া দিতে হইবে।

আমি মন্দিরের সিঁড়ির ধাপে আসিয়া বসিলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকার আকাশে তাই নক্ষত্ররাজি দীপমালিকার মত জ্বলিতেছিল। আমি সেদিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, এইত কয়দিন আগে অতিথিশালার বারান্দায় রাত কাটাইয়া গিয়াছি। সেই রাতে ও আজিকার রাতে কতইনা তফাৎ। সেদিনও দেবদত্তার কথায় আসিয়াছিলাম। আজও দেবদত্তার কথায় আসিয়াছি—কিন্তু...এই কিন্তুই মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। ভাবিতে ছিলাম—এই নকল চন্দন মূর্তি গড়াইয়া আমার কি লাভ বরং আমি অন্যায়েরই প্রশ্রয় দিতেছি, চুরিতে সাহায্য করিতেছি। উদ্রায়ণত আমার কোনো অনিষ্ট করেন নাই। তবে? না। একাজ আমি দেবদত্তার জন্য করিতেছি। দেবদত্তা কিছু বলিলে না বলিবার আমার সাধ্য নাই। সে যদি বলে দত্ত, তোমায় শূলে যাইতে হইবে—তবে বোধহয় আমি শূলে যাইতেও পারি। যে কাজ করিতে আসিয়াছি তাহাও বা শূলে যাইবার চাহিতে কি কম? যদি ঘুণাক্ষরেও একথা জানাজানি হইয়া যায় তবে মহারাজ কি আমায় শূলে না দিয়া ছাড়িবেন? কিন্তু...সঙ্গে সঙ্গে দেবদত্তার জন্য একাজ করিতেছি ভাবিয়া মনে মনে আনন্দও পাইতেছি। সেই আনন্দ যদি না পাইতাম তবে বোধহয় এই হীন কাজ আমি করিতাম না। হীন? কথাটি কানে কর্কশ লাগিল। ভাবিলাম একথা এখুনি ছুটিয়া গিয়া রক্ষীদের জানাই। চিৎকার করিয়া বলি আমি কি কুকর্ম করিতে আসিয়াছি। কিন্তু তখনি মন বলিল, দত্ত এ তোমার মহান কর্ম, চরম উৎসর্গ। দেবদত্তার জন্য তুমি নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছ। স্বর্গ তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। দেবদত্তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোময় চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখিবে। সেই অমরত্বের আনন্দে দেখিলাম আমার সমস্ত শরীর শিহরিত হইয়া উঠিল।

শেষ রাত্রে দেবদত্তা আমার কাছে আসিয়া বসিল। বলিল ভৌবণ্ডিককে কিভাবে মদ্যপান করাইয়া সে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কলা প্রভাতের পূর্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবেনা। আর পুরোহিতকে স্বস্ত্যয়নের জন্য তাহার ভগ্নীর গৃহে প্রেরণ করিয়াছে, সেও কল্য প্রভাতের পূর্বে ফিরিবে না।

বলিলাম, দত্তা, তোমার ভগ্নির কথাত কথনো শুনি নাই।

দেবদত্তা হাসিল, বলিল, থাকিলেত শুনিবে। যে স্থানের কথা বলিয়াছি তাহা সে সমস্ত রাত্রি খুঁজিয়াও পাইবেনা।

চুপ করিয়া রহিলাম।

ভোরের কাক ডাকিবার পূর্বেই কাজ শেষ হইল। দেবদত্তা সেই দুই প্রতিমা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর সন্তুষ্ট হইয়া নূতন প্রতিমা সিংহাসনে বসাইয়া পুরাতন প্রতিমা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইল। শেষে আমার দিকে এমনভাবে

চাহিয়া দেখিল তাহাতে আমি কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলাম।

দেবদত্তা প্রদত্ত অর্থ শিবের হাতে তুলিয়া দিলাম। বলিলাম, শিব, সাবধান। একথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। তাহা হইলে তোমাকে ও আমাকে উভয়কেই শূলে যাইতে হইবে। কিন্তু তখন কি জানিতাম এই সত্য পরদিন সকালেই প্রকাশ পাইয়া যাইবে—ইহাকেই বলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি! কিন্তু আমারো বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছিল।

তাই প্রদ্যোতের সঙ্গে যখন দেবদত্তা বীতভয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে তখন মহারাজ উদ্রায়ণ জীবন্ত স্বামীর প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এ প্রতিমা সেই প্রতিমা নহে। প্রথমে পুরোহিতের তলব হইল। সে কিছু বলিতে পারিলনা। তাহারপর দ্বারপালের। তাহার নিকট হইতেও যখন কিছু জানা গেলনা তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নগরে ততক্ষণে একথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে চন্দনকাঠের ভগবান মহাবীরের জীবন্ত স্বামী প্রতিমা কে বা কাহারা গতরাত্রে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থানে অবিকল সেইরূপ প্রতিমা বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে মহারাজের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মনের মধ্যে নানা কথা তখন তোলপাড় করিতেছিল। শূলের ভয়ও যে না করিতেছিল তাহাও নয় এক একবার সত্যকথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল—কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে দেবদত্তাকে সেখানে কিছুতেই জড়ানো চলিবেনা। যদি সমস্তই প্রকাশ পাইয়া যায় তবে বলিব চণ্ড প্রদ্যোতের জন্য আমিই নকল প্রতিমা বসইয়া আসল প্রতিমা চুরী করিয়াছি। কিন্তু যতক্ষণ কিছুনা বলিয়া পারা যায় ততক্ষণ চুপ করিয়া থাকিব।

জানিনা মহারাজ আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা কিন্তু তিনি আমায় সোজাসুজি প্রশ্ন করিলেন না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই বলিলেন। দেখত দত্ত, এইটী কি জীবন্ত স্বামীর সেই প্রাচীন প্রতিমা?

প্রতিমা হাতে লইয়া খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম, না।

মহারাজ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, সে প্রতিমা কাল রাত্রে চুরী গিয়াছে—তুমি কি সে সম্বন্ধে কিছু জান?

উভয়ে সঙ্কটে পড়িলাম। দ্বিধা করিলেই বিপদ তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, না।

তুমি কি জান সেই সঙ্গে দেবদত্তাকেও আজ সকাল হইতে পাওয়া যাইতেছে না?

এবারে বিস্ময়ের ভাণ করিয়া অস্ফুট উচ্চারণ করিলাম, দেবদত্তাকে?

মহারাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল তিনি যেন আমার অন্তঃস্থল সম্পূর্ণ দেখিয়া লইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—ইদানীং দেবদত্তার বাহ্যরূপে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে তুমি কি কিছু জান ?

সহসা মাথার মধ্যে এক বুদ্ধি খেলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম দেবদত্তাকে বাঁচাইব। কিন্তু প্রদ্যোৎকে ছাড়িব কেন ? তাই বলিয়া উঠিলাম, জানি।

মহারাজ সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তখন বলিতে আরম্ভ করিলাম—মহারাজ কিছুদিন পূর্বে এখানে এক মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি চন্দন প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আসিয়াই সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন। দেবদত্তা তাঁহার পরিচর্যা করিয়া সুস্থ করিয়া তোলে। তিনি যাইবার সময় দেবদত্তাকে দুইটি গুলিকা দিয়া যান। গুলিকার এই গুণ যে তাহা ভক্ষণ করিয়া যে কামনা করা যায় তাহা সিদ্ধ হয়। দেবদত্তা প্রথম গুলিকা ভক্ষণ করিয়া রূপ কামনা করিয়াছিল ; দ্বিতীয়…

আমি একটু থামিলাম। মহারাজ আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন। আমাকে থামিতে দেখিয়া বলিলেন দ্বিতীয় গুলিকা ভক্ষণ করিয়া সে কি কামনা করিয়াছিল ?

বলিলাম, অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোৎকে।

আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন—বুঝিয়াছি, ইহা সেই দাসীপুত্রের কাজ। এই চন্দন প্রতিমার ওপর তাহার অনেকদিনের লোভ ছিল। এই সুযোগে সে দেবদত্তা ও চন্দনপ্রতিমাকে হস্তগত করিয়া পলাইয়াছে। কিন্তু সে কতদূর যাইবে বলিয়া তিনি আমাকে আর কোনো প্রশ্ন না করিয়াই প্রস্থান করিলেন। আমিও নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তিনি যদি আরো খুঁটাইয়া প্রশ্ন করিতেন তবে আমি কি বলিতাম জানিনা কিন্তু ইহাতে সাপও মরিল লাঠিও ভাঙিল না গোছের হইল।

মহারাজ যখন দ্রুতগতিতে মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তখনি বুঝিলাম যে প্রদ্যোতকে ধরিবার জন্য তিনি অবন্তীর পথে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রেরণ করিবেন। হইলও তাহাই। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইতে না হইতে সংবাদ আসিল প্রদ্যোত ধৃত হইয়াছেন। দেবদত্তা ও চন্দন প্রতিমা সহ তাঁহাকে বীতভয়ে ফিরাইয়া লইয়া আসা হইতেছে।

সেই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরাক্রান্ত

রণকৌশলী চণ্ডপ্রদ্যোৎ ধৃত হইয়াছেন ইহাই এক সংবাদ তাহার পর চন্দন প্রতিমার প্রত্যাবর্তন সমস্ত ঘটনাকে এমন এক মহত্ব দিয়াছিল যে সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য দলে দলে জনতা রাজপ্রাসাদের চত্বরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। আমিও সেই দলে মিশিয়া দেবদত্তাকে যাহাতে খুব কাছ হইতে দেখা যায় সেইরকম স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা হইতে তখনো অনেক বিলম্ব ছিল। সেই সময় দেখিলাম অশ্বারোহী-বাহিনীপরিবৃত মহারাজের রথ রাজপ্রাসাদের চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইল। রথের মাঝখানে সেই চন্দন প্রতিমা উচ্চাসনে বসানো ছিল। তাহার পেছনে চণ্ডপ্রদ্যোত ও দেবদত্তা। সম্মুখে সারথীর পাশে অশ্বারোহীবাহিনীর নায়ক যোধজিৎ বসিয়াছিল।

চণ্ডপ্রদ্যোৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনা হয় নাই। সসম্মানেই আনা হইয়াছে। মহারাজ উদ্রায়ণ ধীর স্থির ও ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাই কোনো বিষয়েই হঠকারিতা করিতেন না।

আমি দেবদত্তার দিকে চাহিয়াছিলাম। সে কোন দিকে চাহিয়া দেখিতে ছিল না, মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল।

দেবদত্তার জন্য আমার মন কেমন যেন আর্দ্র হইয়া উঠিল। ভাবিতেছিলাম আজ সে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে সে পরিস্থিতি তাহার জীবনে কোন দিনই আসিত না যদি মহাত্মা না আসিতেন, যদি সে গুলিকা লাভ না করিত। সে দাসী—দাসীই থাকিত। অবন্তীর পট্টমহারানী হইবার সে স্বপ্ন দেখিত না। উচ্চাশার জন্যই না তাহার আজিকার এই লাঞ্ছনা? উচ্চাশা কি খারাপ? তাহা বলিতে পারি না। উচ্চাশা না থাকিলে মানুষ কখনো বড় হইতে পারিত না। কিন্তু দেবদত্তার এই লাঞ্ছনার মূলে আমার দায়িত্বও কম নয়। আমি যদি নকল চন্দন প্রতিমার নির্মাণ কাজে তাহাকে সাহায্য না করিতাম তবে হয়ত আজ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা হইত না। দেবদত্তার জন্য নিশ্চয়ই চণ্ডপ্রদ্যোৎকে ধরিবার জন্য মহারাজ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিতেন না। এও ভাগ্য! যদি যুদ্ধ হইত তবে চণ্ডপ্রদ্যোৎকে বন্দী করে কাহার সাধ্য কিন্তু আজ তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র না হইলেও একাকী ছিলেন।

দেখিলাম দেবদত্তার দিকে আমার মন ধাবিত হইল। দেবদত্তাকে কি সত্যই প্রদ্যোৎ পট্টমহারাণী করিবে? মনে হয় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ হইতে বাছাবাছা সুন্দরীদের সে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার অন্তঃপুর ভরিয়া রাখিয়াছে—নানা স্থানের পুষ্পের মধ্যে দেবদত্তাও মাত্র একটী পুষ্প হইয়া ফুটিয়া থাকিবে।

যতদিন তাহার রূপ ও যৌবন থাকিবে ততদিন প্রদ্যোৎ মধুলোভী ভ্রমরের মত তাহার অধর সুধা পান করিবে তাহারপর সে উড়িয়া অন্য পুষ্পে গিয়া বসিবে। হায় দেবদত্তা তুমি উপেক্ষিতাদের দল মাত্রই বৃদ্ধি করিবে—সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল দেবদত্তা যদি আমার হইত। একটী তীক্ষ্ণ বেদনা আমার সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া গেল—তবে দেবদত্তা কি আমাকে ভালবাসিত না ?—সে না বাসুক, আমিত তাহাকে ভালবাসি।

মহারাজ ততক্ষণে আসিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এক স্বর্ণ খচিত ছত্রের নীচে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণে মন্ত্রী ও সেনাপতি বামে বৃদ্ধ পুরোহিত। পুরোহিতকে কেন জানিনা আমার কীটের মত মনে হইতেছিল—সে সেই নকল জীবন্তস্বামী লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রদ্যোত ও কাঞ্চনগুলিকাকে ততক্ষণে নীচে নামানো হইয়াছে। মহারাজ প্রদ্যোতকে যেন বলিতেছেন…তুমি তস্করের মত জীবন্ত স্বামীর প্রতিমা লইয়া যাইতেছিলে। তোমার অপরাধ অক্ষম্য। তবু তোমায় আমি ক্ষমা করিলাম। জীবন্ত স্বামীর আসল প্রতিমা তুমি পাইবেনা, এই নকল প্রতিমা লইয়া তুমি ফিরিয়া যাও। যোধজিৎ তোমায় সীমান্তের ওপারে ছাড়িয়া আসিবে।

প্রদ্যোত মাথা নীচু করিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজ এবার দেবদত্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেবদত্তা তুমি আমার দাসী। তক্ষশীলা হইতে তোমায় ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম। তোমার অবিনয়ও ক্ষমার অযোগ্য। তবু তোমায়ও আমি ক্ষমা করিলাম। শুধু তাই নয়, তোমার দাসত্ব হইতেও তোমায় আমি মুক্ত করিলাম। এখন যেমন তোমার অভিরুচি। ইচ্ছা হইলে এখানে থাকিতে পার, ইচ্ছা হইলে প্রদ্যোতের সঙ্গে অবন্তীও যাইতে পার।

দেবদত্তা কি প্রত্যুত্তর দেয় শুনিবার জন্য আমার হৃদয় দুলিতে লাগিল। আমি আশা করিয়াছিলাম সে বলিবে এই চন্দন প্রতিমা ছাড়িয়া আমি যাইতে পারিব না। কিন্তু আমার আশা ভঙ্গ হইল। দেবদত্তা ধীরে' ধীরে বলিল, মহারাজ, আমি অবন্তী যাইতে ইচ্ছা করি।

দেখিলাম আমার মত দেবদত্তাও চন্দন প্রতিমাকে ভালো বাসে নাই। সে যে বলিয়াছিল 'যে প্রতিমাকে এতদিন আম সেবাযত্ন করিয়াছি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছে না' তাহা সর্বৈব মিথ্যা। আমার মত সেও মানুষকেই ভালো বাসিয়াছে।

কখন যে প্রদ্যোত ও দেবদত্তা রথে উঠিল, কখন আসল জীবন্ত স্বামীকে নামাইয়া নকল জীবন্ত স্বামীকে রথে তোলা হইল, লক্ষ্য করি নাই। চমক ভাঙিল রথের চাকার

ঘর্ঘর শব্দে। মনে হইল সেই চাকা আমার হৃদয়ের অস্থি পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। একটী যাতনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম পথপার্শ্বের খর্জুর বৃক্ষতলে আমি শুইয়া আছি। শুক্লা দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশীলেখা নিরভ্র আকাশে উদিত হইয়াছে। বুকের ব্যথা আরো তীব্র হইয়া যেন চাপিয়া বসিয়াছে।

মহাবীরের হলেড্ডুগ

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমান জৌগ্রামে মহাবীর কেবল দর্শন জয়ন্তী-প্রকাশিত ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের স্মরণিকায় ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাবীরের রাঢ়-চারিকা প্রসঙ্গে বৎসর অনুসারে মহাবীরের চারিকাকৃত গ্রামনামাবলী প্রকাশ করেছেন। পাটনা থেকে প্রকাশিত *Behar Herald* পত্রিকার ১৯৭৭ সালের ১৬ই এপ্রিলের সংখ্যাতেও (pp. 13-15) ডক্টর মণ্ডল 'Topography and Toponomy of Mahavira's Itinerary in West Bengal' প্রবন্ধে মহাবীরের রাঢ়-চারিকার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই তালিকায় যথাক্রমে (ঙ) এবং E পর্যায়ে পঞ্চম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় হলদী (হলেড্ডুগ) গ্রামটিকে বর্ধমান জেলার খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত বলে তিনি অনুমান করেছেন। তাঁর মনে সন্দেহ থাকায়, মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত হলদিয়া গ্রামটিকেও তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

আমার গবেষণার তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি সাত বৎসর যাবৎ গ্রাম পরিক্রমা করছি। আমার গবেষণার বিষয় হ'ল বর্ধমান চম্পা ও ভাগলপুর চম্পার ঐতিহাসিক ভূগোল সংকলন এবং সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রেরণার উৎস অনুসন্ধান।

রাঢ় দেশের অজয় ও দামোদর অন্তর্বর্তী ভূ-ভাগের বিভিন্ন গ্রাম আমি পরিক্রমা ও পরিভ্রমণ করেছি ; বহু দেব-দেবীর সন্ধান পেয়েছি ও তাঁদের সম্পর্ক নিরূপণ করেছি। পদব্রজে অনেক গ্রাম আমি খুঁটিয়ে দেখেছি তন্ন তন্ন ক'রে।

সে-কালের পার্থালিস বর্তমান পারতালিত সন্নিহিত খড়ি নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত হলদী গ্রামে আমি গিয়েছি এবং পাতি পাতি ক'রে অনুসন্ধান করেছি। হলদী গ্রামে বিভিন্ন বনেদী বংশে রক্ষিত কাগজ-পত্র ও দলিল-দস্তাবেজ আমি দেখেছি। বর্তমান হলদী-নিবাসী শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে আমি যে-দলিল পর্যবেক্ষণ করেছি, তাতে হলদী গ্রামের পুরাতন নাম হলদ্দী পেয়েছি। তদ্দৃষ্টে আমার ধারণা হয়েছে, 'হলদ্দী' শব্দটি 'হলেড্ডু' শব্দের অপভ্রংশ। 'হলেড্ডু' স্থান নামটির পাঠান্তর রয়েছে—'হলিড্ডু' এবং 'হলেড্ডুয়া'।

হলদী গ্রামে বর্তমানেও তেঁতুল গাছের বীথি রয়েছে খড়ি নদী বরাবর। হলদী গ্রামে বর্তমানে 'আম্হাই গোপথ' নামে একটি পুরাতন রাস্তা আছে। এইখানে একটি অতিবৃদ্ধ তেঁতুল গাছ রয়েছে, যার কাণ্ডের পরিধি ছত্রিশ ফুটের মতো এবং ডালের

পরিধি ষোল ফুটের মতো। এই তেঁতুল গাছের অদূরে রয়েছেন দেবতা বলদেব। এঁর পূজক হলেন 'অধিকারী'-উপাধিক ব্রাহ্মণ-বংশ। এছাড়া রয়েছেন সূর্যমণিঠাকুরাণী এবং দেবতা জুড়ো-বুড়ো। এই জুড়ো-বুড়ো হচ্ছেন ধর্মঠাকুরের সহচর। ধর্মপূজার দিক্‌ডাকে ইনি নিয়মিত পুষ্পমাল্য পেয়ে থাকেন। এঁর নিত্য-সেবার জন্যে পাঁচবিঘা পরিমাণ জমি নির্দিষ্ট আছে। ধর্মঠাকুর স্বরূপনারায়ণ এবং সর্বমঙ্গলা এই গ্রামের বাস্তু দেবতা। আশে-পাশের গ্রামে প্রস্তর-নির্মিত নগ্ন মহাবীর-মূর্তি আমি অনেক দেখেছি। শিব, শীতলা প্রভৃতি নানা বিচিত্র হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর নামে সে-সব এখনও পূজিত হয়ে আসছে।

প্রবাদ, আমাদের পূর্বোক্ত তেঁতুল গাছটি নাকি অচেনা গাছ; কোনো অচেনা ভৈরব চালিয়ে নিয়ে এসেছেন কামরূপ থেকে। খড়ি নদীর ধারে রয়েছে "পাগলার ডাঙ্গা"। ঐ ভৈরব নাকি অচেনা গাছটিকে ফেলে রেখে, এই পাগলার ডাঙ্গা দিয়ে অন্তর্হিত হন। এ ছাড়া, এখানে দেবতা আছেন পঞ্চানন আর জাঙিলা মনসা। 'জাঙিলা' শব্দটি মনসার জাগুলি নামটিকে স্মরণ করায়।

গ্রামের বর্ষীয়ান ভদ্রলোক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ষীয়সী সহধর্মিনীর মুখ থেকে সম্প্রতি আমি এই গ্রামে প্রচলিত টুসু-গানের দু'টি ছড়া সংগ্রহ করেছি। যথা ঃ

(১) হলুদ ফুল তুলতে গেলাম
শিরে টানা টানা পাতা।
শিব চরণে দেখা হ'ল
শিবের মাথায় জটা॥
কেন শিব কেন শিব
কেন তোমার মাথায় জটা
জেন দেবতা পূজো দিয়েছি
সেই দিয়েছে জটা।
একি ফুল গোছা গোছা॥

(২) তেঁতুল ডাঙ্গার তেঁতুল গাছটি
পাতা ঢল ঢল করে গো
পাতা ঢল ঢল করে।
তার তলাতে ন্যাংটা ক্ষ্যাপা
সদাই খেলা করে গো,
সদাই খেলা করে॥

গুপ কাঁদে গুকুলি কাঁদে, কাঁদে তরুলতা
আজ সকালে দেখা হয়েছে
কেন ন্যাংটার কথা গো
কেন ন্যাংটার কথা ॥

নেংটা গেল নেংটি পরে
আ বুলবুলির দেশেতে
এখন নেংটা ঘরে এলো না
তেঁতুল তলায় হারিয়ে
তেঁতুল তলায় হারিয়ে।
কুচ-কুচ কুচাই বন
কেন ন্যাংটা এতক্ষণ।
আজ থাকো গো ন্যাংটা ক্ষ্যাপা
শুধুই বুধই খেয়ে।
কাল তোমাকে পূজব আমি
তেঁতুল ফুল দিয়ে ॥

মহাবীরের চারিকায় পঞ্চম বৎসরের বর্ণনায় বলা হয়েছে,—

Then both reached Savatthi and then proceeded to Haleduga. Here there was a big Turmeric [Tamarind] tree where Mahavira stood in meditation and his feet are said to have burnt by fire [L.A.I., J.C. Jain, p. 258)।

হলেড্ডুগের পরিচয় দিতে গিয়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র জৈন মহাশয় লিখেছেন,—

Halidduga or Haledduya—a village, Mahavira arrived here from Savatthi and proceeded to Nangala. It's exact situation is not known. (Do, p. 287)

মহাবীরের রাঢ়-চারিকায় হলেড্ডুগর বা হলিড্ডুগর অবস্থান সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। সে-বিচার করবেন বিশেষজ্ঞগণ। আমার অনুসন্ধিত হলদী গ্রামের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য-পরম্পরার কিঞ্চিৎ পরিচয় বর্তমান প্রবন্ধে বিবৃত করা

গেল। আমার সংগৃহীত টুসুগানের দুটি ছড়া থেকে এই গ্রামে 'জেন' বা 'জনিদেবতা', ন্যাংটাক্ষ্যাপা মহাবীরের আগমন ও তেঁতুল-তলায় তাঁর ধ্যানমগ্ন-অবস্থায় অবস্থান সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা সে-বিচার সুধীজন করুন। সিংহলে প্রবাদ, তেঁতুলগাছ অতি দীর্ঘজীবি হয়ে থাকে। হলদীগ্রামের বর্তমান এই অচেনা তেঁতুল গাছটিই বা কত পুরাতন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ সে-বিচার করে দেখতে পারেন।

১ মহাবীরের সময়ে সাবত্থী (শ্রাবস্তী) উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল। গোণ্ডা জেলার অকৌনা হতে ৫ মাইল পূবে ও বলরামপুর হতে বার মাইল পশ্চিমে রাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরে যে সাহেত মাহেত অবস্থিত পণ্ডিতেরা তাকেই প্রাচীন শ্রাবস্তী বলে মনে করেন। হলিদ্দুগ গ্রাম শ্রাবস্তীর পূর্বপরিসরে অবস্থিত ছিল। —সম্পাদক

রৌহিণেয়

[একাঙ্কিকা]

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় দৃশ্য

[মহাসেন উদ্যানে যাবার পথ। পেছনে চোর চোর শব্দ। রৌহিণেয় দৌড়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে]

রৌহিণেয় : না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। তাড়া তাড়িতে ঘরেই অদৃশ্যকারিণী জামা ফেলে এলাম। আর এখন আকাশগামিনী পাদুকা অট্টালিকার দরজায়। যে ভাবে তারা আমায় ঘিরে নিয়েছিল—দেয়াল টপকে পালিয়ে এলাম কিন্তু এখন সেই পাদুকা আনি কি করে?

[মহাসেন উদ্যান হতে ধর্মসভায় প্রদত্ত ভগবান মহাবীরের উপদেশ অস্পষ্ট রূপে তার কানে এসে পড়ছে]

রৌহিণেয় : আরে! এ আমি কোথায় এলাম? ও কিসের শব্দ? এতো মহাসেন উদ্যানে যাবার পথ যেখানে ভগবান মহাবীরের ধর্মসভা হচ্ছে। না না আমি ওদিকে যাব না। পিতার শেষ আদেশ—মহাবীর যাকে লোকে তীর্থংকর বলে, তাঁর কথা কখনো শুনবেনা, ভুলেও ও'র কাছে যাবেনা। যদি যাও ত সর্বনাশ হয়ে যাবে। চুরী তোমার কুলধর্ম—সেকথা ভুলে যাবে। কিন্তু এখন উপায়? পেছন ফিরি ত কি ভাবে ফিরি? পেছন হতে চোর চোর শব্দ আসছে [শব্দ] আর সম্মুখে মহাবীরের ধর্মসভা! হায়, এখন আমি কি করি—কিন্তু এখন আমায় যেতে হবে ওই পথেই। হাঁ—ঠিক সময়ে একথা আমার মনে এসেছে। আমি যদি কানে আঙুল দিয়েনি তবে মহাবীরের কথা আমার কানে যাবেনা।

[কানে আঙুল দিয়ে দৌড়ে খানিকদূর যাচ্ছে। সহসা বাবলার কাঁটা তার পয়ে ফুটছে। আঃ করে চীৎকার করে উঠছে]

রৌহিণেয় : বিপদের ওপর বিপদ। এখন কাঁটা বার করি কি করে? যারা আমার পেছন নিয়েছে তারা ত এদিকেই আসছে। বলুন পিতা, এখন আমি কি করি! যদি কাঁটা বার করি ত মহাবীর বাণী কানে

পড়ে যাবে আর যদি না বার করি তবে দৌড়ই কি করে ?
[পেছনে চোর চোর চোর শব্দ। রোহিণেয় বাধ্য হয়ে কাঁটা বার করছে। সেই সময় তার কানে পড়ছে

নিমেষ বিহীন নেত্র হয় দেবতার।
কণ্ঠধৃত পুষ্পমাল্য শুকায় না আর ॥
দেবদেহ ভূমিস্পর্শ করেনা কখনো।
ইচ্ছামাত্র কার্যসিদ্ধি হয় আরো জেনো ॥

রোহিণেয় : হায় হায় হায়! একি অনর্থ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মহাবীর বাণী আমার কানে পড়ে গেল। [কানে আঙুল দিয়ে মহাবীর বাণী বার করবার চেষ্টা করছে] এদের বার করিত কি ভাবে? এতো বেরুচ্ছেই না। হায় হায় হায় এখন কি করি ?
[দুজন আরক্ষকের প্রবেশ]

১ম আরক্ষক : তুমি কে ?

রোহিণেয় : আমি ? আমি নাগরিক।

২য় আরক্ষক : নাগরিক ত এভাবে পালাচ্ছিলে কেন ?

রোহিণেয় : পালাচ্ছিলাম না, দৌড়াচ্ছিলাম।

১ম আরক্ষক : [মুখভঙ্গী করে] পালাচ্ছিলাম না, দৌড়াচ্ছিলাম···বেশ! এই কথা বল মন্ত্রীবর অভয়কুমারকে। পালাচ্ছিলাম না, দৌড়চ্ছিলাম। [দ্বিতীয় আরক্ষককে] এর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দাও।

রোহিণেয় : আমি চোর নই, আমি বৈশ্য। আমার নাম দুর্গচণ্ড। নিবাস শালিগ্রাম।

১ম আরক্ষক : আর আমরা যদি বলি তুমি রোহিণেয় চোর তবে—

রোহিণেয় : মিথ্যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে।

১ম আরক্ষক : চুপ, আর একটীও কথা নয়।
[সানুচর অভয় কুমার আসছেন। আরক্ষকেরা তাঁকে প্রণাম করছে]

১ম আরক্ষক : দেব! এই রোহিণেয় চোর। এ দিক দিয়ে পালাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আজ একে আমরা ধরতে পেরেছি।

অভয়কুমার : [রোহিণেয়র দিকে চেয়ে] কি—তুমি রোহিণেয় ?

রোহিণেয় : না না আমি রোহিণেয় নই। আমি শালিগ্রামবাসী বৈশ্য। নাম দুর্গচণ্ড।

অভয়কুমার : শালিগ্রাম নিবাসী ? এখানে কি জন্যে এসেছিলে ?

রোহিণেয় : ভগবান মহাবীরের ধর্মসভায় যাচ্ছিলাম এর মধ্যে এরা আমায় ধরে নিল।

অভয়কুমার : [আরক্ষকদের দিকে চেয়ে] তোমরা কি করে জানলে এই রোহিণেয় ?

১ম আরক্ষক : দেব ! এদিক হতে চোর চোর শব্দ আসছিল আর এ এদিকে দৌড়ে পালাচ্ছিল।

অভয়কুমার : কিন্তু এতো বলছে…

১ম আরক্ষক : দেব ! এ মিথ্যে কথা বলছে।

অভয়কুমার : [একটু চিন্তা করে রোহিণেয়কে] দুর্গচণ্ড, তুমি যখন ভগবান মহাবীরের উপদেশ সভায় যাচ্ছিলে তখন তুমি আমার সহধর্মী। সহধর্মীর সম্মান করা আমার কর্তব্য। তুমি আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করে আমার গৃহ পবিত্র করো। [আরক্ষকদের দিকে চেয়ে] এর হাতকড়ি খুলে আমার ঘরে পৌঁছে দাও।

১ম আরক্ষক : দেব !

অভয়কুমার : বাস। আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।

[আরক্ষকেরা রোহিণেয়র হাতকড়ি খুলে নিয়ে যাচ্ছে। অভয়কুমার নিজের অনুচরদের একজনকে বলছেন]

অভয়কুমার : তুমি অন্যপথে আমার গৃহে যাও। সেখানে আরক্ষকদের একথা জানিয়ে দাও যে যে লোকটিকে ওরা নিয়ে যাবে সে লোকটি যাতে কোনো ভাবে ওখান হতে পালিয়ে না যায়। কিন্তু এমনভাবে তার ওপর লক্ষ্য রাখবে যাতে সে যে নজরবন্দী একথা বুঝতে না পারে।

১ম অনুচর : তাই হবে। [প্রস্থান]

অভয়কুমার : [২য় অনুচরকে] আর তুমি শালিগ্রাম যাও। সেখান হতে খবর নিয়ে এসো সেখানে দুর্গচণ্ড নামে কোন বৈশ্য থাকে কিনা। ওর সম্পর্কে সব বিবরণ নিয়ে আসবে।

[দ্বিতীয় অনুচর চলে যাচ্ছে। অভয়কুমারও]

[ক্রমশঃ

জৈন সম্পর্কে লেঃ কর্ণেল টড্

[এনালস্ এ্যাণ্ড এ্যান্টিকুইটিজ্ অব রাজস্থান হতে]

এবারে জৈনদের সম্পর্কে বিবরণ প্রস্তুত করছি। এরাই রাজস্থানের 'বিদ্বান' বা 'যাদুকর'। এদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে য়ুরোপীয়দের ধারণা নগণ্যই বলা যায়। তারা মনে করে এরা সংখ্যায় অল্প ও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে এবারে বলি। এই ধর্মের বিভিন্ন শাখার একটি শাখা খরতর গচ্ছের[২] যিনি আচার্য তাঁর একারই ১১০০০ গৃহী শিষ্য রয়েছে যারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাস করে। এদের একটি সম্প্রদায় ওসি বা ওসওয়াল ১০০০০০ ঘর। ভারতের বাণিজ্যিক সম্পদের আর্দ্ধেকেরও বেশী এদের হাত দিয়ে হস্তান্তরিত হয়…

রাজ্যগুলির উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা প্রায়শঃই জৈন। আসমুদ্রহিমাচল অর্থলগ্নকারীও এরাই। উদয়পুরের প্রধান শাসক ও বিচারকও জৈন। রাজস্থানের বিভিন্ন সহর সম্পর্কে এই একই কথা বলা যায়।

১ বিদ্বান—জ্ঞানী বা জ্ঞানের রহস্য যে জানে। যারা জৈন নয় তারা এই শব্দটি জৈনদের বেলায় ঐন্দ্রজালিক অর্থে ব্যবহার করে। তারা মনে করে এরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। কোষ রচয়িতা 'অমর' সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি অমাবস্যার রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় করিয়েছিলেন।

২ খরতর অর্থাৎ খাঁটি। সম্মানসূচক এই উপাধি খৃঃ একাদশ শতকে জৈন পৃষ্ঠপোষক অনহিল-ওয়াড়াপত্তনের রাজা সিদ্ধরাজ কর্তৃক বাদবিজয়ী এক আচার্যকে প্রদত্ত হয়। সেই হতে তাঁর গচ্ছের নাম হয় খরতর। প্রখ্যাত হেমচন্দ্র খরতর গচ্ছের আচার্য ছিলেন। তাঁর পট্টাধিকারী এক আচার্য অধুনা মরুস্থলস্থিত উদয়পুরে পদার্পণ করে তাকে পবিত্র করেছেন। আমার নিজের শিক্ষক যতি পরম্পরাক্রমে হেমচন্দ্রাচার্যের শিষ্য। প্রমুখ আচার্য বা শ্রীপূজ্য প্রভূত বিদ্যার অধিকারী ও চরিত্রবান। প্রাচীন সমস্ত লিপিরও তিনি পরিজ্ঞাতা। আমার জন্য এতদিন দুর্বোধ্য এক লিপির তিনি পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন। তাঁর সতত ভ্রাম্যমান গ্রন্থ ভাণ্ডারটিও বেশ বড় তবে তাতে জৈন ধর্ম গ্রন্থাদিই বেশী। এই গ্রন্থ ভাণ্ডার তাঁর দুই শিষ্যের তত্বাবধানে থাকে যাঁরা তাঁর মতই মেধাসম্পন্ন ও প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে সক্ষম। মরুস্থল হতে দুই শিষ্যদের লিখিত আমন্ত্রণ [বিজ্ঞপ্তি] পত্র শ্রীপূজ্য আমাকে দেখাবার জন্য আমার যতিকে দেন। এগুলি গোল করে মোড়া, কয়েক ফুট দীর্ঘ ও চিত্র সম্বলিত।…জৈনাচার্যদের কি পরিমাণ সম্মান দেওয়া হয় তা এ হতেই বোঝা যাবে যে রাজপুতানার রাজারাও নগর দ্বারের বাইরে এসে এঁদের অভ্যর্থনা করে নগরে প্রবেশ করান। এই সম্মান রাজারা কেবলমাত্র অন্য রাজাকেই দিয়ে থাকেন। ওপরে যে জৈনাচার্যের উদয়পুর আগমনের বিষয়ে উল্লেখ করেছি তাঁকে উদয়পুরের মহারাণা সকল প্রকার সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা

বিভূতিভূষণ দত্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্পষ্ট নির্দেশ

কোন কোন স্থলে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় যে, অঙ্কপাতে কোন গতি অনুসরণ করিতে হইবে। যথা,—

'শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।'

কবি স্পষ্টতঃ বলিয়া দিলেন, দক্ষিণা গতি। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' গ্রন্থে আছে,—

'শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।'

চন্দ্রকলা = ১৬, রাম = ৩, করতল = ২ ; দক্ষিণাগতিতে উদ্দিষ্ট শক ১৬৩২। অবশ্য বামাগতি যে হইতে পারে না, তাহা প্রচলিত শককাল হইতে বোঝা যায়। তথাপিও কবি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন,—'বাম হল্য বিধিকান্ত…' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন,[৪৩] অঙ্কের বামাগতি, এই বিধি। কিন্তু এখানে সে বিধিরূপ কান্ত কি না বক্র হইয়া অনলে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ দক্ষিণাগতি ধরিবে। হেমচন্দ্র সূরি ধৃত প্রাচীন গাথার শেষ চরণ[৪৪]—

'অংকট্ঠানা পরাহুত্তা'

'পরাহুত্তা অর্থ 'পরাঙ্‌মুখে' অর্থাৎ 'বিপরীতক্রমে'। সুতরাং ওখানে বামাগতি ধরিতে হইবে, তাহার নির্দেশ রহিয়াছে। ইহা বলা উচিত যে, ঐ নির্দেশের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ ঐ বৃহৎ রাশিটা ২৯৬ এর সমতুল্য, ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং গণনা দ্বারা নির্ণয় করা যায় যে, কোন গতি ধরিতে হইবে। কিন্তু গণনাটা সহজ নহে।

৪৩ প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৬, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

৪৪ এই চরণ সম্বন্ধে পাঠভেদ দেখা যায়। 'পঞ্চ সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে ধৃত এই গাথার শেষ চরণের পাঠ 'অংকট্ঠানা ইগুণতীসং' (অভিধান রাজেন্দ্র, ৪র্থ খণ্ড ১৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আমরা হেমচন্দ্র সূরি ধৃত পাঠই স্বীকার করিয়াছি।

তাই গাথাকর্তা পাঠককে সংশয়ে না রাখিয়া স্পষ্ট বলিয়া গেলেন যে, বামাগতি ধরিতে হইবে। সেইরূপ 'নেমিপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত প্রথম রচনাটীতে স্পষ্টতঃ নির্দেশ আছে যে, স্থানক্রমে, অর্থাৎ একক, দশক, শতকাদি স্থান যেই ক্রমে বিন্যস্ত আছে, সেই বামাগতিক্রমে অঙ্ক বিন্যাস করিয়া সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে।

অনুমান

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহের বর্ণনাভঙ্গী হইতে অনুমান হয় যে, বাঙ্গলা, তথা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত নাম সংখ্যা প্রণালীতে বামাগতি সাধারণ বিধি, দক্ষিণাগতি অসাধারণ বিধি। নতুবা দক্ষিণাগতিক্রমে নাম সংখ্যা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্তাকে স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করিতে হইত না যে, তিনি তাহাই করিয়াছেন। সেইরূপে অনুমান হয় যে, প্রাকৃত সাহিত্যের নামসংখ্যা প্রণালীতে দক্ষিণাগতি সাধারণ বিধি, বামাগতি অসাধারণ। জিনভদ্রগণির ব্যবহৃত দৃষ্টান্তসমূহ এই অনুমানের অনুকূল হইবে। যদিও তাঁহার রচনাতে নাম সংখ্যা প্রণালীর বহুল উপযোগ হইয়াছে, মাত্র দুই স্থলে ব্যতীত, অপর সর্বত্রই দক্ষিণাগতি ক্রমে অঙ্কপাত করিতে হয়। অপর পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোতিষাদি গ্রন্থে নামসংখ্যা প্রণালী ব্যবহারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাচীনকাল, অন্ততঃ চতুর্থ খ্রীষ্ট শতক হইতে পাওয়া গেলেও একমাত্র বকশালী গণিতের একটি স্থল ব্যতীত, অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থে দক্ষিণাগতি অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দশম শতকের নেমিচন্দ্রের প্রযুক্ত দৃষ্টান্তসমূহ কিয়ৎ পরিমাণে এই অনুমানের প্রতিকূলতা করিবে। তিনি দক্ষিণাগতি প্রয়োগ বেশী করিলেও বামাগতির প্রয়োগ নেহাৎ কম করেন নাই। আমরা পূর্বে জিনসেনের রচনা হইতে দুইটা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথমটাতে স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে যে, বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় স্থলে নাম সংখ্যা প্রণালী মতে সংখ্যা উল্লেখের পরেই শত সহস্র লক্ষ কোটি প্রভৃতি স্থান নামের উল্লেখ সহকারে সেই সংখ্যাটি পুনঃ কথিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে যে দক্ষিণাগতি অনুসর্তব্য, তাহাও প্রকারান্তরে নির্দেশিত হইয়া গেল। এইরূপে জিনসেনের লেখা হইতে জানা যায় না যে তাঁহার সময়ে জৈন সাহিত্যে কোন্ গতিক্রমে নাম সংখ্যা সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইত। ঐ কালের অপর কোন জৈন গ্রন্থে নাম সংখ্যা প্রণালী ব্যবহার হইয়াছে কিনা, আমি জানি না। প্রাকৃত ভাষায় আদিতে কেবলমাত্র দক্ষিণাগতিই অনুসৃত হইত, পরে হয়ত সংস্কৃত সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাতে বামাগতিক্রমেও নাম সংখ্যা প্রযুক্ত হইতে লাগিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে কিনা, দেখিতে হইবে। যাহা হউক এই বিষয়টা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সুধীবর্গের নিকট অনুরোধ করিতেছি।

নাম সংখ্যা প্রণালীর উৎপত্তি : হেমচন্দ্রের মত

নাম সংখ্যা প্রণালীর উৎপত্তির বিশিষ্ট কারণ কি, তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। প্রথম প্রবন্ধে উহার কতকগুলি বিশেষ উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছিল; যথা—ছন্দোবন্ধন সৌকর্য, অঙ্কের বিশুদ্ধি রক্ষা, ইত্যাদি। তাহা হইতে অনুমান হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ ঐ সকল কারণে, তাহারো পূর্বে হয়ত বা সাঙ্কেতিক ও অঙ্কগুপ্তি কারণে উহার উৎপত্তি, অন্ততঃ বিস্তৃত প্রচলন হইয়াছিল—সুপ্রসিদ্ধ জৈন লেখক হেমচন্দ্র সূরি ঐ বিষয়ে একটা মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। একটা বিশেষ রাশির উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি টিপ্পনী করিয়াছেন,"এই রাশিকে কোটি-কোট্যাদি প্রকারে বলিতে কেহই সমর্থ নহেন; তাই একপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্কমান সংগ্রহার্থ গাথাদ্বয়ের (উল্লেখ করা হইল)"।[৪৫] ইহাকে আরো একটু খুলিয়া বলিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিক যুগ হইতে ন্যূনাধিক আঠারটা অঙ্কস্থান সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে এবং উহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নাম বা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃত সাহিত্যের অঙ্কস্থানের নামকরণরীতি কথঞ্চিৎ ভিন্ন। জৈন মহাবীরাচার্যের (৮৫০ খ্রীষ্ট সনে) 'গণিত সার সংগ্রহে' চব্বিশটা অঙ্কস্থানের উল্লেখ আছে।[৪৬] তাহাদের সকলের পৃথক নাম আছে বটে, কিন্তু ঐ নামকরণ প্রণালীতে মোট পনরটি পৃথক সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। সেইহেতু কোন কোন অঙ্কস্থানের নাম অপর দুই স্থানের নামের সমাহারে গঠিত হইয়াছে। যথা,—'দশ সহস্র' (=অযুত), 'দশলক্ষ' (=নিযুত) ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যের নামকরণ-পদ্ধতি ভিন্ন।[৪৭] হেমচন্দ্র তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতিতে পাঁচটা পৃথক সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়;—একক, দশক, শতক, সহস্র, কোটি। কখন কখন একটা ষষ্ঠ সংজ্ঞাও ধরা হইত—লক্ষ। ইহাদের বিভিন্ন সমাহার দ্বারা পনরটি অঙ্ক স্থানের নাম সাধারণতঃ করা হয়। ততোধিক অঙ্কস্থানের নাম রাখিতে গেলে নামগুলি যে শুধু ভারী হইবে তাহা নহে; তাহাদের ব্যবহারেও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে। হেমচন্দ্রের বক্তব্য রাশিটা ঊনত্রিংশ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ দ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না। এইপ্রকারে নিরুপায় হইয়াই হেমচন্দ্র সেই রাশির অন্তর্ভুক্ত অঙ্কগুলির নামোল্লেখ ক্রমান্বয়ে করিয়াছেন। ইহা বলা

---

৪৫ 'অয়ং চ রাশিঃ কোটি কোট্যাদি প্রকারেণ কেনাপ্যভিধাতুং ন শক্যতে। অতঃ পর্যন্তাদারভ্যাঙ্কমান সংগ্রহার্থং গাথাদ্বয়ং।' অনুযোগদ্বার সূত্র, ১৪২ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬ গণিতসার সংগ্রহ, ১।৬৩-৬৮

৪৭ Bibhutibhusan, Datta 'The Jaina School of Mathematics', *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. 21, 1929, pp. 115-145. বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠা।

উচিত যে, এই কৌশল তিনি নিজে উদ্ভাবন করেন নাই ; উহা বহু প্রাচীন। ঐ গাথাতেই তাহার প্রমাণ আছে। হেমচন্দ্র গাথায় অবলম্বিত কৌশলটা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। উদ্ধৃত গাথা দুইটী যে গাথা-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে আরো সাতটা রাশির বর্ণনা আছে। উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট। সেগুলি অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যেইটি সর্বাপেক্ষা বড়, সেইটী বিশ অঙ্কস্থানব্যাপী। তাহার উল্লেখে গাথা কর্তাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে।

লক্খং কোড়াকোড়ি চউরাসীয়ং ভাব সহস্সাইং।
চত্তারি অ সওট্ঠা হুংতি সয়া কোড়ীকোড়ীণং ॥
চউয়ালং লক্খাইং কোড়ীণং সও চেব য সহস্সা।
তিন্নি চ যয়া চ সত্তরি কোড়ীণং হুংতি নায়ব্বা ॥
পংচাণউই লক্খা এগাবন্নং ভবে সহস্সাইং।
ছস্সোলসোত্তর সয়া এসো ছট্ঠো হবই বগ্গো ॥

বর্ণিত সংখ্যাটি এই—১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৬। এইপ্রকার বেগ ও কষ্ট পাইয়া প্রাচীন গাথাকার এতদপেক্ষাও অনেক বড় সংখ্যাটিকে এই রীতিতে বর্ণনা করিবার প্রচেষ্টা আর করিলেন না। তাহার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিলেন। সেই পদ্ধতিটা যে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ তাহা বর্ণনা দেখিলেই উপলব্ধি হইবে।

এইরূপে দেখা যায় যে, অতি বৃহৎ রাশি,—এত বৃহৎ যে, অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ সহকারে তাহাদিগকে বলা সহজ নহে, সম্ভবও নহে—বর্ণনা করিবার জন্যই যেন নাম সংখ্যা প্রণালীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাই হেমচন্দ্রের অভিমত। প্রাচীন গাথার বর্ণনাভঙ্গীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি স্বমতকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপর এক জৈন লেখকও সেই কথাই বলিয়াছেন,—"এই রাশি ঊনত্রিশ অঙ্কস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে বলিয়া কোটিকোট্যাদি প্রকারে তাহাকে বলিতে কেহ সমর্থ নহে। সেইহেতু এক প্রান্তস্থিত অঙ্কস্থানের সংগ্রহ পূর্বপুরুষ প্রণীত গাথাদ্বয় দ্বারা হইল।"[৪৮] যাহা হউক, পরবর্তীকালে বোধহয়, বিশেষ উপযোগিতার কারণে, ছোট সংখ্যা

৪৮ 'অয়ং চ রাশিরেকোনত্রিংশদঙ্ক স্থানেন কোটি কোট্যাদি প্রকারেণাভিধাতুং কথমপি শক্যতে। ততঃ পর্যন্তবর্তিনোঽঙ্কস্থানাদারভ্যাঙ্কস্থানসংগ্রহমাত্রং পূর্বপুরুষ প্রণীতেন গাথাদ্বয়েনাভি-ধীয়তে।—পঞ্চ সংগ্রহ (অভিধান রাজেন্দ্র ধৃত, চতুর্থ খণ্ড, ১৫০১ পৃষ্ঠা)।

স্থাপন করিতেও ঐ নূতন পদ্ধতিটা সর্বসাধারণ কর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল। নেমিচন্দ্র[৪৯] লিখিয়াছেন—

> "ছাদালসুন্ন সত্তয়াবাবন্নং হোংতি মেরুপহুদীণং।
> পং চন্নং পরিধীত্ত কমেণ অংকক্কমেণেব ॥

অঙ্কক্রমে রাশি বর্ণনাই নাম সংখ্যার মূল মর্ম। এই প্রকারে বর্ণনার কারণ বোধ হয় উপরে উক্ত হইয়াছে তাহাই।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা উপরের আলোচনাতে কি কি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় প্রাকৃত সাহিত্যেও নামসংখ্যা প্রণালী প্রচলিত আছে।

২। বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয় ক্রমই প্রাচীন কাল হইতে নামসংখ্যা প্রণালীতে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

৩। আদিতে সংস্কৃত সাহিত্যে বামাগতি এবং প্রাকৃত সাহিত্যে দক্ষিণাগতি প্রয়োগ সাধারণ ছিল. বোধ হয়।

৪। কোন বৃহৎ রাশিকে সহজে ব্যক্ত করিবার জন্যই বৈদিককাল হইতে প্রচলিত নামসংখ্যা পরে সুপ্রণালীবদ্ধ হওয়া সম্ভব।

৭ই আষাঢ়, ১৩৩৭ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ [৩৭ ভাগ—১ম সংখ্যা], ২৮-৩৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

৪৯ ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা।

> ষট্‌চত্বারিংশবচ্ছূন্যসপ্তকদ্বিপঞ্চাশৎ ভবন্তি মেরু প্রভৃতিনাম্।
> পঞ্চানাং পরিধয়ঃ ক্রমেণ অঙ্কক্রমেণৈব ॥

উদ্দিষ্ট সংখ্যা—৫২৭০৪৬।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. V No. 6 : Sraman : October 1977
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৮৪ ॥ দশম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী
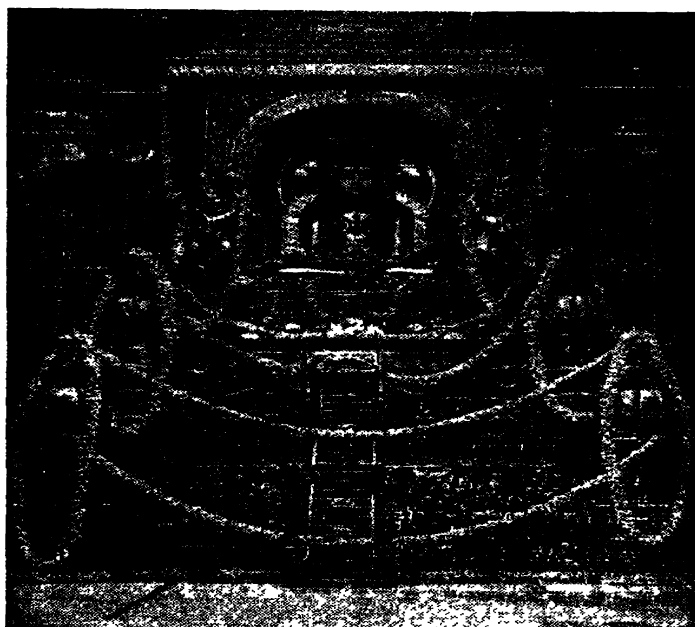
ভগবান শীতলনাথ
কলিকাতা

সহমরণ, জৈনধর্ম ও জৈনাচার্যগণ

সহমরণ প্রথার কবে উদ্ভব হইয়াছিল সেকথা জানা না গেলেও এই প্রথা যে অনেক প্রাচীন তাহা বলা যায়। এবং শুধু ভারতেই নয়, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, শ্লাভদেশ, গ্রীস, মিশর, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে ভারতের মত এই প্রথা আধুনিক যুগের সূচনা অবধি আর কোথাও স্থায়ী হয় নাই। স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হইবার বাসনাই যে সহমরণের একমাত্র কারণ তাহা বলা যায় না। পুরুষ প্রধান সমাজে স্ত্রী জাতির হীনমন্যতা ও স্বামীর অবর্তমানে আত্মীয় পরিজনের লাঞ্ছনা যে পরিমাণে তাহাদের সহ্য করিতে হইত সহমরণের তাহাও পরোক্ষ কারণ বলা যায়। সধবাদের সাত খুন মাফ হইলেও বিধবাদের জন্য সামাজিক বিধি-নিষেধ এত কঠোর ছিল যে তিলে তিলে তুষানলে দগ্ধ হওয়ার চাইতে অনেকে চিতানলে প্রবেশ করিয়া একবারে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই ভালো মনে করিত। মধ্যযুগে মুসলমান শাসনকালে যুদ্ধে যাহাদের পতি মারা যাইত তাহারা বিজেতার বন্দিনী হইয়া সম্মান হারাইবার পরিবর্তে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিত। রাজপুতেরা ইহাকেই জৌহর ব্রত বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং স্বভাবতঃই এইরূপ মহিলাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হইত। শীল রক্ষার জন্য এইরূপ আত্মদানের কে না প্রশংসা করিবে? কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কেবলমাত্র পত্নীরাই যে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইত তাহা নহে, সময়ে সময়ে মাতারাও পুত্রের সঙ্গে সহমরণে যাইতেন তাহারো উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে সতীদের স্মারক খুব বেশী না দেখা গেলেও রাজস্থানে এরূপ স্মারক বহুল দেখা যায়।

সহমরণ প্রথার যে ভাবেই উদ্ভব হইয়া থাক, কালক্রমে তাহা পরম্পরাগত ও স্ত্রী জাতির নিপীড়নের রূপ লাভ করে। স্বেচ্ছায় জলন্ত আগুনে প্রবেশ করা খুব সহজ কাজ নয়। ভালবাসার তীব্রতা খুব অধিক না হইলে সহজেই নিজেকে বিস্মৃত হওয়া যায় না। লোকলজ্জা ভয়ে প্রথমে স্বীকৃত হইয়া পরে চিতানল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বাঁচাইবার এবং নিষ্ঠুর ভাবে তাহাদের পুনরায় চিতানলে দগ্ধ করিবার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। সেই বিবরণগুলি সত্যই করুণ ও হৃদয় বিদারক। সুতরাং সতীদাহ নিবারণের প্রচেষ্টাও স্বাভাবিক।

মনুতে বিধবাদের আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান থাকিলেও সতীদাহের কথা বলা হয় নাই। পরবর্তী স্মৃতিগ্রন্থে সতীর প্রশংসা করা হইলেও সতীদাহ বাধ্যতা মূলক তাহা বলা হয় নাই। মুসলমান রাজত্বকালে আকবর ও জাহাঙ্গীর এই প্রথার

নিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। আধুনিক যুগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস সর্বপ্রথম এই প্রথা বন্ধ করিতে উদ্যোগী হন (১৭৯০ খৃঃ)। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এক সার্কুলার জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও সতীদাহ বন্ধ হয় না। রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশীয় নেতাগণ ইহার নিরোধ কল্পে প্রচার সুরু করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সতীদাহের নিরোধ কল্প ৭ই ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে ১৭টী রেগুলেশন জারী করেন যাহার ফলে সতীদাহ বেআইনী ঘোষিত হয় এবং যাঁহারা উহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা আইনতঃ দণ্ডনীয় হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ রেগুলেশন মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সীতে বিধিবদ্ধ হয়। গভর্নর জেনারেল অকল্যাণ্ড ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে করদরাজ্য উদয়পুরে এই আইন বিধিবদ্ধ করান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এই আইন জয়পুরে ও ১৯১১খৃষ্টাব্দে বিকানীরে বিধিবদ্ধ হয়। এই সমস্ত আইন ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে সতীদাহ প্রথা আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জৈনধর্ম বা জৈনাচার্যগণ সতীদাহ বা সহমরণের কোন সময়েই সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে ইহা মোহ ও অজ্ঞান জনিত আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ কর্মবাদে যদি বিশ্বাস করিতে হয় তবে সহমরণে মৃত্যু বরণ করিলেও যে তাহারা পুনরায় স্বামী স্ত্রী রূপে জন্মগ্রহণ করিবে সেকথা বলা যায়না। একজনের কর্ম তাহাকে মনুষ্য যোনিতে এবং আর একজনের কর্ম হয়ত তাহাকে তীর্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করাইতে পারে। এই জন্যই বিধবাদের জন্য সহমরণের কথা জৈন শাস্ত্রে বলা হয় নাই। বরং গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে সৎ জীবন বা সাধবী সংঘে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভগবান মহাবীরের জীবিত কালে মগধ ও বৈশালীতে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় তাহাতে নিহত যোদ্ধৃগণের পত্নীরা মহাবীরের সাধবী সংঘে প্রবেশ করেন। খরতরগচ্ছাচার্য শ্রীজিন দত্ত সূরী সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি যখন রাজস্থানের ঝুঁঝনুতে গমন করেন তখন শ্রীমাল পরিবারের কোন বাল-বিধবাকে সতী হওয়া হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাধবী সংঘে প্রবেশ করান। শ্রীজিন দত্ত সূরীর সময় খৃষ্টীয় দশম শতক। সপ্তদশ শতকের জৈন যোগী শ্রীআনন্দ ঘনের জীবনেও অনুরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি যখন মেড়তায় যান তখন শ্মশান ক্ষেত্রের নিকট এক মহিলাকে সতী হইতে উদ্যত দেখিতে পান। সেই মহিলা আনন্দঘনকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে ও স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গমন করিতেছে জানাইয়া তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। আনন্দঘন তাহাকে সদুপদেশ দেন ও তৎক্ষণে একটী পদ রচনা করিয়া গাহিয়া শোনান। তাহার তাৎপর্য এইরূপ ঃ

ভগবান ঋষভদেবই আমার একমাত্র প্রিয়তম। তাই আমি অন্য কাহাকেও স্বামীরূপে পাইতে ইচ্ছা করি না। তিনি যদি প্রসন্ন হন তবে তিনি আমায় কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। এই সম্পর্কের আদি থাকিলেও অন্ত নাই।

সংসারে যে প্রেম সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বাস্তবে তাহা প্রেম সম্বন্ধই নহে। আমার যে প্রেম সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ নিরুপাধিক। সংসারের যে প্রেম সম্বন্ধ তাহা উপাধি সহিত, তাই নাশশীল।

সংসার সম্বন্ধে স্ত্রী নিজের পতির চিতায় পুড়িয়া মরিতে চাহে। ভাবে, এই ভাবে সে শীঘ্র তাহার পতির সহিত মিলিত হইতে পারিবে। কিন্তু মিলনের নির্দিষ্ট স্থান না থাকায় তাহা সম্ভব নহে।

কেহ ভাবে উগ্র তপস্যা করিলেই স্বামী প্রসন্ন হইবেন সেইজন্য শরীরকে ক্লিষ্ট করে। কিন্তু সেই মিলনাকাঙ্ক্ষা শরীরের। আমি সেকথা বলিনা। আমি চাই তাঁহার কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া একরস হইতে।

কেহ বলে ঈশ্বরের ইহা লীলা। তিনি মনোভাব অবগত হইয়া তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু শুদ্ধ চেতনা বলে, দোষরহিত পরমাত্মায় এই লীলা সম্ভব নহে। কারণ লীলা নানা দোষের আকর।

পতির চিত্ত প্রসন্নতাই পতিভক্তির পূর্ণতা। নির্মল অন্তঃকরণে অভিন্ন ভাবে পতির কাছে আত্ম সমর্পণই চিত্তবৃত্তির নিরোধ যাহা মোক্ষপদের ভূমিকা।
বলা বাহুল্য সেই মহিলা সতী হওয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মোন্নতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।

জৈন ধর্মের এই মানবীয়তার জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে বহু পতিহারা মহিয়সী মহিলা 'সতী' হইয়া নিজের জীবন বিনষ্ট না করিয়া সমাজ, দেশ ও জনগণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ মহিয়সী মহিলাদের মধ্যে তৃতীয় পৃথ্বীরাজের মা কর্পূরদেবী, বিগ্রহরাজের স্ত্রী লাহিনী, সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মা ময়নল্লাদেবী, ২য় মূলরাজ ও ২য় ভীমদেবের মা নায়িকা, কালাচুরী বংশীয় অলহনদেবী ও গোশাল দেবীর নাম করা যায়। জৈন কথানক সাহিত্যেও এই আদর্শেরই জয়-গান করা হইয়াছে। জ্ঞানপঞ্চমী কথার পতিহারা দেবীর উক্তি দিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করি—'একমাত্র সিদ্ধশীলা[১] ছাড়া আর কোথাও শান্তি নাই। যাহার স্বামী নাই ও যে সাংসারিক সুখভোগ হইতে বঞ্চিত সেও গৃহকর্মে নিরত হইয়া, না গৃহী না সাধুর জীবন যাপন করিবে।'

১ যেখানে মুক্তাত্মারা অবস্থান করেন।

চন্দন মূর্তি

[পঞ্চম উচ্ছ্বাস]

আমার নাম অতীশ।

মগধের প্রখ্যাত বাৎসায়ন বংশে আমার জন্ম হইয়াছিল কিন্তু বাৎসায়ন বংশের অনুরূপ আমার আচরণ হইল না। তাই যখন পিতা বেদধ্যয়ন করাইতেন আমি তখন আমাদের গ্রাম সংলগ্ন অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লতা গুল্মাদি সংগ্রহ করিতাম। বোধ হয় তাহা দেখিয়াই আমার পিতা আমাকে ভেষজশাস্ত্র পড়িবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভাবিয়াছিলেন জীবক কুমার ভৃত্যের মত আমিও হয়ত কোনোদিন প্রভূত খ্যাতিলাভ করিব। আমাদের গ্রামে বৈদ্য নাথশর্মা বাস করিতেন। তাঁহার নিকট আমার শিক্ষানবিসী হইল। তিনি সুশিক্ষক ছিলেন তাই তাঁহার নিকট আমার শিক্ষা বেশ খানিকটা অগ্রসর হইলেও সহসা তাঁহার মৃত্যুতে আমি অকূল পাথারে পড়িলাম।

কি করিব ভাবিতে ছিলাম। সেই সময় রন্তিদেবের কথা মনে পড়িল। তিনি পিতৃবন্ধু ছিলেন এবং যখন আমাদের এখানে আসিতেন তখন আমাদের গৃহে উৎসবের আবহাওয়া প্রবাহিত হইত। তিনি ভেষজশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষও অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। মনে জ্যোতিষ লইয়া কিছু নাড়াচাড়া করিবার ইচ্ছা ছিল তাই যখন সেকথা পিতাকে বলিলাম তখন তিনি রন্তিদেবের নামে এক পত্র দিয়া দিলেন। সেই পত্র লইয়া আমি এক শুভদিনে শ্রাবস্তী যাত্রা করিলাম।

রন্তিদেব আমায় সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করিলেন। এবং এক ক্ষত্রিয়ের গৃহে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই গৃহ আমার অত্যন্ত পরিচিত বলিয়া মনে হইল কিন্তু আমিত সেই প্রথম শ্রাবস্তীতে গিয়াছিলাম।

সেই গৃহ পরিচিত বলিয়া মনে হইলেও সেই গৃহে অবস্থান আমার সুখকর হয় নাই। তাহার কারণ ক্ষত্রিয় সিংহ যে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া ছিলেন তাহা নয়। তিনি আমার সর্ববিধ সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু প্রথম রাত্রি হইতে আমি কেমন যেন ভয় পাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম রাত্রির কথাই বলি। মধ্যরাত্রে সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল আমার শয্যাখানি যেন দুলিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম বোধ হয় ভূমিকম্প হইতেছে। কিন্তু না। তাহা হইলে ত ছাদ হইতে প্রলম্বিত দীপদানের শৃঙ্খলটিও দুলিত। ঘরের দরজাগুলি খট্ খট্ শব্দ করিত। কিন্তু কোথাও কিছু নাই। সমস্ত যথাবৎ এমন কি আমার শয্যাও।

তবে কি আমি ভুল দেখিয়াছিলাম ? না। পরদিন দেখিলাম কাহারা যেন আমায় শয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া চলিল। হাত পা নাড়িতে গেলাম, পারিলাম না। দেখিলাম তাহা বাঁধা। চীৎকার করিতে গেলাম, গলায় স্বর ফুটিল না। অস্পষ্ট অন্ধকারে কত অলিগলি পার হইয়া আসিলাম। তাহারপর সহসা প্রভাতের অরুণিমা ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম। নিম্নে ক্ষরস্রোতা নদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কি নদী তাহা জানিনা। আমাকে তাহারা কোথায় লইয়া আসিয়াছে তাহাও জানিনা। কিন্তু সহসা দেখিলাম হাত পা বদ্ধ অবস্থায় তাহারা আমাকে শূন্যে উৎক্ষীপ্ত করিয়া দিল। আমি পড়িতে লাগিলাম। সেই নদীর প্রবাহ আমার চোখে পড়িল। আর একটু হইলে আমার শরীর জলস্পর্শ করিত। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ঘুম ভাঙিয়া গেল।

বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই স্বপ্নের কথা কাহাকেও বলিতে পারিলাম না। এমন কি রন্তিদেবকেও নয়। আমার বয়স তখন কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিযা গিয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়া আমি ভয় পাই। লোকে কি ভাবিবে ? ছি ঃ !

কিন্তু সেই গৃহে আমি আর বোধহয় থাকিতে পারিব না। কারণ কাল রাত্রে রমণী কণ্ঠের চাপা কান্না শুনিয়াছি। আর আজ ? আজ তাহাকে স্বচক্ষে দেখিলাম। দেখিলাম সে আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—দেখ দেখ। তোমার জন্য আমায় কি সাজা পাইতে হইয়াছে। বলিয়া সে তাহার পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত করিয়া দিল। দেখিলাম তাহার পীঠে কশাঘাতের সদ্য ক্ষত চিহ্ন। সেই ক্ষত স্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে। ভাবিতেছিলাম মানুষ কত নিষ্ঠুর হইলে এইরূপ কশাঘাত করিতে পারে। কিন্তু আমি কি করিয়াছি ? —তবু তাহার মুখের দিকে তাকাইতে গিয়া বেদনায় আমার সমস্ত শরীর কুকড়াইয়া গেল। আমি আমার হস্ত দিয়া চক্ষু দুটী আবৃত করিতে গেলাম। দেখিলাম আমার চক্ষু নাই। শুধু দুইটি শূন্য কোটর রহিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ! তবে আমি দেখিতেছি কি করিয়া ? আমি চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

পরদিন পাঠে মন দিতে পারিলাম না। সমস্ত সকাল তাহার কথাই চিন্তা করিলাম। তাহাকে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়াও মনে পড়িল না। কে তাহাকে এমন কশাঘাতে জর্জরিত করিল ? এবং কেন করিল ? সে ত স্পষ্টই ইহার জন্য আমাকে দায়ী করিয়া গেল। কিন্তু আমি ত তাহার অনিষ্ট করা দূরের, তাহাকে ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। রাত্রি জাগরণের জন্যই বোধহয় আমার চোখ দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাই অসুস্থতার ভাণ করিয়া রন্তিদেবের কাছ হইতে তাড়াতাড়ি বিদায়

লইলাম। তবু তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলাম না। বলিলে না জানি তিনি কি ভাবিবেন—সেই সঙ্কোচই আমায় নিবারিত করিয়া রাখিল। কিন্তু আমি আমার নিবাস স্থানেও ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না। সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কখন সূর্য অস্ত গেল, কখন সন্ধ্যা হইল জানিতে পারিলাম না। যখন খেয়াল হইল তখন দেখিলাম আমি নগরের উপান্তস্থিত এক প্রাচীন জীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। মন্দিরটী চণ্ডীকার বলিয়া মনে হইল। ভাবিলাম আজ রাত্রি এই খানেই কাটাইয়া দিব।

রাত্রি তখনো বেশী হয় নাই। শুক্লপক্ষ ছিল বলিয়াই জ্যোৎস্না দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণে পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল চণ্ডী মন্দিরের বাহিরে হয়ত কোন কালে বিরাট কপাট ছিল কিন্তু আজ তাহার চিহ্ন নাই। ঘরের ভেতরও বেদীতে চণ্ডীমূর্তি দেখিতে পাইলাম না। শুধু দেখিলাম মূল বেদীর সম্মুখে এক লৌহ বেদিকার ওপর কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ এক মহিষ স্থাপিত রহিয়াছে। সেই মহিষ ছাড়া সমস্ত গৃহই শূন্য। মন্দিরের সম্মুখে উম্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তাহার কুট্টীম বিদীর্ণ করিয়া তাহার ফাঁক দিয়া হরিদ্বর্ণ তৃণ উদ্গত হইয়াছে। সেই প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে একটী ছোট ঘর দেখিলাম। বোধ হয় কোনো সময় পূজারীর বাসস্থান ছিল। তাহার সম্মুখে অযত্ন পরিবর্দ্ধিত করবীর ঝাড়।

ঘরের দরজা ঠেলিতেই দরজা খুলিয়া গেল। ভেতরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন রাত্রি সেইখানে কাটাইব স্থির করিলাম, এবং দরজার নিকটস্থ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া উত্তরীয় পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম।

শুইয়া শুইয়া ক্ষত্রিয়ের গৃহের কথা চিন্তা করিতে ছিলাম—কিন্তু যে সব ঘটনা ঘটিতে আমি দেখিয়াছিলাম তাহার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইলাম না। সেই রমণী যাহাকে আমার জন্য কশাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে সেই বা কে? এবং আমাকেও যাহারা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিল তাহারাই বা কে? এবং কেনই বা আমায় হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিল? আমার চক্ষুরই বা কি হইল এবং চক্ষুহীন অবস্থায় আমি কি করিয়া দেখিতে ছিলাম সে সব কথা চিন্তা করিতে করিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম তাহা জানিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম জানি না। কিন্তু সহসা বনকুক্কুট যাহারা রাত্রির মত সেই করবীর ঝাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের উড়িয়া যাইবার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে কাহারো পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। এত রাত্রে এখানে কাহার আবির্ভাব হইয়াছে—তাহার উদ্দেশ্য কি সে সব কথাও মনের ভেতর উঁকি দিয়া গেল। ঘরে থাকা উচিত না বাহির হওয়া তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। শেষে দরজা একটুখানি ফাঁক করিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম এক গাঢ় গৈরিক বস্ত্র

ধারিণী স্ত্রীমূর্তি এই ঘরের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ঘরে থাকা আর যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। তাই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমি যেমন আশ্চর্য হইয়াছিলাম আমাকে দেখিয়া তিনিও সেইরূপ আশ্চর্য হইলেন। আমার তাঁহাকে সাক্ষাৎ চণ্ডী বলিয়াই মনে হইতেছিল। তাঁহার এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে নর কপাল। উন্মুক্ত পিঙ্গল কেশরাশি আগুলফ বিলম্বিত। স্বর্ণাভ মুখ-মণ্ডল গৈরিক বস্ত্রে কুণ্ডলাকারে আবৃত। তাঁহার চোখ দুইটী বিকচ কাঞ্চনার পুষ্পের মত ঈষৎ লাল ও উন্মীলিত। সেগুলির মধ্য হইতে এক মন্দ মন্দ আলোর মত বাহির হইতেছিল। সেই মূর্তি মনোহরও ছিল না ভয়ঙ্করও ছিল না। আমি তাঁহারমুখের দিকে তাকাইয়া ছিলাম। দেখিলাম তাঁহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে আরম্ভ করিল। বিস্ফারিত চোখ দুটি আরো বিস্ফারিত হইল। নাসাগ্রে একপ্রকার স্ফুরণ দেখা গেল। ভ্রূলতা বিকুঞ্চিত হইল। কপালে বলিরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি সহসা আমায় প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, তুই চোরের মত এই গৃহে কেন প্রবেশ করিলি ?

চোরের মত এই গৃহে আমি প্রবেশ করি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও অনুমতি আমি গ্রহণ করি নাই। করিবার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া দেখিলাম যাহা আমার জিহ্বাগ্রে সর্বপ্রথম আসিল তাহাই বলিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, মাতঃ, আমি অজ্ঞান ও দুঃখী। না জানিয়া রাত্রি যাপনের জন্য এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

ভৈরবী আমাকে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত দেখিলেন। বলিলেন, তুই ব্রাহ্মণ ?

হাঁ মাতঃ, আমি বাৎসায়ন গোত্রীয়।

বাৎসায়ন ? বৈদিক ক্রিয়া জানা আছে ?

বলিলাম, অতি সামান্য। কারণ বেদপাঠে আমার রুচি কোনো দিনই ছিল না।

তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তুই এখানে কি করিতেছিলিস ?

জানি না তিনি আমার নিকট কি জানিতে চান। কিন্তু আমি ত এখানে কোনো কিছুই করি নাই। সেই কথাই তাঁহাকে পুনরায় বলিলাম।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি বুঝিলেন জানি না। বলিলেন, ঠিক ঠিক বল, নহিলে অকল্যাণ হইবে।

অকল্যাণের কথায় একটু ভয় হইল। কারণ কল্যাণ করিতে পারুন আর নাই পারুন ভৈরবীরা অকল্যাণ করিতে পারেন তাহা জানিতাম। তাই বলিলাম, ঠিকই বলিয়াছি মাতঃ।

এবারে ভৈরবী মৃদু হাস্য করিলেন। সে হাসি নারীজনোচিত ছিল না। না ছিল তাহাতে শীল, বিনয়, লজ্জা ও মাধুর্য। আমি আরো ভীত হইয়া উঠিলাম। হাত জোড় করিয়া বলিলাম, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন মাতঃ।

আমার অপরাধ তিনি ক্ষমা করিলেন কিনা জানি না, জানিনা তিনি প্রসন্ন হইলেন না অপ্রসন্ন। শুধু এই দিকে আয় বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন।

তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া মন্দির সংলগ্ন পঞ্চবটীতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি তখন আমার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া টিপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যাহা আমি স্বপ্নে দেখিতে ছিলাম তাহাই আবার দেখিতে লাগিলাম দেখিতে দেখিতে সহসা মেঘ করিয়া আসিল। প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। দিগমণ্ডলে বিদ্যুৎ চমকিত হইল। আমি যে নৌকায় বসিয়া ছিলাম তাহা দুলিতে লাগিল। যাহা দেখিতেছি তাহা নদী নয়, সমুদ্র। মুহূর্তে সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিল। নৌকা আরো বেগে দুলিতে লাগিল। না এই ধরণের নৌকা আমি দেখি নাই। যাত্রীরা চীৎকার করিতেছে। কি ভাষায় চীৎকার করিতেছিল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি? আমি সেই উত্তাল সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছি। কে যেন আমায় জড়াইয়া আছে। বিদ্যুতের আলোকে মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ আমি দেখিতে পাইলাম। বুঝিতে পারিলাম না আমার পূর্বদৃষ্ট রমণীর মুখের সঙ্গে সেই মুখের কোনো সাদৃশ্য ছিল কিনা? কিন্তু সে ও আমি ডুবিয়া যাইতেছি—সমুদ্রের অতলে। বোধ হয় ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। পরমুহূর্তে ভৈরবীর অঙ্গুলি স্পর্শ ললাটে অনুভব করিলাম। আমার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল। চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম। দেখিলাম ভৈরবী আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। বলিলেন, কিরে ভয় পাইয়াছিলি?

বলিলাম, হাঁ মাতঃ।

যা এখান হইতে পালা।

কোথায়?

কোথায় কি? শ্রাবস্তীতে আর এক মুহূর্ত থাকিস্ না, তুই তক্ষশীলায় যা। সেখানে তোর ভাগ্যোদয় হইবে। তুই না বৈদ্য?

মাতঃ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বুঝিতে কি আমিই পারিতেছি—এ সমস্তই তাঁহার লীলা বলিয়া তিনি চণ্ডীমন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বলিলাম, মাতঃ আপনি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছেন। দয়া করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিন।

তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন।

সাহস পাইয়া বলিলাম, মাতঃ, আমি যাহা দেখিলাম তাহা কি সত্য?

হাঁ সত্য। যাহা তোর জীবনে ঘটিয়াছিল। এই বলিয়া তিনি থামিলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, ইহ জীবনে নয়, পূর্ব জীবনে।

কিন্তু মাতঃ যাহা পূর্বে স্বপ্নে দেখি নাই এখন দেখিলাম—তাহা কি ?

তিনি চণ্ডীমন্দিরের দিকে আবার দৃষ্টিপাত করিলেন। বলিলেন, যথাসময়ে জানিতে পারিবি।

বলিলাম, বুঝিলাম—তাহাই আমার ভবিতব্য ? তাই নয় কি ?

এবার তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ভবিতব্য কেহ খণ্ডাইতে পারে না। তোকে যাহা বলিলাম তাহা নিয়তি। তাহাই তোকে করিতে হইবে। তুই এই মুহূর্তে শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করিয়া যা।

এই মুহূর্তে ?

হাঁ এই মুহূর্তে।

কিন্তু মাতঃ—

দাঁড়াইয়া তর্ক করিবি না যাহা বলিলাম তাহা করিবি বলিয়া তিনি ঘরের দিকে মুড়িলেন।

সুতরাং সেস্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। যাইতে যাইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাইলাম—শ্রাবস্তীর বাহিরে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে একদল সার্থবাহ রাত্রিযাপন করিতেছে। তুই তাহাদের সঙ্গ ধরিয়া তক্ষশীলায় চলিয়া যা।

তাই কাহাকেও কিছু জানানো হইলনা। আমি ভৈরবীর নির্দেশানুসারে সার্থবাহের দলে যোগ দিলাম এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

দেখিতে দেখিতে ছয় বছর কাটিয়া গেল। আর্য নাগদত্তের কাছে থাকিয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আমি ভালো ভাবে অধ্যয়ন করিলাম। আয়ুর্বেদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার মনে পরোপকারের ভাবটি বিশেষ ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল আয়ুর্বেদের জ্ঞানকে আমি যেন অর্থোপার্জনের মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করি। ইহাকে পরোপকারের সুযোগ রূপ ঈশ্বরের দান বলিয়া যেন গ্রহণ করি। পরের দুঃখে দুঃখী হইতে পারিলেই এই বিদ্যার সার্থকতা, নহিলে তাহা কেবল ভার স্বরূপ।

তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া আমি বৈদ্যরূপে নূতন জীবন আরম্ভ করিলাম এবং সেই সূত্রে গুল্ম জাতীয় এক ঔষধের সন্ধানে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে একবার তক্ষশীলা হইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িলাম। এদিককার পাহাড়ে হরিৎ শোভা ছিল না, ছিল ছোট ছোট বৃক্ষ ও নগ্ন পাহাড়। আর পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। সেই উপত্যকার ধারে ধারে

সার্থের রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়া লোক যাতায়াত করে। সেই রাস্তা দিয়াই আমিও হাঁটিয়া আসিয়াছি। পথের দুধারে মাঝে মাঝেই পান্থশালা। তাই রাত্রি যাপনের কোথাও কোনো কষ্ট নাই। চারি দিকের বৃক্ষ প্রকৃতির মধ্যে এই পান্থশালাগুলি ছিল মরুদ্যানের মত। কারণ এই সব পান্থশালায় যে ধরণের সুখ সুবিধা পাওয়া যাইত তাহা সাধারণ গৃহস্থের গৃহেও দুর্লভ ছিল। অবশ্য সাধারণ যাত্রীদের জন্য সাধারণ পান্থশালা ছিল কিন্তু ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ ও রাজপুরুষদের জন্য যেসব পান্থশালা ছিল তাহার ঐশ্বর্য ছিল কল্পনার অতীত।

এক সাধারণ পান্থশালার প্রাঙ্গণে বসিয়া আমি খরমুজ খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছিলাম ও পার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করিতে ছিলাম। কথায় কথায় আমি কি করি জিজ্ঞাসা করায় আমি বৈদ্য সেকথা বলিয়া ফেলিলাম। বৈদ্য কথাটী কানে যাইতেই যাহার নিকট হইতে খরমুজ ক্রয় করিয়াছিলাম সে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথাকার বৈদ্য ?

বলিলাম, তক্ষশীলার।

সে তখন আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া আমায় প্রশ্ন করিল, আপনি কী তক্ষশীলার হিন্দু বৈদ্য ?

বলিলাম, হাঁ।

সে তখন আমাকে কিছু না বলিয়া ছুটিয়া নিকটস্থ সম্ভ্রান্ত পান্থশালার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনাকে একবার ঐ পান্থশালায় যাইতে হইবে। মহাক্ষত্রপের স্ত্রী সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষত্রপের বৈদ্যদের ওষুধে কাজ হইতেছে না। তাই অপনি যদি একবার তাঁহাকে গিয়া দেখেন ত ভালো হয়।

বলিলাম, অবশ্যই দেখিব। বলিয়া হাত ধুইয়া সেই লোকটীর পেছন পেছন সম্ভ্রান্ত পান্থশালার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

কয়েকদিনের প্রবাসে আমার কাপড় চোপড় একটু ময়লা হইয়া গিয়াছিল। বোধহয় তাহা দেখিয়াই রাজকর্মচারীর মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু আমার আকৃতি ও সৌম্যতা বোধ হয় তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাই সে বিরক্তি খানিক পরেই বিলীন হইয়া গেল। সে বলিল, তুমি বৈদ্য ?

হাঁ।

কোথাকার ?

তক্ষশীলার।

তক্ষশীলা নামটি তাহাকে আরো একটু প্রভাবিত করিল। সে আরো একটু

নম্র হইয়া বলিল, আমাদের মহাক্ষত্রপের স্ত্রী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন তুমি কি তাঁহার চিকিৎসা করিতে পারিবে ?

কেন পারিব না।

সে আমার কাপড় চোপড়ের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু কিছু বলিল না। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে এস বলিয়া তাহার অনুসরণ করিতে বলিল।

আমি তখন তাহাকে অনুসরণ করিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিলাম। দেখিলাম উপরে উঠিবার সিঁড়িতে নানা রঙের গালিচা পাতা। সিঁড়ির দুই দিকে সুন্দর কারুকার্য এবং ঘরের মেঝেতে মহামূল্য ফরাস পাতা। দরজায় দ্বিধাবিভক্ত সূক্ষ্ম পর্দা। পার্শ্বে দুইজন সুন্দরী রমনী দাঁড়াইয়াছিল। দরজার নিকটে গিয়া সে আমায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া একজন সুন্দরীর কানে কানে কি বলিল। সে খুব সাবধানে দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ভিতরে যাইতে বলিল।

রাজকর্মচারী নীচে নামিয়া গেল। আমি সেই সুন্দরীকে অনুসরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিতেই একটা মধুর সুগন্ধের সুরভি আমার নাকে গেল। ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে আমি ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইলাম। এমন সুসজ্জিত গৃহ আমি ইতি পূর্বে দেখি নাই। গৃহসজ্জায় নিপুণতা ও সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় ছিল। ফরাস, পর্দা, মসনদ, দীপদান, চিত্র ও মূর্তিগুলি এভাবে সাজানো ছিল যে সমগ্র কক্ষটীকে আমার চিত্র বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ডান দিকে দেয়ালের পাশে পুরু মোটা গদীর ওপর দু তিনটী মসনদ। তাহারি একটীতে একজন মধ্য বয়সী স্থূল পুরুষ বসিয়া ছিলেন। তাঁহার অনতি দূরে এক অনুপম সুন্দরী যোড়শী তরুণী বসিয়াছিল যাহার গায়ের রঙ শ্বেত কমলের চাইতেও বেশী কোমল। তাহার কপোলের ওপরটা হাল্কা লাল। ঠোঁট দুটীর লালিমা শুক চঞ্চুকেও লজ্জা দেয়। ধনুকের মত বাঁকা তাহার ভ্রূযুগল সোণালী। তাহার দীর্ঘ পক্ষ্মবিশিষ্ট নীল চোখ বিষণ্ণ ও আদ্র। তাহাকে দেখিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। চণ্ডীমন্দিরের পঞ্চবটীতে বিদ্যুৎ ঝলকে যে মুখ আমি দেখিয়াছিলাম সেই মুখের সঙ্গে এই মুখের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রহিয়াছে দেখিলাম।

আমি তাহাকে আর একবার না দেখিয়া পারিলাম না। দেখিলাম তাহার গায়ে সোণালী মখমলের অঙ্গাবরণ ও শাল শালোয়ার। শরীরে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই কিন্তু সেই অলঙ্কার সে এরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছে যে তাহাতে অলঙ্কারের সৌন্দর্য যেন আরো বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার তখন এক কবির কথা মনে পড়িল যে লিখিয়াছিল রত্ন স্ত্রীজাতিকে কি ভূষিত করিবে ? স্ত্রীজাতি রত্ন ছাড়াও

মনোহারিণী। কিন্তু স্ত্রীজাতির অঙ্গ সঙ্গ না পাইলে রত্ন কাহারও মনোহরণ করে না।

কক্ষে এই দুইজন ছাড়াও আর কয়েকজন তরুণী উপস্থিত ছিল কিন্তু তাহাদের চেহারা ও বিনীত ভাব দৃষ্টে বুঝিলাম তাহারা ক্ষত্রপের অন্তঃপুর পরিচারিকা।

ক্ষত্রপের সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি বিনীতভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই কি তক্ষশীলার হিন্দু বৈদ্য ?

প্রত্যুত্তর দিলাম, হাঁ মহাক্ষত্রপ।

তিনি বলিলেন, আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। আমার বৈদ্যদের ওষুধে কোন ফল হইতেছে না।

বলিলাম, আমি একবার তাঁহাকে দেখিতে চাই।

আচ্ছা তবে চল ভেতরে যাই—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্বেতপাথরের দেয়াল হইতে শ্বেত পর্দা সরাইয়া দিতেই ভেতরে যাইবার পথ দেখা গেল। ক্ষত্রপ ও ষোড়শী আগে চলিলেন। এবং আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আর একটী কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সেখানে হাতীর দাঁতের পায়াওয়ালা একটি পালঙ্কের বিছানা। তাহার ওপর ফেনসদৃশ কোমল সাদা শয্যার ওপর ক্ষত্রপাণী শুইয়া ছিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর শ্বেতবস্ত্রের আবরণে ঢাকা ছিল। শুধু চিবুকের ওপরিভাগ খোলা ছিল। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম তাঁহার চেহারার সঙ্গে ষোড়শীর চেহারার অবিকল মিল ছিল। কিন্তু ষোড়শীর তরুণ সৌন্দর্যের স্থলে ইঁহার ভিতর প্রৌঢ়াবস্থার প্রভাব ও দীর্ঘ রোগভোগের চিহ্ন বর্তমান ছিল। ক্ষত্রপাণীর ওষ্ঠ তাহার লালিমা হারাইয়া ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল। বোজা চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছিল। পীতাভ ভ্রূ এবং সতেজ ললাটের স্নিগ্ধ শুভ্রতা রুক্ষ ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল। ক্ষত্রপ ক্ষত্রপাণীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাক দিলেন। কিন্তু তিনি সামান্য নেত্র উন্মীলিত করিয়াই আবার নিমীলিত করিয়া লইলেন।

আমি তাঁহার শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার হাত বাহির করিয়া নাড়ী ধরিলাম। দেখিলাম, যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই। ইহা স্নায়বিক রোগ, ইহা হইতে যে কোন সময়ে মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতিষেধক ওষুধের নাম আমি জানিতাম। তাই ক্ষত্রপকে একটী পাত্রে যত পুরুনো সম্ভব হয় তত পুরুণো দ্রাক্ষাসব আনাইতে বলিলাম।

সেই বস্তুর ক্ষত্রপের নিকটে অভাব ছিলনা। রক্তের মত লাল সেই পুরুণো দ্রাক্ষাসব পরিপূর্ণ শুভ্র কাঁচের পাত্র তাই পরিচারিকা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। সোণার চষকে সেই সুরা আমি ঢালিয়া লইলাম। তাহারপর আমার পুঁটুলি

হইতে এক রত্তি ওষুধ বাহির করিয়া ক্ষত্রপাণীর মুখ হাঁ করাইতে বলিলাম। ক্ষত্রপ তাঁহার মুখ হাঁ করাইতে সেই ওষুধ আমি তাঁহার মুখে ফেলিয়া একটুখানি সুরা তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলাম। ক্ষত্রপাণীকে তাহা গিলিতে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম, আর ভয় নাই। উনি খানিক বাদেই চক্ষু মেলিবেন—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ববর্ণিত কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম।

ক্ষত্রপ ও পারসিক বৈদ্যদের সঙ্গেই কথা বলিতেছিলাম। পারসিক বৈদ্যরা ব্যাধির ইতিবৃত্ত আমায় শুনাইতে ছিল। ইতিমধ্যে পরিচারিকা আসিয়া ক্ষত্রপকে ডাক দিল। বলিল ক্ষত্রপাণী তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

ক্ষত্রপের চোখে মুখে আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে গেলেন। দেখিলাম ক্ষত্রপাণীর চোখ সম্পূর্ণ খোলা। তাঁহার চেহারায় জীবনের স্পন্দন ফিরিয়া আসিয়াছে।

ক্ষত্রপ ক্ষত্রপাণীর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইতে ক্ষত্রপাণী বলিলেন, আমি এখন বেশ ভালো আছি। সেকথা বলিবার জন্য তোমায় ডাকাইয়াছি—

ক্ষত্রপ আমাকে দেখাইয়া বলিলেন—সে এই হিন্দু বৈদ্যের জন্য। এও সেই কথাই বলিতেছে।

ক্ষত্রপাণী আমার দিকে কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাইলেন। বলিলেন, বৈদ্য তুমি রোগ চেন, অন্যেরা কিছুই জানে না।

আমি সাধারণ পান্থশালায় ফিরিয়া যাইতে ছিলাম কিন্তু ক্ষত্রপ আমায় ফিরিতে দিলেন না। তাঁহার নিজের কক্ষের পাশের কক্ষে আমার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বাধ্য হইয়া আমায় সেইখানে থাকিতে হইল।

দেখিতে দেখিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ক্ষত্রপাণী এখন আরো সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। আমার বাহ্য বেশ ভূষারও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বহুমূল্য বেশবাস পরিহিত বর্তমানের আমার সঙ্গে সাধারণ পান্থশালার খরমুখ খাওয়া পূর্বেকার লোকটীর আর কোনো মিল ছিল না।

ক্ষত্রপাণী সুস্থ হইয়া উঠিলেও মহাক্ষত্রপ আমায় ছাড়িয়া দিলেন না। আমি তক্ষশীলায় ফিরিয়া যাইবার কথা বলিলে তিনি বলিলেন ক্ষত্রপাণীর ইচ্ছা তুমি আমাদের পরিবারের বৈদ্যরূপে আমাদের সঙ্গে থাক।

ক্ষত্রপাণীকে আমার নিজের কথা জানাইলাম। বলিলাম, আমার ইচ্ছা আমি দেশে ফিরিয়া গিয়া আমার দেশের অধিবাসীদের দুঃখ দূর করি। তাহাদের সেবা করি।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে ক্ষত্রপাণী যাহা বলিলেন তাহার ওপর আমার আর কথা চলিল না। তিনি বলিলেন, বৈদ্য, তোমার দৃষ্টি এত সংকীর্ণ কেন? তোমার দেশ? তোমার

দেশ কি এইটকুই। এই বিশ্বজগৎ কী তোমার দেশ নয়? তুমি তরুণ, তোমার প্রতিভা আছে। তুমি যেখানেই থাকিবে সেইখানেই পীড়িত আর্তজনের সেবা করিতে পারিবে।

ইহার কি প্রত্যুত্তর দিব?

তাহা ছাড়া ভৈরবীর কথা আমার মনে পড়িল, তক্ষশীলায় তোর ভাগ্যোদয় হইবে। ভাগ্যোদয়ের ইহাই কি প্রারম্ভ?

শেষ পর্যন্ত মহাক্ষত্রপের সঙ্গে থাকিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। পারসিকদের রাজধানী পার্সেপলিস আমি দেখি নাই। শুনিলাম মহাক্ষত্রপ শীঘ্রই পার্সেপলিস যাইবেন। ভাবিলাম ইঁহাদের সঙ্গে আমার সেই যাত্রা সুখকর হইবে।

দেখিলাম আমার এই সঙ্কল্পে অনাহিতার খুব আনন্দ হইল। অনাহিতা সেই ষোড়শী তরুণী ও ক্ষত্রপের কন্যা যাহাকে দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহার ওপর আমার সুখ সুবিধা তত্বাবধানের ভার পড়িয়াছিল। ক্ষত্রপাণী আমায় পুত্রবৎ স্নেহে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সামান্য কয়দিন হইলেও আমি একপ্রকার তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিলাম।

অনাহিতা একদিন আসিয়া আমায় বলিল, বৈদ্য, তোমায় আমি একটি জিনিষ দেখাইব বলিয়া সে একটী কাষ্ঠ পেটিকা আমার সম্মুখে রাখিল। সেই কাষ্ঠ পেটিকায় চন্দন কাঠের একটী জিন মূর্তি ছিল। সেই মূর্তি সে আমার হাতে দিল। আমি সেই মূর্তি হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলাম। সেইমূর্তি আমার অত্যন্ত প্রিয় মনে হইল।

অনাহিতা বলিল, বৈদ্য, তুমি কি বলিতে পার এই মূর্তি কাহার?

বলিলাম, পারি। এই মূর্তি ভগবান মহাবীরের। মথুরায় নিগ্রন্থ বিহারে এ ধরণের মূর্তি আমি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি।

অনাহিতা বলিল, আমি মথুরা দেখি নাই কিন্তু তক্ষশীলা দেখিয়াছি। অদ্ভূত সুন্দর জায়গা। সেইখানে এক দোকানীর কাছে এই মূর্তি দেখি। এই মূর্তির ভাবখানি আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল। শুধু তাহাই নয় এই মূর্তিখানি হাতে লইয়া মনে হইয়াছিল ইহার সহিত আমার সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের। আচ্ছা বৈদ্য, তুমি কি জন্মান্তর মান?

বলিলাম, মানি। আর এই মূর্তি সম্পর্কে তুমি এখুনি যে কথা বলিলে আমারো ঠিক তাহাই মনেহইয়াছিল। মনে হইয়াছিল এই মূর্তি আমি কোথায় যেন দেখিয়াছি—কোথায় তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। হয়ত এই মূর্তি কোন জীবনে আমার কছে ছিল।

তবে এই মূর্তি তুমিই রাখিয়া দাও—বলিয়া অনাহিতা কাঠের বাক্সটী আমার দিকে আগাইয়া দিল।

আমি সেই মূর্তি তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, না অনাহিতা, এ মূর্তি তোমার কাছেই থাক। এ মূর্তি তোমার এবং আমার উভয়ের।

অনাহিতা কি বুঝিল জানি না। দেখিলাম তাহার গৌরবর্ণ মুখ সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে আমার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া সেই মূর্তি ও কাঠের বাক্স তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ইহার পর কয়েকদিন অনাহিতাকে দেখিতে পাইলাম না। সে যে ভীষণ কাজে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাও আমার মনে হইল না। কারণ তাহার চক্ষু যে আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছে তাহা আমি প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছি। কিন্তু সে সব সময়ই দেখিতেছি নিজেকে আমার আড়ালে করিয়া রাখিয়াছে।

আমি তখনো মেয়েদের মন বুঝিতে শিখি নাই। তাহা না হইলে এই লোক দেখানো অবহেলাকে অনুরাগের লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারিতাম। বা নিজেকে সরাইয়া লইয়া আমার মনে তাহার প্রতি কৌতূহল জাগ্রত করার প্রয়াস রূপেও গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু হায় তখন আমি নিজেকেই ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম আমি কোন অসাবধান মুহূর্তে তাহার প্রতি অবিনয় প্রকাশ করিয়াছি যাহাতে সে রুষ্ট হইয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া সে কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখিলাম আমি যেন তাহার আসার প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি।

আমার এই ভাবান্তর একদিকে যেমন আমার কাছে মাধুর্য মণ্ডিত মনে হইতেছিল তেমনি অন্যদিকে আমার কাছে সব কিছু বিরস বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া পালাইয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু পারিলাম না।

এই সময় অনাহিতা যেমন অকস্মাৎ আসা বন্ধ করিয়াছিল, তেমনি অকস্মাৎ একদিন আমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এই কয়দিন আমার কাছে না আসিবার কারণ রূপে বলিল, বৈদ্য, শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া এই কয়দিন আসিতে পারি নাই।

বলিলাম, অনাহিতা, আমাকে ত সে কথা কেহ বলে নাই। বলিলে তোমায় ওষুধ দিতাম। তাহা হইলে তুমি শীঘ্রই ভালো হইয়া যাইতে।

অনাহিতা তেমনি দৃষ্টি উত্তোলিত না করিয়াই বলিল, অসুখের কথা আমি কাহাকেও বলি নাই।

আমি আর কোনো প্রশ্ন করিলাম না। বলিলাম, এখন ভালো আছ ত?

সে নিরুত্তাপ ভাবে তাহার প্রত্যুত্তর দিল—হুঁ। তাহারপর একটু থামিয়া বলিল, আগামী পরশু আমরা পার্সেপোলিস অভিমুখে যাত্রা করিব।

আমিও তাহা জানিতাম। তবু বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলাম, তাই নাকি ?

সে এবার মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে কি ছিল তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু তাহা ইন্দীবর মালার মত আমায় বন্ধন করিতেছিল, কস্তুরিকালেপের মত আমায় স্নিগ্ধ করিতেছিল ও মন্দারপুষ্পের মত আমার অন্তর-বাহির সৌরভে মগ্ন করিয়া তুলিতে ছিল।

নির্দিষ্ট সময়েই আমরা যাত্রা করিলাম এবং নির্দ্ধারিত দিনে পার্সেপোলিস আসিয়া পৌঁছিলাম। পথে এমন কিছু ঘটে নাই যাহার উল্লেখ প্রয়োজন। পথের জন্যই বোধ হয় আমি ও অনাহিতা আরো নিকটে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম আমার প্রতি তাহার ব্যবহার অনেকখানি স্বচ্ছন্দ হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর এত বড় রাজ্যের রাজধানী যে এমন বৃক্ষ-বনস্পতি বিহীন হইবে তাহা ভাবি নাই। কিন্তু মনুষ্য নির্মিত সুরম্য হর্ম্য, বৃষচূড় স্তম্ভশ্রেণী ও সৌধশিখর আমাকে বিমুগ্ধ করিয়া দিল। অপদান মহাকক্ষ নির্মাণে কত কোটি স্বর্ণ ব্যয় হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু তাহা আমার চোখে পৃথিবীর এক পরম বিস্ময় বলিয়া মনে হইয়াছিল।

পার্সেপোলিসে আমি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হইয়া পড়িলাম। মহাক্ষত্রপ আমার গুণের কথা যেভাবে যেখানে সেখানে বলিতে লাগিলেন, পারসিক চিকিৎসকেরা যে রোগ সারাইতে পারে নাই সেই রোগ আমি তরুণ হইয়াও সারাইয়া দিয়াছি তাহাতে লোকে প্রভাবিত না হইয়া পারে না। তাই সবখান হইতে আমার ডাক পড়িতে লাগিল। এমন কি দেবপুত্র দারাউসকেও আমি দেখিয়া আসিলাম। ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্নই বলিতে হইবে। ভৈরবী ঠিকই বলিয়াছিলেন তুই তক্ষশীলায় যা সেখানে তোর ভাগ্যোদয় হইবে। কিন্তু অনাহিতাকে সেদিন কেন দেখিয়াছিলাম—তাহা আজো বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। অনাহিতা আমাকে ভালবাসে তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহাকে আমি পাইতে পারি তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই। কারণ সে মহাক্ষত্রপের দুহিতাই নয়। দেবপুত্রের দূর সম্পর্কীয় এক ভগিনী কন্যাও। তাহার বিবাহ রাজবংশীয় কোন মহাক্ষত্রপের সঙ্গেই হইবে। কিন্তু তখনো জানি নাই যাহা ঘটিবার তাহা না ঘটিয়া যায় না, যাহা ঘটিবার নহে তাহা ঘটে না। মানুষ ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তটস্থ হইয়া দেখা ছাড়া তাহার আর কিছু করণীয় নাই। তাহা নহিলে স্বয়ং দেবপুত্রকে কেন স্ত্রী ও মাতাকে ফেলিয়া, বর্ম ও রাজবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সামান্য অশ্বতরের পীঠে প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে হইবে ? আর আমাকে ? —যাক সেকথা যথাস্থানে বলিব।

পার্সেপোলিসে আসিয়াই আমি প্রথম আলেকজান্দারের কথা শুনিলাম। ফিলিপ পুত্র আরিস্ততল শিষ্য আলেকজান্দার সেদিন দিগ্বিজয়ী বীরের খ্যাতি লাভ করেন নাই,

তখন মাত্র সূর্যোদয় হইয়া ছিল কিন্তু তাঁহার শৌর্য, ক্ষণস্থায়ী ক্রোধ, উচ্চাভিলাষ, ও মহান হৃদয়ের কথা লোকে আলোচনা করিত। অনাহিতার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কে কতবার আমিই আলোচনা করিয়াছি। অনাহিতাই বলিয়াছিল আলেকজান্দারের স্বপ্ন ভারতবর্ষ জয় করিয়া সমগ্র এশিয়ার অধিপতি হইবার। এবং সেই স্বপ্ন সত্যে রূপান্তরিত করিতে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইবে পারস্য। অনাহিতার কথাই সত্য হইল। অল্পদিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল আলেকজান্দারের সৈন্যদল এশিয়া মাইনরে আসিয়া অবতরণ করিয়াছে।

চারিদিকে তখন সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। স্বয়ং দেবপুত্র বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহাক্ষত্রপ ও তাঁহার পরিবারের সঙ্গে আমিও এশিয়া মাইনরে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। অনাহিতার মত গ্রীক বীর আলেকজান্দারকে আমারো দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করিয়া যখন আমরা আমানুস পর্বতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন শুনিলাম আমানুস পর্বতের ওপারে তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া আলেকজান্দার ইসাসে অপেক্ষা করিতেছেন।

দেবপুত্র তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে সেইখানেই অবস্থান করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আমরা সেইস্থানে অবস্থান করিয়া আলেকজান্দারের আক্রমণের প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আলেকজান্দার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া আমাদের আক্রমণ করিতে আসিলেন না।

আমরা যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলাম সেস্থানে যুদ্ধ হইলে কি হইত বলা যায় না। হয়ত আলেকজান্দার পরাজিত হইতেন। কিন্তু কয়েকদিন অপেক্ষা করিবার পরও যখন আলেকজান্দার আসিলেন না ও যখন সংবাদ আসিল তিনি ইসাসে সামান্য সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া সমুদ্রোপকূল ধরিয়া পিছু হটিয়া গিয়াছেন তখন আশঙ্কা করা হইতে লাগিল যে তিনি পেছনের দিক দিয়া আমানুস অতিক্রম করিয়া আমাদের বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু দিন দশ আরো অপেক্ষা করিবার পর যখন সেদিক হইতেও আলেকজান্দারের আক্রমণের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তখন আমাদের সেনা নায়কেরা অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন আলেকজান্দার সমুদ্রকূলবর্তী স্থান পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিবার সাহস করিতেছেন না। তাই আমাদের এখন এখানে চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া যেখানে তিনি এখন অবস্থান করিতেছেন সেইখানে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শেষ করিয়া দেওয়া উচিত। নানা তর্ক বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া ইসাসে অবতরণ করিল। আলেকজান্দার যে সামান্য সৈন্য সেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারা পারসিক সৈন্যদের দ্বারা নিহত হইল।

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অনেকে আলেকজান্দারকে দায়ী করেন। কিন্তু তাহা বোধহয় করা যায় না। আলেকজান্দার সামান্য অসুস্থ সৈন্যদের সেখানে রাখিয়া অন্য দিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি ভাবিতেই পারেন নাই যে বিশাল পারসিক বাহিনী গরিবত্ম' অতিক্রম করিয়া ইসাসের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য অবতরণ করিবে। কিন্তু যখন সে সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল তখন তিনি তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী লইয়া ঝটিকা বেগে পিনারাস নদীর অপরতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইল। গ্রীক সৈন্যের আক্রমণে পারসিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং যখন দেবপুত্র দারায়ুস যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন তখন পারসিক বাহিনীর সৈন্যরা যে যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল। পারসিক শিবির ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আলেকজান্দার স্বয়ং দেবপুত্রের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। দেবপুত্র উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজবেশ ও বর্ম পরিত্যাগ করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে বিচরণক্ষম অশ্বতরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সামান্য সৈনিকের বেশে রাত্রির অন্ধকারে পার্বত্য সানুদেশে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আলেকজান্দার সেই বর্ম ও রাজপরিচ্ছদ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পলাইবার ব্যস্ততায় তিনি স্বীয় স্ত্রী ও মাতার কথা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা আলেকজান্দারের হাতে বন্দীনী হইলেন। আমরাও বন্দী হইলাম। মহাক্ষত্রপ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রপাণী সেই সংবাদ পাইয়া বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিলেন। আমরা তাঁহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিলাম না। তাই বলিতেছিলাম যাহা ঘটিবার তাহা না ঘটিয়া যায় না এবং যাহা ঘটিবার নহে তাহা ঘটে না। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই বিপর্যয়েও আমি ও অনাহিতা একে অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি নাই। দেখিলাম পরদিন আমাদের এক নৌকায় তোলা হইল। শুনিলাম আমাদের গ্রীসে প্রেরণ করা হইবে। অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে আমরাও গ্রীসে চলিলাম। অনাহিতা কাতরভাবে আমার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে কোন জিজ্ঞাসা ছিল না যেন তাহার পূর্ব জীবন আজ সম্পূর্ণ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, যেন সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার মত আর কিছুই বাকী নাই। আমরা বিশেষ কিছুই সঙ্গে আনিতে পারি নাই কিন্তু দেখিলাম অনাহিতা সেই চন্দন মূর্তির ছোট্ট কাঠ পেটিকা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

অনাহিতাকে এত নিকটে ইহার পূর্বে আর কোনো দিনই পাই নাই। আমরা দুজনে নৌকার পাটাতনে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। তাহার সোণালী চুল বাতাসে উড়িয়া আসিয়া আমার মুখে পড়িতেছিল। সে কি ভাবিতেছিল জানিনা। কিন্তু আমার শ্রাবস্তীর সেই রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। যে নৌকা সেদিন ছায়াছবির মত দেখিয়াছিলাম সেই নৌকায় আজ আরোহণ করিয়া জলে ভাসিয়া চলিয়াছি।

অনাহিতার মুখের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ভীরু মনে হইল। সমুদ্র যদিও শান্ত ছিল তবু সেই লবণাম্বুরাশির দিকে চাহিয়া মনে ভয় জাগা স্বাভাবিকই ছিল। সে সহসা আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহারপর সেই প্রথম আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। বলিল, অতীশ, তুমি আমায় কখনো পরিত্যাগ করিবে না তো ?

তাহার এই প্রশ্নের কারণ আমি বুঝিতে পারি। কারণ আমরা এখন স্বাধীন নই, পরাধীন। তাই আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু আমি জানি তাহা হইবার নয়। ভৈরবী সেইজন্যই স্পষ্ট করিয়া সেদিন কিছু বলেন নাই। মৃত্যু ছাড়া কেহই তাহাকে আমার নিকট হইতে বিশ্লিষ্ট করিতে পারেনা। তাই কোন কথা না বলিয়া তাহার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে লইলাম। তাহারপর তাহা ধীরে ধীরে আমার বুকের ওপর চাপিয়া ধরিলাম।

অনাহিতার মুখে কয়দিন পর প্রথম হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসি মন্দারপুষ্পের মতই নির্মল ছিল কিন্তু সেই হাসি আমার হৃদয়ে সূচীবৎ তীক্ষ্ণ বেদনাও সঞ্চারিত করিল। শ্রাবস্তীর সেই রাত্রির কথা বলি বলি করিয়াও তাহাকে বলিতে পারিলাম না। সে আমার আরো নিকটে সরিয়া আসিয়াছিল। আমি তখন আবেগের স্বরে বলিলাম, না অনাহিতা না। মৃত্যু পর্যন্ত কেহই আমাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

সমুদ্র সেদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শান্ত ছিল কিন্তু বিকালের দিকে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল—সেই মেঘ ক্রমে বড় হইল। সহসা কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিল। আমাদের নৌকার পাল নামাইয়া লওয়া হইয়াছিল কিন্তু নৌকা ভীষণ দুলিতে লাগিল। সম্মুখে একখানি নৌকাকে উল্টাইয়া যাইতে দেখিলাম। বোধ হয় আমাদের নৌকাও উল্টাইয়া যাইবে। আরোহীরা চীৎকার করিতেছিল। কিন্তু অনাহিতাকে দেখিলাম সে বেশ শান্ত ছিল।

নৌকা তখন ডুবিতেছিল। অনাহিতা আমার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে তখন দুই বাহু দিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিল। আমিও তাহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলাম। দেখিলাম সেই মুহূর্তেও সে সেই চন্দন মূর্তি পরিত্যাগ করে নাই। সেও হাসিল, আমিও হাসিলাম। কারণ সেই মূর্তি তাহার এবং আমার উভয়ের। সে বলিল মৃত্যু পর্যন্ত। আর সেই মুহূর্তে নৌকা উল্টাইয়া গেল। আমিও বলিলাম, মৃত্যু পর্যন্ত। আমাদের সেই আলিঙ্গন শিথিল হয় নাই। দেবদত্তার ও আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই চন্দন মূর্তিও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল।

জৈন দর্শনে স্যাদ্বাদ

হরিমোহন ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

ইহারপর আরও একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। তাহা স্যাদ্‌বাদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য তর্ক শাস্ত্রের শাসনের সম্বন্ধে। স্যাদ্‌বাদের বিস্তারিত আলোচনায় বোধহয় ইহাই সংগ্রহ করিতে পারা যায় যে, বাস্তব জগতে বস্তুর স্বরূপ একপ্রকার প্রহেলিকাময়। কারণ কোন বস্তুকেই একান্তভাবে আছেও বলিতে পারি না, আবার নাইও বলিতে পারি না। নিত্যও বলিতে পারি না, আবার অনিত্যও বলিতে পারি না। একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। বস্তু তাহার নিজ স্বরূপের দ্বারা প্রতিনিয়তও বটে, আবার প্রতিনিয়ত নয়ও বটে। সেইজন্য জৈন আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, বস্তুকে কোন এক বিশেষণে বিশেষিত করিতে যাইও না। করিতে গেলেই ভ্রমে পতিত হইবে। আমার মনে হয়, ইহার ন্যায় ব্যাবহারিক জীবনে শ্রদ্ধেয় উপদেশ আর নাই। পারমার্থিক সত্য থাকিতে পারে এবং তাহার সম্বন্ধে কোন একপ্রকার একান্ত-সত্যপ্রকাশক বাক্য-প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ ব্যাবহারিক জগতে আমাদের অবস্থান করিতে হইবে, যতক্ষণ প্রতীতির সাহায্যে বাহ্য বস্তু লইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, ততক্ষণ আমার বোধহয় স্যাদ্‌বাদ প্রদর্শিত বস্তু স্বরূপ আমাদের ব্যাবহারিক জীবন যাত্রায় বাস্তবিক সহায়তা করে। বস্তু বিরুদ্ধ-ধর্মের আধার হইতে পারে এবং অবক্তব্যও হইতে পারে কিন্তু উহাই প্রকৃত বস্তুর স্বভাব এবং প্রকৃত বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়; কতকগুলি কল্পিত আন্তর ভাবের সহিত নহে।

এস্থলে আরও একটী কথার উত্থাপন বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। আরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্রে (Logic) Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নামে তিনটী নিয়ম আছে। সেই তিনটী নিয়মের কার্য হইতেছে, ভাব রাজ্যের সামঞ্জস্য নিরূপিত করা। Law of Identity অনুসারে আমরা বলিতে বাধ্য যে, যে বস্তুটীকে একবার যে প্রকার বলিয়া ধরিয়া লইব, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যেমন A is A, ঘট ঘটই। A is B, একথা বলা চলে না, বা ঘটটী নূতন বা ঘটটী পুরাতন, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা চলে না। Law of Contradiction বলে যে, একটী মাত্র বস্তুতে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মকল্পনা করা

যায় না। A cannot be both B and not-B। ঘটটী মৃৎসংস্থান বিশেষও বটে, আবার মৃৎ সংস্থানবিশেষ নয়ও বটে, একথা বলা যায় না। এইরূপে Law of Excluded Middle-এ বলা হয় যে বস্তু কোন দ্বি-কোটি বিনির্মুক্ত একথা বলা চলে না। হয় বল, ঘট অস্তি, না হয় বল, ঘটটী নাস্তি ; উহা অস্তি ও নাস্তি—এই দুই ভিন্ন অপর কিছু, একথা বলা চলে না। আজকালকার পাশ্চাত্য প্র্যাগম্যাটিক তর্কশাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিতে চান যে ঐ সমস্ত নিয়ম পরিণাম বা পরিবর্তনহীন আন্তর জগতে খাটিতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে খাটে না। সেইজন্য Dr. Schiller তাঁহার Formal Logic নামক গ্রন্থে প্রাচীন আরিষ্টটলের মতবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "Are they laws of thought or of things?" বাস্তব জগতের বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়। সুতরাং আমাদের চিন্তার নিয়মাবলী এমন হওয়া উচিত যে, উহারা সেই বাস্তব জগতের বস্তু সমুদায়ের প্রকৃতি নির্ণয়ে সমর্থ হয়। আজ আমরা এতক্ষণ স্যাদ্‌বাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম ঠিক এই প্রকার বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লইয়াই Schiller প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রবিদগণ চিরন্তন বস্তু নিরপেক্ষ তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) সংস্কার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আরিষ্টটল কথিত একান্তস্বরূপতা (rigid identity) ভাব জগতে থাকিতে পারে, প্রকৃতিসিদ্ধ বস্তু জগতে ঐরূপ একান্তস্বরূপতার অস্তিত্ব নাই। প্রতি বস্তুই নিত্যও বটে, পরিণমমানও বটে, উহার স্বরূপতা বজায় রাখিয়াও অনুক্ষণ ভেদকে আশ্রয় দিয়া থাকে। উহাতে identity-ও আছে আবার difference-ও আছে। জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে উহা উৎপাদ, ধ্রৌব্য ও ব্যয়যুক্ত। উহা 'অস্তি'ও বটে, 'নাস্তি' ও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। সুতরাং উপরিকথিত একান্তবাদী Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নিয়মত্রয়ের অবকাশ বস্তুজগতে নাই।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ভাগ ৩১, ১ম সংখ্যা ১৩৩১, পৃঃ ১-১০

চন্দনা

[জৈন একাঙ্কী]

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শ্রেষ্ঠী ধনবাহর অন্তঃপুর। দাসী ঘরের উঠোন ঝাড় দিচ্ছে। সেই সময় মল্লিকা আসছে]

মল্লিকা : ও মেয়ে, তাড়াতাড়ি ঝাড় দে। গৃহস্বামিনী যদি এসে যান তো মাথা কেটে নেবেন।

[মূলার প্রবেশ]

মূলা : কিরে, আমি তোদের কথায় কথায় মাথা কেটে নেই না ?

মল্লিকা : না মা, তবু আমাদের জীবনত দাসেরই জীবন। মানুষ না হয়ে যদি পশু হতাম ত এ বোধ আমাদের হত না। কালই দণ্ডপাণি জৈতলীকে গরম গরম লোহা দিয়ে পুড়িয়েছে।

মূলা : কোন জৈতলী ?

মল্লিকা : যাকে সে কালই কিনে এনেছিল। ও জৈতলীর ওপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল কিন্তু জৈতলী ওকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ? দণ্ডপাণির দাসেরা ওকে আবার ধরে নিয়ে এল। দণ্ডপাণি যখন লোহা গরম করে তাকে ছেঁকা দিতে লাগল তখন তার সে কী চীৎকার ও কান্না। সে আর বাঁচবে না। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে] না বাঁচাই ভালো। মরেই সে বাঁচবে। দাসীদের ভাগ্যই এমনি। তবুও আপনার ঘরে আমরা ভালই আছি।

[চন্দনাকে নিয়ে ধনবাহ আসছেন]

ধনবাহ : মূলা, মূলা, দেখো তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি।

মূলা : [দেখে] দাসী ?

ধনবাহ : না না, আমাদের কোন সন্তান নেই বলে তুমি দুঃখ করছিলে তাই তোমার জন্য সন্তান নিয়ে এসেছি। ওকে তোমার মেয়ের মত

পালন কর। বড় ভালো মেয়ে ও। [চন্দনার দিকে চেয়ে] তোমার নাম কি মা ?

চন্দনা : আমার নাম ? সে নাম ত শেষ হয়ে গেছে। এখন যে নামে আপনারা আমায় ডাকবেন সেই আমার নাম।

ধনবাহ : তোমার সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি ও জেনেছি তার চাইতেও শীতল চন্দনের মত তোমার স্বভাব। তাই তোমায় নাম রাখলাম চন্দনা। চন্দনা, এ তোমার মা। এ'কে মা'র মতই শ্রদ্ধা করবে।

চন্দনা : তাই করব, বাবা।

[মূলাকে প্রণাম করেছ]

ধনবাহ : মল্লিকা, একে ভেতরে নিয়ে যাও ও স্নান করিয়ে ভালো কাপড় চোপড় পরাও।

[মল্লিকা চন্দনাকে নিয়ে যাচ্ছে]

ধনবাহ : কেন মূলা, উদাস কেন ? চন্দনাকে কি তোমার পছন্দ হলনা ? তুমি খুসী হলে না মনে হচ্ছে ?

মূলা : কে বলল আমি খুসী হই নি ?

ধনবাহ : কে আর বলবে ? তুমি খুসী হলে না হলে সে কি আমি বুঝতে পারি না ? কিন্তু হ্যাঁ, তুমি ওর প্রতি দুর্ব্যবহার করো না। মনে হচ্ছে ও খুব বড় ঘরের মেয়ে। বেচারা কত কষ্টে পড়ে গেছে। তুমি ওকে শান্তি দিও।

তৃতীয় দৃশ্য

[ধনবাহের গৃহের অভ্যন্তর। মূলা ও চিলাতী। সামান্য দূরে অন্য এক দাসী কাজ করছে]

মূলা : এ সব তুই কি বলছিস চিলাতী ?

চিলাতী : স্বামিনী যা বলছি সব সত্য। মন-গড়া কিচ্ছু বলি নি। আপনিও কি নিজের চোখে দেখছেন না।

মূলা : না না। এমনত কিছু আমার চোখে পড়েনি। চন্দনা ত খুব শান্ত মেয়ে।

চিলাতী : ও সব ভড়ং। আপনি নিজে যদি চোখ বন্ধ করে থাকতে চান ত থাকুন আমি কি করতে পারি ?

মূলা : কি বলতে চাস তুই ?

চিলাতী : কি বলতে চাই ? শ্রেষ্ঠী দানশালায় আজকাল কেন বার বার যান বলতে পারেন ?

মূলা : মুখ সামলে কথা বলবি চিলাতী।

চিলাতী : আপনি আমাকে মুখ সামলে কথা বলতে বলছেন কিন্তু ঘর সামলাতে হবে আপনাকে নিজেকেই। আমিত ক্রীতদাসী মাত্র কিন্তু ঘর যদি নষ্ট হয় তবে হবে আপনার।

মূলা : না না চিলাতী, এমন কখনো হতে পারেনা, শ্রেষ্ঠী এমনিতে ধার্মিক, ব্রতধারী।

চিলাতী : হু ব্রতধারী ! আপনি এই সন্তুনা নিয়েই বসে থাকুন।

মূলা : তো তুই যা বলছিস সব সত্যি ? আমাকে দেখাতে পারিস ?

চিলাতী : কেন পারব না ?

মূলা : বেশ। নিজের চোখে না দেখে আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করতে চাই না।

[মূলা চলে যাচ্ছে। অন্য দাসীটি কাছে এসে]

দাসী : চিলাতী, এ তুই কি করলি ? চন্দনা বড় ভালো মেয়ে।

চিলাতী : ভালো ত ভালো। তাতে কি ? আছে ত দাসী-ই ! এদিকে আমরা দিনরাত খেটে খেটে মরি আর ওদিকে ও সেজেগুজে দানশালায় বসে থাকে। আমার ত গা জ্বলে যায়।

দাসী : তাই বলে কি তুই ঈর্ষ্যা বশে এক ভালো মেয়ের জীবন নষ্ট করবি ?

চিলাতী : নষ্ট ত ওকে ভাগ্যই করে দিয়েছে তা নইলে দাসী হয়ে কেন আসবে ?

দাসী : মনে হচ্ছে গোশালকের নিয়তিবাদের ভূত তোর ঘাড়ে চেপেছে।

চিলাতী : আরে, চিলাতী ওত বোকা নয়। দেখ কাউকে বলিস না যেন। তুই মদনলেখাকে জানিস তো ? ওর চোখ আছে চন্দনার ওপর। আমি যদি চন্দনাকে কোন রকমে তার ঘরে পৌঁছে দিতে পারি তবে সে আমায় এক লক্ষ কার্ষাপণ দেবে। দশ হাজার কার্ষাপণ সে আমায় আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

দাসী : এত কার্ষাপণ নিয়ে তুই কি করবি ?

চিলাতী : দাস জীবন হতে নিজেকে মুক্ত করে নেব।

চতুর্থ দৃশ্য

[অতিথিশালা। চন্দনা ও মল্লিকা]

চন্দনা : মল্লিকা, তুই কি বলতে পারিস, মা আমার প্রতি কেন এত বিরূপ ?

মল্লিকা : কেন পারব না ? তার কারণ তোর রূপ।

চন্দনা : রূপ! রূপ! রূপ! ছি ছি! সংসারে কি রূপ ছাড়া আর কিছু নেই ? রূপই কি সব ?

মল্লিকা : রূপই সব। বিশেষ করে মেয়েদের। তোর রূপের জন্যই ত শ্রেষ্ঠী কার্ষাপণ দিয়ে তোকে কিনে এনেছেন।

চন্দনা : না না মল্লিকা, তুই জানিস না। বাবার মন খুব উদার ও ভালো।

মল্লিকা : হতে পারে খুব উদার ও ভালো। কিন্তু পুরুষই ত! স্বামিনীর ভয় পাছে দাসী রানী ও রানী দাসী না হয়ে যায়।

চন্দনা : ছি ছি ছি—তাই কি.কখনো হতে পারে ?

মল্লিকা : কেন পারে না ? তুই ত শ্রেষ্ঠীর নিজের মেয়ে নোস ?

চন্দনা : এসব বলে তুই আমায় দুবিধায় ফেলিস না মল্লিকা। আমি তো তাঁতে আমার প্রতি বাৎসল্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনা।

মল্লিকা : তা ঠিক। তবে···

ধনবাহ : [বাহির হতেই] চন্দনা, মা চন্দনা!

[ধনবাহ আসছেন। মল্লিকা চলে যাচ্ছে]

চন্দনা : আসুন বাবা আসুন।

ধনবাহ : মা, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। আমায় কাজে বাইরে যেতে হবে। হতে পারে ফিরতে দু' তিন দিন লেগে যেতে পারে। খুব সাবধানে থাকবে ও সাধু শ্রমণদের পরিচর্যা যথাযথভাবে করবে। কেমন ঠিক আছে ত ?

চন্দনা : ঠিক আছে বাবা।

ধনবাহ : আচ্ছা তাহলে আমি চলি।

চন্দনা : না বাবা একটু বসে বিশ্রাম করে যান। এত রোদে হেঁটে এলেন। আমি ঠাণ্ডা জল এনে আপনার পা ধুইয়ে দি।

[চন্দনা দৌড়ে জল আনতে যাচ্ছে। শ্রেষ্ঠী সেখানে রাখা এক চৌকীতে বসছেন। চন্দনা জল নিয়ে পা ধোয়াতে গেলে]

ধনবাহ : না মা, না। আমি নিজেই ধুয়ে নিতে পারব।

চন্দনা : কিন্তু আমি যদি ধুইয়ে দি তবে কি কোনো দোষ হবে ?

ধনবাহ : দোষ কেন হবে ? তবে তুমি আমার মা। আমি কি মাকে দিয়ে আমার পা ধোয়াতে পারি ?

চন্দনা : আপনি ভুল করছেন বাবা, মা-ই' ত ছেলের লালন পালন করে।

ধনবাহ : হেরে গেলাম মা, হেরে গেলাম। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।
[চন্দনা জল ঢেলে পা ধোয়াচ্ছে। সহসা তার চুল গ্রন্থি খুলে জলে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে। ধনবাহ তা আলতো করে তুলে ধরছেন। দূর হতে চিলাতী মূলাকে তাই দেখাচ্ছে। এমন সময় অনেক দূর হতে শব্দ আসছে : জয় ভগবান অর্হতের জয়, জয় ভগবান নির্গ্রন্থের জয়, জয় শ্রমণ জ্ঞাতপুত্রের জয়]

চন্দনা : এ কিসের জয়ধ্বনি বাবা ?

ধনবাহ : জ্ঞাতপুত্র ভগবান মহাবীরের। তিনি ভিক্ষে নিতে রোজ নগরে আসেন কিন্তু আশ্চর্য, ভিক্ষে না নিয়েই আবার ফিরে যান। আজ ছ'মাস প্রায় হতে চলেছে।

চন্দনা : কেন বাবা ?

ধনবাহ : কি করে জানব মা। মহামাত্য-পত্নী নন্দা পায়েস করে ও'কে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা নেন নি। মহারাজ নিজে ও মহাদেবী ও'কে ভিক্ষে দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাও নেন নি। তিনি কেন ভিক্ষা নিচ্ছেন না তা কেউ জানে না। নৈমিত্তিকেরা বলেছে তাঁর কোনো অভিগ্রহ আছে—তা পূর্ণ হলেই তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু কি সে অভিগ্রহ তা কেউ জানে না। মা, ভারী কঠিন ও'র তপশ্চর্যা।...আচ্ছা তবে আমি চলি। সাবধানে থাকবি কেমন ?

[ধনবাহ চলে যাচ্ছেন]

চন্দনা : অভিগ্রহ। ভগবানের কি সে অভিগ্রহ ? তিনি কি আসবেন না এখানে ? যদি সে অভিগ্রহ আমার দ্বারা পূর্ণ হত! কিন্তু না আমার এত সৌভাগ্য কোথায় যে তাঁকে আমি ভিক্ষা দিতে পারি!

[চিলাতী ও মূলা এক নাপিত ও কামার নিয়ে সেখানে আসছে]

মূলা : নিয়ে যাও এই কুলটাকে। কেটে দাও এর সুন্দর চুল। হাতে পায়ে বেড়ী পরিয়ে বন্ধ করে রাখ একে অন্ধকার কুঠরীতে যেখানে সূর্যের আলোও না পৌঁছয়।

চন্দনা : কেন মা? আমি কি এমন অপরাধ করেছি যার জন্য আপনি আমায় এমন কঠোর সাজা দিচ্ছেন।

মৃণা : অপরাধ! নিজেকেই জিগ্যেস কর কালনাগিনী। আমার স্বামীকে জাদু করে নিজের বশ করতে চাস্?

চন্দনা : আপনার ভুল হচ্ছে মা। চন্দনা তা কখনো করতে পারে না। তাছাড়া তিনি ত আমায় মেয়ের মত ভাল বাসেন।

মৃণা : চুপ কর কালামুখী। আমি সব নিজের চোখে দেখেছি। চুল হাতে নিয়ে সোহাগ করছিলেন। আর তুই কিনা চাস আমায় বোঝাতে। তুই কি আমায় বোঝাবি? নিয়ে যাও এই কুলটাকে। আমি এর মুখও দেখতে চাই না।

[সকলে চন্দনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে]

[ক্রমশঃ

ডাঃ হরিসত্য ভট্টাচার্য

জৈন দর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ হরিসত্য ভট্টাচার্য বিগত ২ নভেম্বর ১৯৭৭ পরলোকে গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে জৈন তত্ত্ব বিদ্যার ক্ষেত্র যে একজন একনিষ্ঠ জ্ঞান তাপসকেই হারাল তাই নয়, আমরাও একজন উদারমনা সহৃদয় সতীর্থকেও হারালাম।

হুগলি জেলার কোন্নগরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ভট্টাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন ছয় কি সাত সেই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাই আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর বাল্যজীবন ব্যতীত হয়। কিন্তু তিনি মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন যেজন্য স্কুলের ও প্রতিযোগিতামূলক অন্য অন্য পরীক্ষায় শুধু যে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাই নয়, পুরস্কার, বৃত্তি আদিও লাভ করেছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি ও পদক লাভ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আই, এ পরীক্ষাও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি পান। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় অনার্সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এম, এ, পরীক্ষা ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ফাইনাল বি, এল, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দেই তিনি আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং দীর্ঘ ৪৭ বছর ওকালতি করে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তা হতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম আইন ব্যবসায়ে যোগ দেবার সময় হতেই তিনি ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে জৈন দর্শনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সেই সময় তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ 'ন্যায়বিন্দুর' ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ মহাবোধি সোসাইটীর জার্ণালে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

যে সময় তিনি প্রথম জৈন দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন সেই সময় বাঙ্‌লাদেশে জৈন চর্চার তেমন সূত্রপাতই হয়নি বলা যায়। তাই তাঁকে প্রায় একক ভাবে ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে এক্ষেত্রে কাজ করতে হয়েছে। পরে অবশ্য তিনি আরার কুমার দেবেন্দ্রপ্রসাদ, ব্যারিষ্টার সি আর জৈন, কলকাতার ছোটেলাল জৈন ও প্রখ্যাত জৈনাচার্য বিজয় ধর্ম সূরীর উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করেন। আচার্য বিজয় ধর্ম সূরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ট ছিল যে আচার্যের দেহাবসানের পর তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দেবার জন্য তাঁর শিষ্য বিজয় ইন্দ্রসূরী কর্তৃক তিনি শিবপুর, গোয়ালিয়রে আমন্ত্রিত হন এবং তাতে যোগদানও করেন।

সেই সময় কলকাতার পান্নালাল বাকলীওয়ালের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। 'The Place of Jainism in the Systems of Indian Philosophy', 'The Psychical Facalties in Jainism' ইত্যাদি প্রবন্ধ তাঁকে এত প্রভাবিত করে যে তাঁর সহযোগিতায় বাঙ্‌লা ভাষায় একখানা জৈন সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র প্রকাশিত করতে মনস্থ করেন। তারই ফল স্বরূপ 'জিনবাণী' প্রকাশিত হয়। জিনবাণী অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি তবু যতদিন তা বর্তমান ছিল ততদিন তিনি তার সম্পাদক মণ্ডলীর একজনই ছিলেন না, ছিলেন তার নিয়মিত লেখকও।

জীবনের গোড়ার দিকে তিনি যে চারখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাদের নাম: 'Divinity in Jainism', 'A Study of the Indian Science of Thought from the Jaina Standpoint', 'Anekanta' ও 'Namaskar Mahamantra'। শেষ দুইখানি বইয়ের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন।

তাঁর লিখিত জৈন তীর্থংকরদের সংক্ষিপ্ত জীবনী মূলক গ্রন্থ 'Lord Mahavir', 'Lord Parsva', ও 'Lord Aristanemi' জৈন সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়।

তাঁর 'Reals in Jaina Metaphysics গ্রন্থটী ১৯৪৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. ডিগ্রী লাভ করলে কলকাতার জৈন সমাজ তাঁকে বিশেষ ভাবে সংবর্দ্ধিত করেন। ১৯৬৬ সালে এই গ্রন্থটী বোম্বাইর সেঠ শান্তিদাস খেতসী চেরিটেবল ট্রাস্টের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। 'Jaina Prayer' গ্রন্থের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে আশুতোষ গোল্ড মেডাল লাভ করেন। এই গ্রন্থটী কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে প্রকাশিত হয়েছে। বাদীদেবসূরীর সুবৃহৎ প্রখ্যাত গ্রন্থ 'প্রমাণ-নয়-তত্ত্বালোকালংকার, গ্রন্থটীর রত্নপ্রভসূরীর টীকা সহ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ Jaina Gezette-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ও Dr. Jacobi'র সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই অনুবাদ বম্বের জৈন সাহিত্য বিকাশ মণ্ডলের অর্থানুকূল্যে এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা জৈন ধর্ম ও নীতি সম্পর্কিত ১২টী প্রবন্ধ প্রস্প্রতি 'Jaina Moral Doctrines, রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এইটী তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ।

ডাঃ ভট্টাচার্যের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তার্কিকতা, সত্য ও মানব প্রেম ও উদার মনোভাবের জন্য সোহনলাল বাঁকেরাই একাদেমী অব উইসডম্ তাঁকে Honorory Doctor of Law ডিগ্রী প্রদান করেন।

আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।
- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০ ।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় ।
- যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ থেকে মুদ্রিত ।

WB/NC-120
Vol. V No. 10 . Sraman : February 1978
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৮৪ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

রাজন্যদের উপদেশ দানরত মহাবীর, কাঁকালীটীলা, মথুরা, খৃষ্টীয় প্রথম শতক

ভগবান মহাবীর
প্রথম অঙ্ক
পূর্ব জীবন

[স্থান ঃ ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের রাজপ্রাসাদ। রাজা সিদ্ধার্থের শয়ন কক্ষ। সময় ঃ মধ্য রাত্রি। রাণী ত্রিশলা নিজের শয়ন কক্ষ হতে এসে সিদ্ধার্থকে জাগরিত করছেন]

ত্রিশলা ঃ আর্যপুত্র! আর্যপুত্র!

সিদ্ধার্থ ঃ [জাগরিত হয়ে] ত্রিশলা ? তুমি এত রাত্রে ?
[একটু সরে ত্রিশলাকে বসবার জায়গা করে দিচ্ছেন]

ত্রিশলা ঃ [বিছানার এক প্রান্তে বসে] না, না, এমনি। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল তাই তোমাকে বলতে এলাম। আশ্চর্য স্বপ্ন! স্বপ্ন ত নয়, যেন সত্যি। দেখলাম—হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য, ধ্বজ, কলস, সরোবর, ক্ষীর সমুদ্র, দেব বিমান, রত্ন আর নির্ধূম অগ্নি। আরো দেখলাম একটা দিব্য আলো যেন প্রবেশ করল আমার কুক্ষীতে। সে আলোয় সব কিছু আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সে আলো এমনি প্রোজ্জ্বল, ঠিক যেন মধ্যাহ্ন সূর্য অথচ দাহহীন।

সিদ্ধার্থ ঃ আশ্চর্য স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন ত আমার ভালো বলেই মনে হচ্ছে ত্রিশলা। এতে আমাদের অর্থলাভ, ভোগলাভ, পুত্রলাভ, সুখলাভ, রাজ্যলাভ হবে বলেই মনে হয়। ত্রিশলা, তোমার গর্ভে কুলদীপ পুত্র এসেছে। তবু কাল সকালে নৈমিত্তিকদের ডেকে পাঠাব তাদের মুখেই শোনা যাবে বিশদ ভাবে স্বপ্নফল। কি বল ?

ত্রিশলা ঃ আমিও তাই বলি।

□

[স্থান ঃ সিদ্ধার্থের রাজ সভা। সময় ঃ প্রভাত। পরিষদ সহ রাজা সিদ্ধার্থ বসে রয়েছেন। যবনিকার অন্তরালে সপরিকরে রাণী ত্রিশলা। রাজার সম্মুখে বসে নৈমিত্তিকেরা গণনা করছেন। রাজ সভায় তিল ধরণের স্থান নেই]

নৈমিত্তিক : মহারাজ, শাস্ত্রে আমাদের ৭২ রকমের স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে ৪২টি সামান্য ফলদায়ী, বাকী ৩০টি উত্তম ফলদায়ী। এ রকম স্বপ্ন ভাগ্যবতী রমণীরাই দেখে থাকেন। জাতক গর্ভে এলে ভাবী তীর্থংকর বা রাজচক্রবর্তীর মা দেখেন ১৪টি, বাসুদেবের মা ৭টি, বলদেবের মা ৪টি, মাণ্ডলিক দেশাধিপতির মা ১টি। মহারাণী যখন ১৪টি স্বপ্ন দেখেছেন তখন তিনি অচিরেই সর্বজ্ঞ তীর্থংকর বা রাজচক্রবর্তী রাজার জন্ম দেবেন তাতে ভুল নেই।

[একথা শোনা মাত্র চারদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। কৌণ্ডকীরা বেত্রাস্ফালন করেও তাদের শান্ত করতে পারে না। রাজা তখন তাদের নিরস্ত করে নৈমিত্তিকদের প্রচুর দান দক্ষিণা দিয়ে সভা বিসর্জিত করেন]

□

[স্থান : সিদ্ধার্থের বিশ্রাম কক্ষ। সময় : মধ্য রাত্রি। সিদ্ধার্থ উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রসূতীর সংবাদের অপেক্ষা করছেন। পরিচারিকা প্রিয়ভাষিতা সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হচ্ছে]

প্রিয়ভাষিতা : [রাজাকে প্রণাম করে] দেব, এইমাত্র মহারাণী এক নব জাতকের জন্ম দিয়েছেন। প্রসূতী ও নব জাতকের কুশল।

সিদ্ধার্থ : [চিন্তা মুক্ত হয়ে] শুনে আনন্দিত হলাম প্রিয়ভাষিতা। এই নাও তোমার পুরস্কার।

[নিজের গলা হতে খুলে তাকে সাতনলী হার দিচ্ছেন]

□

[স্থান প্রসূতীর শয়ন কক্ষের বহির্ভাগ। সময় : মধ্য রাত্রি। রাজা, মন্ত্রী ও আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। ধাত্রী দূর হতে নব জাতককে তাঁদের দেখাচ্ছে]

সিদ্ধার্থ : কচি সূর্যের রঙ নব জাতকের। মনে হচ্ছে এই মাত্র যেন সূর্যোদয় হল।

মন্ত্রী : আমারো তাই মনে হচ্ছে মহারাজ। দেখলাম—আকাশে যেমন সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ে তেমনি এর প্রভা সবখানে ছড়িয়ে পড়ল। মহারাজ, জাতকের কি দেওয়া হবে নাম ?

ত্রিশলার স্বপ্নদর্শন, কল্পসূত্র, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক
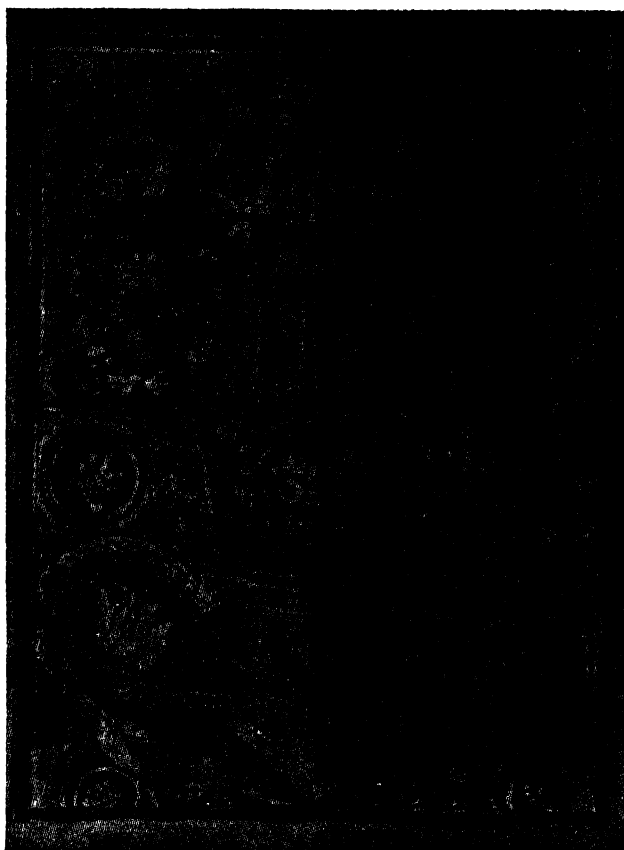
সিদ্ধার্থ : কি আবার নাম ? ও যেদিন হতে গর্ভে এসেছে সেদিন হতে লক্ষ্মীর চঞ্চলা অপবাদ ঘুচেছে। যাদের জয় করা হয়নি এমন সব সামন্ত নৃপতিরা আনুগত্য জানিয়ে গেছে। আমার মন বলছে অকারণ লব্ধ নয় এই ঋদ্ধি। তাই যখন ওর জন্য ধন-ধান্য, কোষ-কোষ্ঠাগার, বল-পরিজন ও রাজ্য সীমার বিস্তৃতি তখন ও বর্দ্ধমান।

□

[স্থান : রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান। সময় : প্রভাত। অন্যান্য বালকদের সঙ্গে রাজপুত্র বর্দ্ধমান খেলা করছে]

১ম বালক : সাপ ! সাপ ! সাপ !

বর্দ্ধমান : কোথায় সাপ দেখি ?

২য় বালক : দেখতে পাচ্ছিস না ? সাপটা গাছকে জড়িয়ে রয়েছে।

১ম বালক : [বর্দ্ধমান সেদিকে এগিয়ে যেতে গেলে] না-না-না, তুই ওদিকে যাসনে বর্দ্ধমান। যদি তোর একটা কিছু হয়ে যায় তবে দেবী ভারী রাগ করবেন। [যেতে বাধা দিচ্ছে]

বর্দ্ধমান : যাঃ সর। [হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে] যত সব ভীতুর দল। এর জন্য খেলা বন্ধ করতে হবে ? এই দ্যাখ—
[গাছের কাছে গিয়ে এক ঝটকা দিয়ে সাপটাকে দূরে ফেলে দিয়ে]
এই আমি গাছে উঠলাম।
[গাছে উঠছে]

২য় বালক : বর্দ্ধমান, তুই শুধু বীর নস, মহাবীর।

বর্দ্ধমান : [গাছ হতে নেমে] আমিই প্রথম হয়েছি। তোরা কে এবার আমায় ঘাড়ে নিবি ?

সকলে : আমি। আমি। আমি।

□

[স্থান : অন্তঃপুর। সময় : মধ্যাহ্ন]

ত্রিশলা : শুনছ, ওকে আর এভাবে খেলে বেড়াতে দেওয়া হবে না। আজ যদি একটা কিছু হয়ে যেত তবে কী বিপদই না হত। এবারে ওকে লেখশালে দাও।

সিদ্ধার্থ : তাতে আমার কী অমত, তবে ওর কিছু শিখবার আছে বলে মনে হয় না ত্রিশলা। দেখেছ ওর চোখের দীপ্তি। ওর যা জ্ঞান আমাদের
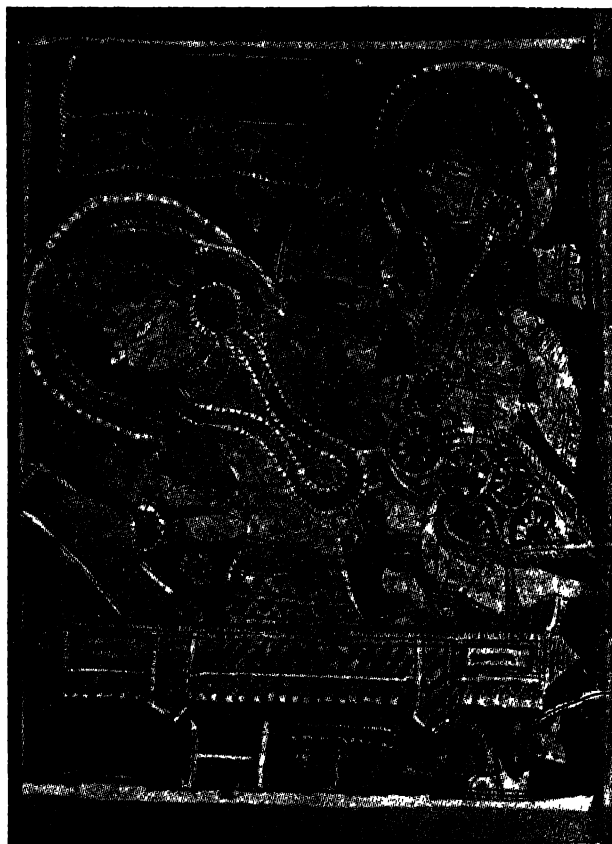
মহাবীরের জন্ম, কল্পসূত্র, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক

সকলের জ্ঞান একত্র করলেও সেখানে পৌঁছবে না। ওত জ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানী।

ত্রিশলা : ওই জন্যইত আমার এত ভয়। ও যদি আর দশজনের মতো হত। কিন্তু ওকে লেখশালে পাঠাতে যেন ভুলো না।

□

[স্থান : অন্তঃপুর। সময় : সন্ধ্যা]

সিদ্ধার্থ : কেমন বলিনি ?

ত্রিশলা : আমার হার হয়েছে। লেখশাল হতে ও প্রায় তখন তখনি ফিরে এসেছে। আচার্য নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। বললেন, ওকে শিক্ষে দেই, এমন আমার বিদ্যে নেই। আরো বললেন, বর্দ্ধমানের লেখশালে যাওয়া যেন আম গাছে আম্রপল্লব টাঙানো, সরস্বতীকে শিক্ষা দেওয়া, চাঁদকে ধবল করা, সমুদ্রে লবণ নিক্ষেপ।

□

[স্থান : অন্তপুর। সময় : অপরাহ্ন]

ত্রিশলা : তুই ওত কী ভাবিস বলত ?

বর্দ্ধমান : সে অনেক কথা মা। সংসারের কথা, জীবনের কথা, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর কথা। এই সংসার এমনিতে সুখের বলে মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তা দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ যাকে সুখ বলে মনে হয় তাও দুঃখ। কারণ সেই সুখ নিত্য নয়. তা ক্ষণিক, তার অভাবই দুঃখ। মানুষ কিন্তু সেকথা সহজে বুঝতে চায় না। তাই দুঃখ হতে আরো গভীর দুঃখে ডুবে যায়। ভূমি, গৃহ, ধন, ঐশ্বর্য, পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব এমন কি নিজের দেহও একদিন বিবশ হয়ে যায়। মা, আমি বুঝতে পেরেছি সাংসারিক সুখভোগের মধ্যে দিয়ে মানুষ কখনো নিত্য সুখ লাভ করতে পারে না। দুঃখ বরণ করে দুঃখ জয়ের মধ্য দিয়েই নিত্য সুখ লাভ করতে হয়। অর্হ‌ৎ পার্শ্ব সেই কথাই বলেছিলেন। সেই জিন নির্দিষ্ট পথ। সেই পথেই আমায় যেতে হবে।

ত্রিশলা : বাবা, তোর কথা শুনলে আমার বুক কেঁপে ওঠে।

বর্দ্ধমান : না মা, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার বেঁচে থাকতে তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমি প্রব্রজ্যা নেব না।

ত্রিশলা : তুই আমাকে নিশ্চিন্ত করলি বাবা।

□

[স্থান : অন্তঃপুর। সময় : অপরাহ্ন]

সিদ্ধার্থ : সংসারে আর থাকা চলে না, ত্রিশলা। কানের কাছের চুলগুলো পাকতে সুরু করেছে। জরা এসেছে এ তারই শমন। জীবনে অনেক ভোগইত করেছি। এখন ভোগ বিরতি। সংসার ভার বহন করার পর বহন করতে হয় সংযম ভার। কি বল ?

ত্রিশলা : কি আর বলব। তোমার যা মত, আমারো সেই মত।

সিদ্ধার্থ : শুনে খুসী হলাম ত্রিশলা। রাজ্যভার নন্দীবর্দ্ধনের হাতে তুলে দিয়ে পাদোপগমন ব্রত গ্রহণ করে চলো এবার জীবনের অবসান ঘটাই।

□

[স্থান : রাজোদ্যান সংলগ্ন সরোবর। সময় : অপরাহ্ন। গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। বর্দ্ধমান একাকী চিন্তামগ্ন। বর্দ্ধমানের অগ্রজ নন্দীবর্দ্ধন বর্দ্ধমানের পেছনে এসে উপস্থিত হয়েছেন]

নন্দীবর্দ্ধন : বর্দ্ধমান !

বর্দ্ধমান : দাদা !

নন্দীবর্দ্ধন : ঘরে তোকে দেখতে না পেয়ে সবখানে খুঁজে বেড়াচ্ছি। [চিন্তিত-ভাবে] বাবা-মার মহাপ্রয়াণের খবর বোধ হয় পেয়েছিস।

বর্দ্ধমান : পেয়েছি দাদা। [একটু থেমে] দাদা, আমি প্রব্রজ্যা নেব। অনুমতি দাও।

নন্দীবর্দ্ধন : প্রব্রজ্যা ? না না বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমান : কিন্তু প্রব্রজ্যা আমায় নিতেই হবে।

নন্দীবর্দ্ধন : কিন্তু তার কি এত তাড়া। একে বাবা মার এই শোক। তার ওপর তুই যদি আমাদের ছেড়ে চলে যাস সে আমি সহ্য করতে পারব না।

বর্দ্ধমান : কিন্তু—

নন্দীবর্দ্ধন : সে জানি বর্দ্ধমান। প্রব্রজ্যা নিতে তোকে বাধাও দেব না। তবে—

বর্দ্ধমান : তবে ?
নন্দীবর্দ্ধন : সংসারে কি দুটো বছর আরো থেকে যেতে পারিস না।
বর্দ্ধমান : তাই হবে দাদা।

□

[স্থান : জ্ঞাতখণ্ড উদ্যান। সময় : অপরাহ্ন। লোকে লোকারণ্য। বর্দ্ধমান চন্দ্রপ্রভা পালকী হতে অবতরণ করে প্রব্রজ্যা নেবার জন্য উদ্যত হয়েছেন। কুলবৃদ্ধা তাঁর বস্ত্রালঙ্কার গ্রহণ করে তাঁকে উপদেশ দিচ্ছে]

কুলবৃদ্ধা : কুমার! তোমায় আমি উপদেশ দেই সে সাধ্য আমার নেই। কারণ তুমি সকল জ্ঞানে জ্ঞানী। তবুও স্নেহের উপরোধে তোমাকে দু একটী কথা বলি। পুত্র, তুমি তীব্রগতিতে পথ অতিক্রম করবে। তোমার গৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখবে। ক্ষুরধারের মতো নিশিত এই পথ। প্রমাদহীন হয়ে তা অতিক্রম করবে। জ্ঞান দর্শন ও চারিত্র দিয়ে সর্বদা ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত রাখবে ও সমস্ত রকম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও নিজের সঙ্কল্প হতে চ্যুত হবে না। কঠোর তপস্যা দ্বারা রাগ ও দ্বেষ নির্জিত করে উত্তম ধ্যানের দ্বারা মোক্ষ লাভ করবে।

বর্দ্ধমান : সব্বম্ অকরণিজ্জং মে পাবকম্মম্—আজ হতে সমস্তরকম পাপ কর্ম আমার পক্ষে অকৃত্য।

ভগবান মহাবীর
দ্বিতীয় অঙ্ক
সাধক জীবন

[স্থান : মোরাক সন্নিবেশের বহির্ভাগে অবস্থিত দুইজ্জন্ত আশ্রম। সময় : অপরাহ্ন]

কুলপতি : এসো, এসো।

বর্দ্ধমান : আপনি কি করে জানলেন আমি এদিকে আসছি ?

কুলপতি : সূর্য কি কখনো মেঘে ঢাকা থাকে। তোমার প্রব্রজ্যার খবর এদিকে সবাই জানে। তুমি আমারি আশ্রমে অবস্থান কর।

বর্দ্ধমান : কিন্তু—

কুলপতি : না, না, তোমার কোনো কথা আমি শুনব না। তোমাকে কিছুদিন অন্ততঃ আমার আশ্রমপদে অবস্থান করতেই হবে। তোমার পিতা আমার মিত্র ছিলেন। আশ্রমের প্রতি তাঁর অনুকূল দৃষ্টি ছিল। তোমাকে তাই আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।

বর্দ্ধমান : কিন্তু আপনিত জানেন শ্রমণ ধর্মের নিয়মানুযায়ী চাতুর্মাস্য ছাড়া শ্রমণ একখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে পারে না।

কুলপতি : তা বটে। তবে প্রথম চাতুর্মাস্য আমার এখানেই করবে, কথা দাও। আর আজ তোমাকে আমার এখানেই থাকতে হবে।

বর্দ্ধমান : বেশ, তাই হবে।

□

[স্থান : দুইজ্জন্ত আশ্রম। বর্দ্ধমানের কুটীরের বহির্ভাগ। সময় : অপরাহ্ন]

কুলপতি : বর্দ্ধমান, তোমায় একটা কথা বলি। তোমার প্রতিশ্রুতি মতো তুমি এখানে বর্ষাবাস করতে এসেছ সে আমাদের আনন্দের কথা। তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রক্ষা করা। অথচ তুমি যে কুটীরে বাস কর, সেই কুটীরই রক্ষা করনা। গাই বাছুর কুটীরে ছাওয়া বিচালি, লতাপাতা খেয়ে যায় তুমি তাদের কিছু বলনা।

বর্দ্ধমান : আর্য, আমি কি করতে পারি ?

কুলপতি : পাখীরা যে নীড় বাঁধে তারা তা রক্ষা করে। তুমিও তাই করবে। গাইবাছুর তাড়িয়ে কুটীরের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আশ্রমিকেরা বলে এ তোমার ইচ্ছাকৃত অবহেলা। শুনে আমার কষ্ট হয়।

বর্দ্ধমান : তাত, আপনার কুটীর যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য আমি আজই আপনার কুটীর পরিত্যাগ করে যাব।

কুলপতি : কিন্তু আমি সেকথা বলিনি।

বর্দ্ধমান : না, আমিও ভুল বুঝিনি। কিন্তু কুটীরের রক্ষণাবেক্ষণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রমণের আত্মদেহেই মমত্ব থাকেনা, ত বিষয়ে। তাছাড়া এ পরিগ্রহ। পরিগ্রহ হিংসাকেই পুষ্ট করে। হিংসা সাম্য ভাবনার বিরোধী। যা সাম্য ভাবনার বিরোধী তা শ্রমণের পরিত্যাজ্য। আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, আমি অন্য কোথাও গিয়ে অবস্থান করব।

□

[স্থান : কোল্লাগ সন্নিবেশের রাজপথ। সময় : মধ্যাহ্ন]

গোশালক : দেব! নালন্দার তন্তুবায়শালায় যেদিন প্রথম আপনাকে দেখি, সেদিন হতে আমি আপনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছি। আপনার কৃচ্ছ্রসাধন, আপনার তিতিক্ষা, আপনার ধ্যানের গভীরতা আমায় মুগ্ধ করেছে। আপনি আমায় আপনার শিষ্যত্বে দীক্ষিত করুন।

বর্দ্ধমান : গোশালক! আমি এখনো সর্বজ্ঞ হয়নি। কেবল জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত তীর্থংকর কাউকে দীক্ষা দান করেন না।

গোশালক : তবে আপনার পরিচর্যা করবার আমায় অনুমতি দিন।

বর্দ্ধমান : গোশালক, তীর্থংকর সাধন অবস্থায় কারু পরিচর্যা গ্রহণ করেন না।

গোশালক : তবে শুধু আপনার সঙ্গে থাকবার আমায় অনুমতি দিন।

বর্দ্ধমান : গোশালক, সে তোমার অভিরুচি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তোমায় অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে। পারবে কী? কর্ম নির্জরার পথ লোহার মত দুর্বহ ও গুরুভার। সমস্ত জীবন পালন করেও তা হতে নিষ্কৃতি নেই।

গোশালক : ভগবন্, আপনি যা পারবেন আমিও তা নিশ্চয়ই পারব।

□

[স্থান : চোরাক সন্নিবেশের আরক্ষালয়। সময় : মধ্যাহ্ন। আরক্ষালয়ের বাইরে লোকের ভীড়]

প্রহরী : দেব, দু'জন নগ্ন শ্রমণ আজ নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছিল। প্রশ্ন করেও জবাব পাওয়া গেলনা। বড়টী কথাই বলেনা। আর এই ছোটটী বলে—নগরে প্রবেশের কী কোনো বাধা আছে?

রাজপুরুষ : দাও ওকে দুই ঘা। বাধা আছে কী নেই তাহলেই বুঝবে। আর [বর্দ্ধমানের দিকে চেয়ে] তোমার কী হয়েছে? বোবা রোগ? তারো ওষুধ আছে। গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে একটু লবণ ছড়িয়ে দাও। [তথাকরণ] তবু মুখ খুলছেনা। তবে জলে চোবাও। নাকে মুখে জল ঢুকতে ধ্যান ভাঙ্‌বে। গুপ্তচর হয়ে আসবার মজা তখন বুঝতে পারবে।

গোশালক : আমরা শ্রমণ, আমরা গুপ্তচর নই। আমাদের ছেড়ে দিন। ও'র আজ মৌন তাই কথা বলবেন না।

রাজপুরুষ : মৌন? দেখি কতক্ষণ মৌন থাকে। তোরা ওই ছোঁড়াটীকে বেঁধে রাখ আর বড়টীকে জলে নামা।

[সাধ্বী জয়ন্তী ও সোমার প্রবেশ]

জয়ন্তী : আরে, আরে, তোমরা এ কী করছ?

প্রহরী : [অন্য প্রহরীদের] একটু সরে দাঁড়া আর্যিকাদের আসতে দে।

[বাইরে সরগোল]

রাজপুরুষ : [উঠে দাঁড়িয়ে] আপনারা এখানে?

জয়ন্তী : ভিক্ষাচর্যার জন্য এপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আরক্ষালয়ের সামনে লোকের ভীড় দেখে ও গুপ্তচরদের সাজা দেওয়া হচ্ছে শুনে এগিয়ে এলাম। তারপর ও'কে [বর্দ্ধমানকে দেখিয়ে] দেখতে পেলাম। উনি কে তা জান? উনি ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের রাজপুত্র। এখন প্রব্রজিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ও'র আত্মিক শক্তি অপরিসীম। তোমরা ও'কে মুক্ত করে ও'র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

□

[স্থান : কূপিয় সন্নিবেশ। সময় : মধ্যাহ্ন]

গোশালক : এত কষ্ট আমার সহ্য হয় না। এই অনার্য দেশে একে ভিক্ষেই পাওয়া যায় না তারওপর কখনো চোর কখনো গুপ্তচর বলে মারধর করে। কি দরকার এখানে থাকার? তার চেয়ে রাজগৃহ কি বৈশালী বাণিজ্যগ্রামে থাকলেই হয়। সেখানকার মানুষের শ্রমণদের প্রতি

বেশ শ্রদ্ধা আছে। অন্ততঃ অনাহারে থাকতে হয় না। ক'বারইত বললাম। বলেন, কর্ম নির্জরার জন্য এই ক্ষেত্রই ভালো। ঐ যে ভিক্ষাচর্যা হতে ফিরছেন।

[বর্দ্ধমানের প্রবেশ]

দেবার্য, আজ ভিক্ষা পেলেন ?

বর্দ্ধমান : না গোশালক।

গোশালক : আজ ক'দিন হল ?

বর্দ্ধমান : বোধ হয় ছাব্বিশ দিন।

গোশালক : ছাব্বিশ দিন অনাহার ? আর ক'দিন অনাহারে থাকবেন। চলুন, রাজগৃহে ফিরে যাই।

বর্দ্ধমান : তোমার কষ্ট হচ্ছে গোশালক, তুমি ফিরে যাও। আমি আরো কিছু দিন এখানে অবস্থান করব।

গোশালক : আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু কি পাওয়া যায় এখানে। কদ্রব চালের বাসি ভাত আর টক ঘোল। তাও সব সময় পাওয়া যায় না। লা:ভর মধ্যে কুকুরের তাড়া আর লাঠিঝাঁটা। আমি রাজগৃহে ফিরে যাব স্থির করেছি।

বর্দ্ধমান : তাই যাও গোশালক।

□

[স্থান : দৃঢ়ভূমির পোলাস চৈত্য। বর্দ্ধমান মহাপ্রতিমা তপ-নিরত। সময় : রাত্রি। সংগমক নামক দুষ্ট দেব তাঁর ধ্যান ভাঙ্‌বার চেষ্টা করছে]

সংগমক : তোমার ধ্যান ভাঙতে পারব না ? তুমি কি মনে করো ? এই দ্যাখো আমি ধুলো বৃষ্টি করছি। প্রলয়কালীন এই ধুলো যখন চোখ মুখ নাক কানের ভেতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করবে তখন ধ্যান আপনি ভাঙবে। ...ভাঙল না ? আচ্ছা, তোমার মাংস এবার মাংশাসী পিঁপড়ে হয়ে আমি কু.র কুরে নেব। এখন ? ...এখনো ধ্যান ভাঙল না ? দাঁড়াও বিছে হয়ে তোমাকে আমি কাটি। দেখি, তুমি যন্ত্রণা কত সহ্য করতে পার ? ...আশ্চর্য ! এখনো ধ্যান ভাঙল না ? আচ্ছা এবার হাতী হয়ে তোমার দেহ নিয়ে আমি লোফালুফি করব। ...তবু না। বাঘ হয়ে তোমার শরীর এবারে

মহাবীরের কৃচ্ছ্রসাধনা, কল্পসূত্র, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক
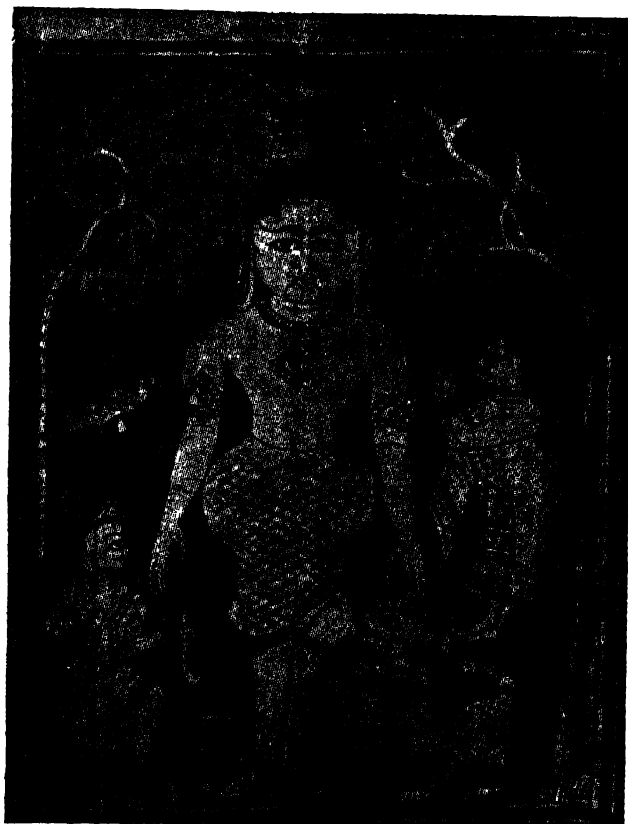
আমি দীর্ণ করি ? ...তবু না। তবে কি আমায় হার মানতে হবে ? না, না, না, হার আমি মানতে পারি না। তুমি যে ধাতুতেই তৈরী হও না কেন, ধ্যান আমি তোমার ভাঙবই। ...বর্দ্ধমান, চেয়ে দেখ আমি মদালসা, স্বর্গের অপ্সরী। তোমার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হয়ে স্বর্গ হতে আমি নেমে এসেছি। আমার সহচরীরা তোমার সেবার জন্য উন্মুখ। আমরা সকলেই চিরযৌবনা। চিরকাল তাই তুমি আমাদের সঙ্গে সুখভোগ কর। ...(সিদ্ধার্থ বলবে) বর্দ্ধমান, তুমি চেয়ে দেখো আমরা কে ? তোমার মা ও বাবা। তোমার এই শরীর-নিগ্রহ আমাদের সহ্য হয় না। তুমি ঘরে ফিরে এসো। ...(ত্রিশলা বলবে) পুত্র, তোমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ করে উর্দ্ধতন সাতপুরুষ যে ধনরত্ন সংগ্রহ করেছেন তা উপভোগ কর। ...(সিদ্ধার্থ বলবে) পুত্র, তুমি ক্ষত্রিয়। গৃহে অবস্থান করে ধর্মাচরণ কর। ভৈক্ষ্যজীবনের বিড়ম্বনা ক্ষত্রিয়ের শোভা পায় না। ...বর্দ্ধমান, আমি বিরোচন ইন্দ্র। তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে তোমায় বর দিতে এসেছি। তুমি কি চাও ? —ধন, জন, পুত্র কলত্র এমন কি স্বর্গীয় বৈভবও আমি তোমায় দিতে পারি। ...নাঃ আর নয়। পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। দপদপ করছে শুক তারা। বর্দ্ধমানের ধ্যান ভাঙতে আমি অসমর্থ হয়েছি।

[বর্দ্ধমান মহাপ্রতিমা ধ্যানে সিদ্ধ হয়ে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়াবেন]

সংগমক : দেব। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমার পরাজয় হয়েছে। আমি ভগ্নপ্রতিজ্ঞ, আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ। অদ্ভুত আপনার তিতিক্ষা। আপনি অচিরেই লাভ করবেন অনুপম জ্ঞান, অনুপম দর্শন, অনুপম চারিত্র, অনুপম লাঘব, অনুপম ক্ষান্তি, অনুপম মুক্তি, অনুপম সত্য। আপনি অচিরেই হবেন অর্হৎ, জিন, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।

ভগবান মহাবীর
তৃতীয় অঙ্ক
তীর্থংকর জীবন

[স্থান : মধ্যমাপাবা। সোমিলের যজ্ঞশালা। সময় : প্রভাত]

গৌতম : এই যজ্ঞশালার দিকে না এসে এরা সব কোথায় চলেছে? না অন্য কেউ অন্যখানে যজ্ঞের আয়োজন করেছে? কিন্তু তা যদি করত তবে আমাদেরি ত আহ্বান করত। না : ওই একটী লোক এদিকেই আসছে। দেখি, ওকেই জিজ্ঞেস করি। ওহে, শোন শোন—

[আগন্তুকের প্রবেশ]

আগন্তুক : আজ্ঞে।

গৌতম : এই সাত সকালে হন্ত-দন্ত হয়ে তোমরা সব কোথায় চলেছ?

আগন্তুক : কেন, মহাসেন উদ্যানে।

গৌতম : এই যজ্ঞশালায় না এসে মহাসেন উদ্যানে? সেখানে কি কেউ যজ্ঞের আয়োজন করেছে?

আগন্তুক : না, না, তা নয়। আপনি কি শোনেন নি তীর্থংকর মহাবীরের কথা। ঋজুবালুকা তীরে কেবল-জ্ঞান লাভ করে তিনি এখন সেখানে এসে অবস্থান করছেন। যেমন তেজস্বী, তেমনি সুবক্তা। অর্দ্ধমাগধীতে কি সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন ধর্মের তত্ব।

গৌতম : অর্দ্ধমাগধীতে? কেন, সংস্কৃত জানে না বুঝি?

আগন্তুক : জানবেন না কেন? কিন্তু আমরা কি সবাই জানি। তাই আমাদের জন্য এই আর কী। তিনিত সর্বজ্ঞ।

গৌতম : সর্বজ্ঞ? অসম্ভব। সর্বজ্ঞ আমি। সর্বজ্ঞ সংসারে এখন আর কেউ নেই। জানো আমি সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে এসেছি।

আগন্তুক : জানি আপনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কিন্তু সর্বজ্ঞ নন্। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি ত্রিকালদর্শী।

গৌতম : বুঝেছি বুঝেছি। কোন শঠ, প্রবঞ্চক বা ঐন্দ্রজালিক তোমাদের বাকবিন্যাসে বিভ্রান্ত করেছে। কি বলল সে?

আগন্তুক : বললেন, আত্মা আছে। তোমাকে যেমন প্রত্যক্ষ দেখছি সেই রকম আত্মাকেও প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

গৌতম : তাই বললে বুঝি ? [চিন্তিতভাবে] আচ্ছা তুমি যাও।
[আগন্তুকের প্রস্থান]

গৌতম : অথচ ওই বিষয়েই আমার সন্দেহ। সন্দেহের কারণ বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি বেদবাক্য। আমি এখন কি করি ? তার কাছে যাই, না···। যাওয়াই ঠিক। যদি ভণ্ড হয় তবে তার ভণ্ডামির মুখোশ খুলে যাবে আর যদি সর্বজ্ঞ হয় তবে সে আমার মনের কথা জানতে পারবে ও তার নিজে হতেই নিরসন করে দেবে।

□

[স্থান : মহাসেন উদ্যান। সময় : মধ্যাহ্ন]

মহাবীর : এসো এসো ইন্দ্রভূতি গৌতম ! আমি তোমারই অপেক্ষা করে আছি।

গৌতম : [বিস্মিতভাবে] আমার ? আপনি কি করে জানলেন আমার নাম— আমি এখানে আসছি ?

মহাবীর : এতে আশ্চর্যের কী আছে ? তোমার নাম সবাই জানে।

গৌতম : তা বটে।

মহাবীর : কিন্তু গৌতম, তোমার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ তাই নয় কী ?

গৌতম : হাঁ ভগবন্, কিন্তু এবার সত্যি আমায় বিস্মিত করেছেন। কারণ, আমার এই সন্দেহের কথা সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সবাই আমায় দিগ্বিজয়ী বলেই জানে।

মহাবীর : তুমি দিগ্বিজয়ী তাতে ভুল কি, কিন্তু তোমার ওই সন্দেহের কোন কারণ নেই গৌতম। যে দেখে, যে শোনে, যে অনুভব করে, এমন কি যে সন্দেহ করে, সেই আত্মা। গৌতম, তুমি বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে পারনি। তার তাৎপর্য পৃথিবী আদি ভূত সমুদায় হতে উদ্ভূত চেতন আত্মার সঙ্গে নয়, চেতনায় যে বিভিন্ন জ্ঞান পর্যায়ের উদ্ভব হয় তার সঙ্গে। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি-র অর্থ পরবর্তী জ্ঞান পর্যায়ের সময় পূর্ববর্তী জ্ঞানপর্যায়ের স্ফুরণ হয় না এইমাত্র।

গৌতম : বুঝতে পেরেছি ভগবন্, বুঝতে পেরেছি। আমার অনেক দিনের সন্দেহ আজ দূর হল। আমার অনেক দিনের জ্ঞানের অহঙ্কার আজ চূর্ণ হল। আপনি আমায় শ্রমণ দীক্ষা দান করুন।

□

[স্থান : মধ্যমাপাবা। সোমিলের যজ্ঞশালা। সময় : মধ্যাহ্ন]

মহাবীরের উপদেশ সভা, কল্পসূত্র, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক

অগ্নিভূতি : তুমি কি বলছ সোমিল ? এ অসম্ভব। সূর্য পশ্চিমে উদিত হতে পারে কিন্তু :বাদে ইন্দ্রভূতি গৌতম পরাজিত হয়েছেন তা হতে পারে না। তুমি হয়ত ভুল শুনেছ।

সোমিল : আমি ভুল শুনি নি। আর্য ইন্দ্রভূতি তাঁর পাঁচ শত শিষ্য সহ অনাগার ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যদি বিশ্বাস না হয় তবে তুমি তা স্বচক্ষে গিয়ে দেখে আসতে পার।

অগ্নিভূতি : কিন্তু আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

বায়ুভূতি : যখন সোমিল বলছে তখন আমি না হয় বিশ্বাসই করছি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাদের কী কর্তব্য ?

অগ্নিভূতি : কর্তব্য আর কী ! আমাদের সকলের একত্রে শ্রমণ মহাবীরের কাছে যাওয়া ও তাকে বাদে পরাস্ত করে ইন্দ্রভূতি গৌতমকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনা।

সোমিল : আর যদি বাদে তোমরা পরাজিত হও ?

বায়ুভূতি : তবে ইন্দ্রভূতির পথই আমরা অনুসরণ করব।

সোমিল : তবে সেখান হতে কেউই তোমরা আর ফিরে আসবে না।

□

[স্থান : রাজগৃহ। মহাবীরের ধর্মসভা। সময় : প্রভাত। মগধ নৃপতি শ্রেণিক বিম্বিসার সপরিকরে সেই ধর্ম সভায় উপস্থিত]

মহাবীর : সংসারে চারটী জিনিষ দুর্লভ। মনুষ্য-জন্ম, সদ্‌ধর্ম-শ্রবণ, ধর্মে শ্রদ্ধা, ও ধর্মে উদ্যম।

শ্রেণিক : ভগবন্, মনুষ্য জন্মের এত গুরুত্ব কেন ?

মহাবীর : শ্রেণিক, মনুষ্য জন্মের গুরুত্ব এই জন্য যে নারক ও তীর্যক জীব কর্মফল ভোগের জন্যই দেহ ধারণ করে। স্বর্গও ভোগ ভূমি। দেবতারা পুণ্য কর্মের ফল ভোগের জন্যই স্বর্গে দেহ ধারণ করেন। কর্মভূমি তাই একমাত্র এই মনুষ্যলোক। মনুষ্য-জন্মের তাই এত গুরুত্ব। একমাত্র মানুষ্য জন্ম-হতেই জীব মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু শুধু মনুষ্য-দেহ ধারণ করলেই হয় না। আমাদের চারপাশে অগণিত মানুষ রয়েছে। তারা কি সকলে মুক্তি লাভে সমর্থ ? না। তার কারণ তারা সদ্‌ধর্ম শ্রবণই করেনি। তাই ধর্ম-শ্রবণ সংসারে দুর্লভ। শ্রেণিক, সদ্‌ধর্ম শ্রবণই সব নয়। এখানে কয়েক হাজার লোক উপস্থিত।

তাদের সকলের ধর্ম-শ্রবণ হয়েছে। কিন্তু সকলের কী হয়েছে ধর্মে শ্রদ্ধা? হয়নি। সংসারে শ্রদ্ধা তাই দুর্লভ। কিন্তু শ্রেণিক, শ্রদ্ধাও সব নয়। চাই উদ্যম—নিরলস প্রয়াস। প্রয়াসহীন শ্রদ্ধা অর্থহীন, বন্ধ্যা। তাই এই চারিটির সংযোগ সংসারে দুর্লভ।

শ্রেণিক : ভগবন্, ধর্ম কী?

মহাবীর : ধর্ম অহিংসা, সংযম ও তপ। সমস্ত জীবে সমভাবই অহিংসা। সংযম আত্মনিয়ন্ত্রণ, রাগ-দ্বেষ জয়। তপ তপস্যা। সমভাব ছাড়া রাগ-দ্বেষ জয় করা যায় না। তাই অহিংসা পরমো ধর্ম। শ্রেণিক, সংসারে অগণিত জীবের মধ্যে মানুষের সংখ্যা কম, মানুষের মধ্যে যারা সদ্‌ধর্ম শ্রবণ করেছে তাদের সংখ্যা আরো কম। যারা সদ্‌ধর্ম শ্রবণ করেছে তাদের মধ্যে শ্রদ্ধাবান আরো কম। শ্রদ্ধাবানদের মধ্যেও আবার উদ্যমী আরো পরিমিত। শ্রেণিক, বহু পুণ্যের ফলে এই মনুষ্য-দেহ লাভ করে তাকে হেলায় বিনষ্ট করো না। তোমার ধর্ম শ্রবণ হয়েছে, ধর্মে শ্রদ্ধা, এবার ধর্মে উদ্যমী হও।

শ্রেণিক : ভগবন্, আমি শ্রমণ ধর্ম গ্রহণে অসমর্থ। শ্রাবক ধর্ম পালনেও। আমায় শুধু সম্যকত্ব ব্রত দিন।

মহাবীর : তোমার যেমন অভিরুচি।

□

[স্থান : কৌশাম্বী : মহবীরের ধর্মসভা । সময় : প্রভাত]

জয়ন্তী : ভগবন্! জীব কি ভাবে গুরুত্ব অর্জন করে?

মহাবীর : জয়ন্তী, হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহের দ্বারা। শুকনো লাউয়ের খোল যদি কর্দমলিপ্ত করে জলে ফেলে দেওয়া হয় তবে তা ডুবে যায় সেইরকম। সেই খালে যখন মাটীর প্রলেপ থাকেনা তখন তা ভেসে ওঠে। তেমনি হিংসাদি ক্লিষ্ট কর্মের অবসানে জীবও উর্দ্ধগতি লাভ করে ও লোকাকাশের উপরস্থ সিদ্ধশিলায় গমন করে ও নিত্য আনন্দে বিরাজিত হয়। সেখান হতে আর তাকে সংসার চক্রে পুনরাবর্তন করতে হয় না।

জয়ন্তী : ভগবন্! সংসারে ঘুমিয়ে থাকা ভালো না জেগে থাকা?

মহাবীর : জয়ন্তী, কারু পক্ষে জেগে থাকা ভালো, কারু পক্ষে ঘুমিয়ে থাকা।

জয়ন্তী : ভগবন্! তার কারণ কী?

মহাবীর : তার কারণ, যে অধর্মী, যে অধর্ম পথে চলে, যে অধর্ম আচরণ করে, অধর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, তার ঘুমিয়ে থাকা ভালো। তার ঘুমিয়ে থাকায় অনেকের অনিষ্ট করতে পারে না। ফলে সে কম পাপ অর্জন করে। অপরপক্ষে যে ধার্মিক, ধর্মপথে চলে, যে ধর্মের আচরণ করে, ধর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, তার জেগে থাকা ভালো। কারণ সে সেভাবে আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও ধর্মাচারণে সাহায্য করতে পারে। জয়ন্তী, এভাবে সব কিছুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে হবে। একান্ত আগ্রহী হলে হবে না।

□

[স্থান : রাজগৃহ। রাজপথ। সময় : প্রভাত]

গোশালক : আর্দ্র'ক, তোমায় একটা কথা বলি শোন।

আর্দ্র'ক : বলুন।

গোশালক : তোমার ধর্মাচার্য শ্রমণ মহাবীর আগে একান্ত বিহারী ছিলেন, একা বিচরণ করতেন। একা অবস্থান করতেন। এখন সাধু ও গৃহীদের মণ্ডলী আহ্বান করে তাদের উপদেশ দেন, ধর্মচর্চা করেন। এর মধ্যে কি কোন বৈসাদৃশ্য দেখতে পাওনা।

আর্দ্র'ক : আপনার এই প্রশ্নের তাৎপর্য কী ?

গোশালক : আমার এই প্রশ্নের তাৎপর্য এই যে তোমার ধর্মাচার্য ভারী অস্থিরচিত্ত। পূর্বে তিনি জনসমাগম হতে দূরে থাকতেন এখন জন সমুদায় একত্রিত করে তাদের মনোরঞ্জনের দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করছেন। তাঁর পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বিরোধের দিকেও তাঁর দৃষ্টি নেই। শ্রমণের একান্তবাস যদি ধর্ম' হয় তবে তোমার ধর্ম'াচার্য এখন ধর্ম বিমুখ হয়েছেন বলতে হয় আর এই যদি ধর্ম হয় তবে তাঁর পূর্ব' জীবন নিরর্থক।

আর্দ্র'ক : আর্য! আপনি যা বলছেন তা ঈর্ষ্যাপ্রসূত। শ্রমণ মহাবীরের এই দুই জীবনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কোথায় ? তিনি যতদিন সাধক ছিলেন ততদিন একান্তবাসী ছিলেন। এখন যখন সর্বজ্ঞ, কেবলী ও তীর্থংকর হয়েছেন তখন লোক-সংগ্রহের জন্য সাধু ও গৃহী একত্রিত করে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন।

□

[স্থান : পোলাসপুর। সদ্দালপুত্রের ভাণ্ডশালা। সময় : মধ্যাহ্ন]

মহাবীর : সদ্দালপুত্র! এই মাটীর বাসন কি ভাবে তৈরী হয়েছে?

সদ্দালপুত্র : ভগবন্! জল মাটি কাদাকাদা করে ভূসো ও নাদি দিয়ে মাটীর পিণ্ড পাকিয়ে সেই পিণ্ড চাকে দিয়ে এই বাসন তৈরী হয়েছে।

মহাবীর : সদ্দালপুত্র! তা পুরুষ প্রযত্নে হয়েছে না নিয়তি বশে?

সদ্দালপুত্র : ভগবন্! নিয়তি বশে।

মহাবীর : তবে তোমার প্রযত্নে হয়নি?

সদ্দালপুত্র : না ভগবন্।

মহাবীর : আচ্ছা সদ্দালপুত্র, তোমার এই কাঁচা ও পাকা মাটীর বাসন কেউ যদি ভেঙে দেয়, ছড়িয়ে দেয়, ফেলে দেয়, তবে তুমি কী কর?

সদ্দালপুত্র : আমি তার চুলের মুঠি ধরে মাটীতে ফেলে লাঠি দিয়ে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দেই।

মহাবীর : কেন সদ্দালপুত্র? নিয়তি বশেই সে এগুলো ভেঙেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে, তবে তুমি তাকে সাজা দেবে কেন?

সদ্দালপুত্র : ঠিক বলেছেন দেবার্য। নিয়তিবাদের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। আর্য গোশালক কি ভ্রমের মধ্যেই না আমাকে এতদিন ফেলে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, নিয়তি বশেই সব কিছু হয়। পুরুষ প্রযত্ন মিথ্যা। মুক্তি—সেও নিয়তি বশেই হয়। তার জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন নেই। ভগবন্, আমার নির্গ্রন্থ প্রবচনে শ্রদ্ধা হয়েছে, নির্গ্রন্থ প্রবচনে বিশ্বাসী হয়েছি, আমি নির্গ্রন্থ প্রবচন গ্রহণ করতে চাই। আমায় শ্রাবক ধর্মে দীক্ষিত করুন।

[স্থান : শ্রাবস্তী। ছত্রপলাস চৈত্য। সময় : মধ্যাহ্ন]

মহাবীর গৌতম, তুমি আজ তোমার এক পূর্ব পরিচিতকে দেখতে পাবে।

গৌতম ভগবন্, সেই পূর্বপরিচিত কে?

মহাবীর কাত্যায়ন স্কন্দক পরিব্রাজক।

গৌতম ভগবন্, স্কন্দক এখানে কেন আসছে?

মহাবীর গৌতম, নির্গ্রন্থ শ্রাবক পিঙ্গলক আজ তাকে কয়েকটী প্রশ্ন করে। সে তার প্রত্যুত্তর দিতে পারে নি। তাই সে এখানে আসছে। এই এসে যাবে।

[স্কন্দকের প্রবেশ]

গৌতম : স্কন্দক, এসো এসো। এইমাত্র ভগবান তুমি আসছ সেকথা বললেন। তোমার মনে কয়েকটী প্রশ্ন জেগেছে তাই নয় কী ?

স্কন্দক : হাঁ গৌতম। ইনিই কী তোমার ধর্মাচার্য ?

গৌতম : হাঁ স্কন্দক।

স্কন্দক : ভগবন্, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি আসছি তা যখন জানতে পেরেছেন তখন আমার প্রশ্নও অবশ্যই জানতে পেরেছেন।

মহাবীর : স্কন্দক, তোমার প্রশ্ন লোক সান্ত না অনন্ত, জীব সান্ত না অনন্ত। সিদ্ধি সান্ত না অনন্ত। সিদ্ধ সান্ত না অনন্ত। তাই নয় কী ?

স্কন্দক : হাঁ ভগবন্।

মহাবীর : স্কন্দক, দ্রব্য, ক্ষেত্র কাল ও ভাব ভেদে লোক চারপ্রকার। দ্রব্যরূপে লোক সান্ত কারণ তা মাত্র পঞ্চদ্রব্যময়। ক্ষেত্ররূপে লোক সান্ত যদিও তার পরিমাণ উপমা দ্বারাই ব্যক্ত করতে হয়। কিন্তু কালরূপে লোক অনন্ত কারণ তা পূর্বে ছিল, এখন আছে, পরেও থাকবে। ভাবরূপেও লোক অনন্ত।
ঠিক সেইরকম দ্রব্যরূপে জীব সান্ত, ক্ষেত্ররূপে জীব সান্ত, কালরূপে জীব অনন্ত, ভাব রূপে জীবে অনন্ত।
সিদ্ধি ও সিদ্ধর বেলাতেও এই চার ভঙ্গ।

□

[স্থান : শ্রাবস্তী। কোষ্ঠক চৈত্য। সময় : প্রভাত]

আনন্দ : ভগবন্, আজ পথে আজীবিক সম্প্রদায়ের আচার্য গোশালকের সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি আমায় ডেকে বললেন, আনন্দ, তোমার ধর্মাচার্য শ্রমণ মহাবীর সর্বজ্ঞ, কেবলী ও তীর্থংকরের খ্যাতি অর্জন করেছেন তবু তাতে তাঁর সন্তোষ নেই। তিনি কি ভাবেন যে সংসারে তিনি একাই তীর্থংকর ? তাই তিনি বলে বেড়াচ্ছেন মংখলীপুত্র গোশালক আমার শিষ্য। এখনো সে সর্বজ্ঞ হয়নি। আনন্দ, তুমি যাও। গিয়ে তাঁকে বল যে আমি এখুনি তাঁর ওখানে আসছি। আমি তাঁকে আমার তপোবলে ভস্ম করে দেব। ভগবন্! গোশালক কী নিজের তপোবলে অন্যকে ভস্ম করতে সমর্থ ?

মহাবীর : হাঁ আনন্দ। গোশালক তপোবলে অন্যকে ভস্ম করতে সমর্থ। তবে

তীর্থংকরকে নয়। তার যত তপোবল তার অনন্ত গুণ বেশী তপোবল নিগ্রন্থ শ্রমণে। কিন্তু নির্গন্থ শ্রমণেরা ক্ষমাশীল হন। তাই তাঁরা তপোস্তেজ ব্যবহার করেন না। নিগ্রন্থ শ্রমণের যে তপোবল তার চাইতে অনন্তগুণ বেশী তপোবল নিগ্রন্থ স্থবিরে। কিন্তু নিগ্রন্থ স্থবির ক্ষমাশীল হন। তাই তাঁরা তপোস্তেজ ব্যবহার করেন না। নিগ্রন্থ স্থবিরের যত তপোবল তার চাইতে অনন্তগুণ বেশী তপোবল অর্হৎ তীর্থংকরের। কিন্তু অর্হৎ তীর্থংকর ক্ষমাশীল হন। তাই তাঁরা সেই তপোস্তেজ ব্যবহার করেন না। আনন্দ, তুমি সমস্ত সংঘকে সূচিত করে দাও যে গোশালক এখানে উপস্থিত হলে কেউ যেন তার সঙ্গে বিতর্ক না করে এমন কি ধর্মালোচনাতেও প্রবৃত্ত না হয়, তার কথার প্রতিবাদ না করে।

□

[স্থান : শ্রাবস্তী। কোষ্ঠক চৈত্য। সময় : মধ্যাহ্ন]

সিংহ : ভগবন্! আপনি কী আমায় স্মরণ করেছেন?

মহাবীর : হঁা। সিংহ। তুমি নাকি আমার ভাবী অনিষ্ট আশংকায় কেঁদে ফেলে ছিলে?

সিংহ : হঁা। ভগবন্! আপনার ওপর গোশালক যেদিন তপোবলের প্রয়োগ করে সেদিন হতে আপনার দেহ ব্যাধিপীড়িত। তাই গোশালকের ভবিষ্যৎবাণীর কথা মনে করে আমি ব্যাকুল হয়েছি।

মহাবীর : সিংহ, তীর্থংকর কখনো কাল পূর্ণ না হলে দেহত্যাগ করেন না। আমি এখনো ১৬ বছর এই পৃথিবীতে অবস্থান করব।

সিংহ : ভগবন্, আপনার কথা যেন সত্য হয়। আপনার কথায় আমি আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু ভগবন্ আপনার শরীর যে প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে চলেছে এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

মহাবীর : সিংহ, শরীরের প্রতি তীর্থংকরের আত্ম বুদ্ধি থাকে না। তবু যদি তোমার তাই ইচ্ছে, তবে শ্রমণোপাসিকা গাথাপত্নী রেবতীর কাছ হতে সে যে দু'ধরণের ওষুধ তৈরী করেছে—যার একটী আমার জন্য সেটী নয়, অন্যটী যা অন্যের জন্য তা নিয়ে এসো। তার সেবনে আমার শরীর সুস্থ হবে।

□

[স্থান : শ্রাবস্তী। তিন্দুকোদ্যান। সময় : প্রভাত]

কেশী : মহাভাগ গৌতম, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি।

গৌতম : পূজ্য কুমার-শ্রমণ ! আপনি স্বচ্ছন্দে আমায় প্রশ্ন করুন ।

কেশী : আর্য গৌতম, ভগবান পার্শ্ব চতুর্যাম ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন আর ভগবান মহাবীর পঞ্চযাম ধর্মের। একই নিগ্রন্থ পরম্পরায় দুই তীর্থংকরের দুই প্রকার বিধানের কারণ কি ?

গৌতম : কুমার-শ্রমণ কেশী। ধর্মতত্ত্বের উপদেশ অধিকারীর ওপর নির্ভর করে। প্রথম তীর্থংকর ভগবান ঋষভের সময় মানুষ সরল ছিল কিন্তু জড়বুদ্ধি। তাই আচার মার্গে স্থিত থাকা তাদের পক্ষে সহজ ছিলনা। আর অন্তিম তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের সময় মানুষ কুটিল ও জড় বুদ্ধি। তাই তাদের পক্ষেও আচার মার্গে স্থিত থাকা সহজ নয়। সেই জন্য এই দুই তীর্থংকর অপরিগ্রহ হতে ব্রহ্মচর্যকে আলাদা করে পঞ্চযাম ধার্মের উপদেশ দেন। কিন্তু মধ্যবর্তী ২২ জন তীর্থংকরের সময় মানুষ সরল ও চতুর বুদ্ধি হয়। তাই আচার মার্গে স্থিত থাকা তাদের পক্ষে সহজ। এজন্য তাঁরা ব্রহ্মচর্যকে অপরিগ্রহ হতে পৃথক করেন না। অপরিগ্রহেই তার সমাবেশ হয়ে যায়।

কেশী : সাধু গৌতম, সাধু। আপনার প্রজ্ঞাকে ধন্যবাদ। আমার সংশয় দূর হয়েছে। আজ হতে পার্শ্বাপত্য সম্প্রদায় ভগবান মহাবীরের তীর্থে যোগদান করছে। পার্শ্ব ও মহাবীরের দুই নিগ্রন্থ সংঘ মহাবীরের অধীনে আজ এক সংঘে রূপান্তরিত হল।

□

[স্থান : পাবা। হস্তীপালের রজ্জুশালা। সময় : অপরাহ্ন]

গৌতম : ভগবন্, আপনি আমায় স্মরণ করেছেন ?

মহাবীর : হ্যাঁ গৌতম।

গৌতম : আদেশ করুন ভগবন্ !

মহাবীর : গৌতম। পার্শ্ববর্তী গ্রামে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। তুমি সেখানে যাও ও তাকে প্রতিবোধিত করো। সে তোমার দ্বারাই প্রতিবোধিত হবে, আর কারু দ্বারা নয়।

গৌতম : যে আজ্ঞা ভগবন্ !

□

[স্থান : পাবার নিকটবর্তী গ্রাম। রাজপথ। সময় : প্রভাত]

গৌতম : কি বললে সুদর্শন ! ভগবান কালগত হয়েছেন ?

সুদর্শন : হ্যাঁ ভগবন্ !

গৌতম : বিশ্বাস হয় না সুদর্শন ! আমি যে তাঁকে দীর্ঘ ৪০ বছর ছায়ার মতো অনুসরণ করেছি তিনি তাকে তাঁর নির্বাণ সময়ে দূরে সরিয়ে দেবেন ! আমার কী দুর্ভাগ্য যে সেই সময় আমি তাঁর কাছে থাকতে পারলাম না। আমার হৃদয় বজ্র দিয়ে তৈরী তাই এখনো তা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। তারাই ভাগ্যবান যারা তাঁর প্রয়াণ সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল। জানিনা তিনি কেন প্রয়াণ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করলেন। সুদর্শন, আমি কি হতভাগ্য…না সুদর্শন, এ আমারি ভ্রান্তি। তাঁর মতো বিতরাগীতে আমার অনুরাগ ছিল। বোধহয় সেই অনুরাগ পরিত্যাগ করাবার জন্যই আমায় শেষ সময়ে তিনি পরিত্যাগ করলেন। ভগবন্, তবে তাই হোক। আজ হতে আমার তোমাতেও অনুরাগ নেই। …আমি সমস্ত রকম অনুরাগ বিরাগ পরিত্যাগ করলাম। ভগবন্ ! একি ! একি আলোর নির্ঝর ! প্রকাশের নেই আর আবরণ। আমি মুক্ত, সর্বানন্দময়, স্বাধীন।

□

[স্থান পাবা। সময় সন্ধ্যা]

গণরাজ : প্রজ্ঞার আলো নির্বাপিত হয়েছে। আসুন আমরা দ্রব্যের আলোক জ্বালিয়ে অজ্ঞান অমানিশার অন্ধকারকে আলোকিত করি।

ভগবান মহাবীর

পাত্র

১। সিদ্ধার্থ
২। নৈমিত্তিক
৩। মন্ত্রী
৪। বালক
৫। বর্দ্ধমান
৬। নন্দীবর্দ্ধন
৭। কুলপতি
৮। গোশালক
৯। প্রহরী
১০। রাজপুরুষ
১১। সংগমক
১২। গৌতম
১৩। আগন্তুক
১৪। অগ্নিভূতি
১৫। সোমিল
১৬। বায়ুভূতি
১৭। শ্রেণিক
১৮। আর্দ্রক
১৯। সদ্দালপুত্র
২০। স্কন্দক
২১। আনন্দ
২২। সিংহ
২৩। কেশীকুমার
২৪। সুদর্শন
২৫। গণরাজ

পাত্রী

১। ত্রিশলা
২। প্রিয়ভাষিতা
৩। কুলবৃদ্ধা
৪। জয়ন্তী

শ্রমণ

সূচীপত্র

চতুর্থ বর্ষ ॥ চতুর্থ খণ্ড

বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮৪

নাটক

প্রবন্ধ

ভ্রমণ

শোকসংবাদ

সংকলন

চিত্র

WB/NC-120

Vol. V No. 12 Sraman April 1978

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. R. N. 24582/73